তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব

কামদেব মুখোপাধ্যায় এম. এ (ট্রিপল)., বি. এড

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষের অধীনে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত

১৯৯৭

ST - VERF

Ref.
80.33
কাম/তারা

120025

STOCK TAKING - 2011

প্রাক্-কথন

শরৎচন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বনস্পতি-প্রায়। বিপুল তাঁর সৃষ্টি, যার মধ্যে আছে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা, গান ইত্যাদি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা সর্ববাদিসম্মত। 'ধাত্রীদেবতা', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর' ইত্যাদি তাঁর কীর্তি-সৌধ। এখানে তিনি কথাকোবিদ। মহাকবির প্রসারিত দৃষ্টিও তাঁর অনেক সৃষ্টিকে কালোত্তীর্ণ করে রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তারাশঙ্করের প্রায় দু'শত (১৯০) ছোটগল্পে তাঁর শক্তিমত্তার স্বাক্ষর যেমন চিহ্নিত, তেমনই সমাজ ও জগতের বিচিত্র পরিবেশ-প্রতিবেশ ও বিচিত্র নরনারীর রূপ ও স্বরূপ সেখানে বিবৃত। এরই সঙ্গে প্রকৃতির পরিচয়ও মেলে। বাংলা বিশেষতঃ রাঢ়বাংলার এক আঞ্চলিক চৌহদ্দীতে মাটি-প্রকৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মানুষের অজস্র শ্রেণী ও জীবন-জীবিকার নর-নারীর এখানে ভীড়। বাউরী, বৈষ্ণব, বেদে, সদগোপ, মাঝি, বাগদী, বাউল, ভিক্ষুক, পটুয়া, হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত, সাঁওতাল, জেলে, পাটনী, তান্ত্রিক এবং উগ্রক্ষত্রিয় থেকে উচ্চবর্ণের কায়স্থ-ব্রাহ্মণও আছে, তেমনই আছে জমিদার, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উদ্বাস্তু, গণিকা, শিক্ষক, ড্রাইভার, চৌকিদার, ব্যবসায়ী, যাযাবর প্রভৃতি নানা সামাজিক গোত্রের হাজার মানুষ। তাদের একদিকে যেমন শ্রেণীবিন্যাস করা যায় তেমনি তাদের মধ্যে জীবন ও জগতের শ্রেণী-সংঘাতও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ পক্ষে, তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস গভীরভাবে আলোচনা করলে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়। তারাশঙ্করের নিজস্ব বক্তব্যেও এর সমর্থন মেলে। যেমন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর লাভপুরের 'অতুল শিব ক্লাব'-এ তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর সময় তিনি বলেছিলেন—'লাভপুর আমার জন্মভূমি। আমি এই মাটিতে জন্মেছি। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক। লাভপুরের সামাজিক পরিবেশ, মানুষজন ও তাঁদের সৃজনশীল সংস্কৃতির ছায়ায় আমি লালিত হয়েছি। সেই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি ফুলের মালা কি করে পরবো। আমাকে লাভপুরের একমুঠো মাটি দাও। এই ধরিত্রী, ধাত্রীদেবতার মৃত্তিকা আমি সর্বাগ্রে মাখবো, নিজে শুদ্ধ হবো.....সম্পূর্ণ হবো।' নিজ জন্মভূমিকে তারাশঙ্কর এইভাবেই তাঁর হৃদয়ার্ঘ্য অর্পণ করেছেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। একথা প্রাণের কথা, এবং এই প্রাণের কথা চিত্রিত করায় তাঁর এত আনন্দ। এই জন্যই তারাশঙ্করের সাহিত্যে গ্রাম-গঞ্জের গণদেবতার সঙ্গে তাদের প্রতিবেশ ও পরিবেশও এত অকৃত্রিমভাবে উঠে এসেছে।

তারাশঙ্করের মননের একদিকে যেমন আছে তাঁর উপন্যাস, অন্যদিকে তেমনই আছে তাঁর ছোটগল্প। স্বাভাবিকভাবেই ছোটগল্পের আঙ্গিক ভিন্ন হলেও তার মধ্যবর্ত্তী চিত্র-চরিত্র, সমাজ, ইত্যাদিতেও তার একই চিন্তাভাবনা ও রূপের পরিচয় মেলে।

আমাদের বর্তমান আলোচনা "তারাশঙ্করের ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব"। সুতরাং, সমাজতত্ত্বের যে যে বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত, তার বিচার-বিশ্লেষণেই আমরা ঐকান্তিক।

ইতিপূর্বে তারাশঙ্করের গল্প সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও মূলতঃ সমাজতত্ত্বের নিরিখে তাঁর গল্পের বিচার-বিশ্লেষণ আজও অনুপস্থিত। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনায় তাঁর সমস্ত গল্প সমাজতত্ত্বের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণেই আমরা ঐকান্তিক।

এই দুরূহ কাজে যাঁর নিয়ত অনুপ্রেরণা, শুভৈষী-মানসিকতা, নিরন্তর-প্রচেষ্টা, অনাবিল সাহচর্য ও অগাধ স্নেহ পেয়েছি— তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় নির্দেশক ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ মহাশয়। তিনি নানা ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর অমূল্য সময় আমাকে দিতে কখনও কার্পণ্য করেন নি।

সমস্যা দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের। বিশেষ করে তারাশঙ্করের "সাহিত্য জীবন" ১ম ও ২য় খণ্ড এবং রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সম্পাদিত "গল্প পঞ্চাশৎ" এই গ্রন্থ ত্রয়। বহু অন্বেষণ করেছি; পাওয়া যায়নি কোথাও। শেষে আমার আদি নিবাস বর্ধমান জেলার মাতিশ্বর নামে এক গ্রামে অবহেলিত অথচ প্রায় শতবছরের প্রাচীন "ভোলানাথ পাঠাগারে" এগুলি পাই। অবশ্য এ বিষয়ে সাহায্য করেছিলেন আমার জন্মভূমি 'পলতা' গ্রামের অগ্রজ-কল্প কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত মহাশয়। মালদা জেলার জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য বহুভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী পাঠাগার, কলিগ্রাম ভারতীয় পাঠাগার, মালতিপুর শরৎচন্দ্র বাণীমন্দির পাঠাগার, রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের পাঠাগার থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

বীরভূমের লাভপুরে তারাশঙ্করের জন্মস্থানেও গিয়েছি। লাভপুরের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী শিবশঙ্কর আচার্য, স্থানীয় ধনডাঙ্গার বাসিন্দা তারাশঙ্কর-মনস্ক লেখক শ্রীযুক্ত বসন্ত কবিরাজ, পঞ্চায়েতের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রণব রায়, ফুল্লরাপীঠের পূজারী সমরেন্দ্রনাথ উকিল (৭০) সঞ্জীবকুমার ওঝা (৫২), পার্শ্ববর্তী গোগা গ্রামের প্রণব দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ সাহায্যে উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের মূল্যবান কথা ও তথ্য আমার কাছে ক্যাসেটেও রক্ষিত আছে।

সর্বদা অভিভাবকের ভূমিকায় আমাকে স্বতঃপ্রণোদিত ও আশীর্বাদ দিয়েছেন আমার শিক্ষক তথা প্রাক্তন সহকর্মী বর্তমানে চেরাপুঞ্জীর মঠাধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ।

সংসারে নানা ব্যস্ততার মাঝেও সততঃ প্রেরণা দিয়েছেন আমার করুণাময়ী জননী ও আমার সহধর্মিণী।

এছাড়া স্থানীয় ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহ-প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ বহুভাবে বহু উপকার করেছেন এবং আরও অনেকেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি চির ঋণী।

দু'চারটি মুদ্রণ ত্রুটি রয়ে গেল। এ ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে বিদগ্ধ পরীক্ষকদের এই গবেষণা মনোজ্ঞ হলে আমার চার বছরের নিরলস পরিশ্রম সার্থক হবে।

কামদেব মুখোপাধ্যায়

(কামদেব মুখোপাধ্যায়)

সূচীপত্র

ভূমিকা —/১

প্রথম অধ্যায়—ভূম্যধিকারী শ্রেণী-কেন্দ্রিক /৫
- ক) জমিদারশ্রেণী /৫
- খ) ম্যানেজার, নায়েব ও গোমস্তা /১৯
- গ) কেরাণী-কর্মচারীদল /২১
- ঘ) পাইক-বরকন্দাজ-পেয়াদা /২৩
- ঙ) শোষণ ও শাসন /২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়—শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘাত / ৩১
- ক) ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা /৩১
- খ) ক্যাপিটালিস্ট উৎপাদন পদ্ধতি /৩৮
- গ) ব্রাত্য শ্রেণী /৫০
- ঘ) কৃষক আন্দোলন—তেভাগা আন্দোলন /৫৮

তৃতীয় অধ্যায়—গল্পের বিচিত্র বিন্যাস, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ধরণ-ধারণ তথা বিচার-বিশ্লেষণ /৬৮
- ক) জমিদার তন্ত্রের প্রকৃতি ও বিচিত্ররূপ /৬৯
- খ) ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি /৭৬
- গ) অন্ত্যজশ্রেণীর জীবনের ভিন্নভিন্ন চিত্র /৮২
- ঘ) সমাজবিবর্তনে ক্ষয়িষ্ণু ও ক্রমবিলীয়মান গোষ্ঠী /৯১
- ঙ) লোকায়ত জীবনের নায়ক-নায়িকা /৯৪
- চ) বৈষ্ণব জীবনের নানা রূপ /১০১
- ছ) শিক্ষকজীবন সম্পর্কে প্রাচীন মূল্যবোধ /১০৬
- জ) সামাজিক সচলতা—অনুভূমিক ও উলম্বী সচলতা /১০৯

চতুর্থ অধ্যায়—রাজনীতি। /১১৫

পঞ্চম অধ্যায়—নারীচরিত্রের রূপ ও স্বরূপ। /১২৪

ষষ্ঠ অধ্যায়—বংশানুক্রম ও পরিবেশ। /১৪২

সপ্তম অধ্যায়—সংস্কার ও কুসংস্কার। /১৫৩

অষ্টম অধ্যায়—সামাজিক ব্যাধি—পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদি। /১৬৫

নবম অধ্যায়—হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক। /১৭৫

দশম অধ্যায়—ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ও ভাব। /১৮৫

একাদশ অধ্যায়—সামাজিক পরিবর্তনের ত্রিধারা /১৯০
- ক) একাভিমুখী। /১৯০
- খ) পুনরাবির্ভাবশীল। /১৯১
- গ) বিবর্তন সম্মত। /১৯২

দ্বাদশ অধ্যায়—উপসংহার। /২০৫

সংযোজন— /২০৯

ভূমিকা

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সমাজতত্ত্ব

কালের বিচারে সাহিত্যের নবীনতম অথচ সক্ষম ও সুন্দর জাতক ছোটগল্প। উনিশ শতকেই এর জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ। এর রূপ ও স্বরূপ সম্পর্কে দেশে ও বিদেশে বহু মূল্যবান আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মূলকথা — " বিন্দুতে সিন্ধু, চূড়ামণি-যোগের স্নান মুহূর্ত, ঘটনা-শুক্তিতে শায়িত একটি ক্ষুদ্র নিটোল মুক্তা, ললাট লিপিতে উৎকীর্ণ এক বাক্যের একটি গাঢ়বন্ধ জীবনানুশাসন, চোরালণ্ঠনের আলো, ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথার সরল আলেখ্য, ঘনান্ধকারের বিদ্যুৎ-ঝলক"[১] ইত্যাকার নানান অভিধায় ছোটগল্পের পরিচয় লিপিবদ্ধ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গল্প লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভিন্নরুচি বর্তমান। লেখার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা যেমন বর্তমান, তেমনই পাঠকের নিকট সেই গল্প গ্রহণ অথবা বর্জনের স্বাধীনতাও বিদ্যমান। অবশ্য লেখকগণ সর্বদাই সমকালীন জীবনদর্শন এবং মানবীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করায় ঐকান্তিক ভিন্ন স্টাইল-এ। তাই লেখকের লেখায় সমাজের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ভঙ্গীতে হয় অভিব্যক্ত ।

বর্তমান আলোচনা যেহেতু সমাজতত্ত্বের নিরিখে তারাশঙ্করের ছোটগল্প, তাই সমাজতত্ত্ব ও সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের অবতারণা এখানে প্রাসঙ্গিক।

একথা সকলেরই জানা যে, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবর্জিত মানুষ হয় দেবতা না হয় পশু। স্বভাবের তাড়নায় কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের সমাজ সৃষ্টি। সমাজেই তার জন্ম, বৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা এবং মৃত্যু। রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তি-বিশেষে ভিন্ন হলেও কোন মানুষই সমাজ ব্যতিরিক্ত নয়। তাই মানুষের জীবনে সমাজের ভূমিকা আজ অনন্য বলে স্বীকৃত। মানবজীবনে সমাজ-ই বুঝি রাষ্ট্রপুরুষ। অথচ মানুষের মনে 'সমাজ' নামক এই গুরুত্বপূর্ণ চেতনার বিকাশ ঘটেছে কিন্তু বহু বিলম্বে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে প্লেটোর Republic এবং অ্যারিস্টটলের Ethics & Politics গ্রন্থদ্বয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে হলেও সমাজ সম্পর্কে প্রথম অবতারণা লক্ষ্য করা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও এর যেমন আভাস মেলে, তেমনই প্রাচ্যের পুরাণ ও বেদেও পূর্ববর্তী পর্যায়ের নজির আছে। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, সমাজবদ্ধ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা ও নবনব তত্ত্ব এবং তথ্যের উদ্ভাবনের পর সমাজ সম্পর্কে ঔৎসুক্য—যার ফলশ্রুতিতে সমাজতত্ত্বের জন্ম। বর্তমানে এর বহু শাখা - প্রশাখা।

সমাজতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সমাজ জীবনে নানা ধরনের সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করা। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের সমাজজীবন স্মরণীয়। অষ্টাদশ শতকের শিল্প-বিপ্লব আমূল পরিবর্তন এনেছিল ইউরোপের সমাজজীবনে। যেমন - শ্রমিক-মালিক বিরোধ, শ্রমিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামভিত্তিক সমাজের অবক্ষয়, নগরভিত্তিক সমাজের গুরুত্ব, বৃদ্ধি ইত্যাদি। ফরাসী বিপ্লবের পশ্চাতেও দারিদ্র্য ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস হয় পরিলক্ষিত।

তাছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাবিকগণের বিভিন্ন দেশে গতায়াতে সেখানকার সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ এবং তাকে অবলম্বন করেই শুরু হয় ইতিহাস চর্চা। পরবর্তীকালে এই ইতিহাস চর্চা থেকেই সমাজতত্ত্বের সৃষ্টি। সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও এক বিশেষ ধারণাজাত হয়। মানুষ স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করে এবং যুক্ত হয় নানা জটিল সম্পর্কের জালে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল-ই 'সমাজ' নামে অভিহিত। সমাজ গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেছেন, "Society exists only as a time sequence, it is a becoming not a being; a process, not a product."[২] সেইসঙ্গে তাঁরা আরও বলেছেন, যে সমাজ "..... is a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of many groupings and divisions of controls of human behaviour and liberties."[৩] আবার Giddings সমাজকে বৈজ্ঞানিক অর্থে বলেছেন, "..... a society is naturally developing group of conscious beings, in which converse passes into definite relationships that, in course of time, are wrought into complex and enduring organization"[৪]

সুতরাং অনুমান করা যায় যে, সমাজস্থ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক খুবই জটিল। এ ধরণের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জাল-ই হল 'সমাজ'। যে শাস্ত্র মানুষের যাবতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক, তার সাংগঠনিক প্রকাশ, কর্মপ্রণালী ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে তাই-ই সমাজবিদ্যা।

লেখকমনের সমাজ, জীবন, কল্পনা, রূপ ইত্যাকার বোধ থেকেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য। লেখক ও পাঠক উভয়েই

উপরিউক্ত উপাদান প্রাপ্তির প্রত্যাশী। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে পাঠকশ্রেণী দুভাগে বিভক্ত— (১) প্রথম শ্রেণীর নিকট সামাজিক সত্যের চিত্রই প্রধান বলে সাহিত্যের মূল্য। (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা বহুভোগে তৃপ্তির প্রত্যাশী। শিল্পের ভোগে তাঁরা চিত্ত-সরসে ঐকান্তিক এবং সেই সঙ্গে জীবনরসপানেও তাঁদের আর্তি। আর এই ভোগের সঙ্গে মননের আত্মীয়তার মধ্যে সমাজের নানা প্রসঙ্গ জমা হয়। মোট কথা, সমাজ (সামাজিক পরিস্থিতি এবং শ্রেণীবিন্যাস), পরিবার (পারিবারিক কাঠামো), ঐতিহ্য, আচরণবিধি, সাংস্কৃতি-মান এবং অন্য একটি বৈশিষ্ট্য (মোট ব্যক্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক জানা-অজানা নানা ঘটনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অন্তরে লালিত ও পল্লবিত হয়)— এগুলির সমবায়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্যিকের মন।

সাহিত্যে যে সমাজ, রাজনীতি, প্রগতি ইত্যাদির অনিবার্য প্রভাব পড়ে তার প্রমাণের জন্যে এসেছে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং উপাদান সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটে যা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাস নির্দেশিত পথে সমাজকে বদলাতে চায়। তাই এই মতাবলম্বীগণ মনে করেন যে সাহিত্যে আর্থ-সামাজিক পটভূমির প্রতিফলন বিশ্লেষণ যেমন জরুরী, তেমনই সাহিত্যে যে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার বিচারও প্রয়োজন। এপ্রসঙ্গে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন, "লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাস মার্কসবাদী সাহিত্য ভাবনার একটি বিশিষ্ট দিক।"[৫] তিনি আরও বলেছেন, "মার্কসবাদই একমাত্রবিদ্যা যাতে দীক্ষা নিলে ঐ সম্বন্ধের গোলকধাঁধায় প্রবেশ নিষ্ক্রমণের আলো নিজের দৃষ্টিতে অনুভব করা যায়। এবং একথাও মনে রাখি মার্কসীয় জ্ঞানমার্গ একটি মৌল দৃষ্টিকোণ তা অন্য বিদ্যার ঘাতক নয়, সাহিত্য শিল্প সাধনার নিজস্ব ভূমিতে সে আগ্রাসী নয়, যতটা সম্ভব তাকেও পুষ্ট হতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রায়ই যান্ত্রিক প্রয়োগে ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যায় এই বিদ্যার সুযোগটুকু স্খলিত হয়ে পড়ে।"[৬] প্রাজ্ঞ মার্কসবাদী সমালোচকের বক্তব্যের শেষাংশে যে বিপদের সংকেত আছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটিই আজ বেশী লক্ষণীয়।

বাংলা ছোট গল্পের প্রকৃত যাত্রা রবীন্দ্রনাথ থেকেই। তাঁর অসংখ্য গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবিকার নর-নারীরা হাজির হয়েছে, যাদের সঙ্গে সামাজিক বিকাশের ধারা নিগূঢ়ভাবে অন্বিত। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও সমাজের সেইসব ব্রাত্য শোষিত শ্রেণীর প্রাত্যহিক সমাজ জীবনালেখ্য বিধৃত। তবে উপন্যাসে যা তখনও সম্ভব হয়নি, ছোটগল্পের নিগড়ে তা কিন্তু বাঁধা পড়তে শুরু করেছে। আসলে ছোটগল্প বলেই হয়ত তা করা সম্ভব হয়েছে। শুধু নিম্ন কোটির মানুষ বলেই নয়, বিচিত্র বৃত্তির এবং বৃত্তিহীন মানুষের কথা এই পথেই, এইভাবেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এমনসব তুচ্ছ, গুরুত্বহীন মানুষের মিছিল ছোটগল্পে আছে—যাদের সমস্যা বৃহৎ নয়, জটিল নয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজ বিন্যাসে এবং জীবনে প্রসারিত সত্য-ছবিকে চিনে নেওয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। এবং এদের নিয়েই উপন্যাস রচনায় বানিয়ে তোলার কথায় বিস্তারে বাস্তবতা চাপা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ছোটগল্পে চকিতে দীপ্ত হয়ে একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে। মূল্যবোধের অবসান, হতাশা ও মানসিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন, দারিদ্র্যের পীড়ন, নেতিবাচক সংশয়, উদভ্রান্ত বিহ্বলতা, ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদ, বেকারত্ব প্রভৃতি কারণে এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পর সমাজ জীবনে তথা ব্যক্তি জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তার বাস্তব চিত্র তথা সমাজচিত্র ছোটগল্পে চিত্রিত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য শুধুমাত্র আপাতদৃষ্ট সমাজচিত্রই নয়, সমাজজীবনে দ্বিধাদীর্ণ রূপ, তার হরেক রকম চিত্র-চরিত্র, মূল্যবোধ, মনোবিকলন, মানসিক বিকার— বিকৃতির আদিম রিরংসার অশ্রুতপূর্ব রূপও বিধৃত হয়েছে এই সমাজতত্ত্বের বিশাল ক্যানভাসে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলগোষ্ঠী তথা 'কল্লোল যুগ' নতুন একটি বিশিষ্ট পর্ব অধ্যায় সংযোজন করেছে। নতুন আদর্শ প্রবর্তনের তাগিদেই তার যাত্রা। বাস্তববাদের পথে এই গোষ্ঠীর লেখকদের যাত্রা বলেই 'কল্লোল' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কিন্তু "কল্লোল যুগ" নিজেদের বস্তুবাদী বলে দাবী করলেও মূলতঃ সে গোষ্ঠীর লেখকেরা ছিলেন ভাবাবেগ ও রোমান্সের সঙ্গী। সেখানকার বাস্তবতার ঘরে ফাঁকি ছিল বড়। সেজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের মধ্যে ছিল না"।[৭] তাছাড়া আধুনিক সভ্যতার আড়ালে যে মানুষের আদিম যৌন প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে—যা সমগ্র জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং যেটি "ফ্রয়েডীয়ান তত্ত্ব" নামে খ্যাত, তাকে আশ্রয় করেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক'। এখানে ভিখু ও পাঁচী সরীসৃপের মতই আদিম প্রবৃত্তির বশে বন্দী। তারাশঙ্করের 'সাপুড়ের গল্প', 'বেদের মেয়ে' প্রভৃতি এই পর্যায়ের অন্তর্গত যা সমাজতত্ত্বের নিরিখে মূল্যবান।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও মূল্যবোধের পরিবর্তনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশেষ ভূমিকা স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ এক বিপর্যস্ত মূল্যহীন অন্ধকারে প্রবেশ করেছে যেখানে ন্যায়, নীতি, ধর্ম,

নারীত্ব, মর্যাদা, মনুষ্যত্ব সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং অর্থই কেবলমাত্র জীবনের মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে প্রকট। এইসব সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যের রাজ্যেও এসেছে। প্রগতিবাদী লেখকগণ দায়িত্বের সঙ্গে তা পালন করতে এগিয়ে আসেন। এই পর্বের লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে মার্কসীয় নীতির উপর নির্ভর করে মধ্যবিত্তের সুযোগ সন্ধানী মুখোশ উন্মোচন করেন। ফলে "মধ্যবিত্তের জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের সমস্ত মোহভঙ্গ হয়ে যায়। সমস্ত কৃত্রিমতার মুখোশ যেন খুলে পড়ে এবং নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা কিছুটা শিহরিত হয়ে উঠি।"(৮) অবশ্য মানিকের অনেক পূর্বেই প্রাচীন ঐতিহ্যে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেন। তাঁর লেখনী শুধু বর্তমান নয়, যেন অতীত ও ভবিষ্যতের 'রাণার'। জীবন-দর্শন-ধর্ম-ঐতিহ্য-ফ্রয়েডীয়ান তত্ত্ব, মার্কসীয় ধারণা—ইত্যাদি সবই তাঁর লেখায় আছে। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন, "লেখকের লেখার মধ্যে ফ্রয়েড এবং মার্কসের প্রসঙ্গ যেমন আছে, ঠিক তেমনি জমিদারী কাজের কথা, শাক্ত—বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ, এদেশের গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের এবং আরো আগেকার তথাকথিত এই 'আধুনিক' যুগের নানা ঘটনার উল্লেখ আছে।" (৯) এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দুবাবুর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, "জমিদারী কাজে এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজে তারাশঙ্কর গ্রামীণ মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং কাছ থেকে দেখা এই জীবন প্রবাহকে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম দু'দশকে নানা উপন্যাস ও গল্পে আন্তরিক নিষ্ঠায় তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।" (১০) তারাশঙ্করের "শ্মশানের পথে" গল্পে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের সুপার স্ট্রাকচার অপূর্ব নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত। এখানে জমিদারের চাপরাশী, সুদখোর মহাজন, কাবুলীওয়ালা, হৃদয়হীন কবিরাজ—এযুগের সকলেই আছে। তারাশঙ্কর বলেছেন, "কম্যুনিজম যে তত্ত্ব বলে— সকল মানুষের সমান অধিকার সব মানুষ সম-মর্যাদার অধিকারী, যে তত্ত্বের মধ্যে কল্পনা এক স্বর্গরাজ্যের যে রাজ্যে অন্নে-বস্ত্রে-শিক্ষায়-স্বাস্থ্য-সুখে এক স্বর্গ রাজ্যের, যে রাজ্যের মধ্যে অনাচার নেই, পীড়ন নেই, শাসকের রক্তচক্ষু নেই, ভয় নেই, যে রাজ্য-অভয়ের রাজ্য সেই কম্যুনিজমের প্রতি ১৯১৮ সালের পর থেকে অন্ততঃ বিশ বছর ধরে প্রায় প্রতিটি লেখকই আকৃষ্ট হয়েছেন।"(১১) কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কম্যুনিষ্টদের পথ থেকে সরে দাঁড়ান। হয়তো পরবর্তী কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজকক্ষে সংযত ছিলেন না কিংবা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিলেন। এপ্রসঙ্গে লেখক স্বয়ং তাঁর 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে বলেছেন, "কম্যুনিষ্টের স্বর্গরাজ্যে কম্যুনিষ্ট দলের একাধিপত্য। সেখানে ব্যক্তি নেই, আত্মা নেই, ঈশ্বর নেই, অমৃত নেই। আছে, আত্মাহীন প্রাণ। আছে মৃত্যু, আছে হিংসা, আছে কৌশল, তাতেই বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি অন্ন-বস্ত্র-বস্তু জ্ঞানের। তাতে অবিশ্বাস আনুগত্যে আছে দণ্ড-বন্ধন-মৃত্যু।" (১২)

তারাশঙ্কর সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্টির কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। সে জন্যে তিনি বিজয়বাবু (মন্বন্তর), ধীরানন্দ (সন্দীপন পাঠশালা), সঞ্জীব (প্রেম ও প্রয়োজন), এর মত গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি মার্কসবাদ পড়েননি। যদি পড়তেন তাহলে হয়তো বাংলা সাহিত্যে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারতেন। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করে তিনি সাম্যবাদ চাননি। "বঙ্গভঙ্গ"কে নিয়ে তেমন কোন কালজয়ী সাহিত্য কীর্তি রচিত হয়নি। যে কাজটা পারতেন একমাত্র তারাশঙ্করই। এ প্রসঙ্গে শকুন্তলা ভট্টাচার্য বলেছেন, "একাজটাও পারতেন বোধহয় একমাত্র তারাশঙ্করই; যদি তিনি পূর্ববাংলার লোক হতেন। কারণ শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী বিশ্লেষণ আর মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ এত গুরুভার বিষয়কে যে যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ করতে পারে না তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সার্বজনীন", আর মার্কসবাদ ছাড়া শুধুমাত্র কাব্যিক ভাবাবেগ ও নষ্টালজিয়াও যে বিষয়টিকে ওৎরাতে পারে না তার প্রমাণ সমরেশ বসুর বিস্মৃত প্রায় উপন্যাস "হারায়ে সেই মানুষে"। তারাশঙ্করের দুর্বার আবেগ শক্তিশালী মাটির টান আর মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসার সঙ্গে যদি মার্কসবাদের কংক্রীটের ভিত যুক্ত হোত তো এই বঙ্গভঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে মহাকাব্যের মত উপন্যাস রচিত হতে পারত।" (১৩)

কথা সাহিত্যে তারাশঙ্কর যেমন ক্লাসিক শিল্পী, তেমনি বিচিত্র অপরূপ ছোটগল্পেরও তিনি স্রষ্টা; এজগতে তিনি নন্দিত। সমাজ ও সমাজ জীবনের বিচিত্ররূপ তাঁর সৃষ্টিতে অপরূপতায় বিধৃত। সমাজ (বিশেষতঃ বাঙালীসমাজ), তার জীবন ও অন্তর্গত চরিত্রাবলী তাঁর সৃষ্টিতে যেমন বিচিত্রভাবে স্থান পেয়েছে, তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত।

তবে কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে, "পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্ক আবিষ্কারে, তার ঘোষিত ও অঘোষিত অভিপ্রায় চিনে নেওয়ায় সাহায্য" (১৪) করে । কিন্তু তার ক্যানভাস ও সুযোগ ব্যাপক বলে তার রূপ সুস্পষ্ট। অন্যদিকে ছোটগল্পের রূপ ও স্বরূপে এই সুযোগ ও সময় একেবারেই সীমিত। তবুও ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ ছোটগল্প বোধ করি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী এবং তা সাহিত্যাস্বাদীও বটে।

তারাশঙ্করের গল্পের আন্তরধর্মের বাস্তবতা ও তার স্বরূপ নির্ধারণ সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণে সম্ভব বলেই আমাদের ধারণা। এবং বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার হয় যথার্থ আবিষ্কার। আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রসূত বিচিত্র সমস্যা, জীবন-জীবিকা ও তার শ্রেণীবিন্যাস, শ্রেণীসংঘাত এবং গল্প-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের স্বরূপ নির্ধারণই আমাদের সাধ্য। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সূত্রেরই আছে বিচার-বিশ্লেষণ।

পাদটীকা

(১) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় :	কালের পুত্তলিকা	পৃঃ - ৭
(২) Mac Iver & Page :	Society	Ch 22- P-511
(৩) প্রাগুক্ত :		P -5
(৪) Giddings :	Principles of Sociology	P. 5
(৫) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত :	রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ৩
(৬) প্রাগুক্ত :	রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ৩
(৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় :	লেখকের কথা	পৃঃ - ২২
(৮) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য :	ছোটগল্পে ত্রয়ী	পৃঃ - ২৯
(৯) হরপ্রসাদ মিত্র :	তারাশঙ্কর	পৃঃ - ৮৪
(১০) পূর্ণেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় :	মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে তারাশঙ্করের উপন্যাস	পৃঃ - ১৪
(১১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :	বীথিকা (শিল্পীর স্বাধীনতা)	পৃঃ - ২৮৯
(১২) প্রাগুক্ত :	বীথিকা (শিল্পীর স্বাধীনতা)	পৃঃ - ২৯১
(১৩) শকুন্তলা ভট্টাচার্য :	বাংলা সাহিত্যের তিন বাঁড়ুজ্যে ('সমন্বয়' শারদ সংখ্যা '৯৫)	পৃঃ - ২০
(১৪) ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত :	রবীন্দ্রনাথ : - ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	পৃঃ - ১৩

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও ভূম্যধিকারী শ্রেণী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবন দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল : তাঁর রচনা বহুধা, বিচিত্র ও সুপ্রচুর। তাঁর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, গল্পের সংখ্যা একশত নব্বই। "তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ" তিনখণ্ডে (১ম খণ্ড; জুলাই ১৯৭৫, ২য় খণ্ড, এপ্রিল ১৯৭৬, ৩য় খণ্ড; সেপ্টেম্বর ১৯৭৭) যথাক্রমে ৬৬টি, ৬৫টি ও ৫৯টি গল্প সংকলিত হয়েছে। সম্পাদক-শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। আয়না (১৯৬৩) নারী রহস্যময়ী (১৯৬৭) ও মিছিল (১৯৬৯) গ্রন্থত্রয়ী আত্মকথা ও স্মৃতিরোমন্থনমূলক রচনা বিবেচনা করে বাদ দিয়েছেন।" (১) রবীন্দ্রনাথের মত তিনি জমিদারদের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষেত্র ত্যাগ করেননি, বরং বলা যেতে পারে যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায়ই জমিদারদের অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও বঙ্কিমের সঙ্গে তারাশঙ্করের রচিত জমিদারদের পার্থক্য দুস্তর। বঙ্কিম সামাজিক কাহিনীতে জমিদারকে নায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁদের বিশাল আভিজাত্য চোখ ধাঁধাঁনি জৌলুসে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমের "নায়ক গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ নবযুগের নতুন বুর্জোয়া বিবেকের অধিকারী এবং তাদের জমিদারী গৌরবে বুর্জোয়া মূল্যবোধের বিকীরণ অনুভবে অসুবিধা হয় না।"(২) তাছাড়া বঙ্কিম নিজে জমিদার সন্তান ছিলেন না। উচ্চপদে চাকরী করে কিছু জমির মালিক হলেও ভূস্বামীর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেননি। সেই সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদারগণ প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন হতে পারেননি এবং কলোনিয়াল ইকনমি সৃষ্টি বা ভূস্বামীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীর সংঘাত কিংবা যন্ত্রদানবের এমন উগ্র আকার ধারণ করেনি। রবীন্দ্রনাথের জমিদারগণ যখন সামাজিক বিধানদাতা কিংবা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ, তখন তারাশঙ্করের জমিদারগণ ক্রমশঃ বিলীয়মান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাঁরা নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে উদ্ভ্রান্ত-দিশাহারা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পগুচ্ছের ৮০টি গল্পের মধ্যে ২৮টি গল্পে জমিদারকে প্রধানকরে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সর্বত্র প্রধান নয়। অন্যদিকে তারাশঙ্করের গল্পগুলির মধ্যে প্রায় ৩৪টিতে জমিদার থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জমিদারগণের ভূমিকাই প্রধান। কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রধান হয়েও গল্পের মোক্ষপ্রাপ্তিতে প্রধান অবলম্বের ভূমিকায় বর্তমান। সমকালীন -মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আভ্যন্তরীণ বিকার্য, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, শ্রমজীবীদের সচেতনতা, ধর্মঘট, উদ্ভট অবাস্তবতা, যৌন বিষয়ে পক্ষপাত বর্তমান। কিন্তু তারাশঙ্কর গল্প বা উপন্যাসে সর্বত্রই নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সাবেক জমিদার বনাম নব্য ব্যবসায়ী, সামন্ততন্ত্রের পরাভব, ধনতন্ত্রের উন্মেষ এবং সেই সঙ্গে রাঢ়ের পল্লীর সাধারণ দরিদ্র পরিশ্রমী অজ্ঞ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন।

জমিদার শ্রেণী

বীরভূমের এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর। শৈশব থেকেই জমিদারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড়। তাই জমিদারী প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর প্রতি ছিল তাঁর দ্বিধাবিমিশ্রিত আকর্ষণ। পড়ন্ত জমিদারতনয় তারাশঙ্করের হৃদয়ে জমিদারী-আভিজাত্যের অহংকারটি ছিল জড়িয়ে। এমনকি যখন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে চরম দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখনও তিনি জমিদারী আভিজাত্যের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি। জমিদারী দম্ভ এযুগে অর্থহীন, মূল্যহীন একথা উপলব্ধি করলেও সাহিত্য সৃষ্টিকালে জমিদারদের বংশানুক্রমিক সম্মান, মর্যাদা, ঐতিহ্য ও প্রতিপত্তিকে ভুলতে পারেননি। তাই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতি তিনি সকরুণ সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন বারংবার। প্রাচীন জমিদার ছিলেন অত্যাচারী, ব্যাভিচারী, শোষক কিন্তু এ সবের মধ্যেই আবার জমিদারদের ঔদার্য, দানশীলতা, প্রজাপালন, সমাজসেবামূলক কাজের উদাহরণও কম নেই। তারাশঙ্কর সেই প্রাচীন ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই বোধহয় জমিদারদের শত শত দোষ, ত্রুটি এবং রক্ষণশীল মানসিকতাকে উদার লেখনীর মাধুর্যে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও জমিদারকুলের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "আমাদের সামাজিক ইতিহাস লেখক ও ঔপন্যাসিকগণ একটা কথা বিশেষ স্মরণে রাখেন না যে, মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া গত দুই-তিন শতাব্দী জমিদারবংশই প্রদেশের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থল ও আধার ছিল। এই কার্যতঃ স্বাধীন অপ্রতিহতপ্রভাব ভূস্বামীকুলের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিতবাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ও গুণগ্রাহিতাকে কেন্দ্র করিয়াই জাতীয় জীবনযাত্রা আবর্তিত হইয়াছে" (৩) প্রসঙ্গক্রমে জমিদারী প্রথার উৎস ইতিহাস স্মরণীয়।

১৭৯৩ খ্রীঃ বৃটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর ফলে বাংলায় ব্যক্তিগত জমির মালিকানা ও ভূস্বামী সম্প্রদায়ের হয় সৃষ্টি। তাঁরা ধীরে ধীরে অর্থে, বিত্তে, শৌর্যে, পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন। এই ভূস্বামীরাই অর্থের অহংকারে ও লোভের বশবর্তী হয়ে সমাজে অন্যায় অত্যাচার করে

সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। জমিদারদের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও শোষণের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নিরীহ অসহায় প্রজাকুল প্রতিবাদের জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, কখনও বা বিদ্রোহী হয়। তারাশঙ্করের 'রাজা, রাণী ও প্রজা' 'বরমলাগের মাঠ' ইত্যাদি গল্পে এই সত্যটি ধরা পড়ে। আবার বহু প্রজা এই ভূস্বামীগণের কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। 'রায়বাড়ী', 'ব্যাঘ্রচর্ম', 'পণ্ডিতমশাই' প্রভৃতি গল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিগত কয়েক শতকে জমিদারগণ জাতির মুখপাত্র-নেতা হিসেবে সমাজ সাহিত্য, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছেন। তারাশঙ্কর পরম আগ্রহে এদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

বংশানুক্রমে অর্জিত বিপুল অর্থ ও আধিপত্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে। জমিদারগণের নিজ চারিত্রিক দোষ, নানা উদ্ভট চিন্তা, অবাস্তব উন্মাদনা, অসৎপ্রবৃত্তি এবং যন্ত্রযুগের পদার্পণ ইত্যাদি কারণে তাঁদের বৈভব বা শক্তির বিনাশ শুরু হয়েছে। এই অস্তমিত অবস্থাতেও অনেকে প্রাচীন স্মৃতি রোমন্থন বা পূর্বপুরুষদের কীর্তি প্রচার করেছেন। ফলে সামান্য প্রজাদের কাছেও তাঁরা হাস্যাস্পদ হয়েছেন। 'সাড়ে সাত গণ্ডার' জমিদার এর প্রমাণ।

তারাশঙ্কর কেবল এই জমিদারগণের ধ্বংসের ও প্রতাপের চিত্র অঙ্কন করেই ক্ষান্ত হননি; জমিদারদের জন্যে তাঁর বেদনা, দীর্ঘশ্বাস ও সহানুভূতিরও প্রকাশ মেলে। লাভপুরের ভূস্বামীদের দুঃখ-দুর্দশার দিনে অতীতের অভিজাত অহংকার ও দৃপ্ত পৌরুষের কথাও বলেছেন। দুঃখ অনুভব করেছেন অন্তরে এবং এই অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তারাশঙ্কর সৃষ্ট নব নব ফসল। তিনি বলেছেন "আমার কাল সেকাল আর একালের সন্ধিক্ষণের কাল" [৪] এই যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অতীত ও বর্তমানকে দুচোখ ভরে দেখেছেন; গ্রামীণ সমাজ কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যন্ত্রসভ্যতা গ্রামের কৃষিকে কীভাবে গ্রাস করছে, জমিদার এবং নব্য ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বে সামন্ত তান্ত্রিক সমাজের ধীরে ধীরে অবলুপ্তির কিভাবে পথবাহী— তাও তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত দেখেছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন— "সামন্ততন্ত্র ও জমিদার তন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বে ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" [৫] সামন্ততন্ত্রের বাহক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার দাপট অটুট রাখতে চান, এরই মাঝে গ্রামে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজন। যাদের ক্রূর দৃষ্টিতে গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধ ভেঙে পড়ে; জমিদারগণ তা সহ্য করতে পারেন না। আধুনিক ইন্ডাস্ট্রি প্রসূত নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভাঙতে প্রলুব্ধ করে। ফলে গ্রামের নিরীহ রায়তগণ স্বাধীন হতে চেষ্টা করে—শুরু হয় সংঘাত। ঐতিহাসিক তারাচাঁদ এই সংঘাতের কথা স্বীকার করেছেন, **"There was consequently a clash of interests between the two classes and 'what is more there is nothing in common between them. The new land lords in most cases were businessman who purchased land in search for profitable investment of surplus funds. They were unfamiliar with the affairs of cultivation and were uninterested in the work of agricultural improvement."** [৬]

তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এ পর্বের এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বর্তমান। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তারাশঙ্করকে জমিদারী তদারকি করতে হয়েছিল। খাজনা আদায়, সুদ নেওয়া, ঋণ দেওয়া বা আদায় করা সবই তাঁকে করতে হয়েছে। তিনি দেখেছেন গ্রামের রায়তরা কিভাবে মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারগণ যে, মহাজনী করেন তাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তারাশঙ্করের এক জমিদার আত্মীয় "নিজ বিধবা ভ্রাতৃবধূকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সর্বস্বান্ত করেছে লেখকেরই সম্মুখে" [৭] বিলীয়মান ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের এই জঘন্য অন্যায় দেখেও সহানুভূতি গোপন রাখেননি তারাশঙ্কর, জমিদারদের কোথাও তিনি অযথা প্রশ্রয় দেননি। তাই তো সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘর্ষে সামন্ততন্ত্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেছেন। তাই একদিকে "জলসাঘর"এর ঝাড়লণ্ঠনের আলো হয়েছে ম্লান-বিষণ্ণ, অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ী উঠতি ধনী মহিম গাঙ্গুলীর নিজস্ব ডায়নামোর বৈদ্যুতিক আলো ঝকঝক করে জ্বলতে থাকে। বাঈজীকে বকসিস্ দিতে বিশ্বম্ভরের সোনার বাক্স নিঃশেষ হয়ে যায়, অথচ মহিম গাঙ্গুলী অনায়াসে নগদ টাকার তোড়া ছুড়ে দিতে কসুর করে না।

তারাশঙ্কর জমিদার শ্রেণীর উত্থান-পতন দেখেছেন, তাদের সঙ্গী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কতখানি সমাজতত্ত্বঘটিত বাস্তবতায় আশ্লিষ্ট হয়েছে সেই আলোচনাই মুখ্য। কারণ তাঁর থেকে তাঁর সৃষ্টিই বাঙালীর মূল্যবান ঐতিহ্য।

তারাশঙ্করের জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্প অনেক আছে—কোথাও মুখ্য, কোথাও গৌণ; কোথাও নেপথ্যে, কোথাও তাঁরা প্রকাশ্যে; কোথাও যশস্বী হৃদয়বান, আবার কোথাও সুদখোর, লোভী, ব্যাভিচারী ও অত্যাচারী।

নীচে জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির তালিকা দেওয়া যাক—

তালিকা — (ক)

১) শ্মশানের পথে।
২) রাজা, রাণী ও প্রজা।
৩) খড়্গ।
৪) ট্যারা।
৫) পুরোহিত।
৬) জলসাঘর।
৭) মুখুজ্জেমশাই।
৮) বিষধর।
৯) কুলীনের মেয়ে।
১০) রাখালবাঁড়ুজ্জে।
১১) রঙীন চশমা।
১২) সমুদ্রমন্থন।
১৩) ইস্কাপন।
১৪) রায়বাড়ি (পত্তনিদার)।
১৫) ব্যাঘ্রচর্ম।
১৬) পণ্ডিতমশাই।
১৭) নুটু মোক্তারের সওয়াল।
১৮) প্রতিমা।
১৯) রাজপুত্র
২০) সন্তান।
২১) ইতিহাস।
২২) মধুমাষ্টার।
২৩) না।
২৪) মালাকার।
২৫) বন্দিনীকমলা।
২৬) পিঞ্জর।
২৭) হরিপণ্ডিতের কাহিনী।
২৮) শেষকথা।
২৯) সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার।
৩০) আরোগ্য।
৩১) বরমলাগের মাঠ।
৩২) জন্মান্তর।
৩৩) রসকলি।
৩৪) মা, (সাময়িক পত্রে "ফল্গু")।
৩৫) পাটনী।
৩৬) দেহের প্রদীপে রূপের শিখা।
৩৭) আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলী।
৩৮) তৃষ্ণা।
৩৯) বিষপাথর।
৪০) সনাতন।
৪১) সর্বনাশী এলোকেশী।
প্রভৃতি।

সাধারণতঃ জমিদারী-বিমিশ্রিত গল্পতে জমিদারের ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগণ্য, তবে এইসব গল্পে জমিদার একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—সন্দেহ নেই; কিন্তু কোন কোন গল্পে জমিদার বর্তমান থাকলেও তাঁদের নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই। যেমন—

ক) রসকলি ঃ— এই গল্পটি মূলতঃ বৈষ্ণব নায়ক-নায়িকা সংশ্লিষ্ট। জমিদার থাকলেও তাঁর নাম বা পদবীর কোন উল্লেখ নেই। কেবল কাছারীতে গ্রাম্য সালিসির বিচারকের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত। তিনি পুলিনের জরিমানা করেছেন এবং মঞ্জুরীকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মঞ্জুরী রাজী না হওয়ায় জমিদার তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। কাছারীতে জমিদার সপার্ষদ উপবিষ্ট এবং এখানে তাঁর ইতর ভাষায় সংলাপ শোনা যায়। জমিদারের চরিত্র-ভ্রষ্টতার ইঙ্গিত এই গল্পের মূল কথা।

খ) শ্মশানের পথে ঃ— এই গল্পটিও সাধারণ বৈষ্ণব চরিত্র-ভিত্তিক । জমিদারের নাম, ধাম, পদবীর নেই উল্লেখ। কেবল তাঁর পেয়াদার উল্লেখ আছে। পেয়াদা টাকা আদায় করতে এসে দরিদ্র গোষ্ঠর জীর্ণ গৃহ লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই এখানকার জমিদারের অত্যাচারী, প্রজাপীড়ক ও শোষক চরিত্রের পরিচয় মেলে।

গ) খড়্গ ঃ— মোঙ্গল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে ঢেকার রামজীবন রায় বিশাল জমিদার ছিলেন। বর্তমানে জমিদারী ধ্বংসের পথে। রামজীবন রায়ের বংশধর এই গল্পের রাজাবাবু শিক্ষিত। তিনি ওকালতি করেন। রাজাবাবু পরোপকারী এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ঘ) ট্যারা ঃ— গল্পটি এক বাউরি তোতলা ছেলের কাহিনী। এখানে জমিদার ভবানীরঞ্জন রায় উচ্চশিক্ষিতঃ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র নিয়ে মজলিস করেন এবং দেশ বিদেশের যুদ্ধের খবরাখবর নিয়ে আলোচনা করেন। এই গল্পে তাঁর চকিতে আবির্ভাব।

ঙ) কুলীনের মেয়ে ঃ— গল্পটি মূলতঃ এক বিধবার বেদনাবিধুর করুণ কাহিনী। এখানে দু'জন জমিদারের নামোল্লেখ আছে। একজনের আছে শিক্ষাদীক্ষা, তিনি পরোপকারী, কিন্তু তাঁর ভূমিকা নগণ্য। অন্য জমিদারের ভূমিকা প্রায় শূন্য।

চ) ব্যাঘ্রচর্ম ঃ— এ গল্পটির প্রধান চরিত্র রতনহাড়ি। জমিদার হেমাঙ্গবাবু, অথচ তাঁর পদবীর উল্লেখ নেই। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত। হেমাঙ্গবাবু খামখেয়ালী, তাঁর শখ—কুকুর পোষা।

ছ) পণ্ডিতমশাই ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র ব্রাহ্মণ যতীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী কাকপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। জমিদার গল্পটির মোক্ষপ্রাপ্তিতে সহায়ক হয়েছেন, কিন্তু তাঁর নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই।

জ) সন্তান ঃ— এখানে জমিদারের নাম লক্ষ্মীবাবু, কিন্তু তাঁর পদবীর উল্লেখ নেই। এই চরিত্রটি সাদাসিধে, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আভিজাত্য-গর্বী।

ঝ) ইতিহাস ঃ— এখানে জমিদারের নাম, পদবী বা ভূমিকা নেই, কেবলমাত্র পাত্র হিসেবে উল্লেখ আছে। তিনি বি. এ. পাশ এবং বিপত্নীক।

ঞ) পিঞ্জর ঃ— এখানে জমিদারের নাম নেই। তিনি নাট্যমোদী, স্বার্থান্বেষী। গল্পে তাঁর ভূমিকা নগণ্য।

চ) রাজপুত্র ঃ— এই গল্পের নায়ক বিশ্বনাথ রায়। ইনিও মোঙ্গল আমলে ঢেকার বিখ্যাত জমিদার রামজীবন রায়ের বংশধর। বিশ্বনাথ বর্তমানে সর্বস্বান্ত। কিন্তু এই দারিদ্র্য কেমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ গল্পে নেই।

ছ) শেষকথা ঃ— এই গল্পে জমিদারের পদবী ও পেশার উল্লেখ থাকলেও নাম নেই। ভূমিকা নগণ্য।

জ) বরমলাগের মাঠ ঃ— এখানে বিষজর্জরিত বরমলাগের মাঠ জমিদারের কাছ থেকে ক্রয় করেন সমাজতন্ত্রী শিবনাথ। এখানে জমিদারের নাম ও পদবীর উল্লেখ নেই।

ঝ) পাটনী ঃ— এই গল্পে জমিদারের স্বপ্রকাশ নেই, তবুও শ্মশানের জমির মালিক বলে মৃতদেহ সৎকারে যা লাভ হবে জমিদার তার ১/২ অংশ বখরা পাবেন। শিবলোকে কাজ করার প্রেক্ষাপটে জমিদারের Capitalistic মনোভাব সক্রিয়।

জমিদার সংশ্লিষ্ট গল্পগুলিকে আবার ৪টি পর্বে ভাগ করা যায় ঃ—

ক বর্গ	।।	জমিদার-প্রধান গল্প
খ বর্গ	।।	জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান নন।
গ বর্গ	।।	জমিদারগণ অপ্রধান হয়েও গল্পের রসসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছেন।
ঘ বর্গ	।।	জমিদারী ও ব্যবসা একই সঙ্গে বর্তমান

তালিকা দুই

'ক' বর্গ

	গল্প	প্রধান চরিত্র
১।	রাজা, রাণী ও প্রজা।	লেখক তারাশঙ্কর স্বয়ং।
২।	জলসাঘর।	বিশ্বম্ভর রায়।

৩।	রাখাল বাঁড়ুজ্জে	স্বয়ং
৪।	রঙীন চশমা	বড়কর্তা (মদ-মাংস খান না।)
৫।	সমুদ্রমন্থন	উমানাথ
৬।	রায়বাড়ি	রাবণেশ্বর রায়।
৭।	পুত্রেষ্টি	গণেশ বাঁড়ুজ্জে।
৮।	নুটু মোক্তারের সওয়াল	বড়কর্তা মুখুজ্জে।
৯।	রাজপুত্র	বিশ্বনাথ রায়—বর্তমানে জমিদারী নেই।
১০।	মা	মহাবিষ্ণু সরকার
১১।	সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার	বনবিহারী সরকার।
১২।	জন্মান্তর	বলরাম চাটুজ্জে।

তালিকা - তিন

'খ' বর্গ

১।	শ্মশানের পথে	জমিদারের উল্লেখ নেই (শোষক)।
২।	খড়্গ	রাজাবাবু (রায়)।
৩।	রসকলি	নাম, পদবী নেই (ব্যভিচারী)।
৪।	বিষধর	বিনয়কৃষ্ণ রায় (জমিদার ও সঃ চাকুরে, অবসরপ্রাপ্ত, চরিত্রহীন।
৫।	কুলীনের মেয়ে	কৃষ্ণবাবু এবং যোগীন্দ্র গাঙ্গুলী।
৬।	ট্যারা	ভবানীরঞ্জন রায়।
৭।	ইস্কাপন	নাম উল্লেখ নেই, স্বল্প জমির মালিক।
৮।	ব্যাঘ্রচর্ম	হেমাঙ্গবাবু, উচ্চশিক্ষিত ও শৌখিন।
৯।	পণ্ডিত মশাই	নাম উল্লেখ নেই।
১০।	প্রতিমা	অমূল্য চ্যাটার্জী, মদ্যপ।
১১।	ইতিহাস	জমিদারী আছে কিন্তু নাম উল্লেখ নেই।
১২।	না	অনন্ত।
১৩।	মালাকার	রাম রায়।
১৪।	পিঞ্জর	নাম উল্লেখ নেই।
১৫।	হরিপণ্ডিতের কাহিনী	রায়বাহাদুর, ভূমিকা নগণ্য।
১৬।	পাটনী	অনুল্লিখিত।
১৭।	মধুমাষ্টার	জ্ঞানদা রায়।

তালিকা - চার

'গ' বর্গ

	গল্প	প্রধান চরিত্র
১।	পুরোহিত	বিমল রায়।
২।	সন্তান	লক্ষ্মীবাবু।

৩।	বন্দিনী কমলা	তিন ভাই।
৪।	শেষ কথা	সাউ ও সাঁই দুই জমিদার।
৫।	আরোগ্য	মুখার্জী ও চ্যাটার্জী
৬।	বরমলাগের মাঠ	নাম উল্লেখ নেই।
৭।	অগ্রদানী	শ্যামদাস
৮।	সর্বনাশী এলোকেশী	জমিদার নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই।

তালিকা - পাঁচ

'ঘ' বর্গ

১।	পুরোহিত	বিমল রায়, কলিকাতায় ব্যবসা।
২।	মুখুজ্জে মশাই	হীরেন্দ্র, ঐ
৩।	শেষ কথা	সাউগণ ব্যবসায়ী

এখন তালিকাভিত্তিক আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

তালিকা - দুই

'ক' বর্গ

১) রাজা রাণী ও প্রজা ঃ— গল্পটি একটু অভিনব। উত্তম পুরুষের বাচনিকে লেখা। জমিদার স্বয়ং লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃটিশ সরকারের চাপে দিনে দিনে বর্ধিত রাজস্ব পরিশোধ করতে অনেক জমিদার হিমসিম খেয়েছেন। অনেক জমিদারের কাছে পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী গলগ্রহ হয়ে উঠেছে।

"পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন হইয়াছে হয়রানি। সরকারের সদরে এক একবার রাজস্ব দাখিলের সময় হয় আর নিখিল ভুবন অন্ধকার হইয়া উঠে।" [৮] জমিদার খাজনা আদায় করতে যান কিন্তু প্রজারা খাজনা দিতে নারাজ। তাই লেখক বিদ্রোহী প্রজাদের মোড়লের কাছে যান। মোড়ল নিভৃতে জমিদারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাণীমার কাছে সপরিবারে আশ্রয় নেয়। রাণীমার মাতৃসুলভ আচরণ ইত্যাদি হল গল্পটির সারবস্তু। গল্পটি রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" নাটককে স্মরণ করায়। এই গল্পটি লেখকের যে আত্মজীবনীমূলক রচনা তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন "গল্পের রাজা আমি, রাণী আমার গৃহিণী, প্রজা যে, সে রাধাবল্লভ, সেও আমার মতো বাস্তব সত্য। ঘটনাটি পনেরো আনা সত্য।" [৯]

২) সমুদ্রমন্থন ঃ— এখানেও সরকারী খাজনার টাকা পরিশোধ করতে জমিদার উমানাথ উদ্‌ভ্রান্ত। দেশ জোড়া দুর্ভিক্ষ, পথে ঘাটে ভিখারীর আনাগোনা। উমানাথের স্ত্রী বাপের বাড়ীর সুবাদে বহু অর্থের অধিকারিণী। দু-একবার এই বিপদ থেকে উমানাথকে তিনি উদ্ধার করেছেন। এবারে তিনি নারাজ। অথচ খাজনা প্রদানের দিন সমাগত। উমানাথ তাই রাতের অন্ধকারে স্ত্রীর গয়না চুরি করতে উদ্যত হন কিন্তু হঠাৎ এক শব্দ শুনে বন্দুক নিয়ে নীচে নামেন, সঙ্গে স্ত্রীও আসেন। এসে দেখেন দিনের বেলায় ভিক্ষে করতে আসা শীর্ণ ভিখারিণীটি ছাগলচুরি করতে এসেছে। কারণ ডাক্তার তার অসুস্থ স্বামীকে মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অথচ সে অর্থহীন, তাই চুরি করতে এসেছে। স্বামীর প্রতি এই ভিখারিণীটির ভক্তি দেখে উমানাথের স্ত্রী রমাদেবীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে; তিনি উমানাথকে নতুনভাবে গ্রহণ করেন।

৩) জলসাঘর ঃ— সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নবীন ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বের সার্থক রূপায়ণ "জলসাঘর" ও "রায়বাড়ি" গল্প দুটি। 'জলসাঘর' গল্পের নায়ক জমিদার বিশ্বম্ভর রায় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে ক্ষয়িষ্ণু অবসানমুখী অতীতের প্রদীপ্ত শিখাটিকে শেষবারের মত জলসাঘরের দরজা খুলে ধরতে চেয়েছেন। "তাঁর রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির 'অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে।" [১০] তিন পুরুষ ধরে রায়বংশের প্রভুরা করলেন সঞ্চয়। চতুর্থ পুরুষে রাজত্ব, পঞ্চম পুরুষে ভোগ,

ষষ্ঠ পুরুষে হল ঋণ এবং সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলে রায়বাড়ীর লক্ষ্মী ঋণের সাগরে ডুবে গেলেন। তা সত্ত্বেও বিশ্বম্ভর তাঁর জমিদারী আভিজাত্যকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। পুত্রের উপনয়ন উপলক্ষে পুরাতন আভিজাত্য যেন পুনরায় নতুনভাবে জেগে উঠল। ঝাড়লণ্ঠনের বাতি সব জ্বলে উঠল কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাসে সপ্তমদিনে কলেরায় প্রিয়তমা পত্নী, পুত্রদ্বয় এবং কন্যাটির অকালপ্রয়াণ ঘটল। টিকে রইল শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী ছোটগিন্নী (হস্তিনী) আর তুফান (অশ্ব)। বিশাল অট্টালিকার এক কোণে আলোহীন অন্ধকারে বসে থাকেন ঋণভারে জর্জরিত প্রবীণ বিশ্বম্ভর রায়।

অন্যদিকে নতুন গজিয়ে ওঠা ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সোনার দেউল ওঠে আধুনিক ধাঁচে। উৎসবে ব্যান্ড বাজে, ঝকঝকে মোটর গাড়ী ধুলো উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায় অথচ এই গাঙ্গুলীর বংশই রায়বাবুদের এলাকায় মহাজনী করেছে। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্য, অন্যদিকে নব্য শ্রেষ্ঠীর দম্ভ এই গল্পে মুখোমুখি সংঘাতের রূপ নিয়েছে। নব্য ধনী গাঙ্গুলীদের জেদ, যেমন করেই হোক বিশ্বম্ভরের ওই মরা পাহাড়ের চূড়া ভাঙবেই। মহিম বাঈজী নাচের আসর বসায়। নিমন্ত্রণ করে বিশ্বম্ভরবাবুকে। উদ্দেশ্য তার রায়বাবুকে আঘাত দেওয়া। রায়বাবু ছোটগিন্নীর সাথে নায়েবকে একটি মোহর দিয়ে আমন্ত্রণ বাড়ী পাঠান। রায়বাবু যান না। অনুষ্ঠান শেষে মহিম বাঈজীকে বলে যে সে যেন রায়বাবুর বাড়ী হয়ে যায়। বাঈজীকে দেখেই রায়বাবু মহিমের দুরভিসন্ধি ধরে ফেলেন। শেষবারের মত তিনি জলসাঘরের দরজা খুলে দেন। বাঈজীর নৃত্যে, আলোর রোশনাই-এ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় জলসাঘর জৌলুসে ভরে উঠল। বকশিস্ দিতে রায়বাবুর গয়নার বাক্স শেষ হয়। প্রমত্ত রজনী শেষে প্রত্যুষে আদরের ঘোড়া তুফানের পিঠে সওয়ার হয়ে উদ্ভ্রান্ত বিশ্বম্ভর ছুটে যান যে কীর্ত্তিহাটে তা অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। ফিরে আসেন জলসাঘরের দিকে। তাঁর হাতের চাবুকটা সশব্দে আছড়ে পড়ে জলসাঘরের দরজায়। পূর্বপুরুষদের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পান 'মোহ। কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ এই ঘরে জমিয়া আছে (জলসাঘর)। ভৃত্যদের বাতি নিভিয়ে দিতে বলেন এবং সবশেষ হয়ে যায়। অতীত-আভিজাত্য-দম্ভ গর্ববাহী বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সংঘর্ষে একালের ব্যবসাদার ধনী মহিম গাঙ্গুলীর জয়লাভই জলসাঘরের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'সাত পুরুষ ধরে রায়দের ধারাবাহিক ভোগবিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং মোহই যে রায়বংশের পতনের একামাত্র কারণ তা কিন্তু নয়। এ এক অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি।" (১১)

৪) রায়বাড়ী ঃ— এই গল্পের নায়ক দীর্ঘকায় প্রশস্ত বক্ষ, সিংহের মত বলিষ্ঠ বিক্রম রাবণেশ্বর রায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী দশকের ঘটনা। জমিদারের বয়স চল্লিশ। দয়ামায়াহীন, শাক্ত তান্ত্রিক, বহু সম্পত্তি ও অতুল ঐশ্বর্যের মালিক রাবণেশ্বর। জমিদারী দাপটে ও গোমস্তার অত্যাচারে হুদ্দা শ্যামপুরের বিদ্রোহী প্রজারা গোমস্তাকে ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে ফেলে পুড়িয়ে মারে; সেই অপরাধের চরম শাস্তি দিতে রাবণেশ্বর লেঠেল কালী বাগ্দীকে হুদ্দাশ্যামপুর লাট পুড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী (বৈষ্ণববংশীয়া কন্যা) ব্রজরাণী বাধা দিলেও কোন ফল হয় না। পুড়ে ছারখার হয়ে যায় ছত্রিশ মৌজা। ছোট বোনের বিয়ে থেকে বাড়ী ফেরার পথে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে-ব্রজরাণী পুত্রসহ মারা যান। রাবণেশ্বর নির্বংশের আশঙ্কায় তারানাম জপ করতে থাকেন। সংসার ত্যাগের সংকল্প নেন তিনি। হঠাৎ গঙ্গার বাঁধ ভেঙে প্রবলবন্যার জল জমিদারী এলাকায় প্রবেশ করে। আশ্রয়হীন প্রজাদের জন্যে রাবণেশ্বর জলসাঘর খুলে দেন। গ্রাম্য এক বালিকার বিয়ের আসরও বসে জলসাঘরে। এই চরম দুর্যোগের রাত্রে বিয়ের অনুষ্ঠান রাবণেশ্বরের জীবনে এক গভীর অর্থবহ ইঙ্গিত বলে মনে হয়। কারণ সংসার পরিত্যাগের বাসনা দূরীভূত হয়। রাবণেশ্বর আবার সংসারে ফিরে আসেন। নির্বংশ হবার জন্যে রায়বংশকে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি মূলে ঘুন ধরেছে এই ধ্রুব সত্যটি তারাশঙ্করের অজানা ছিল না, তবুও অতীতের স্মৃতিবহুল গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলি লেখককে আনন্দ দিত্ আবার জমিদারদের চারিত্রিক ত্রুটিগুলির জন্যে তিনি বেদনা অনুভব করতেন। "সেকালকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ, তার স্খলন, আমি সবই জানি আমার পৈতৃক চরিত্রের ত্রুটির মত।" (১২) সেই সময় অভিজাতগণ কেবল পীড়নক ছিলেন না, তাঁরা প্রজাশাসনে, আশ্রয়হীনে আশ্রয়দানে, প্রতিপালনেও রাজসিক ছিলেন। "তাঁর (রাবণেশ্বর) চিত্তে আসক্তি অনাসক্তির লীলা মনস্তাত্ত্বিক আলো আঁধারিতে অনবদ্য।" (১৩) কিন্তু অসঙ্গতিও ছিল, "একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই অসঙ্গতিই সেই যুগের জমিদার শ্রেণীর চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে তুলেছে। ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণে রাবণেশ্বর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" (১৪) সামন্তদের প্রতি একধরণের শ্রদ্ধা সর্বদাই তারাশঙ্করের হৃদয়ে সংগুপ্ত ছিল, যা ছিল সে যুগের সামন্তযুগীয় বংশগতির ঐতিহ্য। তারাশঙ্কর নিজেই তা স্বীকার করেছেন। "জীবনে বংশগত শিক্ষায় অতীতকে, পুরাতনকে অসম্মান করতে কোন কালেই পারি না বা পারিতাম না।" (১৫)

৫) রাখাল বাঁড়ুজ্জে ঃ— বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের জমিদার রাখাল বাঁড়ুজ্জে। তিনি স্বভাবদুর্বৃত্ত, যেমন লোভী তেমন শয়তান। অবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছল তবুও কদর্য লোভ তাঁকে হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। "গঙ্গাজল"

পাতানো সখা হারাণের কাছ থেকে রাখাল জানতে পারে যে পাশের গাঁয়ের অবস্থাপন্না বিধবা হৈমর সৎ কন্যা লক্ষ্মীকে ঘরের পুত্রবধূ করে আনতে পারলে অনেক বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যাবে। পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েও সম্পদ হাতে পান না রাখাল। হৈম স্থানীয় মহাজন জ্ঞানাঞ্জন দত্তের কাছে সম্পত্তি জীবনসত্ব লিখে কাশীবাসী হন। গল্পের অন্তিম অনুচ্ছেদে বাঁড়ুজ্জের পাশবিক হিংস্রতা প্রকট হয়েছে। হৈমর শূন্য ঘরে একটি বিড়াল বাঁড়ুজ্জের দিকে হিংস্রভাবে গর্জন করে এগিয়ে আসে। বাঁড়ুজ্জে দরজার ফাঁক দিয়ে তা দেখতে থাকে, হঠাৎ বিড়ালটা দরজার ফাঁকে মুখ ঢোকানো মাত্র বাঁড়ুজ্জে তার কণ্ঠনালী চেপে ধরেন দরজা দিয়ে। বেড়ালটাকে মেরে ফেলেন। "এই প্রতীকী বিবরণ ছোট গল্পের ব্যঞ্জনাগর্ভ সংকেত ভাষণের অপূর্ব নিদর্শন। রাখাল বাঁড়ুজ্জের হিংস্র পশু স্বভাবের বীভৎস স্বরূপ উন্মোচনে এ যেন অভিনব চরিত্র স্রষ্টা বাণী শিল্পীর শেষ তুলির টান।" (১৬)

৬) রঙীনচশমা ঃ— এই গল্পে বড়কর্তা পড়ন্ত জমিদার। সুন্দরী অথচ শ্বেতকুষ্ঠ রোগাক্রান্তা কন্যার বিয়ে উপলক্ষে স্বভাবদুর্বৃত্ত রাইকিশোর পাত্রপক্ষের কাছে বিয়ে ভাঙার ষড়যন্ত্র করে কিন্তু কন্যার বিয়ে হয়ে যায়। চৌধুরীদের ঐতিহ্য অনুযায়ী, বড়কর্তা ফলবৃক্ষসমেত ভূমি ব্রাহ্মণ হিসেবে রাইকিশোরকেই দান করেছে। এখানে দুই জমিদারের উদারতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭) পুত্রেষ্টি ঃ— এই গল্পের জমিদার শাক্ততান্ত্রিক গণেশ বাঁড়ুজ্জে পুত্র কামনায় দিশাহারা। গণেশের স্ত্রী এক পোষ্য নেন। গণেশ নিজ ভাইয়ের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে পোষ্যপুত্র অপেক্ষা নিজপুত্র পেতে চান। হঠাৎ এক তান্ত্রিক সাধুর সংস্পর্শে এসে সাধুর পরামর্শ অনুযায়ী নরবলির জন্যে এক রাত্রে গণেশ মেজো গিন্নীর পোষ্য পুত্রটিকে চুরি করতে আসেন, কিন্তু পথে এক কুক্করীকে দেখে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে এবং ছেলেটিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। "গল্পটি মূলতঃ চরিত্রধর্মী। মেজকর্তার চরিত্রের আপাত পুরুষতার অন্তরালে সুপ্ত স্নেহবৃত্তি, পুত্র কামনার জন্যে অপরের পুত্রকে বলি দেওয়ার যে অপরাধ প্রবণতা জেগে উঠেছে, সেই সঙ্গে পুত্রহারা কুক্করীর আর্তনাদ, অমাবস্যার রহস্যাচ্ছন্ন, ভীতি-শিহরণ প্রভৃতি ঘটনা গল্পটিকে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে উন্নীত করেছে।" (১৭)

৮) নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ— অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা তারাশঙ্করের এই গল্পটি বাস্তব এবং অপূর্বসৃষ্টি। নুটুর বাস্তবতা সম্পর্কে তারাশঙ্কর বলেছেন, "নুটু মোক্তার কল্পনার মানুষ নয়, সত্যকারের মানুষ। রামপুরহাট সাবডিভিশনের লোক। প্রথমে ছিলেন ইস্কুল-মাস্টার, তারপর হয়েছিলেন মোক্তার। সে আমলের বিচিত্র স্পষ্টবাদী মানুষ ছিলেন।" (১৮) বি. এ. পাশ নুটু বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়ে নুটুর স্ত্রী অপমানিতা হন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে নুটু শিক্ষকতা ছেড়ে মোক্তারি পাশ করে আদালতে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। "কলিযুগের দুর্বাসা" নুটুর প্রতিজ্ঞা হল যে কঙ্কনার জমিদারদের ঘরের ঐশ্বর্য লক্ষ্মীকে পথে নামানো। কিন্তু উকিলের ব্যর্থতায় প্রথম মামলায় নুটু মোক্তার পরাজিত হন। রাগে, ক্ষোভে নুটু নিজেই ওকালতি পাশ করেন এবং মামলায় অকাট্য সওয়াল করে জয়ী হন। অর্থ ও পসার দিনে দিনে বাড়তে থাকে; নুটুর চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে; নুটু দরিদ্রকে ঘৃণা করতে শুরু করেন। এই সময় কঙ্কনার মুখুজ্জেদের বড়কর্তা তাঁর নাতনীর সঙ্গে নুটুর বড় ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও নুটু বিয়েতে রাজী হন। শুভদিনে বিয়ে হয়ে যায়। নুটুর তীক্ষ্ণ বক্তৃতা ও শ্লেষ চারিত্রিক মাধুর্যকে বাড়িয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত আভিজাত্য-মর্যাদার মোহের কাছে, নিজেকে বন্দী করে ফেলেন। মা লক্ষ্মীর চরণকে পথে নামাবেন বললেও সেই লক্ষ্মীকেই নুটুবিহারী মাথায় চাপান। দরিদ্র-আত্মীয়দের অবজ্ঞা করে নুটু নিজ চরিত্রের গোপন বীজটিকে তুলে ধরেছেন।

৯) রাজপুত্র ঃ— গল্পের নায়ক বিশ্বনাথ রায় প্রাচীন আমলের বিশাল জমিদারের বংশধর। বর্তমানে ভীষণ গরীব। বিনাপথ্যে পুত্র মারা যায়। গ্রামে অভিনয় শিখিয়ে কোনরকমে সংসার চালান তথাপি দুঃখ প্রকাশ করেন না। শেষে উদাসী বিশ্বনাথ 'ক্যারিকেচার' হয়ে যান। মানবজীবনে কি অভাবনীয় পরিবর্তন চকিতে সাধিত হয়ে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "রাজপুত্র" গল্পটি। অবশ্য বিশ্বনাথ কেমন করে দরিদ্র হয়েছেন তার উল্লেখ নেই।

এই গল্পে নতুন গজিয়ে ওঠা জমিদার ঘোষবাবুর উল্লেখ আছে।

১০) মা ঃ— প্রথমে গল্পটির নাম ছিল 'ফল্গু'। এখানে বিলীয়মান জমিদার মহাবিষ্ণু সরকার। প্রথমা স্ত্রীকে সন্দেহের বশে গলা টিপে হত্যা করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। মহাবিষ্ণুর দুই পুত্র। বড়টি দাম্ভিক ও উগ্র। প্রজাহত্যার দায়ে দ্বীপান্তর হয়েছে। ছোটটি বি. এ. পাশ করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং তার ফাঁসি হয়। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মহাবিষ্ণু মৃত্যুর চরম মুহূর্তে স্ত্রী হত্যার কথা স্বীকার করেন। কর্মফলবাদকে অর্থাৎ ভারতীয় সনাতন আদর্শকে স্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর। তাই তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন আদিমতার তীক্ষ্ম প্রকাশ আছে তেমনি অন্যদিকে আছে আদর্শবাদের সংহত প্রশান্তি— সব মিলিয়েই তারাশঙ্কর বিশাল ও ব্যাপক। বাংলা সাহিত্যে এমন বস্তুবৈচিত্র্যের তুলনা মেলা ভার।

১১) সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার ঃ— এই গল্পে আছে নির্বিষ সর্পের নিষ্ফল গর্জন। জমিদারী দাপট শূন্য; বিত্তহীন জমিদার বনবিহারী সরকার। অবস্থাহীন বলে তাঁকে প্রজারাও অবজ্ঞা করে। সন্তানহীন, বিপত্নীক বনবিহারী এক ভাগ্নেকে মানুষ করেন। ভাগ্নে রমেন বর্ধমানের কাটোয়ায় শিক্ষকতা করে। সাড়ে সাত আনির জমিদারী বর্তমানে লোকসানের দিকে ঝুঁকেছে, সেই সঙ্গে প্রজাদের অবজ্ঞাসুলভ আচরণ ইত্যাদি দেখে রমেন মামাবাবুকে জমিদারী বিক্রির পরামর্শ দেয় এবং তখনই শুরু হয় মামা ও ভাগ্নের সংঘাত। পরিশেষে বৃদ্ধ বনবিহারী কাশী যাত্রা করেছেন। প্রথম পুরুষের শৌর্য কবেই অস্তমিত — আজ শুধু বেলা শেষের হাহাকার। এ অবক্ষয় তারাশঙ্কর নিজের গ্রামেই দেখেছেন। বীরভূমের জমিদারীর বৈশিষ্ট্য হল — ক্ষুদ্র আয়তন এবং সংখ্যাধিক্য। তথাপি তাঁদের পরাক্রম কম নয়। "তাঁরা বলতেন, মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।" বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবী ঘোষণা করতেন" [১৯] এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন। তারাশঙ্করের জীবনেও এই ঘটনা ঘটেছিল। "আমার কালের কথা"য় বলেছেন "সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" [২০]

১২) জন্মান্তর ঃ— এখানে জমিদার বলরাম চ্যাটার্জী গ্রামের প্রধান। তিনি মারা যাবার পর তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নিঃসন্তানা হৈম দাপটের সঙ্গে জমিদারী দেখাশুনা করতে থাকেন। কিন্তু ১৯৬১ আইনে জমিদারী চলে যায়। প্রথম পক্ষের উচ্ছৃঙ্খল পুত্র নীলুকে সব ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার মনস্থ করেন। কিন্তু নীলুর শিশুপুত্রকে দেখে আবার সংকল্প ত্যাগ করে হৈম সংসারে ফিরে আসেন। সন্তানহীনা হৈম-র বুভুক্ষু হৃদয়ের হল জন্মান্তর ।

তালিকা - তিন

'খ' বর্গ

এই পর্যায়ে গল্পগুলিতে জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান নন। কাহিনীর প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এধরণের কিছু গল্প প্রথমেই আলোচিত হয়েছে।

১) বিষধর ঃ— এই গল্পের জমিদার "সাত আনির জমিদার রায়বাড়ির এক আনির অর্ধেকের মালিক" বিনয়কৃষ্ণ রায়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। সর্বদা মুখে আদর্শের বুলি ও অন্যকে সন্দেহ করা বা সমালোচনা করা তাঁর স্বভাব। তাই নিজে অসৎ, ভ্রষ্ট চরিত্রের হয়েও হরেণের মত শুদ্ধ চরিত্রকেও সন্দেহ করেন। সর্বদা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন। হরেণ রায়ও জমিদার। তিনিও 'সাত আনির এক আনির মালিক। একদিন হরেণ এক অপরিচিত বালকের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ঐ বালকের মা এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। মাকে বাড়ী থেকে নিয়ে কলকাতায় রাখেন বর্তমানে মা নেই কিন্তু মা বলে গেছেন সেই ভ্রষ্ট ও দুষ্ট চরিত্র হলেন বিনয়কৃষ্ণ রায়। মুখে আদর্শের বুলি, গায়ে ছদ্মবেশে নামাবলীর আচ্ছাদন দিয়ে সমাজের শিরমণি হয়ে থাকতে চেয়েছেন অনেক জমিদার অথচ ভেতরে তাঁদের মত কদর্য চরিত্রের মানুষ আর হয় না। তাদেরই একজন হলেন বিনয়কৃষ্ণ রায়।

২) ইস্কাপন ঃ— এই গল্পের প্রধান চরিত্র ইস্কাপন। বয়স চল্লিশ— মদ্যপ, চোর, দাগী আসামী। নাম ধাম পিতৃপরিচয় সবই অজ্ঞাত। এখানে যে জমিদারের উল্লেখ আছে তাঁকে যথার্থ অর্থে জমিদার বলা যায় না, সামান্য জমির মালিক বলা চলে। ভূমিকা নগণ্য।

৩) প্রতিমা ঃ— প্রতি বছরের মত কুমারিশ মিস্ত্রী দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে জমিদার বাড়ীতে যান। ছোটবাবু অমূল্য চ্যাটার্জী মাতাল, অত্যাচারী। ছোট বউ যমুনা স্বামীর জ্বালায়, যন্ত্রণায় ক্লিষ্টা অথচ সুন্দরী। কুমারিশ দুর্গা তৈরি করে একেবারে ছোট বউ এর মুখের আদলে। ছোট বউ তা দেখে শিউরে ওঠেন। গ্রামবাসী, স্বামী, অন্যান্যরা প্রতিমা দেখে যমুনাকে কি বলবে, সেই ভয়ে, লজ্জায় ও ঘৃণায় পাশের পুকুরে আত্মহত্যা করেন।

৪) মালাকার ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র রজনী মালাকার। তার চারিত্রিক পরিবর্তনের কাহিনীই এই গল্পের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। তথাপি সৌন্দর্য প্রিয়, সমঝদার জমিদার প্রতিমার নতুন সাজ দেখে রজনীকে ১৫ থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা বকসিস্ দিয়েছেন। এই টাকাই রজনীর জীবনের পরিবর্তনে অনেকখানি সহায়ক হয়েছে।

৫) মধুমাষ্টার ঃ— জমিদার জ্ঞানদাবাবু ঃ দানশীল, শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী। পদবী রায়। মূল ঘটনা এক শিক্ষকের বই লেখার করুণ কাহিনী।

৬) হরি পণ্ডিতের কাহিনী ঃ— এই গল্পে জমিদারের উল্লেখ থাকলেও তাঁর নাম বা পদবীর উল্লেখ নেই। জমিদার হরি পণ্ডিতের সহপাঠী। জমিদারের কাছারীতে হরি পণ্ডিতের পাঠশালা। এর জন্যে হরি পণ্ডিতকে বিল্বমঙ্গলের নিত্যপূজা করতে হয় এবং জমিদার গ্রামে আসলে, তাঁকে রান্না করতে হয়। এখানে জমিদার অপেক্ষা হরি পণ্ডিতের

মাধ্যমে আদর্শ শিক্ষকের রূপ দেখানো হয়েছে।

৭) না ঃ— জমিদার পুত্র অনন্ত— অনন্ত অল্পশিক্ষিত ও উগ্রস্বভাবের। সে সবসময় বন্দুক হাতে শিকার করে বেড়ায়। অনন্তের পিসতুতো ভাই কালীনাথ, উচ্চশিক্ষিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই ভাই-এর একই সঙ্গে বিবাহের উদ্যোগ হয়েছিল। কালীনাথ অনন্তের জন্যে কনে হিসেবে ব্রজরাণীকে দেখতে যায়। কিন্তু ব্রজরাণীকে কালীনাথের পছন্দ হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকতা করে দুখানি বেনামী পত্র দুই কন্যার পিতাকে দিল। পাল্টে যায় পাত্রী। ব্রজরাণীর সঙ্গেই কালীনাথের বিবাহ হয়। ফুলশয্যার দিন থেকেই অনন্তের দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে অথচ কালীনাথ সুখেই থাকে। অনন্ত সব বুঝতে পেরে ধৈর্য হারিয়ে ব্রজরাণীর সামনেই কালীনাথকে গুলি করে হত্যা করে ঃ গ্রেপ্তার হয় অনন্ত। উন্মাদ হয়ে যায়। দীর্ঘ আট বছর পর আদালতে চূড়ান্ত রায়ের দিনে স্বামী হন্তাকারীকে শাস্তি বিধানের পরিবর্তে ব্রজরাণী অনন্তকে নির্দোষ বলেন। হ্যাঁ, এই শব্দটির মধ্যেই ছিল অনন্তের ফাঁসি অথচ প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়েও ব্রজরাণী বলেন 'না'। প্রতিহিংসা নয় ক্ষমাই হল জীবনের প্রধান লক্ষ্য — মানবের চিরন্তন ধর্ম। "অসৎ থেকে সত্যের পথে, হিংসা থেকে ক্ষমার পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যে শুভংকরী প্রকৃতি, আজ তাঁরই জয় হল। ক্ষমা করে দিয়ে ব্রজরাণী বাড়ি ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল। পরাজিত হল মানুষের সমস্ত সজ্ঞান প্রয়াস, জয়ী হল শুভংকরী প্রকৃতি।" (২১) এই গল্পের ঘটনাটি বীরভূমের চৌহদ্দীতেই ঘটেছিল। ঘটনাটি কীর্ণাহারের বাবুদের বাড়ীর। "তাঁদেরই একজন এই গল্প প্রকাশের পর তারাশঙ্করের উপর কেস করবো বলে হুমকিও দিয়েছিল।" (২২)

তালিকা - চার

'গ' বর্গ

১) পুরোহিত ঃ— গল্পটিতে একটি তরফ ক্রয় করা নিয়ে বৃদ্ধ পুরোহিত যদু ভট্টাচার্য এর সঙ্গে নবীন জমিদার ও ব্যবসায়ী বিমল রায়ের সংঘাত। অর্থের প্রয়োজনে দেবোত্তর গহনা বিক্রি করতে চান বিমলবাবু কিন্তু পুরোহিত সেই গহনা দিতে অস্বীকৃত হন। বিমলবাবু প্রধান পুরোহিতকে অপমান করতে দ্বিধা করেন না। হঠাৎ একদিন বিমলের স্ত্রী চারুর কঠিন অসুখ হয়। ডাক্তার বাঁচার আশা ছেড়ে দেন। শেষে চারু সুস্থ হয়ে ওঠে। পরে জানা যায় যে পুরোহিত দীর্ঘ ২৮ দিন উপবাসী থেকে গোবিন্দজীর পূজো করে যান মাত্র একবার হবিষ্যি করে। এই কথা জানার পর রুষ্ট বিমলের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটে। পুরোহিত যে তাঁদেরই হিতাকাঙ্ক্ষী তা উপলব্ধি করতে পারেন।

২) বন্দিনী কমলা ঃ— আলোচ্য গল্পটি একটি কিংবদন্তীর প্রতীক আশ্রয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর পড়ন্ত বিকেলের হাহাকার পরিস্ফুট। অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান গোপীবল্লভ গাঙ্গুলী কোম্পানীর দেওয়ানি করে বিশাল জমিদারী গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর লক্ষ্মীসমা তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী মানিক অকালে বিধবা হন। পুত্রের মঙ্গলকামনার্থে আটদিন উপবাস করেন। কোজাগরীর রাত্রের শেষে এক কন্যার আবির্ভাব এবং কন্যাটিকে লক্ষ্মী মনে করে ঘরে বন্দিনী করে মানিক বৌ গঙ্গায় প্রাণবিসর্জন দেন। বর্তমানে শূন্য কুম্ভ জমিদারবাড়ী ঋণভারে জর্জরিত— সম্পদ, অর্থ সব নিঃশেষিত। উপসংহারে সংস্কার থেকে anticlimax সৃষ্টি করেছেন লেখক। অর্থের লোভে ক্ষয়ে যাওয়া তালা খুলে সকলে দেখে একরাশ বিবর্ণ চুল ও এক নরকঙ্কাল। আর একখানা নামাবলী। কিংবদন্তী ও প্রাচীন সংস্কার এই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। গৃহে চিরদিনই লক্ষ্মীকে বন্দিনী রাখা যায় না তা লেখক তুলে ধরেছেন। এখানেও ঘটনাই প্রধান, জমিদারের ভূমিকা অপ্রধান। এখানেও জমিদারদের চরিত্র ভ্রষ্টতা ও অধোগতি তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। "যাঁরা বলেন জমিদারতন্ত্রের প্রতি তারাশঙ্করের দুর্বল পক্ষপাতিত্ব ছিল, তাঁরা যে কতটা ভুল করেন এই গল্পগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে।" (২৩)

৩) আরোগ্য ঃ— অভিশপ্ত ধনৈশ্বর্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার কাহিনী। বিধবা রাসুঠাকরুণ শাঁখপুরের জমিদারবাবুর ভাগ্নী এবং রতনহাটীর জমিদার বাড়ির বউ। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর কথা না শুনে ছোট্ট শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যান। মামাবাবুদের চাহিদা মেটাতে অনেক অর্থ খরচ হয়ে যায়। হঠাৎ ২০ বছর পর পুত্র জমিদারী কিনতে মায়ে কাছে টাকা চাইতে এসে বাক্স খুলে মাত্র বাইশ শো টাকা এবং তিনখানি গিনি পায়। পুত্র সেগুলি নিয়ে মায়ের সাথে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। রাসু ভিখারিণী হয়ে স্বামীর ভিটেয় ফিরে আসেন। "এত সুখ, এত শান্তি, এত তৃপ্তি রাসু ঠাকরুণ জীবনে আর কখনো পান নি। ঐশ্বর্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।" (২৪)

৪) অগ্রদানী ঃ— এই গল্পটির মুখ্য ভূমিকায় পূর্ণ চক্রবর্তী। জমিদার শ্যামাদাসবাবু গল্পটির রসসৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছেন। এখানে জমিদারের অর্থের প্রতি অহংকার, লোভ ও লালসার চিত্র বর্ণিত। উদর সর্বস্ব, লজ্জাহীন হীনচিত্ত পূর্ণ চক্রবর্তীকে হীনতর করার পিছনে জমিদারের অর্থ ক্রিয়াশীল থেকেছে।

৫) সন্তান ঃ— কুৎসিত, বীভৎস গোবিন্দ এই গল্পের নায়ক মূর্খ— বিয়ের জন্যে ধর্মান্তরিত হয়। বিয়ের পণের টাকা সংগ্রহের জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুদের বাড়ীতে কাজ করে। গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে জমিদারবাবুর পুত্রকে দেখাশুনাও করত। একদিন গোবিন্দ পুত্রসন্তান কামনায় ছেলেটিকে ভালবাসার টানে একাত্ম করতে চাইলে লক্ষ্মীবাবু কাজ থেকে গোবিন্দকে তাড়িয়ে দেন। এরপর গোবিন্দ পুত্রসন্তান কামনায় মরিয়া হয়ে কুৎসিত রমণী মঞ্জরীকে বিয়ে করে শ্বশুরালয়ে পুত্রসন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বর্বর পশুর মত কদাকার শিশুকে হত্যা করে। গোবিন্দ শেষে উন্মাদ হয়ে যায়। পাগলাগারদে রূপলাবণ্যময় শিশুদের ছবির ক্যালেন্ডার দেখে আপনমনে হাসে-কাঁদে। এখানেও জমিদার লক্ষ্মীবাবু গোবিন্দকে যদি সহজভাবে গ্রহণ করতেন তাহলে এমন পরিণতি গোবিন্দর জীবনে ঘটত না। জমিদার-পুত্র মানিকের আকর্ষণেই সে বিবাহ করেছে, সন্তান চেয়েছে— পুত্রের সঙ্গে সেও নাচতে চেয়েছে, কিন্তু যখনই কদর্য পুত্র দেখেছে সে পশুর মত তাকে হত্যা করেছে। কারণ গোবিন্দ বুঝেছে শিশুটিকেও এই সমাজে আঘাত, ঘৃণা, অবজ্ঞার বোঝা বইতে হবে যেটি গোবিন্দর জীবনেও ঘটেছে। সে চেয়েছিল মানিককে পুত্ররূপে পেতে। এর মূলে জমিদারেরই ভূমিকা প্রধান।

৬) শেষকথা ঃ— গল্পটির মূল কাহিনী চাষী লালমোহন পাণ্ডে ও তাঁর স্ত্রীর। জীবনের পূর্ণতা ক্ষমায় ও ভালবাসায়, সংঘাতে বা বিরোধে নয়। সাউ ও সাঁই বাবুদের পারস্পরিক সংঘাত শুরু হয়েছে জমির দখলকে কেন্দ্র করে। হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বীর বুকে মহামিলনের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে লালমোহন ও তাঁর স্ত্রী। তারা অহিংসার পথ বেছে নেয়, শুরু করে অনশন। বুড়ির মৃত্যু বুঝিয়ে দেয় ক্ষমাই মানবধর্ম। এই গল্পটির অন্তিমদৃশ্য অনিবার্য ভাবেই "কস্তুরবা'র মৃত্যুদৃশ্যকে স্মরণ করায়। টেন্ডুলকরের ইংরেজি গান্ধীজীবনী "মহাত্মা'র ষষ্ঠ খণ্ডে "কস্তুরবার মৃত্যু" অধ্যায়ে আছে **"Gandhi was visibly moved and with his wrap wiped his tears. The priest completed his ceremony, and before the pyre was set ablaze, Gandhi spoke a few faltering words, Ba, he said, had achieved her freedom; she died with 'Door Die' engrad in her heart."** (২৫)

৭) বরমলাগের মাঠ ঃ— শিবনাথ বারশো পঁচিশ টাকায় আঠার বিঘা উর্বর জমি বরমলাগের মাঠ ক্রয় করেন জমিদারের কাছ থেকে। জমিদারের এই জমির জন্যেই সমাজতন্ত্রী শিবনাথ বিষয়ী হয়েছেন। "লাঙ্গল যার জমি তার" এই তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েও অবিশ্বাসী হয়েছে। তেভাগা আন্দোলনের যোগদানের জন্যে জোতদার বলরামকে শিবনাথ গুলি করেছে। শিবনাথের জীবনে এই উত্থান ও পরিবর্তন সবেরই মূলে ঐ শিবনাথের জমিদার বন্ধুর প্রদত্ত জমিটির ফলেই সংঘটিত হয়েছে।

৮) সর্বনাশী এলোকেশী ঃ— এখানে প্রধান চরিত্র বলরাম বৈরাগী বৈষ্ণব হয়েও মদ, মাংস খায়— বিশাল শরীর তার। সে তার ৫ বিঘা বাগান নিজে কোপায় আবার নিজের দোকানে দোকানদারী করে। হঠাৎ একদিন তার সদ্য লাগানো হেনা গাছটাকে এক দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার বাছুর মুড়িয়ে খেতে শুরু করে। বলরাম প্রচণ্ড ক্রোধে বাছুরটাকে আঘাত করে অচৈতন্য বাছুরটাকে শুশ্রূষাও শুরু করে। এ পর্যন্ত গল্পটি ঠিক ছিল কিন্তু গল্পের মাধুর্য ও রসসৃষ্টিতে জমিদার সহায়ক হয়েছেন। কারণ বাছুরটি তাঁর। জমিদার বলরাম এর জরিমানা ধার্য করেছেন ও নিজের জুতো দিয়ে প্রহার করেছেন। পরবর্তীকালে বাছুরটাকে বলরাম বাড়িতে নিয়ে আসে। নাম দেয় এলোকেশী। এই বাছুরই পরবর্তী পর্বে বলরামের জীবনে কেন্দ্রীভূত।

তালিকা - পাঁচ

'ঘ' বর্গ

১) পুরোহিত ঃ— নবীন জমিদার বিমল রায় গ্রামের জমিদার এবং কলকাতায় তাঁর কয়লার ব্যবসা।

২) মুখজ্জে মহাশয় ঃ— এই গল্পে হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রামের জমিদার কিন্তু দুই পুরুষ যাবৎ তারা কলকাতাবাসী। বালিগঞ্জে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা। ব্যবসার উপকরণের উল্লেখ নেই।

৩) শেষকথা ঃ— এই গল্পে সাউ ব্যবসায়ী। তিনি মিঞাদের জমিদারী ক্রয় করেন। অনেক কলকারখানার মালিক।

তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গর্ভজাত সামন্ততন্ত্রের চাকায় নিষ্পেষিত জমিদারের অবক্ষয়ের দিক যেমন তুলে ধরেছেন, ঠিক তেমনি ঐতিহ্যহীন নব্য গজিয়ে ওঠা ব্যবসায়ীদের অনিবার্য উত্থানকে স্বীকার করে নিয়েছেন। মুমূর্ষু জমিদারদের অনাচার, অত্যাচার, শোষণের চিত্র তুলে ধরলেও তাঁদের জন্যে তারাশঙ্করের মমতার অন্ত ছিল না। জমিদারদের বহুমুখী কর্মধারার সার্থক কারিগর তারাশঙ্কর।

120025 13 FEB 1998

এখন তালিকা "ক" থেকে জমিদারদের বহুমুখী কর্মধারার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে —

ক) অর্থনৈতিক ঃ—

১) জমিদার সামান্য টাকার জন্যে পেয়াদা পাঠিয়ে দরিদ্র প্রজার কুঁড়েঘরখানি লাঠির আঘাতে ভেঙে দেন [শ্মশানের পথে]

২) বিদ্রোহী প্রজাদের সায়েস্তা করে খাজনা আদায়ের জন্যে গমন [রাজা, রাণী, ও প্রজা]

৩) বিদ্রোহী প্রজাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া [রায়বাড়ি]

৪) নতুন পরগণা ক্রয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্যে দেবতার গহনা বিক্রি করতে গিয়ে কুলপুরোহিতের সঙ্গে নবীন জমিদারের সংঘাত। [পুরোহিত]

৫) জমিদারী বনাম ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব [জলসাঘর]

৬) অর্থের লোভে মানুষের চরম অধোগতি [রাখাল বাঁড়ুজ্জে]

৭) দুর্ভিক্ষের চিত্র, সরকারী খাজনা পরিশোধের জন্যে স্ত্রীর গহনা চুরির পরিকল্পনা [সমুদ্রমন্থন]

৮) দুর্বলের উপর জমিদারী শোষণ [রসকলি, ইস্কাপন, পাটনী]

৯) দারিদ্র দূর করতে দরিদ্র প্রজার দ্বারা উচ্চশিক্ষিত জমিদার প্রতারিত [ব্যাঘ্রচর্ম]

১০) জমিদার বনাম শিক্ষার লড়াই ও শিক্ষিতের জয়লাভ [নুটু মোক্তারের সওয়াল]

১১) স্বার্থান্বেষী ও অর্থলোভী জমিদার [পিঞ্জর, মা]

১২) প্রজাদের জমি খাস করিয়ে অন্যকে বিক্রি করা [বরমলাগের মাঠ]

১৩) সৎ মায়ের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের সংঘাত [জন্মান্তর]

১৪) মামলা, রাহাজানি, দাঙ্গাবাজি করে প্রজাদের সর্বনাশ সাধন [নুটুমোক্তারের সওয়াল]

—— ঐতিহাসিক ঃ— মোঙ্গল সম্রাট ঔরংজেবের আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের উপর (খড়্গ), আবার জাতিস্মর মানুষের কাহিনী [দেহের প্রদীপে রূপের শিখা] উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামাজিক ঃ—

১) নারীজাতির সামাজিক ভূমিকা প্রায়ই রক্ষণশীলা, আবার লোভীও বটে। দুশ্চরিত্র নারীর গৃহত্যাগের করুণ কাহিনী [বিষধর]

২) সামাজিক কুপ্রথা 'কৌলিন্য''কে নিয়ে মর্মস্পর্শী বেদনা বিধুর নারীর কাহিনী [কুলীনের মেয়ে, মুখুজ্জেমশাই]

৩) ধনীর কন্যাবলে আত্মকেন্দ্রিক, স্বামীর সুখ-দুঃখের সাথী হন না [সমুদ্রমন্থন]

৪) নারীজাতির চারিত্রিক মাধুর্য [না]

৫) চরিত্রহীন মদ্যপ জমিদারদের হাত থেকে বাঁচতে কখনও আত্মহত্যা [প্রতিমা], আবার কখনও জমিদার স্বয়ং সন্দেহের বশে সুন্দরী স্ত্রীকে হত্যা [মা]

৬) সামান্য জমিদারীর মালিক হয়ে ধনগর্ব, বংশগর্ব এদের মজ্জাগত দোষ। অকৃতজ্ঞতা, মানুষকে অপমান করা এঁরা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মনে করেন অথচ মনুষ্য সমাজে এঁরা জঘন্য চরিত্রের মানুষ [বিষধর]

৭) নিজের চূড়ান্ত অপমান সহ্য করেও তা গোপন করার ব্যর্থ প্রয়াস [মুখুজ্জেমশায়]

৮) অর্থ পিশাচ, বিধবা ভগিনী ও ভাগিনীর সর্বনাশের চেষ্টা [রাখাল বাঁড়ুজ্জে]

৯) সমাজে একশ্রেণীর দুর্মুখ, যারা সর্বদা অন্যের নিন্দা করে এমনকি পাত্র/পাত্রীর সম্বন্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করে [রঙীন চশমা]

১০) কৃপণ, শোষক, নিঃসন্তান, হৃদয়হীন জমিদার নিজপুত্র কামনায় অন্যের পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত। [পুত্রেষ্ঠী] আবার নিজ পুত্র কামনায় দরিদ্র মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমান করেছেন [অগ্রদানী]

১১) আত্মগরিমা প্রচার ও অহমিকা প্রধান [সন্তান] জমিদারতন্ত্রের চরম অধোগতি [রাজপুত্র, বন্দিনীকমলা, রসকলি, জন্মান্তর, সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার ইত্যাদি]

১২) ছাত্র জীবনের নৈতিকতাবোধ নষ্ট [হরিপণ্ডিতের কাহিনী]

সাংস্কৃতিক দিক ঃ— জমিদারগণ কেবল অত্যাচারী, ব্যাভিচারী বা শোষকই ছিলেন না। সেই সঙ্গে অনেকে কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পদ ভোগ করেন এবং সংবাদপত্র নিয়ে দেশ বিদেশের যুদ্ধের খবর রাখেন [ট্যারা]। আবার সৎ মানুষের প্রতি সততার মর্যাদা দানে প্রয়াসী [পণ্ডিতমশাই]। কেউ কেউ আবার বন্যার হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাতে নিজ প্রাসাদ খুলে দেন [রায়বাড়ি]। সৌন্দর্যপ্রিয় সংস্কৃতিবান জমিদার [মালাকার]। জন্তু পোষা বা শিকার করাও ছিল জমিদারগণের প্রিয়সখ [ব্যাঘ্রচর্ম, না, জলসাঘর]। শিক্ষার মান বাড়ুক, দেশীয় শিক্ষার মান উচ্চ হোক, ইংরেজদের শিক্ষার অহংকার চূর্ণ হোক তা চেয়েছেন [মধুমাষ্টার] জ্ঞানদাবাবু।

জমিদারগণের দানে পথ, ঘাট, পুকুর, বিদ্যালয় ইত্যাদি বহু কীর্তি গড়ে উঠেছে। বহু মন্দির নির্মাণ করাও তাঁদের প্রধান কীর্তি। কারণ বীরভূম জেলা একটি পীঠস্থান যা আজও সর্বজনবিদিত। "জমিদারের দানশীলতা নদীপ্রবাহের ন্যায় দুই ধারে শ্যামলতা বিস্তার করিত। তাহার দৃপ্ত পৌরুষ জাতির দুঃসাহসিকতাকে আত্মপ্রকাশের অবসর দিত।" (২৬)

বৃটিশ সরকারে রাজস্বের চাপ এবং নিজেদের বিলাস-ব্যসনের বেহিসেবী খরচ যোগাতে জমিদারগণ রায়তদের উপর খেয়াল খুশিমত রাজস্ব ধার্য করতেন, ফলে রায়তগণ ধীরে ধীরে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হয়; গ্রামে গজিয়ে ওঠে মহাজন নামে ধনী ব্যবসায়ীরদল। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক শোষণের যুগপৎ চাপে রায়তগণ পিষ্ট হয়। "এইসব লক্ষ লক্ষ শ্রমপরায়ণ পিতৃতান্ত্রিক ও নিরীহ সামাজিক সংগঠনগুলি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, ডুবছে দুর্দশার অতল সমুদ্রে, সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গ্রামীণ সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জীবিকা অর্জনের বংশানুক্রমিক উপায়। এটা দেখতে মানবিক অনুভূমির কাছে যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, ...এইসব শান্ত সরল গ্রামগোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক, তারাই চিরকাল প্রাচ্যদেশগুলিতে স্বৈরাচারের ভিত্তি হয়ে রয়েছে, মানুষের চিন্তাধারাকে তারাই যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে বানিয়েছে কুসংস্কারের অবাধ ক্রীড়নক, করে রেখেছে চিরাচরিত নিয়মের ক্রীতদাস, হরণ করেছে তার সমস্ত মহিমা এবং ঐতিহাসিক কর্মদ্যোতনা। একথাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, এই হীন, অনড় ও উদ্ভিদসুলভ জীবন, এই নিষ্ক্রীয় ধরনের অস্তিত্ব থেকে অন্যদিকে তার পাল্টা হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বন্য লক্ষ্যহীন এক অপরিসীম ধ্বংসশক্তি এবং হত্যা ব্যাপারটি হিন্দুস্থানে পরিণত হয়েছে এক ধর্ম প্রথায়। এই ছোট ছোট গ্রাম গোষ্ঠীগুলি জাতিভেদ প্রথা ও ক্রীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত, অবস্থার প্রভুরূপে মানুষকে উন্নত না করে তাকে করেছে বাইরের অবস্থার অধীন, স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে।" (২৭)

একাল আর সেকালের সন্ধিক্ষণের জীবন্ত চিত্রে তারাশঙ্করের আবির্ভাব; দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজের উত্থান-পতন দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন যে, এই সীমাহীন শোষণের চাকায় শোষিত নিপীড়িত মানুষ একদিন দল বাঁধবে নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়। "পল্লী জীবন ও পল্লীসমাজ জীর্ণ হয়েছে; ভেঙে পড়তে গিয়ে কোনক্রমে সেই ভাঙা কাঠে, বাঁশে ঠেকা খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টিকে রয়েছে কায়ক্লেশে, শ্মশান আসছে এগিয়ে— জমিদার মহাজন, কাবুলিওয়ালার শোষণ, তাড়ন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ, ঈশ্বরের নীরবতা গ্রামের চাষীকে টেনে নিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, মৃত্যুর পথে।" (২৮) দরদি লেখক তারাশঙ্কর তাই কৃষকদের সংঘবদ্ধ করে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব অঙ্কন করেছেন রায়বাড়ি গল্পে—হুদা শ্যামপুরের মুসলমান, বাগদী ও হাড়িরা জমিদারের অত্যাচারী গোমস্তাকে পুড়িয়ে মেরেছে।

রাজা, রাণী ও প্রজা গল্পে কৃষক রাইবল্লভ তাদের সমস্ত চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করেছে খাজনা না দেওয়ার জন্যে। নুটুমোক্তারের সওয়াল গল্পে দরিদ্র চাষী মহাভারত একাই লড়াই করেছে কঙ্কনার জমিদারের বিরুদ্ধে। সাউ জমিদারদের বিরুদ্ধে লালমোহনের অহিংস আন্দোলনের জিদ শেষকথা গল্পে। এই গল্পটি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে স্মরণ করায়। বরমলাগের মাঠ গল্পে বলরামকেও স্মরণ করা যেতে পারে।

বীরভূম জেলায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই বৈষ্ণবতীর্থ, কালীতীর্থ এমনকি শৈবতীর্থ ও বিরাজিত। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সাধু-সন্ত এখানে এসেছেন। বেদে, ডোম, বাগ্দী থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণীর মধ্যেও এই ধর্মীয় শক্তির প্রাবল্য বিদ্যমান। বিশেষ করে মনসা, চণ্ডী, কালী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি এই অঞ্চলে ছড়াছড়ি। বিভিন্ন গ্রামে

অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। শক্তি পূজার পীঠস্থানও হল এই বীরভূম জেলা। "বীরভূমের কীর্ণাহার লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়ি, ডোম পূজিত বিখ্যাত সব কালী আছেন। ..... কীর্ণাহারের গ্রাম দেবতা ভদ্রকালী। লাভপুর তো ফুল্লরা দেবীর তান্ত্রিক পীঠস্থান বলে খ্যাত।" (২৯) তান্ত্রিক পীঠস্থান তারাপীঠ বক্রেশ্বর বিখ্যাত। তারাপীঠে সাধক বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধিলাভ করেন। বর্তমানেও প্রতিদিন বহু দর্শনার্থীর ভিড় হয়। এছাড়া বোলপুরের সন্নিকটে অঘোরীবাবার আনন্দ কানন-এর কথা বহুজনশ্রুত। এখানে সম্পূর্ণ তন্ত্রোক্তমতে সাধনা চলত। কালীমূর্তির সম্মুখে সাধকেরা নির্জন অমাবস্যার রাত্রে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে প্রধান গুরুদেব কারণবারি (রক্তচন্দনমিশ্রিত মদ্য) ভক্তদের দিতেন এবং সাধনা চলত। তারমধ্যে শবসাধনা, শিব-শিবানীদর্শন ইত্যাদির সাধনা চলত। বর্তমানে তার অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। অঘোরপন্থীগণ যে ছেলে চুরি করত 'একরাত্রি' গল্পে তার উল্লেখ আছে।

আর আছে বৈষ্ণব ধর্মের কান্ত-কোমলধারা। যেমন গোবিন্দ ভক্ত কবি জয়দেবের জন্মস্থান অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে। যেখানে আজও পৌষমাসের সংক্রান্তিতে মেলা বসে, তা প্রায় এক মাস যাবৎ চলে, বহু বাউলের আগমন ঘটে। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত নান্নুর একটি পবিত্র তীর্থস্থান।

রুক্ষমাটির দেশ রাঢ়, জঙ্গলে পূর্ণ। প্রত্যেক জমিদারের ইচ্ছা একে অপরকে দমিয়ে রাখতে বা নিজে নিরাপদে থাকতে। জমিদারদের মদতে প্রায়ই চুরি, ডাকাতি হত। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে শক্তি বা তান্ত্রিক সাধনার প্রাবল্য ঘটে। প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জমিদারগণের প্রায় অধিকাংশই ছিলেন তান্ত্রিক। আবার অঞ্চলবিশেষে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব ছিল প্রকট। যেখানকার জমিদারগণ বৈষ্ণবীয় মন্ত্রে দীক্ষিত, সেই স্থান ছিল শান্ত; কোনরূপ অশান্তি বা উপদ্রব প্রায়শই অনুষ্ঠিত হত না। তারাশঙ্কর জমিদারগণের বিভিন্ন ধর্মের ও তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি বিভিন্নভাবে ও ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন নানা গল্পে। উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ পর্যন্ত চরিত্রগত নানা দোষ তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। জীবনের কুৎসিত প্রবৃত্তি সুন্দর নিবৃত্তিতাকেও সঠিকভাবে অঙ্কন করেছেন তিনি। তাই তারাশঙ্করের গল্প সুন্দর আর অসুন্দর, মধুর আর বীভৎসতার মহামিলন। "এই কারণেই তাঁর হাতে কোমলে কঠোরে বিচিত্র রস পরিবেশন সম্ভব হয়েছে। এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্করের সাহিত্যে কি বিপুল পরিবর্তন। শরৎচন্দ্র কেবল কোমল কেবল মধুর। জীবনের রস তীর্থে তিনি বৈষ্ণবপন্থী। তাই বাৎসল্য ও মধুর রসই তাঁর সাহিত্যে মুখ্যরস। তারাশঙ্করের চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতু প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক, এমনকি বীভৎস রসও সমান মর্যাদা পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের জীবনে রাধিকা মূর্তিরই আরাধনা, তারাশঙ্করের আরাধ্য জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্ত্তি।" (৩০)

এখন জমিদার প্রধান গল্পগুলির অন্তর্গত জমিদারদের ধর্মীয়পন্থার উল্লেখ করা যায় ঃ—

গল্পের নাম	নাম	গৃহদেব-দেবী	ধর্মীয় মতাদর্শ
১) রসকলি	জমিদারবাবুর নাম নেই।		সম্ভবতঃ তান্ত্রিক
২) রাজা, রাণী ও প্রজা	লেখক স্বয়ং		শাক্ত তান্ত্রিক
৩) খড়্গ	রাজাবাবু		শাক্ত তান্ত্রিক
৪) পুরোহিত	বিমল রায়	গোবিন্দজীউ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক
৫) জলসাঘর	বিশ্বম্ভর রায়	বিভিন্ন দেবদেবী থাকলেও কালীমূর্তিই প্রধান	শাক্ত তান্ত্রিক
৬) রায়বাড়ি	রাবণেশ্বর রায়	" "	শাক্ত তান্ত্রিক
৭) মুখুজ্জে মহাশয়	হীরেন্দ্র মুখুজ্জে		সম্ভবতঃ শাক্ত
৮) পুত্রেষ্টি	গণেশ বাঁড়ুজ্জে		শাক্ত তান্ত্রিক
৯) রঙীন চশমা	চৌধুরী পরিবার	রাধা গোবিন্দ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক/মদ, মাংস খাননা
১০) ব্যাঘ্রচর্ম	হেমাঙ্গবাবু		শাক্ত তান্ত্রিক
১১) জন্মান্তর	বলরাম চাটুজ্জে	লক্ষ্মীনারায়ণ	বৈষ্ণব তান্ত্রিক

	গল্পের নাম	নাম	গৃহদেব-দেবী	ধর্মীয় মতাদর্শ
১২)	না	অনন্ত		শাক্ত তান্ত্রিক
১৩)	বন্দিনী কমলা	গাঙ্গুলী (রায়/খেতাব)	শিব	কুলতান্ত্রিক/শিবভক্ত বড়কর্তা
১৪)	আফজল খেলোয়াড়ী কুমার ও রমজান শের আলী			সম্ভবত শাক্ত তান্ত্রিক

অন্যান্য গল্পগুলিতে জমিদারগণের ধর্মীয় মতাদর্শের উল্লেখ নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জমিদারগণ নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁদের মতাদর্শ নির্ণয়ে অসুবিধা হয়। 'ব্যাঘ্রচর্ম', 'না' এবং 'আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজানশের আলী' এই তিনটি গল্পের জমিদারগণের সখ ছিল শিকার। তার থেকেই তাঁরা যে শাক্ত ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার রাজপুত্র ও খড়্গ গল্প দুটিতে বাড়ীতে বলি হত তার উল্লেখ আছে। তার থেকেও বোঝা যায় যে তাঁরা শাক্তই ছিলেন। 'বন্দিনীকমলা' গল্পে জমিদারদের কুলধর্ম ছিল তান্ত্রিক কিন্তু পরবর্তীকালে বড়কর্তা হয়েছেন শিবভক্ত। আবার সপ্তমীর দিনে শয়তান নায়েব কিত্তিঘোষকে খুন করা হলে মানিক বৌ একেবারে অনাসক্ত জীবনধারণ করেন। পোষাকের যে বর্ণনা আছে তাতে বৈষ্ণবীয় ধর্মের সন্ধান মেলে।

খ. গোমস্তা / নায়েব / ম্যানেজার

রুক্ষ, শুষ্ক রাঢ়ের মাটিতে জন্মে বেশীর ভাগ জমিদার হয়েছিলেন হৃদয়হীন; বিশেষ করে পাঁচ সাত হাজার বাৎসরিক আয়ের অসংখ্য জমিদার ছিলেন বীরভূমে; নিজেদের দাপট ও অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা সর্বদাই সজাগ ছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত হিসেবী। সেই সব জমিদারগণের কর্মচারীবৃন্দ প্রভুকে সন্তুষ্ট করতে সদাপ্রয়াসী ছিল। তাই জমিদার অপেক্ষা কিছু কিছু উর্ধ্বতন কর্মচারী আরও অত্যাচারী ছিল। তারা শোষণের হাতিয়ার হয়ে প্রভুভক্ত সেনানীতে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ আবার নিজের প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিল। এরা ছিদ্রান্বেষী ও স্বার্থান্বেষী। এটি জমিদারী ব্যবস্থাতে যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় কলকারখানাতেও। সেখানেও মালিকের সহযোগী থেকেছে ম্যানেজার বা উর্ধ্বতন কর্মচারীর দল। শোষণের চিত্র এমনভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সামন্ততন্ত্র বা ধনতন্ত্রে সর্বত্রই এই শোষণের চিত্র বিদ্যমান; তা যেমন তারাশঙ্করের যুগে বর্তমান, আজও তেমনি জাতীয় জীবনে সমান ক্রিয়াশীল থেকেছে। লেখকের রচনাগুলির মধ্যে আমরা দু'ধরনের শোষণের চিত্র পাই। চিত্রটি ছকের আকার দেওয়া যেতে পারে —

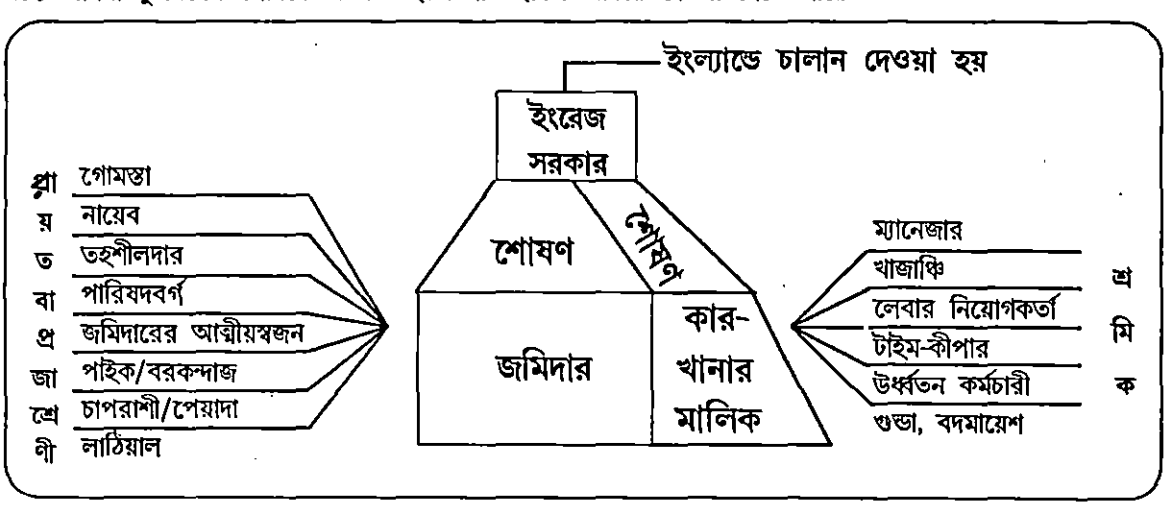

ইংরেজ সরকার কর্তৃক জমিদার ও ভূস্বামীগণ যেভাবে শোষিত হয়েছিলেন কারখানার মালিকগণ সেভাবে শোষিত হন নি, তার কারণ তৎকালীন যুগে কারখানা ছিল মুষ্টিমেয়, উপর্যুপরি কারখানার মালিকগণের অধিকাংশই কোম্পানীর কর্মচারী সংশ্লিষ্ট। তাই কারখানার উপর করের বোঝা বেশী ধার্য করলে স্বদেশীয়গণের ক্ষতি হবে বেশী। ফলে কারখানার মালিকগণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন; তথাপি নিজ শোষণের চাকার ঘূর্ণন অব্যাহত রেখেছিলেন নিরীহ দিনমজুর দরিদ্র শ্রমিকদের উপর।

মুঘল যুগ থেকেই জমিদারগণই রাজস্ব আদায় করতেন। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত নতুন ভূমি রাজস্বের যে নতুন বন্দোবস্ত হয় তার আদায়ের ভার "মোঙ্গল যুগের ভূমি রাজস্ব আদায়কারী জমিদার নায়ক কর্মচারীদেরই" (৩১) উপর দেওয়া হয়। "এইভাবেই ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আদর্শে এক নতুন ভূমি-ব্যবস্থা ও একটি নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়।" (৩২)

এই নতুন ব্যবস্থা বা ফিউডাল পদ্ধতিতে যেমন জমির ব্যক্তিগত মালিক (চাষী) রাজস্বের চাপে সর্বস্বান্ত হয়েছিল, তেমনি জমিদারের খাজনা, আদায়কারী গোমস্তা, নায়েব থেকে শুরু করে গ্রাম্য সর্দার পর্যন্ত দরিদ্রের উপর নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চালাত। চাষীগণ যূপবদ্ধ ছাগের মত সব নীরবে সহ্য করত এবং তিলে তিলে ধ্বংসের অভিমুখী হত। অবক্ষয়ের চূড়ান্তে এসে কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়েছে; রায়বাড়ি, রাজা, রাণী ও প্রজা, শেষকথা, বরমলাগের মাঠ প্রভৃতি গল্পে তার প্রমাণ মেলে। বিশেষ করে রায়বাড়ি গল্পে হুদ্দা শ্যামপুরের বিদ্রোহী প্রজারা গোমস্তা ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে পুড়িয়ে মারে। হয়ত গোমস্তাবাবু সেখানকার দরিদ্র কৃষকদের উপর এমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল যার ফলে তাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সুতরাং শোষণের মাধ্যম হিসেবে এই শ্রেণীর অবদান সবচেয়ে বেশী। পণ্ডিতমশাই গল্পটিতে বর্ণিত গোমস্তা যদি ঘি কমের কথা জমিদারের কাছে না উঠাতেন তাহলে যতীন্দ্রনাথ চাটুজ্জে মশাইকে এমন হেনস্তা হতে হোত না। 'সর্বনাশী এলোকেশী' গল্পে প্রবীণ নায়েবের কৌশলেই গোহত্যাকারী বলরামকে জমিদারবাবুর জুতো পেটা খেয়েও একশত টাকা জরিমানা দিতে হয়েছে।

কলকারখানার মালিকগণ শহরে থাকেন বিশেষ করে কলকাতায়। তাঁরা মাঝে মধ্যে কারখানা পরিদর্শনে আসেন। মালিকগণ নিজ পছন্দ অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। বৃদ্ধ কর্মচারী, যারা সারাজীবন তিল তিল করে কারখানায় কাজ করে নিজেকে নিঃশেষ করেছে অথচ সামান্য কারণেই তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায়। যেমন 'খাজাঞ্চি বাবু' গল্পে বৃদ্ধ খাজাঞ্চিবাবু সারাজীবন ধরে ফায়ারব্রিকস্ কারখানাটিতে কাজ করেছে, নিয়ম শৃঙ্খলা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলেছে। অথচ নতুন মালিক এসে নতুন ম্যানেজার নিয়োগ করে কৌশলে বার্ধক্যের দোহাই দিয়ে ভগবানকে ডাকার পরামর্শ দিয়ে কর্মপ্রিয় খাজাঞ্চিকে বিদায় দিয়েছে। 'ময়দানব' গল্পে বৈদ্যুতিক যন্ত্র এসে প্রাচীন ফণী মিস্ত্রীর নীরবে বিদায় ঘটেছে; এমনকি কারখানাটিকে গভীর ভালবাসার জন্যেই মদ্যপ অবস্থায় কারখানায় শেষ বিদেয় নিতে গিয়ে যন্ত্রের চাকায় তার প্রাণ গেছে।

নায়েব, গোমস্তা ও ম্যানেজারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছকের আকারে দেখানো যেতে পারে —

	গল্প	নাম	ভূমিকা	চরিত্র
১।	ছলনাময়ী	নেই	কলিয়ারীর ম্যানেজার	তান্ত্রিক, প্রবৃত্তির বশে ও অর্থের লোভে জামাইকে হত্যা করে। শেষে নিজেই পাগল হয়ে যায়।
২।	জলসাঘর	তারাপ্রসন্ন	নায়েব	অত্যন্ত সৎ, কর্তব্যপরায়ণ, মনিবের শুভাশুভের অংশীদার।
৩।	মুখুজ্জে মহাশয়	বিষ্ণু মুখুজ্জে	জমিদারী দেখভাল করা	অকর্মণ্য, অহং প্রধান। হীরেন্দ্রবাবু তাঁর চাকরী কেড়ে নিলেও লোক সমক্ষে তা প্রকাশ করতে পারেননি অথচ হীরুর জমিদারীর জন্যে নানারূপ শোষণ চালান।
৪।	ঘাসের ফুল	১। অতুল	কলিয়ারীর ম্যানেজার হতে চলেছেন	অসৎ প্রবৃত্তির চরিত্র, স্বার্থপর।
		২। নাম নেই	ম্যানেজার	অত্যন্ত সৎ, কর্তব্যপরায়ণ।
		৩। নাম নেই	খাজাঞ্চিবাবু	ভূমিকা নগণ্য, সৎ।
৫।	খাজাঞ্চিবাবু	১। বদিবাবু	খাজাঞ্চিবাবু	খুব হিসেবী, শোষণের সহযোগী।
		২। নাম নেই	ম্যানেজার	আধুনিক শোষণের সহযোগী।
৬।	রঙীন চশমা	নাম নেই	নায়েব	খুব সাধারণ বা সততা আছে বলে মনে হয় না।

	গল্প	নাম	ভূমিকা	চরিত্র
৭।	রসকলি	নাম নেই	গোমস্তা	চকিতে আবির্ভাব, শোষণের সহযোগী
৮।	সমুদ্রমন্থন	নাম নেই পদবী সিংহ	নায়েব	প্রভুভক্ত
৯।	রায়বাড়ি	১। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী	গোমস্তা	অত্যাচারী, প্রজাকর্তৃক মৃত্যু
		২। নাম নেই	নায়েব	মনিবের আজ্ঞাবহ
১০।	পণ্ডিতমশাই	রাধাচরণ	গোমস্তা	খুব হিসেবী, পড়াশুনার প্রতি অনীহা
১১।	নটু মোক্তারের সওয়াল	নাম নেই	নায়েব, গোমস্তা	ভূমিকা গল্পে নেই তথাপি তারা অসৎ কারণ নটু তাদের নামেও সমন জারী করেন।
১২।	মা	রামসুন্দর	নায়েব	সম্পত্তি নেই তাই নায়েবগিরিও নেই; অতীতের স্মৃতি নিয়ে রাণীমার কাছে আছেন
১৩।	বন্দিনী কমলা	কিত্তি ঘোষ	নায়েব	অসৎ, শোষক, শঠ, জমিদারপুত্র দ্বারা খুন হন।
১৪।	হরিপণ্ডিতের কাহিনী	নাম নেই	গোমস্তা	শোষকের সহযোগী।
১৫।	ময়দানব	নাম নেই	ম্যানেজার, যুবক ম্যানেজার	উভয়েই শোষণের সহযোগী।
১৬।	সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার	বনবিহারী সরকার মিত্তির	নায়েব পরে জমিদার গোমস্তা, বনবিহারী নিয়োগ করেন	প্রজানুরঞ্জক, শঠ, স্বার্থপর।
১৭।	সর্বনাশী এলোকেশী	নাম নেই	নায়েব	শোষণের সহযোগী।
১৮।	বরমলাগের মাঠ	নাম নেই	গোমস্তা, নায়েব	শোষকের ভূমিকায় আবির্ভাব।
১৯।	জন্মান্তর	হরিহর	গোমস্তা	ভালোমানুষ, স্বভাবভীরু ।

জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে গোমস্তা ও গ্রাম্য মোড়লদের জড়িয়ে এক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্করের গল্পে বিধৃত। জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের ফলে এদের মধ্যে যুগপৎ জমিদারদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্যাঁচ কষে সুবিধা আদায়ের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। রেষারেষি, কলহপ্রবণতা, দাপট, ছিদ্রানুসন্ধান, কুৎসা-রটনা, মামলাবাজ আবার আশ্রয়দাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্মনিষ্ঠা এই শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তারাশঙ্করের বিভিন্ন উপন্যাসে ও গল্পে তা সুন্দরভাবে রূপায়িত। সামান্য নায়েব থেকে কৌশলে ও বুদ্ধির প্রাখর্যে বন্দিনীকমলা গল্পের গোপীবল্লভ জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। এই শ্রেণী, জমিদারের আশ্রয়ে থেকে তাদের মহাজনীকারবার, প্রচুর জমির মালিক বা সুদের কারবার করে প্রচুর অর্থের ও প্রতিপত্তির মালিক হয়ে ধীরে ধীরে জমিদার রূপে আবির্ভূত হতেন।

কেরাণী কর্মচারীর দল— শোষণের হাতিয়ার

ইংরেজদের মদতপুষ্ট জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বজায় রাখতে ও বেহিসাবী খরচ করার জন্যে নির্মমভাবে ভূমি রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। একা জমিদার তাঁর বিশাল এলাকায় সর্বত্র স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারতেন না, তাই কিছু কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন যারা ছিলেন জমিদারের শোষণের ও অত্যাচারের হাতিয়ার। জমিদার কেবল বর্ধিত অর্থ পেলেই খুশী হতেন। ফলে কর্মচারীর দল নিজ ইচ্ছামত এলাকার নিরীহ প্রজাদের

উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাত। জমিদারকে ফাঁকি দিয়ে তারাও প্রচুর অর্থের মালিক হত। জমিদার নিজের বাহুবল প্রতিষ্ঠার জন্য গোমস্তা, নায়েব থেকে শুরু করে লাঠিয়াল, পাইক, বরকন্দাজ প্রভৃতি নামধারী কর্মচারী নিয়োগ করতেন। এরা সকলেই ছিল শোষণের সহযোগী।

—— আবার কলকারখানার মালিকগণও নিজেদের খেয়াল খুশিমত কর্মচারী, ম্যানেজার, গুন্ডা, বদমায়েস নিয়োগ করতেন। যেন তেন প্রকারেণ তাঁদের ব্যবসায়ে মোটা টাকা লাভ করাই ছিল মালিকদের উদ্দেশ্য। অবশ্য তারাশঙ্করের গল্পে কেরাণী-কর্মচারীদের ভিড় অনেক কম, কারণ তিনি মূলতঃ রাঢ়ের রূপকার। নীচের ছকের সাহায্যে কেরাণী ও কর্মচারী কিভাবে জমিদার ও কারখানার মালিকদের তোষণ করত তা দেখানো হল —

গল্প	চরিত্র	ভূমিকা
১। মুখুজ্জে মহাশয়	বিষ্ণু মুখুজ্জে	জমিদারী দেখাশুনা করেন। এমন অভিনয় করেন যেন তিনি নিজেই জমিদার, এমনকি তাঁর কর্মপদ্ধতি শ্রেণী-শোষণের পথ প্রশস্ত করে।
২। রাজপুত্র	অমূল্য	কয়লাকুঠির Head Clerk । মালিকের মন জোগাতে নিজের দরিদ্র শালাকে নিয়ে গিয়েও তার সামান্য কোন চাকরির ব্যবস্থা করেননি।
৩। ইতিহাস	সাহেবগুপ্ত মেজর	মেজর হওয়া সত্বেও সামান্য ২০০০ টাকা পণ চাইতে দ্বিধা করেন না।
৪। ময়দানব	ম্যানেজার	ম্যানেজার মালিকের শোষণের হাতিয়ার। ফণীর সারাজীবন কাজ করেও যন্ত্রসভ্যতায় গজিয়ে ওঠা কৃত্রিম নব্য-মালিক ও নব্য-ম্যানেজার-এর দৌলতে চাকরি গেছে। এখানে ম্যানেজার মালিককে খুশি করেছে।
৫। কুড়ানোঘড়ি	পুলিশ ইনস্পেক্টর	অন্যায়ভাবে সৎব্যক্তিকে চোর সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে নিরীহ মানুষকে হেনস্তা করেছেন, তার আত্মসম্মানে আঘাত করতে দ্বিধা করেন নি।
৬। ভ্যালচার ক্লাব	দারোগাবাবু	ভোলা ছাগল চুরি করেও থানাতে গিয়ে ছাড়া পায়। কারণ তার বাবা দারোগা। প্রশাসনকে এইভাবেই নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন দারোগা, পুলিশ কর্মচারীর দল।
৭। খাজাঞ্চিবাবু	নতুন ম্যানেজার	শোষণের মাধ্যম। পুরাতন মালিকের মন জয় করলেও নতুন মালিকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বদিবাবুর চাকরি গেছে; শোষণের মাধ্যমেরও পরিবর্তনও ঘটেছে।
৮। বিষধর	বিনয়কৃষ্ণ রায়	জমিদার ও সরকারী চাকুরে। মুখে সমাজপতির মত কথা বললেও তিনিই পূর্বে গ্রামের এক বধূকে ঘর ছাড়া করে কলকাতায় নিয়ে যান এবং কিছুদিন পর তাকে ত্যাগ করেন।

৯। রঙীন চশমা	পোষ্টমাষ্টার	মুখে 'হরে কেষ্ট' নাম অথচ স্বার্থান্বেষী। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে জমিদারের মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য জঘন্য বৃত্তি গ্রহণ করেছিল।
১০। ভ্রমন কাহিনী	L.I.C. Agent	গল্পের কথক মহাশয়কে খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল অথচ মুখে বাঙালী বলে বন্ধুত্বের নিগড়ে বেঁধে ছিল।

ঘ. পাইক/বরকন্দাজ/সিপাই

জমিদারগণের আর এক শ্রেণীর নিরীহ, শক্তিশালী, নিরক্ষর, দরিদ্র, নেশাগ্রস্ত কর্মচারী ছিল— যারা নামমাত্র বেতনে বা পেট-ভাতায় জমিদার বাড়িতে থাকত। বাড়ী পাহারা থেকে শুরু করে সংবাদবাহক, পাহারাদার এমনকি জমিদারের নিরাপত্তা রক্ষীর কাজও করত। এদের কাছে অস্ত্র হিসাবে লাঠি, বর্শা, ইত্যাদি থাকত। প্রভুভক্ত সেনানী হিসাবেই এদের কাজ। এরা মূর্খ বলেই হয়ত অত্যন্ত সরল ও বিশ্বস্ত ছিল এবং এরা কদাচ বিশ্বাসঘাতকতা করত না।

তারাশঙ্করের জমিদার প্রধান গল্প অনেক থাকলেও সেখানে পাইক/বরকন্দাজ/চাকর/চাপরাশীর বহুল পরিচয় নেই। নীচের এদের ভূমিকা কোন গল্পে কেমন তা বর্গীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল ঃ—

গল্প	চরিত্র	ভূমিকা
১। স্রোতের কুটো	রামদীন সিপাই	গোপাল জেল থেকে ফেরার সময় সামান্য টাকা কটা আধাআধি ভাগে রামদীনের কাছে রাখতে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পর মাত্র ৫ দিন আগের দেওয়া টাকার অর্ধেকটাও রামদীন আত্মসাৎ করেছে।
২। রসকলি	ভূতসিং/পশ্চিমা চাপরাশী	জমিদারের অত্যাচারের সহযোগী। প্রভুভক্ত।
৩। শ্মশানের পথে	পেয়াদা/খোট্টা	জমিদার অপেক্ষা অত্যাচারী, নারী-লোভী। অশ্রাব্য ভাষা-প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য মনে করে।
৪। সর্বনাশী এলোকেশী	শিউচরণ/চাপরাশী	জমিদারের আদেশে গোহত্যাকারী বলরামকে ধরে নিয়ে গেছে জমিদারের কাছে।
৫। রাজা, রাণী ও প্রজা	ভোদা, ভোম্বল,গণেশ, গজেন্দ্র, গদাধর	এরা কখনও কর্মচারী, কখনও পাইক বা বরকন্দাজ। বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে জমিদারের সহযোগী হয়েছে।
৬। মতিলাল	চাপরাশী	নিরীহ, নির্দোষ মতিলালকে প্রেসিডেন্টের আদেশে নির্দয়ভাবে প্রহার করেছে। এই শাস্তিই মতিলালের জীবনে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
৭। সমুদ্র মন্থন	তারিণীবাগদী/চাপরাশী	বহু প্রাচীন বৃদ্ধ চাপরাশী তারিণী। প্রভুভক্ত। জমিদারের আভিজাত্য ও সম্মানহানির আশংকায় ক্রন্দন করেছে। জমিদার খাজনার টাকা পরিশোধের জন্য পাগলের মত হলে তারিণীও পাগল হয়েছে নিজ সে নাতিকে পর্যন্ত শাস্তি দিয়েছে। অত্যন্ত অন্ধস্নেহ ও প্রভুভক্ত।
	সতীশ/চাকর	ভূমিকা অত্যন্ত সীমিত।

৮। রায়বাড়ি	কালীবাগদী/লেঠেল চাপরাশী/নগদী	এরা সকলেই জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের শোষণের পথকে প্রশস্ত করেছে; বিশেষ করে কালী বাগদী যেন মহাকাল। দৈত্যের মত চেহারা নিয়ে সে দৈত্যের মতোই কাজ করে।
৯। কুড়ানোঘড়ি	কনস্টেবল	ইনস্পেক্টরের আদেশে নিরীহ এবং শান্ত ভদ্রলোকটিকে উলঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি।
১০। চোর	জমিদারের/চাপরাশী	শাসকের মদতে নারী-লোভী হয়েছে।
১১। শ্মশান বৈরাগ্য	যোগী চাষা/চাকর	শাসকের অনুসারী হয়েছে। পেটের জ্বালায় চাকর গিরি করলেও তার হৃদয়ে দয়া মায়া ছিল। কারণ মহিম বাঁড়ুজ্জে বিধবা দিদির বাড়ীতে বিনা খরচে খেয়ে সামান্য টাকা দিদির শ্রাদ্ধের খরচ করেও সেই টাকা অনাথিনী ভাগ্নীর কাছ থেকে আদায় করেছে। ভাগ্নীর শেষ সম্বল গয়নাটুকু মহিম গ্রাস করলে যোগী তখন মেয়েটিকে তা দিতে নিষেধ করেছিল।

ঙ. শোষণ/শাসন

অষ্টাদশ শতাব্দীর নয়ের দশকের শুরু পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষকেরা কেবল জমি চাষ করার অধিকার ভোগ করত, জমি হস্তান্তরের অধিকার ছিলনা। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)-এর পর থেকে জমির মালিকানা আসে জমিদার ও কৃষকদের হাতে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদার যেমন ইংরেজ সরকারকে নির্ধারিত খাজনা দিতে বাধ্য থাকত, তেমনি আবার জমি-সংশ্লিষ্ট কৃষকরাও বাধ্য ছিল বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমির খাজনা জমিদারকে প্রদান করতে। যে সব কৃষক ফসল বিক্রি করে খাজনা দিতে পারত না বা সংসার নির্বাহ করতে ফসল-বিক্রিত অর্থ ব্যয় করে ফেলত কিম্বা প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে খাজনা পরিশোধ করতে না পারলে, নিজেদের জমি বিক্রি বা বন্ধক দিতে থাকে। এই ভাবেই এই সময় থেকে সমাজে গজিয়ে ওঠে নতুন এক শ্রেণী। নাম তার মহাজন। মহাজনী-কারবার করে বিত্তশালী ও অর্থশালী হয়ে পড়ে তারা। সমাজে বিশেষ করে কৃষক সমাজের পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ঃ তারা গ্রাস করতে থাকে জমি, আবির্ভাব হয় ধনতন্ত্রের। **"Though the classes of money-lenders and merchants existed in the rural area of Pre-British India, their function and position in the old economy, were substantially different from those in the new economy. The money-lender in the old Indian Society played almost in insignificant role. He occasionally lent money to the village agriculturist or artisan, the interest strictly fixed by the village Panchayet. Further the money-lender could not annex the land or live stock in case a farmer did not meet the interest claim since the hand belonged to the village community."** (৩৩)

এই মহাজন গোষ্ঠী কৃষক সমাজে দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে থাকে। একদিকে সুদে ঋণদান বা বন্ধকী কারবার, অন্যদিকে অল্পদামে জমি ক্রয় করা। ফলে গ্রামাঞ্চলে শস্যের ব্যবসা মহাজনগোষ্ঠীর একচেটিয়া হয়ে পড়ে। নতুন বৃটিশ শাসনে ঋণগ্রস্তের জমি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় মহাজনদের করাল গ্রাসে কৃষকগণ ধীরে ধীরে ভূমিহীন হয়ে যায়। অনেক সময় জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পত্তনিদারগণও মহাজনের ভূমিকায় অবতীর্ন হন। এই যুগপৎ আক্রমনে ও শোষণে কৃষকগণ শোষিত হতে থাকে। জমিদারদের বেহিসেবী খরচ মেটাতে বা রায়তদের উপর অত্যাচার করতে তারা নব নব কর ধার্য করতে থাকেন। সরকারকে নির্দিষ্ট অর্থ রাজস্ব খাতে আদায় দিলেই সরকার সন্তুষ্ট থাকতো। বাকী উদ্বৃত্ত অর্থ জমিদারগণ নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যয় করতেন। ভূমিহীন কৃষক বা রায়ত দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে দিন-মজুরে পরিণত হত। তারা ভাড়াটে কৃষিমজুর বা ভাগচাষী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়। অনেকে শহরে কলকারখানায় কাজে যোগ দেয়। "১৮৪২ সালে ভারতে কোন ভূমিহীন কৃষক ছিলনা। ১৮৭২ সালে ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষ এবং আরও পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বাংলাদেশে কৃষিকার্যরত ব্যক্তিদের শতকরা ৩০ ভাগই দেখা গেল ভূমিহীন কৃষক।" (৩৪)

বৃটিশ সরকার মনে করতো যে জমিদার শ্রেণী ও তাদের সহযোগী মহাজন গোষ্ঠী এবং উপস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা থাকবে। জমিদার শ্রেণী বৃটিশ সরকারকে কেমন নিরাপত্তা দান করেছিল তা লর্ড বেন্টিঙ্ক এর বক্তব্যে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তার বাংলা তর্জমা এমন —" আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণবিক্ষোভ বা গণ বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে। অন্যান্য বহু দিক দিয়ে, এমনকি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হইলেও; ইহার ফলে এরূপ একটি বিপুল সংখ্যক ধনী-ভূস্বামী শ্রেণী তৈরী হইয়াছে যাহারা বৃটিশ শাসন অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং জনগণের উপর যাহাদের অখন্ড প্রভুত্ব রহিয়াছে"।[৩৫] কিন্তু ক্ষুদ্র বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে যখন শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেল, তখনই তারা জমিদারী শোষণ ও বিদেশীদের চক্রান্ত উপলব্ধি করে। তারা দেখল জমিদার কি ভাবে সাধারণ শ্রেণীকে শোষণ করছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর "পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন" প্রবন্ধে জমিদার শ্রেণী রায়তদের কী ভাবে শোষণ করতেন তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বাজে আদায়, মাঙ্গন, পার্বণী ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে প্রজাদের শোষণ করতেন তারা অন্যদিকে প্রজাদের গৃহে বিবাহ, মাতৃ বা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবোৎসব বা ইষ্টক নির্মিত গৃহ নির্মাণ করতে গেলে তাঁদের জমিদারকে শুল্ক দিতে হত। কোন জমিদারীতে প্রজাদের বেগার খাটতে হত। স্বল্পতম মজুরি, কিন্তু কঠোরতম পরিশ্রম — এই ছিল দরিদ্র প্রজাদের জীবনবেদ। অকথ্য কটূক্তি এবং অনাহার ছিল তাদের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপি।

অন্যদিকে মহাজনদের অর্থলালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে তাদের অর্থগৃধ্নুতে পরিণত করে। এই মহাজন এবং শহরের চতুর ব্যবসায়ীগণ গ্রামে এসে জমি ক্রয় করে এক একজন নব্য জমিদার হয়ে যান। আভিজাত্যের কাঙাল এই সব ব্যবসায়ী ও মহাজন সম্প্রদায় প্রাচীন জমিদারের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে তাদের ঋণগ্রস্ত করে ধীরে ধীরে সেই সম্পত্তি গ্রাস করেছেন। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ইংরেজ কোম্পানীতে মাত্র পাঁচ টাকা মাইনেতে চাকরী করে বুদ্ধির জোরে কয়লা খনির মালিক হয়েছিলেন এবং লাভপুরে জমিদারী ক্রয় করেন — তার নাম নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়। " গ্রামের এক দরিদ্র সন্তান ঘর থেকে বেরিয়ে এক বিচিত্র সংঘটনের মধ্যে ইংরেজ কয়লা ব্যবসায়ীর কুঠিতে পাঁচ টাকা মাইনের চাকুরীতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত কয়লার খনির মালিক হয়ে দেশে আবির্ভূত হলেন।" [৩৬] ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩৯ এই সময়ে দুই মহাযুদ্ধের ফলে গ্রাম্য সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। কৃষিব্যবস্থা পঙ্গু হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আবির্ভাব ঘটে শিল্প সভ্যতার। বৃত্তি নির্ভর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হল। শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ নিবিড় হয়। গ্রাম্য সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত নেমে আসে। সুস্থ জীবন পঙ্গু হয়ে শাসন, শোষণ, তাড়ন এবং কাবুলিওয়ালাদের পেষণে গ্রামের চাষী-সম্প্রদায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। উচ্চবিত্তের হাতে আসে নগদ অর্থের পাহাড়, তারা হয়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খল। তাদের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা সমগ্র গ্রাম্য জীবনকে ক্লেদাক্ত করে তোলে। "সেকালের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের যত পঙ্ক, যত ক্লেদ সমস্ত নিক্ষেপ করেছে তারা ওদেরই জীবন পাত্রে, সে জীবন পাত্র বিষাক্ত করে দিয়েছে। ওদের যুবতী বধূ-কন্যাদের প্রলুব্ধ করে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে - চার আনা- আট আনার বিনিময়ে ভ্রষ্ট করেছে ভোগ করেছে। এমন হয়েছে যে, গভীর রাত্রে নেশার তাড়নায় কামোন্মত্ত হয়ে নির্লজ্জ-হল্লা করে ওদের পল্লীতে প্রবেশ করেছে, লাথি মেরে ঘরের আগড় বা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছে, ভীত স্বামী বা পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, বাড়ীর গৃহিণী কর্তার পৌরুষের লজ্জাকে ঢেকে নিজের নারীজনোচিত লজ্জার মাথা খেয়ে সামান্য দক্ষিণা গ্রহণ করে বা বিনা দক্ষিণাতেই বধূ বা কন্যাকে সমর্পণ করেছে ভদ্রজনের কাছে, কেউ যদি অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ করেছে, তবে শতকরা ৯৯ ক্ষেত্রে অভিভাবক অভিযোগকারীকেই ঘৃণাভরে কঠিন শাসন করে উত্তর দিয়েছেন— নিজের ঘর শাসন কর, হারামজাদা! আর কারও ঘরে না নিয়ে তোর ঘরেই বা গেল কেন? আমরাই এদের সমগ্র নারী সমাজকে এমন করে তুলছি যে এরা ক্রমে হয়ে উঠছে জন্মগত স্বৈরিণী। চারিদিকে সমাজের সকল লম্পটের দেহজ বিষ এদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে। গোটা সম্প্রদায়কে বিষাক্ত ব্যধিগ্রস্ত করে তুলেছে। বছর কয়েক আগে আমি হিসাব করে দেখেছি, এদের শতকরা ষাটটি বাড়ী আজ সন্তানহীন।" [৩৭] এমনভাবেই শ্রেণী শোষণের চিত্র ছিল সেকালে।

বিংশ শতকের প্রথমেই শুরু হয় কৃষি-সংকট, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদেশী শোষণের নগ্নরূপ। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ভূস্বামীদের মধ্যে ক্রমশঃ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, জাতীয়তাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের এর ফলেই জন্ম হয়। নব্য ব্যবসায়ীদের কাছে পরাজিত হয়ে এই ভূস্বামীরাই ইউরোপীয়দের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জমিদারদের বংশানুক্রমিক অর্জিত অর্থ ও আধিপত্য কালের করাল গ্রাসে, নিজ চরিত্রের দোষ - ত্রুটিতে সব বিনষ্ট হয়। নানা উদ্ভট চিন্তা, বাস্তববিমুখ পরিকল্পনা, অসৎপ্রবৃত্তি তাঁদের চরিত্রে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছিল, কালক্রমে সেই সকল পরাক্রম ও বিলাসবৈভব হরণ করে তারা নিঃস্বতার প্রতীকে পরিণত হন এবং অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন (জলসাঘর)। দাপটের গল্প শুনিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরতে চান (সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার)।

তারাশঙ্কর জমিদার সন্তান। এদের ভালোমন্দ সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসে এর সত্যও নির্মমভাবে উপস্থাপনে সার্থক। অবশ্য তিনি জমিদারদের প্রতি মোহাচ্ছন্ন ছিলেন না। অবক্ষয়ের দিকটিকে নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে ঋজুদর্শীর মত তুলে ধরেছেন। এমন কি নিজ পূর্ব পুরুষদের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিও সুন্দরভাবে ও সুস্পষ্ট ভাবে রূপায়ণে সফল। তিনি তাঁর পরিবারের দোষ-ত্রুটি উপস্থাপনেও দ্বিধাহীন। বাবার ডায়রি দেখে বাবার আক্ষেপোক্তিটি হুবহু উল্লেখ করেছেন—"লাভপুরে আসিয়া লোকের-সংসর্গে আসিয়া অল্প বয়সেই মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলাম, বেশ্যাসক্তি জন্মিল"। (৩৮)

তদানীন্তন জমিদারের এই চারিত্রিক অধোগতি অমিতব্যয়িতার ফলস্বরূপ প্রজাদের নিত্য-নতুন নির্যাতন, নিপীড়ন করেছেন তারা। কৃষককে শোষণের জন্য যে সকল পুরাতন সামাজিক নিয়মকানুন প্রয়োজন সেগুলো ক্ষয়িষ্ণু জমিদার টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কৃষিভিত্তিক গ্রাম্য জীবনের ভাঙ্গন প্রকট হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে নিমজ্জমান জমিদারগণ বেঁচে থাকার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় নিত্য নতুন শোষণ চালিয়েছেন। নীচে তারাশঙ্করের ছোট গল্পে জমিদার সৃষ্ট শোষণ ও শোষিতদের চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

তারাশঙ্করের চরিত্র সৃষ্টি সুপরিকল্পিত। কয়েক ধরনের চরিত্রের সমাবেশ এখানে দেখা যায়। যেমন—মহাজন, জমিদার, গ্রামের মোড়ল প্রভৃতি, যাঁরা শোষকরূপে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী অথবা দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষদের শোষণ করেছেন।

রসকলি—জমিদারের চকিতে আবির্ভাব। অত্যাচারী, ভ্রষ্ট চরিত্র এবং শোষকের ভূমিকায় সমাসীন। এমন আরও কয়েকটি গল্প আছে। যেমন—শ্মশানের পথে, বিষধর, প্রতিমা, রায়বাড়ি, রাজা, রাণী ও প্রজা, নুটু মোক্তারের সওয়াল প্রভৃতি। সামন্তপ্রথার চাকায় পিষ্ট পুরুষানুক্রমে চাকর বৃত্তি "সনাতন", "সমুদ্রমন্থন" প্রভৃতি গল্প।

জমিদার অলক্ষ্যে থেকে স্বকীয় দাপটের মাধ্যমে অর্থ আদায়—"পাটনী" গল্প। প্রবৃত্তিতাড়িত স্বভাবদুর্বৃত্ত লোভী শয়তানের চিত্র "রাখাল বাঁড়ুজ্জে"। এই গল্পে কীভাবে নিজ বোন ও বোনের মেয়েকে নিঃস্ব করেছে তা দেখা যায়। সুদখোর গোমস্তা শোষণ করে জমিদার হয়েছিলেন "আরোগ্য" গল্প।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে জমিদারগণ সরাসরি প্রজাদের সর্বনাশ সাধন করেছেন সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে এসেছে শ্রেণী শোষণ। এর কারণ এই যে তখনও পর্যন্ত কলোনিয়াল ইকনমির বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়নি। বাঙালী ব্যবসায় তত বেশী আত্মনিয়োগ করেন নি। তাছাড়া পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের চক্র প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে প্রবেশ করে নি। তাই রবীন্দ্রনাথের আমলে জমিদারগণ গ্রাম ও সমাজের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক। কিন্তু তারাশঙ্করের আমলে ধনতন্ত্র ব্যবসায়ী মহাজন ও যন্ত্র সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছে। জমিদারগণ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে দিগভ্রান্ত হয়েছে। সমাজে পূর্ব পরিচিত ও আভিজাত্য টিকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়েছেন, ফলে গ্রামে বা ব্যক্তি বিশেষ প্রজার সঙ্গে জমিদারদের সরাসরি সংঘর্ষ বা সংঘাত ঘটবার অবকাশ ছিল না। তাই শোষণ ও শাসকের ভূমিকা ছিল নেপথ্যে, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিল অবশ্য প্রকাশ্যে। জমিদারগণ তাদের গর্ব, আভিজাত্য, অর্থগরিমা, বদান্যতা, শৌখিন্য বা রুচিশীলতা সবই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে ব্যবসায়ী বা ধনতন্ত্রের সাথে। তাই ব্যবসায়ী ও মহাজনদের সঙ্গে যে সংঘাত শুরু হয়েছে সেই সংঘাত রাবীন্দ্রিক লেখনীতে ততটা ছিল না, ছিল প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমিদারদের সংঘর্ষ। "শ্রম শোষণের পরিচয় নেই এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রধান লক্ষণ যে শ্রেণী-সংঘাত মালিকে ও শ্রমিকে তার ছবি রবীন্দ্রগল্পে নেই।" (৩৯)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে শরৎচন্দ্রের গল্পে জমিদার কর্তৃক প্রজাদের শোষণ ও শাসন এমনকি সমাজ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা সুস্পষ্ট। সেখানেও ঐ একটিই কারণ যে পুঁজিবাদের আবির্ভাব অতি প্রবল ছিল না।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে তারাশঙ্করের গল্পগুলির পর্যায়বিভাগ (পৃ-২৭), ক্রমিকসংখ্যার বিবরণ (পৃ-২৮) এবং গল্পসৃষ্টির সময়কাল (পৃ-২৯)-এ দেখানো হলো।

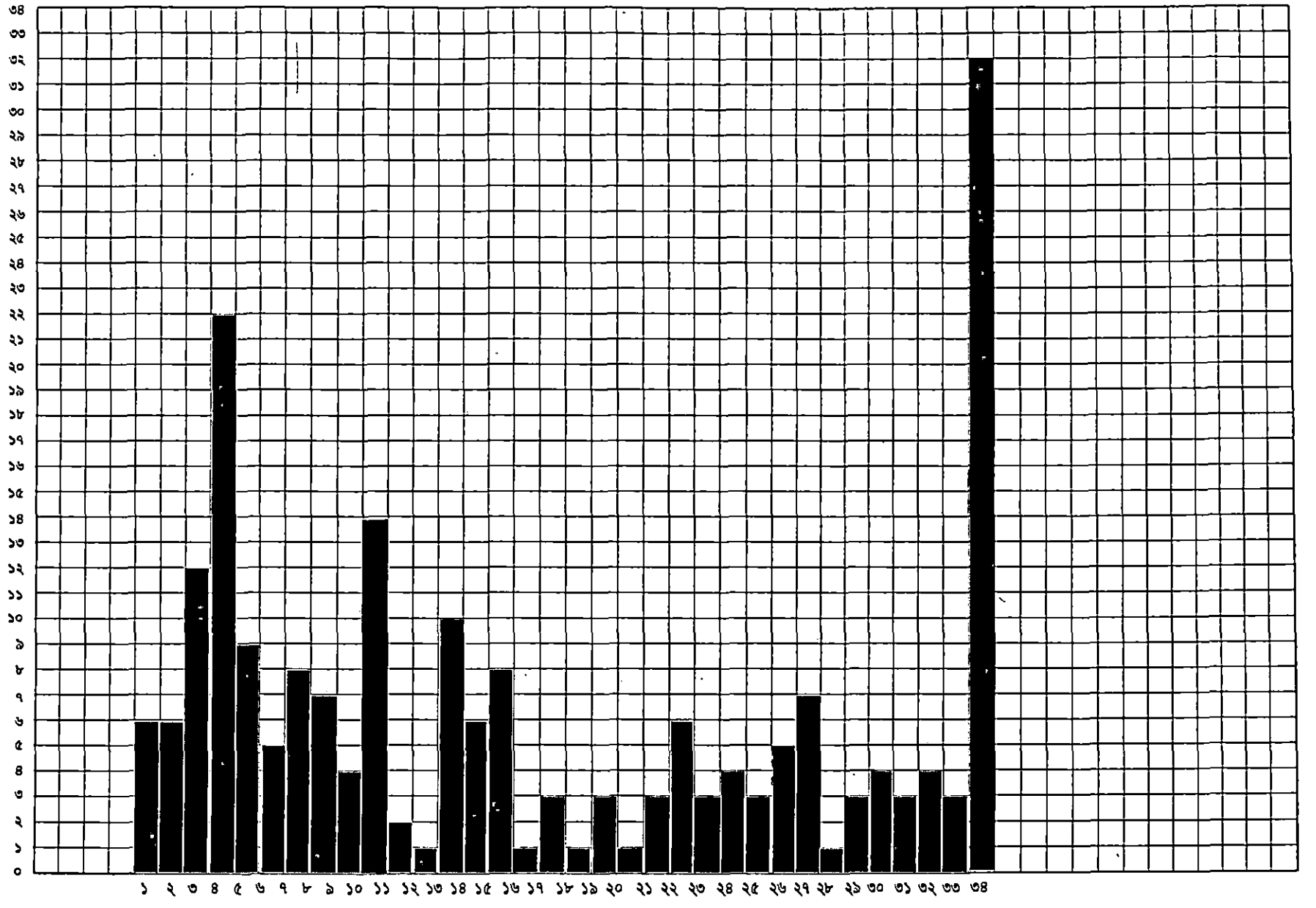

তারাশঙ্করের রচিত ১৯০ টি গল্পের পর্যায়ভিত্তিক বিভাগ (ক্রমিক সংখ্যার বিবরণ পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গেক্রমে তারাশঙ্কর রচিত ১৯০টি গল্পের পর্যায়ভিত্তিক বিভাগের ক্রমিক-নির্দেশিকা

১। জমিদার তান্ত্রিক
২। লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়াপাত।
৩। ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি।
৪। ব্রাত্যশ্রেণীর গল্প
৫। গ্রাম্য নায়ক নায়িকা
৬। বৈষ্ণব জীবনী
৭। হাসির গল্প
৮। সামাজিক বিবর্তনের বিলীয়মান গোষ্ঠী ও বিশেষ ধারার ব্যক্তিদের নিয়ে।
৯। ছোটদের জন্যে (হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল)
১০। বস্তু নির্ভর
১১। বিকলাঙ্গ
১২। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিষ্করুণ ট্র্যাজেডি।
১৩। রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র মানস লীলা।
১৪। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ
১৫। শিক্ষকতাই জীবনের মূলধন।
১৬। অভিশপ্ত
১৭। বই এর আন্দোলনের পটভূমি
১৮। পশুত্ব স্বভাবের চূড়ান্তরূপ
১৯। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
২০। গান্ধীজীর মৃত্যুতে লেখা।
২১। সত্য ঘটনা
২২। ট্র্যাজেডি রিলিফ
২৩। মানবধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের সংঘাত
২৪। প্রেমের গল্প
২৫। জীব ধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের সংঘাত
২৬। ভূত সম্বন্ধীয়
২৭। পশুদের নিয়ে
২৮। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সমপ্রাণতা
২৯। হিংসার পৃথিবীতে অহিংসার আহ্বান
৩০। কবির কল্পনা
৩১। মৃত্যু সম্পর্কে
৩২। অহংকার প্রধান
৩৩। ভ্রমণ মূলক
৩৪। অন্যান্য

❖ একই গল্প একের বেশী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

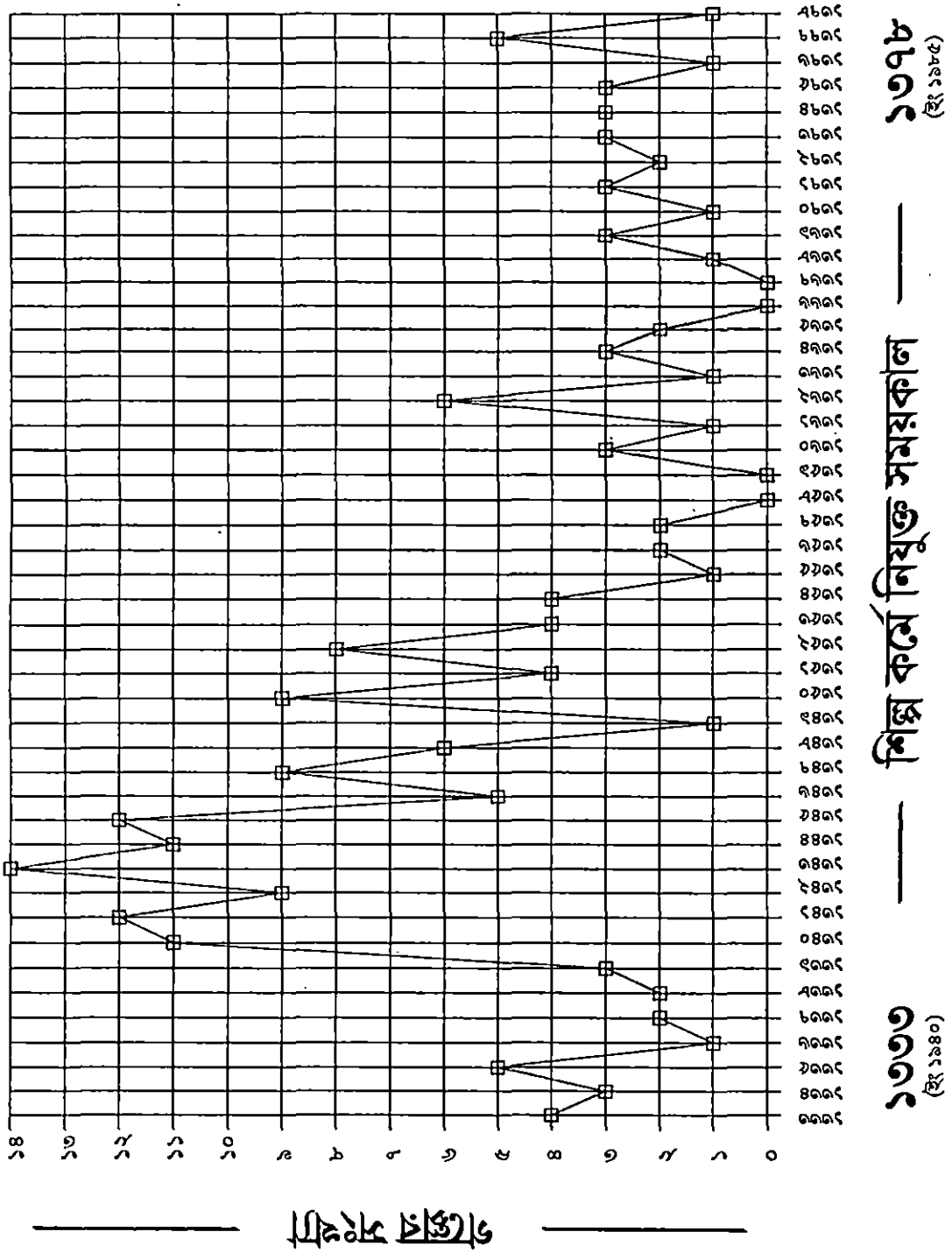

❖ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ' ঃ গ্রন্থত্রয় থেকে প্রাপ্ত।

পাদটীকা

(১) আদিত্য মুখোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ পৃ. ১০৯
(২) ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত : রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোট গল্পের সমাজতত্ত্ব পৃ. ২৮
(৩) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ৫৩৩
(৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা পৃ. ১৭
(৫) প্রাগুক্ত : " " পৃ. ১২
(৬) Tarachand : History of the freedom Movement in India P. 269
(৭) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ.৪৯
(৮) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ.২৫৫
(৯) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ. ৯৯
(১০) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ১৫
(১১) বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : ছোটগল্পে ত্রয়ী পৃ. ৯৬
(১২) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খন্ড) : মিত্র ও ঘোষ পৃ. ৪৫৪
(১৩) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ. ৪৭
(১৪) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ১৭
(১৫) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচিত্র : পৃ. ৩০
(১৬) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) পৃ. ৫৪
(১৭) রথীন্দ্রনাথ রায় : গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা) পৃ. ৪২
(১৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (২য় খন্ড) পৃ. ৬২
(১৯) তারাশঙ্কর রচনাবলী (১০ম খন্ড) : মিত্র ও ঘোষ (কলিকাতা) পৃ. ৩৫১
(২০) প্রাগুক্ত : " " পৃ. ৩৫৪
(২১) অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় : কালের পুত্তলিকা পৃ. ২৬২
(২২) আদিত্য মুখোপাধ্যায় : তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ পৃ. ৫৬
(২৩) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড) পৃ. ৩৯
(২৪) প্রাগুক্ত " : " " পৃ. ৪০
(২৫) Tendulkar : Mahatma Vol-VI P- 238
(২৬) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা পৃ. ৫৩৩
(২৭) মার্কস এঙ্গেলস্ : উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে পৃ. ৩৭-৪৩
(২৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড) পৃ. ৪৮
(২৯) বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি পৃ. ৪৯
(৩০) জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প (ভূমিকা) পৃ. ৮
(৩১) সুপ্রকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস পৃ. ১
(৩২) প্রাগুক্ত : পৃ. ২
(৩৩) A. R. Desai : Social Back Ground of Indian Nationalism P- 177
(৩৪) ডঃ মুক্তি চৌধুরী : ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর পৃ. ২১
(৩৫) সুকাশ রায় : ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস পৃ. ৫
(৩৬) তারাশঙ্কর রচনাবলী : ১০ম খন্ড : (মিত্র ও ঘোষ) পৃ. ৩৫১
(৩৭) প্রাগুক্ত : পৃ. ৪১১
(৩৮) প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৫
(৩৯) ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব পৃ. ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী সংঘাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণী সংঘাত

ভূমিকা ঃ- তারাশঙ্করের গল্পনিচয়ে শ্রেণীবিন্যাস ও শ্রেণীসংঘাত এ-পর্বে আলোচিতব্য। এই পর্বে আলোচনার নিরিখে চতুর্বিধ পর্বাঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। যেগুলি যথাক্রমে ঃ-

(ক) ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা।

(খ) ক্যাপিটালিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি।

(গ) ব্রাত্য শ্রেণী।

(ঘ) কৃষক আন্দোলন-তেভাগা আন্দোলন।

ইউরোপ

ক। ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা ঃ- এই অধ্যায়ে সামন্ততন্ত্র, সামন্তবাদ ও সামন্তপ্রথা সম্পর্কে আলোচনা নিহিত। G. H. Sabine, Vinogradoff কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "Feudal institutions dominated the middle ages as completely as the city-state dominated antiquity" "প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা যেমন নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে গির্জা বনাম রাষ্ট্র অন্যদিকে সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল।" (১)

বিভিন্ন রোমান ও টিউটনিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক পরিণতি হল সামন্ততন্ত্র। সমাজের উচ্চ ও নিম্ন উভয় স্তরেই সামন্ততন্ত্র প্রসার লাভ করেছিল। **"Feudalism was the natural outgrowth of many institutions and customs of Roman and Teutonic origin and grew from both the bottom and the top simultaneously"** (২) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এই উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সামন্ততন্ত্র একটা আপোষ রক্ষা করেছিল। রাজনৈতিক ঐক্যকে ক্ষুন্ন করে সামন্ততন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে ধ্বংস করে, সেই জন্যে মধ্যযুগে স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র একরকম অজ্ঞাত ছিল। বিভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র অসমভাবে গড়ে ওঠার জন্যে এবং এর মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় ঘটার জন্যে সামন্ততন্ত্রের নিখুঁত সংজ্ঞা প্রদান একটা দুরূহ কাজ। তথাপি বলা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সক্রিয় থাকলেও ফ্রাঙ্কো সাম্রাজ্যের পতনের পরই সামন্ততন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ শুরু হয় এবং একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। সামন্ততন্ত্রকে বার্কি (Berki) একটা আর্থনীতিক বৈধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। **"(.....complicated economic legal political system is known as Feudalism)"** (৩)

অন্ধকারময় মধ্যযুগে রোমের সভ্যতা ও রোমীয় রাজনৈতিক আদর্শের অবলুপ্তি ঘটে। একদিকে গীর্জা, অন্যদিকে অভিজাত ও যোদ্ধৃবৃন্দ কর্তৃক শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাকে কেন্দ্র করে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। নবজাগরণের ফলশ্রুতি হিসাবে বহু প্রাচীন ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব হয়, টিউটনীয় আদর্শে সেগুলি পরিমার্জিত হয়। এই পদ্ধতিতেই একরকম রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হই, যাকে সাধারণভাবে বলা যায় সামন্তবাদ। অনুন্নত অর্থনৈতিক জীবন ও ভৌগোলিক কারণে টিউটনরা নগর রাষ্ট্র অপেক্ষা গ্রাম্য সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিতেন। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ব্যক্তিগত আনুগত্যই ছিল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার ভিত্তি। দক্ষতা, বীরত্ব, কর্মকুশলতার ভিত্তিতে জনগণ নেতাদের মনোনীত করতেন। **"Their system emphasised the importance of the individual as opposed to the sovereignty of the state."** (৪)

কেন্দ্রীয় শাসকের অভাবে শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে যায়। রোমের বানিজ্যিক বিপর্যয় এবং অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা-ভূমিকে সম্পদের মূল উৎসে পরিণত করেছিল। ভূমি বিজয়ীর হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতাও তাঁর হাতে চলে যায়। এইভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ, জমি ভোগদখল এবং জমিদার ও ভূমিদাসের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। নেতাদের বর্দ্ধমান, রোমান আদর্শের প্রভাব, যুগের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অভিজাত গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তোলে এবং গণপরিষদগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে, কোন কোন স্থানে অবলুপ্ত হয়। জনগণ ক্ষমতাধর নেতার অনুগত হয়ে যায়। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সভ্যতার বিকাশ এইভাবেই অবরুদ্ধ হয়ে যায়। **"Neither unity nor liberty was possible in feudalism and the political development ~~and the political development~~ of centuries seemed wasted."** (৫)

অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, গ্রাম্যসমাজ নিজস্ব কৃষিখামার সহ প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। ভূমি-সম্পদের প্রধান উৎস হওয়ায় রাজা থেকে যোদ্ধা প্রত্যেকেই সরাসরি কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জমি নিয়ন্ত্রণ গ্রাম্য সমিতির উপর ছিল। গ্রামের কর্তব্য ছিল ছোট খাটো আইনশৃঙ্খলার মীমাংসা করা। সমাজ ও সরকারের সংগঠন ছিল স্থানীয়।

এরই উপর ভিত্তি করে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলা এবং যোগাযোগের আদিম উপকরণের উপস্থিতিতে জীবন-সম্পত্তি রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হলেন, তখন সমাজ জীবনে শক্তিশালীর মূল্য বেড়ে যায়। নিজেদের রক্ষার তাগিদে ছোটজমির মালিক শক্তিশালীর সেবা করতে থাকেন, এমনকি তাঁরা ভূমিস্বত্ব ত্যাগ করে সেবা ও সামগ্রীর বিনিময়ে জমিদারের অধীনে বর্গাচাষ করতেন। জমিদারের সম্পদ ও সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি এভাবেই স্ফীত হতে থাকে। ভূমিদাস সর্বতোভাবে মালিকের অধীন হয়ে যায়। সামন্ততন্ত্র এইভাবেই ভূমিস্বত্ব-কেন্দ্রিক মতবাদে পরিণত হয়। কায়েমী স্বার্থের এই ব্যবস্থা উঁচু থেকে নীচ-সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে সরকারের সকল বিভাগকে স্পর্শ করে। নতুন ভূমি ব্যবস্থায়-রাজাই একমাত্র ভূমির মালিক গণ্য হন। জমিদারদের তিনি জমির মালিকানা প্রদান করেন, বিনিময়ে তাঁরা রাজাকে সেবা করেন। ভূস্বামীদের অধীনে বর্গাদারেরা কাজ করেন এবং অবশেষে এই ব্যবস্থা ভূমিদাসদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাদের দৈহিক শ্রমের উপর সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। নিজ নিজ এলাকায় জমিদারগণ প্রধান হয়ে ওঠেন। কালক্রমে সামন্তবাদ অনিবার্যভাবে সৈন্য, রাজস্ব এবং আদালত, রাজনৈতিক শক্তির—এই তিনটি উপকরণকে করায়ত্ত করেই গড়ে ওঠে। সম্পত্তির সম্পর্ক ছিল চুক্তির মত, যেখানে উভয় পক্ষের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষিত হত। নিজেদের সুবিধার জন্যে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য করতেন। যদিও সামগ্রিকভাবে রাজার ভূমি মালিকানা-তাঁরই শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হত। সামন্তদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, স্বেচ্ছাশ্রম এবং অনুল্লিখিত চুক্তির চিহ্ন আধুনিক রাজনৈতিক সম্পর্কে দেখা যায় না। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিস্বত্ব রাজাকে এবং আরও নির্দিষ্টভাবে কোন পরিবারকে বৈধ সামন্ততান্ত্রিক উপায়ে শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। যেমন—escheat বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ ব্যবস্থা।

যদিও সামন্ততন্ত্র মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক তবুও মিল পরিচালনা করা, কর আদায় করা অথবা সরকারী অফিস চালনা করা প্রভৃতি মূল্যমান-নির্ভর যে কোন কাজই সামন্তপ্রভুরা করতেন। আসলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত ভূমিস্বত্ব-কেন্দ্রিক হয়ে উঠল এবং জমির মত সরকারী অফিসও উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পরিণত হল।

আদালতও ছিল সামন্ততান্ত্রিক আদালত ঃ একে বলা যেতে পারে Council of Lords। এই আদালত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সবরকম বিরোধের মীমাংসা করত। বিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনে রাজা ছিলেন সমাজের অগ্রগণ্য। আদালত অথবা রাজা-আদালত যুগ্মভাবে শাসন-বিচার করতেন। সামন্তবাদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী সরকারী কর্তৃত্বকে বেসরকারী সম্পর্কে নিমজ্জিত করতে চায়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গী Common Wealth এর ধারাবাহিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যেখানে রাজাই হবেন প্রধান প্রশাসক। উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ ও সংমিশ্রণ সামন্ততান্ত্রিক আদালতকে পরবর্ত্তী মধ্যযুগীয় সাংবিধানিক নীতি ও প্রতিষ্ঠানের আধারে পরিণত করেছিল।

সামন্তবাদ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিরঙ্কুশ শাসনের গতিরুদ্ধ করেছিল। কারণ এর প্রয়োজন ছিল সরকারের মধ্যেই সরকার, যাতে কেউ পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করতে না পারেন। বিকেন্দ্রীভূত সামন্ততন্ত্র প্রকৃত রাজনৈতিক প্রগতি বিরোধী ছিল। আইন ছিল প্রাথমিকভাবে সামাজিক প্রথা। আইন ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আধুনিক ধারণা তখন ছিল অজ্ঞাত। রাজা এবং প্রজা উভয়েই প্রথাগত আইন মানতে বাধ্য ছিলেন।

কালক্রমে ধনিক-বণিক-অভিজাত গোষ্ঠীর সঙ্গে ভূস্বামী সামন্তদের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বণিক সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতা করেন। তাঁরা জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে চান এবং সফলও হন। সাময়িকভাবে তাঁরাই নগর রাষ্ট্রের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত করেন। সামন্ততন্ত্রের বিশৃঙ্খলার মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক রূপের আবির্ভাব হয়। ভাষা এবং জাতীয়তার বন্ধন, প্রাকৃতিক সীমানায় খন্ড খন্ড সামন্ত-গোষ্ঠীকে স্থায়ী সংগঠনের অঙ্গীভূত করে এবং ধীরে ধীরে এর মধ্যে থেকেই ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যান্ড, ইটালী ও জার্মানির মত দেশের জন্ম হয়।

ভারত

সামন্তপ্রথা মধ্যযুগে ইউরোপে অত্যন্ত প্রকট, কিন্তু ভারতে এই ব্যবস্থার সুস্পষ্ট চিত্র মধ্যযুগের পাওয়া না গেলেও সামন্ত প্রথার কয়েকটি নিজস্ব চরিত্র আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দে দেখা যায়। এই সময় ভারতে সামন্তপ্রথার দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে—(ক) ভূমিস্বত্বের বৈশিষ্ট্য (খ) ভূম্যধিকারীদের রাজ্য শাসনের ক্ষমতা।

মৌর্য পরবর্তী যুগে 'ভূমি পট্টলী'র সন্ধান মেলে—যেখানে জমির সঙ্গে মালিক সেখানকার শাসনেরও অধিকার দেওয়া হয়। এভাবেই সামন্ত প্রভুর জন্ম। ব্যক্তিগত শাসনের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। গুপ্তযুগে ব্রহ্মদেয় ভূমি পট্টলী সামন্তপ্রথার লক্ষণ স্পষ্ট। এই যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল রাজা কর্তৃক প্রধান সামন্তকে এবং প্রধান সামন্ত আবার ভূমিবন্দোবস্ত দান (Sub-infeudation) করে, এভাবেই মধ্যস্বত্ব প্রথার জন্ম হয়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখ এই প্রথার উল্লেখ করেছেন। সামন্ত ক্রমশঃ বংশানুক্রমিক, আনুগত্যের ভিত্তিতে, প্রয়োজনে রাজাকে সেনা, অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দানের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। সামন্তগণ ইচ্ছানুযায়ী কৃষকদের উচ্ছেদ, বেগার খাটানো ও নিয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে মধ্যযুগের প্রারম্ভে প্রগতিহীন, উদ্যমহীন, উৎপাদন ও পরিশ্রমবিমুখ পরগাছা

শ্রেণীসামন্তদের উদ্ভব হয়। সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী অদৃষ্টবাদী হয়ে যায়। "শুক্রনীতি সার" গ্রন্থে সামন্তের পরিভাষা হিসেবে বলা হয়েছে, "১০০টি গ্রামের শাসককে সামন্ত বলা হত এবং এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে থেকে বার্ষিক ১৩০০০০০ কর্ষ রাজস্ব আদায় হত।" (৬) মৌর্যপরবর্তী যুগে সামন্ত শব্দটির বহু প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। যেমন—"ভূপাল, ভোক্তা, ভোগী, ভোগিক, ভোগিজন, ভোগপতিক, ভোগিরূপ, মহাভোগী, বৃহদ্ভোগী, বৃহদ্ভোগিক, রাজা, রাজ্ঞ, রাজরাজনক, রাজন্যক, রানক, রাজপুত্র, রাজবল্লভ, ঠাক্কুর, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্তরানক, সামন্তকরাজা, মাণ্ডুলিক ইত্যাদি।" (৭) "সামন্তগণ সম্রাটের সেবা, সম্মানজনক ব্যবহার, অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকা ইত্যাদি কর্তব্য হিসেবে মানতে হত।" (৮) "সামন্তগন সম্রাটদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। হর্ষ নিজে সামন্তদের সৈন্যবাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন।" (৯) "এদের নগদ মুদ্রার পরিবর্তে ভূমি বৃত্তিদানের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ আছে মনুস্মৃতি গ্রন্থে।" (১০) "হিউয়েন সাঙ্ লিখেছেন, প্রকাশক, মন্ত্রী, বিচারক এবং পদাধিকারীদের প্রত্যেকের ভরণ-পোষণের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।" (১১)

সুলতানীযুগে সামন্তপ্রথা ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। তুর্কীরাই এর দায়িত্ব বেশী লাভ করে। মুঘলযুগে জমিদারীর কয়েকটি স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়—"(ক) বিভিন্ন শর্তের ভিত্তিতে জমি লাভ করে জমিদার আখ্যায় ভূষিত হতেন। (খ) নির্দিষ্ট কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে বংশানুক্রমিক জমিদারী লাভ করতেন। (গ) যে ব্যক্তি বেতনের পরিবর্তে জমিদারী লাভ করতেন, তাঁকেও জমিদার বলা হত। (ঘ) সরকারের আদেশে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে মালিকানা লাভ করলেও তিনি জমিদার বলে গণ্য হতেন। (ঙ) যে এলাকায় যাঁর নির্দিষ্ট কিছু অধিকার ও স্বত্ব স্বীকৃত ছিল তাকেও জমিদার বলা হত।" (১২)

প্রাথমিক স্তরে জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়, নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষা ও নিজ জমিতে চাষ করা ইত্যাদি প্রধান দায়িত্ব হিসেবে পালন করতেন। নিজ এলাকায় সামন্ত বা জমিদারগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন। ইচ্ছামত করস্থাপন, আদায় ও অত্যাচার করতেন; ফলে কৃষকদের জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ। জমিদারের পরেই থাকতেন স্বত্বভোগী বা কর্মহীন শ্রেণী—যাঁরা কৃষকদের কাছ থেকে শস্যের এক অংশ আদায়-সম্মানী হিসেবে প্রায় বলপূর্বক আদায় করতেন।

কৃষকদের জমিতে চাষ করার অধিকার বংশানুক্রমিক হলেও জমি বিক্রি বা বন্ধকী রাখার অধিকার ছিল না। ফলে ফসল কম হলে সকলের সন্তুষ্টির জন্যে বা করপ্রদানের জন্যে কৃষকরা তাদের গৃহ পালিত পশু, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি বিক্রি করতে বাধ্য হত। সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে মাঝে মাঝে তারা বিদ্রোহ করত। "কোন কোন সময় দলবদ্ধভাবে ডাকাতি ও রাহাজানি করত।" (১৩) "সব মিলিয়ে পূর্ব-মধ্যকালে ভূস্বামীত্বের প্রথার নিয়মগুলি শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিকাশের পরিণাম স্বরূপ মোগল আমলে এই ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।" (১৪)

এরপর এল বৃটিশ সরকার। প্রারম্ভিক যুগে কোম্পানী দ্বৈতশাসন জারি করে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হল ১১৭৬-এর বাংলাদেশে ভয়াবহ মন্বন্তর। ওয়ারেন হেস্টিংস এই শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভ্রাম্যমান কমিটি গঠন করেন। পাঁচ বছরের জন্যে জমিদারী বন্দোবস্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব জমিদারের সঙ্গে কমিটিকে দেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় রাজস্ব যথাযথ আদায় না হওয়ায় এবং জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করার অজুহাত বন্ধ করতে লর্ড কর্নওয়ালিশ ইংল্যান্ডের অনুকরণে সতেরশ তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ "দশশালা বন্দোবস্ত" চালু করেন। এই ঘোষণার দ্বারা বাৎসরিক নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমির মালিকানা স্বীকার করা হয় এবং জমি বিক্রির অধিকার দেওয়া হয়। জমি তখন স্থাবর সম্পত্তি থাকলেও তা বন্ধক, নীলাম, বিক্রি সবই হতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে A. R. Desai বলেছেন **"The new revenue system introduced by the British in India Superseded the traditional right of the village community over the village land and created two forms of property in Land, Land lordism in some parts of the country and the individual peasant proprictorship in others, ... Thus private property in Land came into being in India, land became private property, a commodity in the market which could be mortgaged, purchased or sold."** (১৫)

এরপর জমি লাভ-জনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। কৃষকরা অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৈবদুর্বিপাকে এবং আকাশ পরিমাণ করের বোঝায় পিষ্ট হয়ে পরিবার পরিজনদের মুখের গ্রাস জোগাতে জমিটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারা ভূসম্পত্তি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সম্ভ্রান্ত অর্থশালী বাবুদের বাড়ীতে ক্রীতদাস-দাসীতে পরিণত হয়। এই অব্যবস্থা উনিশ শতকের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত চলেছিল। গ্রামে তখন জমিদার, ব্রাহ্মণ সমাজপতি এবং জমি এই ছিল প্রধান। গ্রামীন জীবন কিছুটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল এবং তাও জমিদারদের নিজস্ব প্রয়োজনে। সরকারী তহবিলে প্রদত্ত নির্দিষ্ট খাজনা দিয়ে প্রজাদের কাছে ইচ্ছামত খাজনা ধার্য করেছে। সেই আদায়ীকৃত কৃষকদের রক্ত নিঙড়ানো অর্থ নিয়ে জমিদারগণ বাঈজী, ব্যাভিচারী, বেহিসেবী জীবনযাপন করেছেন। কৃষককুল মেরুদন্ডহীন হয়ে খাদ্যাভাবে শীর্ণজীর্ণ হয়ে

মৃত্যুর কাল গুনেছে। ফলে সৃজনশীলতার অভাবে জমিদারদের মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ে। আবির্ভূত হল শহরের ধনী ব্যবসায়ীর। যাঁরা কাঁচা পয়সার মালিক হয়ে বৃটিশদের কৌশলে গ্রামে জমিদারী কিনে জাঁকিয়ে বসতে উদ্যত। যাঁরা ঐতিহ্যহীন, আভিজাত্য হীন অথচ সম্মানের ভিখারী। তাঁরা অর্থ দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। এঁদেরই এই ভিত্তিহীন আভিজাত্যের সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের শুরু হল প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। শুরু হল সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূদের সাথে ধনতন্ত্রের শেষ লড়াই। এই দ্বন্দ্ব লাভপুরেও ঘটেছে তারাশঙ্করের চোখের সামনে। "এঁদের সঙ্গে আরম্ভ হল লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক এই ভাগ্যবান ব্যবসায়ীর বিরোধ।" (১৬) এই বিরোধ তারাশঙ্করের গল্পে ও উপন্যাসে বার বার দেখা দিয়েছে।

বিলীয়মান সামন্তগণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে দেবতাদের স্মরণাপন্ন হলেন। ধর্মজীবনের দুটিই পথ। তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রায় প্রত্যেকেই হাজির হলেন কখনও সন্ন্যাসীর মাধ্যমে, কখনও বা বেদে, বাউল, পটুয়া, সাপুড়ে, গোরুমারা ইত্যাদির বেশে। তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের একজন অংশীদার। তাই তিনিও এইসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তাঁর জীবনেও এমনি এক সন্ন্যাসীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। "এই সন্ন্যাসীটি আমার মমতায় এমনই আচ্ছন্ন হন যে, সমস্ত জীবনে তিনি আর লাভপুর ত্যাগ করেন নি। তাঁর পার্থিব দেহের সমাধি আমি নিজে রচনা করেছি। সন্ন্যাসী প্রথম জীবনে পল্টনে চাকরী করতেন, তখন তাঁর নাম ছিল বলভদ্র পান্ডে। সন্ন্যাসী জীবনে তাঁর নাম হয়েছিল রামজী সাধু।" (১৭) এই সন্ন্যাসী প্রভাবিত অনেক কটি (৭টি) গল্প রয়েছে।

দ্বিধাহীন চিত্তে ঋজুবাক তারাশঙ্কর তাঁর গল্পও উপন্যাসে দেখিয়েছেন, গ্রামীণ সমাজ কীভাবে ধ্বসে পড়ছে, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে গ্রামীণ সংস্কার ও শাসনের সমস্ত বন্ধনকে শিথিল করছে। শহুরে জাঁকজমক ও স্বাচ্ছন্দ্যে প্রলুব্ধ হয়ে অসহায় বেকার গ্রাম ছেড়ে ভিড় করছে শহরের রাস্তায়। গ্রামীন ধর্মীয় বিশ্বাসের গাঢ়ত্ব ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে—নির্মোহ দৃষ্টিতে তারাশঙ্কর তা দেখিয়েছেন, তিনি আরও দেখেছেন যুগধর্মের আঘাতে সামন্তগণ ধীরে ধীরে লীন হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তথাপি তিনি নবীনকেই, নব-পরিবর্তনকেই বরণ করেছেন আনন্দের সঙ্গে। লেখকের এই দীর্ঘশ্বাস ও উল্লাস উভয়েই সত্য। এটি সাহিত্যেরও সত্য।

তারাশঙ্কর ছিলেন তান্ত্রিক বংশের সন্তান এবং নব্য ব্যবসায়ীগণ বৈষ্ণব। "ঐ একই গ্রামীণ পরিমন্ডলে সমস্ত তান্ত্রিকতার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত রূপকে যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারাশঙ্কর; তেমনি এখানেই দেখেছিলেন তান্ত্রিক বীরাচারী বংশ পরম্পরার সঙ্গে সদ্য উদীয়মান বৈষ্ণব কুলের প্রতিযোগিতার বাস্তব চিত্র"। (১৮) এই অসম প্রতিযোগিতায় সামন্ততন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী জেনেও তারাশঙ্কর তাঁদের অবক্ষয়ের দিকগুলি তুলে ধরেছেন। অতীতকে সরিয়ে নব্য যন্ত্র বা ব্যবসায়ীর উত্থানকে তিনি মেনে নিয়েছেন ঠিকই; তাই বলে অতীত ঐতিহ্যকে তিনি অবিচার বা শ্রদ্ধা দেখাতে বিস্মৃত হন নি। তাঁর বিখ্যাত "আরোগ্য নিকেতন" উপন্যাসের নায়ক জীবন মশাই তাঁর কম্পাউন্ডার শশীকে এক জায়গায় বলেছেন, "সে আমলটা বড়ই সুখেই গিয়েছে, কী বলিস শশী? ওঃ তার আর কথা আছে গো! সে একেবারে সত্যযুগ।" এই হচ্ছে তারাশঙ্করের মনের কথা। এই ঐতিহ্য প্রীতিই হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নতুনকে বরণ করতে তারাশঙ্করের লেখনীকে আড়ষ্ট বলে মনে হতে পারে; কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যে দিন সমাজের সমস্ত দায়িত্বে ছিলেন জমিদারগণ। তাঁরা যেমন মন্দ কাজ করেছেন আবার ভাল কাজও করেছেন—রাস্তাঘাট, মন্দির, মসজিদ, দীঘি, পুষ্করিণী, স্কুল কলেজ এক কথায় বলা যায় যে গ্রামবাংলার সম্পূর্ণ সংস্কৃতিটাই গড়ে উঠেছিল তাঁদেরই সাহায্যে অথচ সেই সামন্তপ্রভুদের দুর্দিনে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি না দেখানো কোন প্রগতিশীল মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। "যা অনিবার্য তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গতি নেই, আমিও পরিবর্তন চাই। নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হলে পুরানোকে বিদায় দিতেই হবে একথাও মানি। কিন্তু যা যায় তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলব না, হাহাকার করব না—তাই বা কেমন করে হয়?" (১৯) "মা" গল্পে তারাশঙ্কর যেন কার্ত্তিকবাবু। রামসুন্দরকে কার্ত্তিকবাবু বলেছেন, "বড় দুঃখ হয় বুঝলে রামসুন্দর; এতবড় বংশের এই রকম পরিণাম দেখলে বড় দুঃখ হয়। বিশেষ করে আমাদের দুঃখ হয় বেশী।" এইভাবে বহু ক্ষেত্রেই তিনি সামন্তদের অবক্ষয়ে হাহুতাশ করেছেন।

বিলীয়মান সামন্ত-জমিদার অর্থনৈতিক সমস্যা সম্মুখীন হয়েছেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ দাপট, জৌলুস, দেমাক, ও আভিজাত্য জাহির করতে ছাড়েন নি, বিশেষ করে নায়েব, গোমস্তা ও নিরীহ প্রজাদের কাছে। বংশপরম্পরায় জমিদারী খন্ড খন্ড হয়ে বহু জমিদার সৃষ্টি হয়। তাঁদের খরচ অনেক বেড়ে যায় কিন্তু আয় যায় কমে। তাই সরকারী খাজনা দেবার সময় হলে অনেক জমিদারের নাভিশ্বাস ওঠে, চোখে সরষে ফুল দেখেন। তারাশঙ্করের জীবনেও তা ঘটেছিল। তার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়েছেন তাঁর "রাজা, রানী ও প্রজা" গল্পে। গল্পের প্রথমেই রাজা (লেখক) সরকারী খাজনা দেবার সময় তীব্র অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি জমিদারী ও জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা পিতৃপুরুষদের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, " পৈতৃক ক্ষুদ্র জমিদারী কঠিন পেষণে গলায় চাপিয়া বসিয়াছে। জমিদারী এখন দাঁড়াইয়াছে হয়রানি। সরকারের সদনে এক একবার রাজস্ব দাখিলের সময় হয় আর নিখিল ভূবন অন্ধকার হইয়া ওঠে।" (রাজা, রানী ও প্রজা)। এই পর্যায়ে আর একটি গল্প "সমুদ্র মন্থন"। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার উমানাথ বাবুর দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়েছে। একদা, যেখানে জৌলুস ও আড়ম্বরে চারদিক ঝলসে উঠত, আজ আর কিছুই নেই। তবুও আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধরে নিজের

অবক্ষয়কে সতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার সামাজিক জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সরকারী খাজনা দেবার সময় আগত। তাই 'নীরব উৎকণ্ঠায় উমানাথবাবু পাগল হইয়া যাইবেন বোধ হয়।" (সমুদ্র মন্থন)। গল্প দুটিতে জমিদারীতন্ত্রের প্রতি বিরাগ অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

আবার "খড়্গ" গল্পটির বক্তা রাজাবাবু। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামজীবন রায় বিশাল জমিদার বংশের সন্তান, বর্তমানে বিলীয়মান গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তিনি উকালতি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু অতীত ঐতিহ্য এবং সামন্তদের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগ থেকে গত দুই-তিন শতক ধরে এই প্রদেশে জমিদারগণই ছিলেন সর্বস্তরের মানুষের প্রাণশক্তির আধার ও কেন্দ্রস্থল। সমাজে যেটুকু সংস্কৃতি ও প্রগতিচর্চা হত তার মূলে ছিলেন এঁরাই। আবার সামন্তগণ অত্যাচারী, দাম্ভিক, মদগর্বী, শঠ, প্রবঞ্চক, চরিত্রহীন প্রভৃতি তমগুণেরও অধিকারী ছিলেন। ফলে সমাজে দুঃখ, যন্ত্রণা, দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছিল সংগত কারণেই।

সামন্ততন্ত্রের পটভূমিকায় তারাশঙ্কর রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি সার্থক গল্প ও উপন্যাস। 'ধাত্রীদেবতা'য় (১৯৩৯), কালিন্দী (১৯৪০) তে এবং উত্তরকালে "পদচিহ্ন" (১৯৫০)-তে অর্থনীতি, যন্ত্রসভ্যতা ইত্যাদি বিচিত্র শক্তির চাপে সামন্ত জীবনের ক্ষয় ও ক্রম বিলোপের ছবি আছে। 'ধাত্রীদেবতা'য় নায়ক শিবনাথ নিজেই জমিদারী শেষ পর্যন্ত গোঁসাইবাবার হাতে সমর্পণ করেছেন। অন্যদিকে 'কালিন্দী'তে দেখা যায় কলওয়ালা মিঃ মুখার্জী যান্ত্রিক করালগ্রাসের সম্মুখীন হয়ে সামন্ত্রতন্ত্রের প্রতিনিধি ইন্দ্র রায় শেষ পর্যন্ত পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। রামেশ্বরের কনিষ্ট পুত্র অহীন্দ্রের মনে সমাজতান্ত্রিক চেতনার আদর্শও সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির উপরে আঘাত হেনেছে।

আবার অনেক ছোটগল্পের মধ্যেও তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় তুলে ধরেছেন। যেমন, জলসাঘর, রায়বাড়ি, সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার, বন্দিনী কমলা, অগ্রদানী, নুটুমোক্তারের সওয়াল, মা, জন্মান্তর, বিষধর, প্রতিমা, শেষকথা, আরোগ্য, মুখুজ্জে মহাশয়, প্রভৃতি গল্পে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের দিকটি সুস্পষ্ট। জমিদারদের দোর্দন্ড প্রতাপ, আভিজাত্য, ঐশ্বর্যের গরিমা লেখকের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। তাঁর চোখে ব্যক্তিত্ব, ক্রোধ, জিদ, মহানুভবতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি মিলিয়ে বাংলাদেশের জমিদারগণ যেন এক বিরাট মহীরুহ। "মনোজ বসু"র প্রথমদিকের গল্পগুলিতে প্রগতিবাদী জমিদারদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের এক সার্থক চিত্র পাওয়া যায় তারাশঙ্করের "জলসাঘর" গল্পে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়েও লেখক অতীতের অবসানের বেদনা-বিহ্বলতা, অবসাদময় বিষন্নতা উপলব্ধি করেছিলেন। "তিরিশের দশকে এ দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি এবং ধর্মের চেতনার মধ্যে একটা ব্যাপক এবং অস্পষ্টভাবেই পুরোনো কালের জৌলুষ মুছে দেওয়া যে পরিবর্তন বোধ দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্করের "জলসাঘর" এ তারই সুস্পষ্ট ইশারা।" [২০] জলসাঘরে সে সংকট দেখা দিয়েছিল তার সূত্রপাতের পূর্বাভাস রয়েছে "রায়বাড়ি" গল্পে। "রায়বাড়ি"-র জমিদার রাবণেশ্বর রায়ের দীপ্তশৌর্য, ভোগলিপ্সা, প্রবল প্রতিহিংসাপরায়ণতা শেষের দিকে চরমে উন্নীত হয়। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে রায়বাড়ির জলসাঘরের মজলিস ভেসে যায়। সারা বাঙলায় রাবণেশ্বরের সম্পত্তি ছড়ানো রয়েছে। শাক্ততান্ত্রিক রাবণেশ্বর রায় সর্বদা রুদ্রাক্ষের মালা বিরাট বক্ষে ধারণ করতেন। "তারা মা" বলে শক্তির সাধনা, আবার দায়িত্বশীল পিতার মত প্রজাদের সেবা দুই-ই করেছেন। হুদ্দা-শ্যামপুরের থেকে আগত চল্লিশজন প্রজাকে রাত্রে আশ্রয়ও দিয়েছেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাছ ভাত খাইয়েছেন, এমনকি বাড়ীর জন্যে বরাদ্দ দুধ প্রজাদের খাইয়েছেন। প্রজারা রাবণেশ্বরকে বলেছে, "রাজায়-প্রজায় সম্বন্ধ হল বাপ আর বেটা।" বিদ্রোহী প্রজাদের কৌশলে রায়বাবু শিক্ষা দিয়েছেন, "কিন্তু বেটায় এত বাপ বদল করে কেন হে।" পরদিন প্রাতে প্রজাদের বিদায়ের পূর্বে প্রত্যেকে ধুতি, চাদর এবং গাড়িভাড়া দিলেন। প্রজাদের মধ্যে গুপ্ত চিকিৎসক ছিলেন তাই তাঁকে রায়বাবু সম্মানীস্বরূপ পাঁচ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন।

কিছুদিন পর যখন গোমস্তাকে হুদ্দা-শ্যামপুরের প্রজারা ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে পুড়িয়ে মারে তখন রাবণেশ্বর দশাননমূর্তি নিয়ে বিদ্রোহী প্রজাশাসনে উদ্যত হয়েছেন। লাঠিয়াল কালী বাগদীকে হুকুম দেন, "ছত্রিশ মৌজা কালো করে দিয়ে আসতে হবে।" প্রিয়তমা পত্নীর নিষেধ তিনি কর্ণপাত করেন নি। রাজোচিতভাবেই প্রজাশাসন করলেন। মাসখানেক পর যেদিন সন্ধ্যায় জলসাঘরে নাচ গান চলছে, বাপের বাড়ী থেকে স্ত্রীপুত্র আসছে তখন হঠাৎ কালী এসে সংবাদ দেয় রাণীমা বীজনগর থেকে ফেরার পথে—"আকস্মিক এক ঝড়ের তাড়নায় ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে ঘূর্ণিতে পড়িয়া বজরা-ডুবি হইয়াছে।" রাবণেশ্বর এই দুঃসংবাদ শুনে বলে উঠলেন, "তারা, তারা।" রাবণেশ্বরের বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেল। প্রজাদের সমস্ত সম্পদ অকাতরে দান করে সর্বত্যাগী হবার সংকল্প নেন। হঠাৎ গঙ্গার জল বাড়ে, দীঘলমারীর বাঁধ যায় ভেঙে। গ্রামের প্রজাদের আশ্রয়ের জন্যে রায়বাড়ির দরজা খুলে দেন রাবণেশ্বর। বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলীর কন্যার বিয়ের জন্যে জলসাঘর খুলে দেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যান কালীকে নিয়ে। নদীর ঘাট থেকে জলসাঘরের আলো আর সানাইয়ের শব্দ শুনে আবার ফিরে আসেন রাবণেশ্বর। নির্বংশ হবার জন্যে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা

করতে হয়। কারণ তখনও যন্ত্রসভ্যতা ও ধনতান্ত্রিক নগর সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে মাথা চাড়া দেয়নি। রাবণেশ্বর এক বিরাট বিরল চরিত্র। "রায়বাড়ি গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্তশীর্ষ, ভোগলিপ্সার মধ্যে অটল ভগবৎ ভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্ত হস্ততা, ও বৈর-নির্যাতনে অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প, এই সমস্ত দোষগুণ মিলিয়া তাঁর চরিত্রকে রাজোচিত বিশালতা দিয়াছে।" (২১) 'রায়বাড়ি' গল্পের জমিদার তারাশঙ্করের কল্পিত চরিত্র নয়। তিনি জমিদার বংশের সন্তান। হয়তো তিনি এমন চরিত্রের কথা শুনেছিলেন। তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন, "এমন চরিত্রের কথা শুনেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে শুনছি এবং কঠিন চরিত্রের মানুষের ছায়া আমার পিতৃ পুরুষের মধ্যে, পিতৃ পুরুষদের সম সাময়িকদের মধ্যে দেখেছি বলেই এই চরিত্র এত সজীব, এত বাস্তব আমার কাছে। ১০৯২ লাটটি আমাদেরই ছিল। এই লাট শাসন করতে না পেরে আমাদেরই পূর্ব পুরুষ সেকালে নামকরা দুর্ধর্ষ জমিদারকে পত্তনি দিয়েছিলেন।" (২২) তিনি হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতার অধিবাসী গৌরসুন্দর চৌধুরী। তিনি রাজারামপুরের জমিদার রাবণেশ্বর রায় হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন তারাশঙ্করের লেখনীতে। রাবণেশ্বর যে প্রবল ক্ষমতা সম্পন্ন ও অত্যাচারী ছিলেন তা রাবনেশ্বরের কথাতেই প্রমাণ মেলে। রায়গিন্নী প্রজাপীড়নে বাধা দিতে উদ্যত হলে রায়বাবু বলেন, 'গিন্নী। মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। শ্যামপুরের প্রজারা আমার মাথায় পা দিয়েছে।" রাণীও পুত্রে মৃত্যুর পর মর্মাহত রায়বাবু নায়েবকে বিশাল শ্রাদ্ধের ফর্দ করতে বলেন। "রায়বাড়িতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না করে থাকে।" এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর এক শিক্ষক-বন্ধু শরৎচন্দ্র চন্দ এক বিরাট শ্রাদ্ধের ফর্দ দেখান এবং এই ফর্দই হ'ল রায়বাড়ি সৃষ্টির প্রেরণা। 'রায়বাড়ি' গল্পে সম্পদের আভিজাত্যে বেগবান সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ; অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রজা, রায়গিন্নীর মমতা এবং যমদূতাকৃতি একনিষ্ঠ লেটেল কালী বাগদী-সকলেই সামন্ততন্ত্রের জালে বন্দী। বস্তুতঃ "তাঁর (তারাশঙ্কর) রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে।" (২৩)

"জলসাঘর" গল্পেও তারাশঙ্করের প্রাচীন জমিদার-তন্ত্র সম্পর্কে এক ধরণের মোহ ও আকর্ষণের চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের কাছে 'রায়বাড়ি' প্রিয় গল্প, কিন্তু অনেকের কাছে তা নয়। "উৎকর্ষের বিচারে এবং বক্তব্যের পূর্ণতায় "জলসাঘর" এর সঙ্গে "রায়বাড়ি"র কোন তুলনাই চলে না।" (২৪) আসলে জলসাঘরে যে সংকটের সূত্রপাত –তার–পূর্বাভাস রয়েছে 'রায়বাড়ি' গল্পে। 'জলসাঘর'-এর বিশ্বম্ভর রায় বংশের সপ্তম পুরুষ, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তের অন্তিম শিখা। 'চতুর্থ পুরুষ করিয়াছিলেন রাজত্ব, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষ করিলেন ভোগ ও ঋণ। সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলেই রায়বাড়ির লক্ষ্মী সে ঋণ সমুদ্রে তলাইয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীহীন দেবরাজের মত শুধু বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। শুধু এই মাত্র নয়, রায়বংশ এই সপ্তম পুরুষে নির্বংশ হইয়া গেল" (জলসাঘর)। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে বিশ্বম্ভরের সমুদয় সম্পত্তি চলে গেছে। সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তির উপরেই এখন নির্ভরশীল। কলেরায় স্ত্রী-সন্তান মারা গেছে। তবুও আভিজাত্য বোধে ও আত্মমর্যাদা দানে তিনি হিমালয়ের মত অটল। নব্য ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। বণিককুলের আবির্ভাব ও তাদের সঙ্গে বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের সংঘাত অনিবার্য, কারণ অস্তিত্ব ও অতীত দাপট রক্ষার তাগিদে সামন্তগণ তখন মরিয়া। খোদ লাভপুরেই এই দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ করেছেন। জমিদার-প্রধান লাভপুরে হঠাৎ কয়লা খনির মালিক হয়ে আসেন এক পরিবার। শুরু হয় মর্যাদার লড়াই; গ্রামবাসীর কাছে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। "১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজ তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে.....বীরভূমের জমিদারদের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাদের সংখ্যার বাহুল্য। ..... তাঁদের পরাক্রম কম নয়। তাঁরা বলতেন "মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' বুকে চাপড় মেরে তাঁরা বীর্যের দাবী ঘোষণা করে বলতেন,— "আমি জমিদার"। (২৫) এই গল্পে জমিদারের সঙ্গে নব্যব্যবসায়ীর দ্বন্দ্বের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক সংঘাতেরই ইঙ্গিতমাত্র। শ্রীভ্রষ্ট বিশ্বম্ভর গৃহকোণে আত্মগোপন করে থাকেন। মহিমের মোটর গাড়ির হর্ণ কানে আসে, তখনই তাঁর তুফানের (ঘোড়া) হ্রেষারব, এবং ছোটগিন্নী (হস্তিনী)র গর্জন অতীতকে স্মরণ করায়। মহিমের উদ্ধত ব্যবহার বিশ্বম্ভরকে শেষবারের মত গৃহের বাইরে এনেছে। দীর্ঘকাল বাদে আবার জলসাঘর খুলেছেন। মদের নেশায় আর আভিজাত্যের দয়ায় বাঈজীর মনোরঞ্জনে লক্ষ্মীর ঝাঁপির শেষ সম্বল নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি মৃতা স্ত্রীর বহুস্মৃতি বিজড়িত শেষ অলংকারটির মায়াও ত্যাগ করেছেন। হঠাৎ তিনি যেন অতীত বৈভব এবং বিগত যৌবনকে ফিরে পান। আবার সহসা সবই শূন্যে মিলিয়ে যায়, "সহসা মনের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন।—মোহ। কেবল তাঁহার নহে, সাত রায়ের মোহ ওই ঘরে জমিয়া আছে।" জলসাঘরের আলো যে আর জ্বলবে না তা বিশ্বম্ভর উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আলো নিবিয়ে দিতে বলেছিলেন। অস্তগত মহিমা, সামন্ততন্ত্রের পতন যে অনিবার্য লেখক তা জানতেন, তথাপি সামন্ততন্ত্রের প্রতি মোহাবিষ্ট মানসিকতা তাঁর প্রকট। ধনতন্ত্রের আগমন অনিবার্য, মহিম গাঙ্গুলীর বিজলী বাতির কাছে জলসাঘরের ঝাড়লণ্ঠন যে পরাজিত হবেই—তা তারাশঙ্কর জানতেন। কিন্তু তিনি এমন হৃদয়হীন রূঢ় পরিবর্তন চান নি। তাই মহিম তাঁর লেখনীতে মহিমময় হয়ে ওঠেনি। "তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগপ্রবাহের বিরোধিতা করতে চান নি কিন্তু তাঁর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া খানিকটা অবচেতনভাবে নূতনের নির্মমতাকেই যেন প্রধানতঃ অভিব্যক্ত করতে চেয়েছে।" (২৬)

এই গল্পে শুধু রায়বাড়ির দরজাই বন্ধ হয় নি, বন্ধ হয়েছে অতীত আভিজাত্য মন্ডিত সামন্ততন্ত্রের রত্নদ্বার। ঋজুদর্শী, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তারাশঙ্কর তা অঙ্কন করেছেন। "চাবুকের শব্দে গল্পটির চকিত উপসংহার যেন নিষ্ফল আক্রোশে একটি যুগেরই সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।" (২৭)

সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের চিত্র পাওয়া যায় "রঙীন চশমা" গল্পটিতে। সেখানে বিশাল অট্টালিকা ভগ্নপ্রায়, জমিদার চৌধুরী, ধর্মে বৈষ্ণব। পাঁচভাই, তার মধ্যে দু-ভাই এর বংশ নেই। মৃত এক ভাইয়ের পুত্রদ্বয় মাতুলালয়ে থাকে। নিষ্কর্মা ছোটকর্তা বড়ভাইয়ের কাছেই থাকে। এভাবেই ধ্বংসের চরম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে অতীতের সেই বিনয়ে, দানে, সম্পদে লব্ধ প্রতিষ্ঠ চৌধুরী বংশ আজ পতনের শেষ ধাপে। অবশ্য ধ্বংসের প্রত্যক্ষ কারণ উল্লেখ না থাকলেও ধনতন্ত্রের উত্থানই যে মূল কারণ তা অনুমান করলে ভুল হয় না।

এই পর্যায়ের আর একটি সার্থক সৃষ্টি তারাশঙ্করের "বন্দিনী কমলা" গল্পটি। রাজাহাটের বনেদী রায়বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া বংশধরদের নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। কিংবদন্তীর প্রতীকে আশ্রয় করে গল্পটির প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে জমিদার গোপীবল্লভের স্ত্রী মানিকবৌ লক্ষ্মীকে গৃহে বন্দিনী করে গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। কিন্তু কালের অভিশাপ থেকে রায় বংশ রেহাই পেল না; দারিদ্র্যের চরমসীমায় পৌঁছায়। সংসারে ব্যভিচার, অনাচার শুরু হয়। ঋণে জর্জরিত হয় জমিদার বাড়ী। এদিকে কালের অভিঘাতে শতাব্দীর রসনায় অবহেলিত তালাটি ক্ষয়ে একদিন খুলে গিয়ে শুধু ঝুলে থাকে; ঋণ থেকে বাঁচতে লক্ষ্মী বাঁধা ঘর খুলে পান একরাশি চুল, একখানি বিবর্ণ চাদর, একখানি নামাবলী। কালের অভিঘাত কাউকে ক্ষমা করে না, ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও ব্যভিচারী জমিদার-এ দুইয়ের মধ্যে প্রাচীনকে বিদায় নিতেই হবে এবং তাতে যে লক্ষ্মীদেবীকে বন্দিনী করে রাখলেও রেহাই নেই—তা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

আবার Feudal System কখনও কখনও নিজের শখ ও সাধ পরিপূর্ণ করতে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে লোভাতুর, উদর-সর্বস্ব, নির্লজ্জ, বিবেকহীন করে তোলে তার জ্বলন্ত উদাহরণ 'অগ্রদানী' গল্পটি। জমিদার শ্যামাদাস বাবু অর্থ ও জমির লোভ দেখিয়ে পূর্ণ চক্রবর্তীকে এমন নিষ্ঠুর হবার সুযোগ দিয়েছেন। সামন্তগণ এভাবেই নিজেদের খেয়াল-খুশী ও স্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে।

আবার প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করলেও মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি "পুত্রেষ্টী" গল্পের জমিদার গণেশ বাঁড়ুজ্জের। তাই পোষ্যপুত্রে মন ভরেনি; নিজ পুত্র কামনায় পরের ছেলেকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছেন।

সর্বস্ব হারিয়ে অন্যের কাছে আত্মমর্যাদা কখনই হারাতে প্রস্তুত নন "মুখুজ্জে মহাশয়" গল্পে বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়।

জমিদারী দাপট শূন্য, বিত্তহীন, নির্বিষ সাপের নিষ্ফল ফোঁস-ফোঁসানিকে প্রজারাও অবজ্ঞা করে—"সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার" গল্পে বনবিহারী সরকারকে। তিনি কেবল বেলা শেষে পশ্চিম দিগন্তে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকার করেন। এ অবক্ষয় স্বয়ং তারাশঙ্কর লাভপুরেই দেখেছেন।

Landed Aristocracy বা জমিদারী আভিজাত্যের সঙ্গে Mercantile Capital বা উঠতি বণিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বে কিছু জমিদার নিজেদের জমিদারীর মায়া ত্যাগ করে বা আরও অর্থের আশায় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন। এ ব্যাপারে —পুরোহিত, মুখুজ্জে মহাশয়, আরোগ্য, শেষ কথা প্রভৃতি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে।

সামন্তগণের অত্যাচার, মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্তের চিত্র আছে। অন্যায় ভাবে জমিদারগণ প্রজাদের শোষণ, শাসন, জমি-জায়গা লুণ্ঠন করে গৃহদাহ পর্যন্ত করেছেন। "নটু মোক্তারের সওয়াল" গল্পে নটু বিহারী ও মহাভারত এভাবেই শোষিত হন। কঙ্কণার ধনী জমিদার প্রজাদের মাথায় পা দিয়ে চলতেন। অত্যাচারিত নটু সামান্য শিক্ষক থেকে জেদের বশে ওকালতি পাশ করে মামলায় জমিদারদের পরাজিত করেন। নটুর অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে জমিদারবাবু নটুর পুত্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং সামন্ত নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ধনতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া কেমনভাবে বেঁধেছে তা সুন্দরভাবে তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। এই গল্পটিকে আশ্রয় করেই লেখক "দুইপুরুষ"-এর নাট্য রূপ দেন। কলকাতায় তা মঞ্চস্থ হয় এবং চরম মঞ্চ সাফল্য লাভ করেন।

সামান্য, দরিদ্র পাটনীকেও শোষণ করেছেন সামন্তগণ 'পাটনী' গল্পে। "সন্ধ্যামণি" গল্পে দ্বিজপদ শব ঘাটের ডাক নিয়েছে। জমিদারকে বাৎসরিক ১১০০ টাকা দিতে হয়। তাই সে মৃতদেহের জন্য ঘাট মাশুল ২ টাকা করে তোলা সংগ্রহ করে। জমিদারগণের শোষণের রসনা শ্মশানঘাট পর্যন্ত প্রসারিত।

সামন্তগণের চারিত্রিক স্খলন, ব্যাভিচার, অত্যাচার, আপন স্ত্রী হত্যা, পরস্ত্রীকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি অপগুণ ও বর্তমান ছিল। এর ফলেও তাঁদের অবক্ষয় ও পতন ঘটেছে। যেমন "মা" (ফল্গু) গল্পটির জমিদার মহাবিষ্ণু সরকার সন্দেহের বশে নিজের প্রথমপক্ষের সুন্দরী স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করেছেন। সেই পাপের বোঝা তিনি সারাজীবন বহন করে চলেছেন। দুই পুত্র থাকতেও নির্বংশ হয়েছেন। বড়টির প্রজা হত্যার দায়ে দ্বীপান্তর এবং ছোটটির স্বদেশী

আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফাঁসি হয়, সরকার বাবুর হাতে কুষ্ঠ হয়। এইভাবেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। ব্যাভিচার, লম্পট, মদ্যপ চরিত্রহীন সামন্তপ্রধান গল্প 'বিষধর', 'প্রতিমা' প্রভৃতি।

সামন্তযুগে সামন্তগণই গ্রামের শুভাশুভের, বিচারের বিধানদানে সর্বোচ্চ ছিলেন। বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 'তৃষ্ণা' (রসকলি) গল্প; গ্রামপ্রধানের ভূমিকায় আসীন 'জন্মান্তর' 'সর্বনাশী এলোকেশী', প্রভৃতি গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সামন্তগণ থেকেই পরবর্তী সমাজবিবর্তনে সমাজতন্ত্রবাদী ব্যক্তিদের ঘটেছে আবির্ভাব। "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে, নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবক সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল।" [২৮] অহীন্দ্র ও এই যুবকবৃন্দের প্রতিই আকৃষ্ট—একই পথের পথিক।

ধনতন্ত্র/ধনতান্ত্রিক উৎপাদন

ভূমিকা ঃ- ধনতন্ত্র বলতে বোঝা যায় এমন এক ধরণের অর্থনৈতিক সংগঠন যেখানে উৎপাদনের সব উপাদান (জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। মালিকানা ব্যক্তিগত বলে এই সব উপাদান মালিকদের দ্বারা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং সব উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা লাভই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পিছনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। অর্থনৈতিক জীবনে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে, এই স্বাধীনতায় রাষ্ট্র বা সরকার হস্তক্ষেপ প্রায়ই করে না। তাই একে অনেক সময় অবাধ অর্থনীতি বলে।

যে উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধনের প্রাধান্য, মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, মুনাফাকে নিয়ন্তর মূলধনরূপে খাটানো প্রভৃতি বজায় থাকে, তাকে ধনতন্ত্র বলে। ব্যক্তিগত মালিকানা, ভোগ করার স্বাধীনতা, কর্মোদ্যম ও ব্যবসায় সংগঠনের স্বাধীনতাকে অনেকে ধনতন্ত্র বলেন। ধনতন্ত্রে দেশের উপকরণগুলি কিভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে, কি পরিমান, কি ধরনের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হবে, এইসব নির্ভর করে দাম এবং মুনাফার উপর ঃ সংক্ষেপে দাম-মুনাফার পদ্ধতির উপর (Price-profit + Mechanism)। মুনাফার জন্যই উৎপাদন এবং মুনাফা দামের উপর নির্ভর করে। ভোগকারীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী দাম দিতে চান, তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী সামগ্রী উৎপাদন করে বিক্রির দ্বারা মুনাফা হয়। যে ক্ষেত্রে যে শিল্পে মুনাফার হার অধিক, তার উৎপাদন বাড়ে, উপাদানগুলি সে দিকে নিয়োজিত হয়। এইরূপে দাম-মুনাফা ব্যবস্থাই সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও উৎপাদন গুলির নিয়োগের দিক নির্ণয় করে। লেনিনের মতে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে শোষণেরই প্রাধান্য—এই গণতন্ত্র আদতে সংখ্যা লঘুদের শাসন, সম্পত্তিবান এবং ধনীদের ব্যবস্থা—**"This Democracy is always hemmed in by the narrow limits set by capitalist exploitation and consequently always remains, in reality, a democracy for the minority, only for the propertied classes, only for the rich."** [২৯]

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ঃ প্রচলিত শ্রেণীবিভাজন এবং আয়ের ক্ষেত্রের অসাম্য বজায় রাখে এবং উৎপাদনের উপকরণের বেসরকারী মালিকানা অক্ষুন্ন রাখে। সর্বাত্মক পরিকল্পনা অনুযায়ী রাষ্ট্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করলো পুঁজিবাদী অংশীদারের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রয়োজনীয়তা থাকে না কারণ উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের কোন ভূমিকা নেই। নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের দুর্বলতা হল উৎপাদনের উপকরণসমূহকে বেসরকারী লাভ ও মজুরীতে নিয়োজিত করা। মুনাফাই উৎপাদনের শর্ত এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। ক্রয়ক্ষমতা শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অন্যদিকে মুনাফা-মজুরি সম্পর্ক উৎপাদনের বাধাও সৃষ্টি করে। কারণ মজুরি বৃদ্ধি পেলে মুনাফার পরিমাণ কমে যায়, উৎপাদনের উৎসাহও স্তিমিত হয় এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয় না।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পক্ষে এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির বিপক্ষে যুক্তি হল—পরিকল্পিত অর্থনীতি হচ্ছে Muddled Economy বা বিশৃঙ্খল অর্থনীতি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে স্বয়ংক্রিয় মূল্য-নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা উৎপাদনকে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রন করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে অবাধ অর্থনীতি সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির সংস্থান রাখে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিখুঁত মূল্য ব্যবস্থা প্রদান করতে পারে না, উৎপাদনের গতিরুদ্ধ হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বলপূর্বক ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্কোচন, অতিরিক্ত সঞ্চয়ে বাধ্য করা সম্ভব হলেও গণতন্ত্রে শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নের প্রভাবে তা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্রে অবাধ মূলধন সংগঠনের ব্যবস্থা আছে, যাই হোক না কেন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক মজুরী অনেক সময় গণবেকারী ও দেউলিয়া প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে দ্রুত উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করেছে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনেক সময় জোরালো নেতিবাচক বিধিনিষেধ আরোপ করে উৎপাদনে ইতিবাচক উৎসাহ প্রদান করতে পারে।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডে ঘটে যায় শিল্প-বিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যান্ত্রিক কলাকৌশলে উৎপাদন হতে শুরু হয়।

ফলে ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ণ (Capitalist Industrialisation) পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। যার ফলশ্রুতি হল মালিকশ্রেণী অধিকতর বিত্তশালী হতে থাকে; বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণী অধিক মাত্রায় শোষিত হতে থাকে। সামন্তপ্রথা বা জমিদারী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক শহরে কর্মের সন্ধানে ভিড় করে। তাই গ্রামে কৃষকশ্রেণীর সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান হয়। অথচ **"land, Labour & Capital** এই তিনের যোগে ধন সৃষ্টি হয়।" (৩০)

১৭৫৭ খ্রী: পলাশীর যুদ্ধাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তগত করে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি। ১৮৫৭ খ্রী: সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংল্যান্ড সরকার এদেশ তাদের বাণিজ্যিক শক্তিকে প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করলেও ভারতে উপনিবেশিক চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায় নি। ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংস ও শোষণ হয় প্রকট। নিজেদের দেশের তৈরী মাল এ দেশে ইংরেজরা যোগান দিতে থাকে। তাই বৃহৎ শিল্প তারা এদেশে প্রথমে স্থাপন করেনি। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতে সামন্ত-নির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা। তারই জন্য বৃটিশগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। সেই সঙ্গে তারা দেশীয় শিল্পপতিদের জমিতে অর্থ লগ্নী করার জন্যে বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিতে থাকে। ফলে বাংলাদেশের বেশ ধনী ব্যবসায়ী জমিতে অর্থ লগ্নী করে রাতারাতি জমিদার হয়েছেন, বড় শিল্পপতি হন নি। গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের অনেকেই অধিক রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত না হওয়ায় তাদের জমিদারী কেড়ে নেয় বৃটিশ সরকার এবং সেই জমিদারী চলে যায় সদ্য শহুরে নব্য ব্যবসায়ীদের হাতে। **"Greater Part of the provinces land holdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in hand."** (৩১) এরাই ছিল গ্রামবাংলার সর্বনাশের অগ্রদূত। জমিকেনা ও বেশী সুদ আদায় করে এরা ধনী হতে চেয়েছে। অন্যদিকে পঞ্জাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায় সেখানকার লোকেরা শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। কলকাতায় কয়লার ব্যবসা থাকলেও নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় লাভপুরের জমিদারী ক্রয় করেছিলেন—তারাশঙ্কর তা উল্লেখ করেছেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা (রেল-১৮৫৩) স্থাপিত হওয়ায় বৃটিশ শিল্পপতিদের এদেশে আগমন ঘটে। দেশীয় বণিকদের সঙ্গে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দিলেও উভয়ে একটি বিষয়ে একমত ছিল—তা হল শ্রমিক শোষণ। "ভারতের শিল্পক্ষেত্রের দাসত্বই হচ্ছে মূল কথা।" (৩২) ১৭৯৩ সালের পর জমি ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার লাভ করে। ফলে নব্য জমিদারদের খেয়াল খুশিমত খাজনা যোগাতে দরিদ্র প্রজা জমি বন্ধক, বিক্রি করতে বাধ্য হয়। নিঃস্ব হয়ে তারা দলে দলে জীবিকা অর্জনের আশায় শহরে আসে, অন্যদিকে প্রত্যন্ত গ্রামেও গজিয়ে ওঠে মহাজনী কারবার। জন্ম হল প্রাক্ ধনতন্ত্রের। জমিতে নব্য ধনী শ্রেণীর আবির্ভাব এবং গ্রামে তাদের অনুপ্রবেশ সামন্তগণ ভালচোখে দেখেন নি। ফলে শুরু হয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এই দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। বৃটিশ সরকার প্রবর্তিত বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আইন বলে শোষণ ও বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাপে প্রাচীন জমিদারদের নাভিশ্বাস ওঠে; অস্তিত্বে সংশয় জাগে। এই সুযোগে নবোদিত ব্যবসায়ী ও মহাজন গোষ্ঠী জমির একচেটিয়া মালিকে পরিণত হন। শুরু হয় ব্যবসায়ী আর জমিদারের দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর নিজেই তা উল্লেখ করেছেন—"সামন্ততন্ত্র ও জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার, সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" (৩৩)

এই নব্য শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীগণ জমিদারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কখনই করেনি। এমন কি ছল-চাতুরীর মাধ্যমে অনেক কুকর্ম করেছেন। এঁদের কোন ভাল দিক লেখক দেখতে পান নি। তাই হয়ত তিনি এঁদের প্রতি সুবিচার করেন নি। তাঁর সৃষ্ট ব্যবসায়ী চরিত্র কখনই সামন্ত-জমিদার অপেক্ষা উন্নততর নয়। "কালিন্দী"র বিমল বাবুর চরিত্র তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। গল্প হিসেবে 'জলসাঘর' এর মহিম গাঙ্গুলী এবং 'পুরোহিত' এ বিমলবাবু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিজীবনেও লেখক এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিজে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সন্তান, অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান। ফলে অনিবার্যভাবেই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাঁদের দাম্পত্য জীবনে, "এই দ্বন্দ্ব আমার সারাটা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—প্রায় সারাটা জীবন উপলব্ধি করে এসেছি।" (৩৪) এরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় "ধাত্রীদেবতা"য় শিবনাথ ও নাস্তির মধ্যে। দ্বন্দ্বে জয় হয় সামন্ততন্ত্রের। বাস্তবতঃ সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজের জগদ্দল পাথরকে সরিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা যে প্রগতিশীল এই সত্য জ্ঞাত হলেও তারাশঙ্কর তা প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বপক্ষে।

মালিকদের উদগ্র অর্থ তৃষ্ণা, অসংগঠিত, অসচেতন শ্রমিক-মজুরদের অসহায় আত্মসমর্পণ—ইত্যাদির সার্থক রূপকার তারাশঙ্কর। ধনতন্ত্রের নিশ্চিত আগমন ও অস্তাচলগামী সামন্ততন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পদধ্বনি তিনি শুনেছিলেন। আবার রাজনীতিজ্ঞ তারাশঙ্কর মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। বিদেশী শক্তির ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ হোক—তাও তিনি অকুণ্ঠচিত্তে প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ দুটোরই উৎখাত চেয়েছিলেন—"আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়; শুধু আয়তন এবং ভাবটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে। ওর দেহে চাবুকের আঘাতে স্পন্দন জাগবে না। ওকে ভারি ধারালো অস্ত্রাঘাতে খন্ড খন্ড করে সরিয়ে সৎকার করতে হবে, চিতা জ্বালাতে হবে, শবদেহটা আগলে আছে বৈদেশিক রাজশক্তি; একটাকে সরিয়ে আর একটাকে রাখলে

চলবে না। দুটোকে এক সাথে সরাতে হবে। এক চিতায় দুটো যাবে।" (৩৫) এই মানসিকতার জন্যেই হয়তো তিনি জমিদারী রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় রাষ্ট্র-প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করেন নি।

১। মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ঃ- বৃটিশ সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ দেশে জমিদার ও তাঁদের সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বৃটিশদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর থাকবে। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় শিল্পে আয়কর বৃদ্ধি করে এবং কৃষি ও জমিদারীর উপর করভার ততোধিক কম করার পক্ষপাতী হয়, কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল লভ্যাংশের বা মুনাফার অধিক মোহে দেশীয় ব্যবসায়ীগণ জমিদারী ক্রয় করবেন। অনেক বাঙালী ব্যবসায়ী এই মোহে পড়ে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু শহরে ব্যবসায়ী গ্রামে জমিদারী ক্রয় করলেও গ্রামের সাথে তাঁদের সংযোগ সুদৃঢ় ছিল না। না থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ তাঁরা শহরে জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। শহরে বিলাসী জীবন যাপনের ব্যয়ভার নতুন জমিদারীর অন্তর্গত কৃষকদের উপর নিত্য নূতন কৌশলে টাকা আদায় করে মেটাতেন। নিজেরা ঠিক ঠিক সময়ে গ্রামে আসতে না পারার জন্যে স্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দিষ্টকরে বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে চিরকালীন 'পত্তনী' দান করেন। পত্তনীদারগণও আবার নির্দিষ্ট খাজনার ভিত্তিতে কিছু ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। এইভাবে জমিদার ও প্রজার মাঝে কয়েক শ্রেণীর খাজনা-ভোগী উপশ্রেণীর সৃষ্টি হয়। "আমরা বাংলাদেশে যে পাত্তনীদার; দর-পত্তনিদার ও সে-পত্তনিদারদেরকে দেখতে পাই, তাঁরা এবং জমিদারদের প্রতিনিধি ও কর্মচারীরাই প্রবাসী ভূস্বামী গোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি।" (৩৬) এইভাবেই নিষ্কর্মা, সমাজে দুষ্টক্ষতের মত ক্ষুদে জমিদার হিসেবে ভূস্বামীর আবির্ভাব ঘটে। দিনে দিনে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ১৮১৯ খ্রী: অষ্টম আইন জারী হবার পর মধ্যস্বত্ব ভোগীগণ আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয় **"The practice of granting such under tenures has steadily continued until, at the present day, with the putnee and subordinate tenures in Bengal proper.....,but a small proportion of the whole permanently settled area remains in the direct possession of the zemindars."** (৩৭) আবার আবদুল্লাহ রসুল তাঁর কৃষকসভার ইতিহাস গ্রন্থে একই কথা বলেছেন, "দেড় লক্ষ জমিদারের নীচে নয় লক্ষ মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়েছে; অর্থাৎ তখন গড়ে এক একটি জমিদারী এস্টেটের মধ্যে ছয়টি করে মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ঘটেছে।" (৩৮) এরাই বৃটিশ সরকারকে বহুভাবে সাহায্য করেছিলেন। "১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহ এবং ১৮৫৯-৬১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গদেশ ব্যাপী নীল বিদ্রোহে জমিদার, তালুকদার ও মধ্যশ্রেণী বৃটিশ শাসনকে বাঁচাইবার জন্য সকল শক্তি লইয়া উহার পার্শ্বে দন্ডায়মান হইয়াছিল।" (৩৯) এই মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ধীরে ধীরে গ্রামবাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক, সাধারণ মানুষের ভাগ্য বিধাতায় পরিণত হন। অনেকে জমিদার বনে গেছেন। গ্রামীণ জীবনে সাধারণ মানুষকে এভাবেই ধনী হতে দেখেছেন তারাশঙ্কর। জমিদারও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভগ্নস্তূপের উপর নিঃশব্দে ব্যবসায়ীদের মূলধন ক্রমবর্ধমান হয়েছে। স্ব-গ্রামে চেনা লোকেদেরও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছেন তারাশঙ্কর।

তারাশঙ্করের কাল, একাল আর সেকালের সন্ধিক্ষণ। দুই মহাযুদ্ধের মাঝে স্থবির সমাজের ভাঙন, গ্রামীণ অর্থনীতি ক্রমশ পঙ্গুত্ব লাভ, মদমত্ত শিল্প সভ্যতার আবির্ভাব তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। এই মধ্যস্বত্ব শ্রেণী ইংরেজদের তোষণ-প্রাপ্ত হয়ে সমাজের সব সুযোগ সুবিধা, অবাধে শোষণ করেছেন। ফলে গ্রামীণ সমাজ জীবনে যে বন্ধন ছিল তা ভেঙে পড়েছে। যৌথ পারিবারিক প্রথার উপর চরম আঘাত আসে। গ্রামে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবর্তে সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতা। সমষ্টিগত গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে উদ্ভব হয় স্বাতন্ত্র্যবাদ—**"The collective life of the village gave way to individualism."** (৪০)

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কৃষি-সঙ্কট, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক চাপ ইত্যাদি কারণে ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগীরা অসন্তুষ্ট হন। তারাশঙ্করদের মত এই রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী শ্রেণী ইংরেজদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হন। সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হওয়ায় নিজেদের অস্তিত্ব, অর্থাগমের পথ রুদ্ধ হবার উপক্রম হল। নিজেদের অসহায় মনে করে এঁরাই প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে উৎসাহী হন এবং প্রগতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি উন্নাসিকতা প্রদর্শন করে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত হন ও তাঁদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাব জাগে।

১৭৯৩ খ্রী: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ- নয়া জমিদার (ব্যবসায়ী শহরের)

↓

মধ্যস্বত্ব শ্রেণী — পত্তনিদার

↓ ↓

দর-পত্তনিদার

↓

সে-পত্তনিদার।

ব্যবসায়ী শ্রেণী

তারাশঙ্করের অনেক গল্প রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী বিদ্যমান। কখনও গল্পের প্রধান চরিত্রে, কখনও পার্শ্ব চরিত্রে অবস্থান করেছেন তাঁরা এবং গল্পের মোক্ষপ্রাপ্তিতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নীচে ব্যবসায়ী - সংশ্লিষ্ট গল্পগুলির নাম চরিত্র, ব্যবসার প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা ছকাকারে দেখানো যেতে পারে ঃ—

গল্পের নাম ও প্রকাশকাল	চরিত্র/স্থান	প্রকৃতি	গুরুত্ব
১। উল্কা ১৩৩৪সাল আশ্বিন	অনাথবন্ধু গাঙ্গুলী কলকাতা	বিরাট ব্যবসা/কোন ব্যবসা তার উল্লেখ নেই।	ব্যবসায়ী হলেও ভালোমানুষ/জ্ঞানী গুণীদের মর্যাদা দেন
	মিঃ ল্যাম্বার্ট	দালালগিরি।	গৌণ
২। আলো আঁধারি ১৩৩৯ বৈশাখ	হরিশবাবু ও অঁর পুত্র পরেশ	বিরাট ব্যবসায়ী/উপকরণের উল্লেখ নেই	গৌণ
৩। পুরোহিত ১৩৪১ বৈশাখ	বিমল রায় কলকাতা	কয়লার ব্যবসা/গ্রামে ৫০০ টাকা আয়ের জমিদারী আছে	উপপ্রধান চরিত্র/লোভী, উগ্র, অর্বাচীন।
৪। এ্যাও ১৩৪১ বৈশাখ	সুধীরবাবু/বালিগঞ্জ কলকাতা	কনট্রাকটর/ইঞ্জিনিয়ার রুরকী কলেজ থেকে পাশ করা	শ্বশুর জামাই মিলে ব্যবসা।
৫। জলসাঘর ১৩৪১ বৈশাখ	মহিম গাঙ্গুলী/গ্রাম	নব্যব্যবসায়ী/ব্যবসার উল্লেখ নেই।	মূল ঘটনার পরিসমাপ্তিতে এবং একটা কালের পতন ও অন্য কালের আগমনের আহ্বায়ক।
৬। হোলি ১৩৪৪ চৈত্র	কানাই মুখুজ্জে/গ্রাম	কয়লাখনির মালিক, পরে নরহত্যার দায়ে নিঃস্ব হয়ে যান। দালালগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।	অর্থের অহংকারে উত্তমর্ণকে গুলি করেন। বর্তমানে ভালো মানুষ।
৭। সুখনীড় ১৩৪৬ আশ্বিন	হরেন্দ্র/রেঙ্গুন	পাচক, ফেরিওয়ালা, দোকানদার, কয়লার ডিপো, কাঠের গোলা, পুরাতন লৌহলক্কর ইত্যাদি ব্যবসা করেছে বর্তমানে বিরাট ব্যবসায়ী।	ব্যাভিচারী জীবনযাপনে অভ্যস্ত
৮। তৃষ্ণা ১৩৫২ সাল	অমর/কলকাতা	বিরাট ব্যবসা/কোন ব্যবসা তার উল্লেখ নেই।	গৌণ
৯। মানুষের মন ১৩৬৫	ভবেন্দ্র/শহর	স্বদেশী করলেও পরে কনট্রাক্টর ও ধনী হন	প্রধান চরিত্র (নায়ক) আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে চরিত্রহনন করেছেন।
১০। চিনু মন্ডলের কালাচাঁদ ১৩৭১ সাল	নিত্য গোপাল (ঘোষ) মন্ডল/শহর বর্ধমান	বিরাট কনট্রাক্টর/ময়ূরাক্ষী ব্যারেজ ও ডি ভি সি তে কাজ করেছে/বর্তমানে কর্মরত।	গৌণ
১১। এক পশলা বৃষ্টি ১৩৭৫	চন্দ্র চৌধুরী/গ্রাম	কনট্রাক্টর	অর্থের অহংকারে অন্ধ হয়ে চরিত্র হনন করেছে।
১২। ময়দানব ১৩৫০	মালিকবাবু/নাম পদবী নেই। শহরে থাকেন	ফায়ার ব্রিক্স, ফায়ার ক্লে কলিয়ারীর মালিক।	স্বার্থপর মালিক পুত্র দায়িত্ব নেবার পরই ফণীর চাকরী নষ্ট করেছেন ফলে ফণীর জীবনের যবনিকা ঘটেছে।

১৩। ছলনাময়ী ১৩৪০ মাঘ	১। অমিয়বাবুর শ্বশুর ২। অমিয়বাবু/কলকাতা	কালিয়ারীর মালিক। প্রথমে কলিয়ারীর ম্যানেজার পরে কলকাতায় বিরাট ব্যবসায়ী	গৌণ
১৪। মূহুর্ত ১৩৪১	কালীবাবু	মেসের মালিক	গৌণ
১৫। মন্বন্তরবিষ ১৩৪২ মাঘ	সোমনাথ রায়/বিহার	প্রথমে চাকরী পরে কালুবাথানে লোহার কারখানা তৈরী করেন।	গৌণ
১৬। খাজাঞ্চিবাবু ১৩৪২	কোম্পানী/কলকাতা	কোম্পানীর ফায়ার ব্রিক্স কারখানা কলিয়ারী অঞ্চলে আছে।	গৌণ
১৭। আধলা ও পয়সা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ	ভুলু দত্ত/গ্রাম	মহাজন ও ব্যবসায়ী	অত্যন্ত কৃপণ/ধনী হবার বাসনা প্রবল পিতৃহীন
১৮। শিবানীর অদৃষ্ট ১৩৭৫	স্বর্ণকার/নাম নেই গ্রাম	সোনার বাট বিক্রির দায়ে জেল হয়	হওয়ার জন্যেই শিবানীকে পরিচারিকার কাজ নিতে হয়। জীবনে গভীর বেদনা বহ দুঃখ ঘনিয়ে আসে।
১৯। শেষ কথা ১৩৫১ আশ্বিন	জমিদার/ব্যবসায়ী	দোকান/কলকারখানা	গৌণ

জলসাঘর ঃ- এই গল্পের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। এই অঞ্চলে তিনি "রায় হুজুর"। এই সম্বোধন নব্য ধনী মহিম গাঙ্গুলী সহ্য করতে পারেনি। তাই মহিম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, "মরা পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে আমায়।" গাঙ্গুলীরা পুরুষানুক্রমে রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনী করেছে, রায়বাবুদের 'হুজুর' বলছে। অথচ কাঁচা পয়সার আমদানীতে অন্ধ হয়ে অতীতকে ভুলে গেছে, অবজ্ঞা করেছে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারকে । এমনকি বাঈজী পাঠিয়ে অন্তিম আঘাত হেনেছে। জলসাঘরে বাঈজীর নাচে মত্ত হয়ে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ভুলে মহিম জঘণ্য ব্যবহার করেছে। বনেদিয়ানা ও আধুনিকতার লড়াইয়ে অবশ্য ঐতিহ্যহীন আধুনিকতারই জয় হয়েছে।

মানুষের মন ঃ ভবেন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে স্বাধীনতার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে যোগ দেন। উপার্জন হীন বলে ধনীর কন্যা স্ত্রীর সঙ্গে বচসা ও গৃহত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে এক মিলিটারী অফিসারের দৌলতে কনট্রাক্টর হয়ে বাড়ী, গাড়ি, নগদ অর্থের মালিক হন। পূর্ব জীবনের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে যান। স্ত্রী সুভাষিণী স্বামীকে ধনী দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদর্শ বিকিয়ে মদ্যপ হয়ে নয়। ভবেন্দ্র গ্রামে ফেরেন। সুভাষিণী যখন শোনেন যে তাঁর স্বামী মাতাল তখন সুভাষিণী বর্তমান ভবেন্দ্রকে মৃত ভেবে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে সুভাষিণী স্বামীর ফটোর দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "শেষে প্রেতমূর্তি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ? তারপর সহাস্য তিরস্কার করলে ছিছি!"

একপশলা বৃষ্টি ঃ- চন্দ্র চৌধুরী "তো মুখ্যু লোক, আগে বাবুদের বাড়ী ইমারতের কাজ দেখতো। হঠাৎ যুদ্ধের সময় কিছু টাকা নিয়ে ওই" সময় সরকারী দু-চারটে ছোট কাজ করতে করতে সাহেবদের সুনজরে পড়ে গেলেন, "বাইসিকিল ছেড়ে ভট্‌ভটে আওয়াজ করা দু-চাকার গাড়ী কিনলে চন্দ্র চৌধুরী।" যুদ্ধের দৌলতে বেশ ধনী হলেও যে বছর সের ও আনির হিসেব উঠে গিয়ে কেজি ও পয়সার হিসেব চালু হয় সে বছরে চৌধুরী ব্যবসায় ফেল পড়ে, এবং ভীষণ অসুখে অর্থাভাবে মৃত্যু বরণ করেন। চরিত্রহীন মাতাল চন্দ্র জয়াকে কাছে রাখেন। জয়াকে তিনি ভালবাসেন। বাউরীর কন্যা হলেও চন্দ্র চৌধুরী বলতেন, "আমি চৌধুরী, তুই চৌধুরাণী,"। অর্থ উপার্জন করলেও কোনব্যক্তি যদি মাতাল, চরিত্রহীন হন তাহলে তাঁর অর্জিত অর্থ অচিরেই নাশ হয়ে যায়। সমাজে এ ধরণের চরিত্র অভিপ্রেত নয়।

ময়দানব ঃ- পুঁজিবাদের ব্যাপক প্রসার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ক্রমশঃ মানুষকে বড়বেশী কৃত্রিম করে তুলেছে, হৃদয় হয়েছে পাষাণ, নির্মম। অর্থের প্রাচুর্যে মালিকপক্ষ অনায়াসে বিস্মৃত হন শ্রমিকদের ন্যায়, নিষ্ঠা, দায়িত্বের কথা। যন্ত্র যখন শোষণের হাতিয়ার হয়নি, তখন প্রথম মালিক ফণী মিস্ত্রীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বকশিস দিয়েছেন, ফণীও জীবন দিয়ে কারখানাকে ভালবেসেছে। তারপর মালিক পুত্রের হাতে কারখানা গেলে বৈদ্যুতিক যন্ত্র এসেছে; তাই কৌশলে মালিক

ফণীকে বিতাড়িত করেছেন। দানব যন্ত্র যেমন বৃদ্ধ ফণীকে গ্রাস করেছে লোহার দাঁতে, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় মালিক বৃদ্ধফণীর সারাজীবনের নিঃস্বার্থ কর্মের কোন মূল্য বা মর্যাদা দেন নি। নিঙড়ে পিষে খোসা সার করে ফণীকে নিক্ষেপ করেছে দুর্ভাগ্যের গাঢ় অন্ধকারে। এই পর্যায়ে "খাজাঞ্চিবাবু" গল্পটিতে বদিবাবু চরিত্রটি স্মরণ করা যেতে পারে।

ছলনাময়ী ঃ- অমিয় বাবুর শ্বশুরের কয়লাখনি আছে, প্রাচীন ধনী। কিন্তু অমিয়বাবু বালীগঞ্জে পরে বিরাট ব্যবসা শুরু করেন। ধনী হন কিন্তু ধনী হওয়ার পেছনে কোন কারণের ইঙ্গিত নেই বা কোন ব্যবসা করেন তারও উল্লেখ নেই।

মন্থরবিষ ঃ সোমনাথ বাংলার ছেলে। তিনি বিহারে চাকরী করতে যান এবং সেখানে স্বাধীন প্রেমের বিবাহ করেন। পরে লোহার কারখানা গড়ে তোলেন বিহারের কালুবাথানে। উচ্চাকাঙ্খী, বিরাট ধনী ও বিশাল কারখানার মালিক হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর।

শেষকথা ঃ- ব্যবসার মাধ্যমে পুঁজিবাদের আগমন ঘটলে এদেশের বেশ কিছু জমিদার ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তখন জমি অপেক্ষা ব্যবসা হয় প্রিয়। তাই সাউ জমিদারগণ দোকান, কারখানা করে ব্যবসায়ী হয়েছেন। ফলে সাউদের যখন অন্য জমিদারের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ফৌজদারী মামলা বাধে তখন প্রজাদের অবস্থা হয় "ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলু ঘাসের মত।" কাঁচা পয়সার লোভে জমিদারগণ কারবারে যত্নশীল হয়েছেন— জমি বা প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা বা কর্তব্য পালন করেন নি।

মহাজনশ্রেণী

প্রাক বৃটিশ মহাজনদের ঋণদানের ভূমিকা স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু জমিদারী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার পর এই মহাজন গোষ্ঠী সমাজে দ্বৈত ভূমিকায় আবির্ভাব হন। একদিকে ঋণদান অন্যদিকে একচেটিয়া শস্যের ব্যবসায়ী, অন্যদিকে জমি নীলাম, বন্ধক, বিক্রি করার আইন স্বীকৃত হবার পর মহাজনেরা কৃষকদের সাহায্যকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এবং অত্যাধিক সুদ আদায় করতে থাকেন। প্রদেয় অর্থ ও সুদ আদায়ের জন্যে প্রজাদের জমি ক্রোক, নীলাম করতে থাকেন। এই লাভজনক ব্যবসায় গ্রামবাসীদেরও উৎসাহী হতে দেখা যায়। "নূতন বৃটিশ শাসনে ঋণের দায়ে ঋণগ্রস্তের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকায় ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি-জমা মহাজনদের গ্রাসে পতিত হইতে থাকে। .....মহাজন গোষ্ঠীরা এক নূতন প্রকারের ভূস্বামী শ্রেণীতে পরিণত হয়।" [৪১] "পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি, মাংস। পয়সার জন্য ইহারা করতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই। " [৪২] "ভারতীয় সমাজে মহাজন আর ঋণ কোন নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণের এবং বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনের ভূমিকা এক নূতন রূপ ও নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছে।" [৪৩]

গুপ্তযুগে মহাজনের সঠিক চিত্র পাওয়া না গেলেও গুপ্ত - পরবর্তী যুগে মহাজনদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের মতো তদানীন্তন যুগে মহাজনী অত্যাচার এমন নিষ্ঠুর ও হিংসাপরায়ণ ছিল না। ভরদ্বাজ তাঁর ধর্মকোষে মহাজনদের উল্লেখ করেছেন—"যদি অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হয় তাহলে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণশোধ করা যেতে পারে এবং সেই সম্পত্তির মধ্যে জমি, খেত, বাগান, বাড়ী সমস্তই অন্তর্ভুক্ত।" [৪৪] তাহলে এই সময়েও জমি বিক্রয় বা বন্ধকের উল্লেখ পাওয়া যায়।

" ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম সমাজে কৃষকেরা বিচাচরিত প্রথা অনুসারে কেবলমাত্র জমিচাষের অধিকার ভোগ করত, কৃষিজমি হস্তান্তরের অধিকার তাদের ছিল না।" [৪৫] তাই মহাজনদের ভূমিকা বা তাদের এত বারবাড়ন্ত হয় নি। জমি হস্তান্তর হত না বলে মহাজনের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় নি তেমন গ্রামে রক্তাক্ত শকট চলেনি। এরপর আসে ইংরেজ শাসন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা জমিকে ব্যক্তিগত মালিকানা দান করে কৃষকদের জমি, ঘর, সব বিক্রির একটা সুবন্দোবস্ত করে। " ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী একদিকে কৃষক জমির উপর কৃষকের পূর্ণব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে উহা দান, বিক্রয় বা বন্ধক রাখিবার এবং অন্যান্য সকল প্রকারে উহা হস্তান্তরের অধিকার দান করে। অপরদিকে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাদ্বারা রাজস্ব দিবার নিয়মের প্রবর্তন করে। এইভাবে কৃষকের জমি 'মহাজন' নামক এক নূতন শোষকের গ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রস্তুত করা হয়"। [৪৬] তারপর থেকে মহাজনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমিকা অত্যন্ত নগ্ন আকার ধারণ করে; জীবন্ত জহ্লাদসম সমাজ জীবনে আবির্ভূত হয়। ইংরেজগণ উপলব্ধি করেছিল যে মহাজন ও জমিদার শ্রেণীই হল তাদের শোষনের একমাত্র নিরাপদ হাতিয়ার এবং এদের মধ্যস্থতায় এদেশে নিজেদের আখের গোছানোর পথ সুপ্রশস্থ হবে। "মহাজনই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মহাজনী মূলধনের সমগ্র শোষণচক্রের একটি অপরিহার্য মূলদন্ড স্বরূপ।" [৪৭]

তারাশঙ্কর লাভপুরে মহাজনদের অনেক কুকীর্তি স্বচক্ষে দেখেছেন। জমিদারদের মধ্যেও অনেকে মহাজনীকারবার জাঁকিয়ে করেছেন। মহাজনদের মধ্যে অনেকে জমিদার, বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছেন। "জলসাঘর" এর মহিম গাঙ্গুলীরা পুরুষপরম্পরায় মহাজনী করে বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। তারাশঙ্করের অনেক গল্প আছে যেখানে মহাজনগণ বিচিত্র লীলায় লীলায়িত। মহাজনদের মধ্যে কেউ কেউ দোকান খুলেছে। দোকানের মাধ্যমে নিরক্ষর প্রজাদের বেশ ঠকানো যায়, কেউ আবার জমির লোভে মদের দোকান খুলেছে, সমাজে মাতাল তৈরী করে দেয় অনেককে। কেউ অসহায় দরিদ্র সংসারের অসুস্থ ছেলেকে ডাক্তার দেখানোর সামান্য দু'টাকা কেড়ে নিয়েছে। কেউ আবার নিজের বিধবা ভাগ্নীকে অনাথা ভেবেও তার শেষ সম্বল সোনার পোঁটলা নির্লজ্জের মতো হাত পেতে নিয়েছে। কাউকে দেখা যায় সরল মাষ্টার মশাইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর সবচেয়ে ভালো জমিটা কিনে নিয়েছে কিংবা ডাকাতদের কাছে থেকে কমপয়সায় চোরাই মাল কিনেছে; ধর্মে বৈষ্ণব হয়েও মহাজনী কারবার করেছে। মারোয়াড়ী এখানে জাঁকিয়ে উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে মহাজনী কারবার করেছে।

মহাজন - সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে—

	গল্প/প্রকাশন	পাত্র/বৃত্তি	গুরুত্ব
১।	স্রোতের কুটো ১৩৩৪ আষাঢ়	রায়মশাই / মহাজন	পার্শ্বচরিত্র/গৌণ
২।	চোখের ভুল ১৩৩৫ ভাদ্র	গোকুল মোড়ল / তেজারতি	পার্শ্বচরিত্র হলেও Tragic রসমোক্ষনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।
৩।	শ্মশানের পথে ১৩৩৫ আশ্বিন	১। রসিক দত্ত / মহাজন ২। কাবুলীওয়ালা / দাদনী কারবার	উভয়েই গৌণ চরিত্র
৪।	শ্মশান বৈরাগ্য ১৩৪০ আশ্বিন.	মহিম বাঁড়ুজ্জে / মহাজন কুসীদজীবী	প্রধান চরিত্র। অর্থ মানুষের কি বিরাট পরিবর্তন করতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহিম বাঁড়ুজ্জে।।
৫।	মহামারী ১৩৪১ বাসন্তী সংখ্যা	বেঁটে দত্ত / দোকানদার	পার্শ্বচরিত্র।
৬।	মধুমাষ্টার ১৩৪০ অগ্রহায়ণ	হরিশ সাহা / মহাজন	সরল, ভালোমানুষ মধুমাষ্টারের শেষ সম্বল ২বিঘা উর্বর জমিটি কিনে নেয়। সুবিধাবাদী।
৭।	সুরতহাল রিপোর্ট ১৩৫০	হরেরাম পোদ্দার-মহাজন	গৌণ। ডাকাতের চোরাইমাল কিনত। একবার জেলেও যায়।
৮।	বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১৩৫৮ আশ্বিন	১। গাঙ্গুলী মশাই / মহাজন ২। গোবিন্দ গোঁসাই / মহাজন	গৌণ। বৈষ্ণব অথচ মহাজনী কারবার করেন।
৯।	এ্যাও ১৩৪১ বৈশাখ	ধনপতিবাবু-মহাজন	সহকারী চরিত্র। জামাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করেন।
১০।	চন্ডীরায়ের সন্যাস ১৩৪৩ শারদীয়া দেশ	গিরীশ সাহা / মহাজন মদের দোকানদার - জমি কেনে	গৌণ। তথাপি গল্পের পট পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।
১১।	একপশলা বৃষ্টি ১৩৭৫	সাধু খাঁ, দে, চাটুজ্জে তিনজনেই আড়তদার	ধান, চাল এর গদি আছে। সেজ দে চরিত্রহীন।
১২।	মহুরবিষ ১৩৪২-মাঘ	মারোয়াড়ী-কুসীদজীবী।	উচ্চ হারে সুদের কারবার

চোখের ভুল ঃ- গোকুল মোড়ল দু' দশ টাকার তেজারতি করে। গাঁয়ের মাতব্বর। বাবা ছিলেন ছিরাম মোড়ল। গোকুলের কীর্তনগানে অত্যন্ত সখ। প্রায়ই গান গায়। কিন্তু বিশু মোড়লের বিধবা কন্যা উমার প্রতি তার কুদৃষ্টি ছিল। গোকুল শঠ, প্রবঞ্চক, চরিত্রভ্রষ্ট। নিজে একদিন কুমতলবে উমার বাড়ীতে যায়। উমার চিৎকারে এক সন্যাসী হাজির হলে গোকুল তাকেই ধরে চিৎকার করে গ্রামবাসীদের ডেকে নিরীহ নির্দোষ সন্যাসীকে প্রহার দেওয়ায়।

শ্মশানের পথে ঃ- দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত গ্রাম; কঙ্কালসার মানুষগুলো। "যেন মৃতের রাজ্য বলিয়া ভ্রম হয়।" অথচ সেখানেও মহাজন, কাবুলীওয়ালার দাদনী কারবার জাঁকিয়ে বসেছে। জমিদারের পেয়াদাও ভয়াল-বিভীষণ রূপে ধ্বংস কামনায় উদ্যত। দরিদ্র পরিবারের কর্তা গোষ্টমোড়ল। বাবার আমলে অবস্থা ভালই ছিল কিন্তু গ্রাম্য শাসনে আর শোষণে দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁচেছে। শুধু গোষ্ঠ একা নয়। গ্রামের সুশ্রী আজ নেই। "থাকিবে কি করিয়া? পল্লীর শ্রী-ই যে গিয়াছে। মূল মারলে ফুল বাঁচিবে কি করিয়া?" তাই দাদন শোধ করতে না পারায় কাবুলীওয়ালা শকুনের মত গোষ্ঠর স্ত্রী দামিনীকে বলে, "তব তুম্ আসো, তুমকো লিয়ে যাবে।" মৃত কঙ্কালসার পরিবারটার উপর শকুনি, গৃধিনীর মত রসিক দত্ত মহাজনের আবির্ভাব। অসুস্থ মৃতপ্রায় ছেলেটাকে কবিরাজ দেখানোর জন্যে ধার করা দু' টাকাও দুর্বৃত্ত মহাজন গ্রাস করেছে। শ্মশানের কুকুরগুলো যেমন মৃতদেহের চারদিক ঘিরে ধরে, তেমনি মহাজন, কুসীদজীবী, কাবুলীওয়ালার দল গ্রামকে গ্রাম এভাবেই গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তারাশঙ্কর দেশ সেবার কাজে নানাগ্রামে ঘুরেছেন এবং এইসব অত্যাচার শোষণের জীবন্ত ও বাস্তব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন।

শ্মশানবৈরাগ্য ঃ- অর্থই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সুদখোর মহিম বাঁড়ুজ্জের। " টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না, টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে।" এই মন্ত্র ছিল তাঁর তাই মহাজনী কারবারে " কয়েক বৎসরেই চারিপাশে দশক্রোশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বাঁড়ুজ্জের কাছে ছিপে গাঁথা মাছের মতো আটকাইয়া গেল।" ইনকামট্যাক্স অপিসের শমনের তাড়নায় দূরসম্পর্কীয় দিদির বাড়ীতে আশ্রয় নেয় সে। বিধবা দিদির ঘাড়ে পা দিয়ে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় গ্রহণ করে বিনিময়ে দিদির অভাবের সংসারে এক পয়সাও সাহায্য করে না। দিদির অসুখে দিদিরই দেওয়া টাকা থেকে অর্ধেক আত্মসাৎ করে ডাক্তারকে ফি বাবদ দিয়েছে। দিদির মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন করেছে; পুরোহিতকে বলেছে, "টাকা বিষয়, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, কিছুই না, কিছুই সঙ্গে যায় না।" অথচ চশমখোর, মহিম শ্রাদ্ধের কয়েকদিন বাদেই শ্রাদ্ধের খরচ প্রায় সাড়ে পাঁচশো টাকার জন্যে হাহুতাশ করেছে, এমনকি বিধবা ভাগ্নীর দেওয়া গয়নার পুঁটলীটা রক্ত চোষা ভাম্পায়ারের মত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করেছে। অভ্যাস মানুষকে কেমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পটি। সংসারে একা মহিম, অথচ তার চাহিদার অন্ত নেই, "অভ্যাসই যে মানুষের অলঙ্ঘ্য স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, এই মানব সত্যেরই শিল্পরূপ শ্মশান বৈরাগ্য।" [৫৮]

স্রোতের কুটো ঃ- রায়মশাই জমি কেনে। সুবিধাবাদী।

মহামারী ঃ- দুর্ভিক্ষ, কলেরায় গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। দোকানদার সুদখোর বেঁটে দত্ত সেই দুঃসময়ে কাউকে বাকীতে দ্রব্য সামগ্রী দিতে রাজী নয় কারণ যদি এই মহামারীতে অধমর্ণের মৃত্যু হয়। "বেঁটে দত্ত দোকান-দানী খুলিয়া নীরবে বসিয়া আছে। একটি মাত্র খরিদ্দার দাঁড়াইয়াছিল। দত্ত বলিতেছিল, দোকান আমি বন্ধ করে দিয়েছি বাপু। ধার তো দোবই না আর যা দিয়েছি—তারই জন্যে মাথায় মাথায় ভাবছি, ধর তাদেরই যদি কিছু হয় ।" দোকানে মাল থাকতেও সে কাউকে দেয়নি ।

মধুমাষ্টার ঃ- সৎ-নিষ্ঠাবান শিক্ষক বই ছাপানোর জন্যে বাধ্য হয়ে জমি বিক্রি করেছেন। হরিশ সাহা কৌশলে শিক্ষক মশাইয়ের শেষ সম্বল উৎকৃষ্ট দুই বিঘা জমিটুকুই আত্মসাৎ করেছে। এমন হরিশ সাহা গ্রাম বাংলায় বর্তমানেও শত শত রয়েছে। তারাশঙ্কর যেন অতীত ও বর্তমানের ঋজুদর্শী।

সুরতহালরিপোর্ট ঃ- হরেরাম পোদ্দার মহাজনী কারবারী। ডাকাতির চোরাই জিনিস অল্পদামে কিনত। শেষে ধরা পড়ে জেলে গিয়েছিল। চরিত্র ভ্রষ্ট, ভোলা চৌকিদার হয়ত হরেরামের কোন কুকীর্তির সংবাদ জানত যার দ্বারা হরেরামের ফাঁসি হতে পারত। তাই জেল থেকে বেরিয়ে ভোলার মৃত্যু সংবাদ শুনে হরেরাম বলে, "যাক ফাঁসি থেকে বাঁচলাম। বেঁচে থাকলে খুন করতাম।"

এ্যাও ঃ- কলকাতার মহাজন, ধনী। বর্তমানে জামাইয়ের সাথে যৌথ ব্যবসায় নেমেছে। জামাই ইঞ্জিনিয়ার। তাই জামাই আঁকেন নক্সা আর বিজ্ঞ শ্বশুর তা বাস্তবায়িত করেন।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ- চণ্ডীরায় তান্ত্রিক, নেশাগ্রস্ত। এই নেশার সুযোগ নিয়ে গিরীশ সাহা নিজের দোকান থেকে মদ খাইয়ে চণ্ডীরায়ের প্রায় সমস্ত জমিই আত্মসাৎ করেছে। গিরীশ মহাজনী কারবারেও সিদ্ধ হস্ত। এই সম্প্রদায়ের চরিত্র যে কত নীচ, জঘন্য হতে পারে, কত নির্মম, নির্দয় হতে পারে তার সুন্দর সংকেত দিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। " নতমুখে গোটা কয়েক পিঁপড়ে টিপিয়া টিপিয়া মারিয়া গিরীশ আবার বলিল, তবে না হয় এক কাজ করুন কত্তা, 'দলদলির' জোলের ওই পনের কাঠা জমিটা আমাকে দিয়ে দেন। আমার জমির পাশেই বটে, ওতেই না হয় আমি সেরে নেব।" এখানে গিরীশের নির্দয়ভাবে পিঁপড়ে মারার সংকেতে মহাজন সম্প্রদায় পিঁপড়ের মতই অজস্র নিরীহ প্রাণ যে নাশ করে থাকে তা লেখক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঃ- হিন্দুদের কাছে যে কোন বিগ্রহ শ্রদ্ধার সামগ্রী এবং সেবার যোগ্য। "বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা" গল্পের মহাজন গাঙ্গুলী টাকার লোভে এতই মোহান্ধ ও বাস্তবজ্ঞান রহিত হয়েছিল যার জন্যে তিনি বিগ্রহ বন্ধক রাখেন। এই বন্ধক রাখার উদ্দেশ্য ছিল যে অধমর্ণ টাকা পরিশোধ করবেই কারণ বিগ্রহের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তি ইত্যাদি থাকে। গাঙ্গুলীর এই অভিনব লালসার চিত্র বাংলা গল্প সাহিত্যে বিরল।

এক পশলা বৃষ্টি ঃ- চাটুজ্জে, রায়, ঘোষ, সাধু খাঁ, দে—এঁরা সকলেই এককালে জমিদার ছিলেন, বর্তমানে জমিদারী না থাকলেও অনেক জমি-জমা আছে। চাটুজ্জে, দে, সাধু খাঁ—এঁদের ধান ও চালের গদি আছে। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দিনে চাল যখন ৭/৮ টাকা মন তখন এই আড়তদারবাবুগণ চাল ও ধান গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দু'টাকা বারো আনা কেজি বিক্রি করে। এদের চরিত্রও ভালো নয়। জয়া বাউরী দরিদ্র হলেও শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকায় "সেজ দে এখনও তাকে ডাকে।"

৪ বিভিন্নবৃত্তি/ পেশাভোগী শ্রেণী

তারাশঙ্কর পল্লীবাংলার কথাকোবিদ। বিভিন্ন বৃত্তিভোগী মানুষের পরিচয় মেলে তাঁর বিভিন্ন গল্পে। লেখক কখনও রাজনীতির কাজে বা নিজ জমিদারীর স্বার্থে, কখনও বা গ্রামের দুরবস্থা বা মহামারী দূরীকরণের কাজে রাঢ় বাংলার পথে, ঘাটে প্রত্যন্ত গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাছাড়া তিনি প্রায়ই কাটোয়া হয়ে কলকাতায় আসতেন। ফলে বিভিন্ন স্টেশনের নানা পেশা ভোগী মানুষের খুব কাছে এসেছেন ও দেখেছেন। তাদের জীবনের বিচিত্রলীলাই তারাশঙ্করের গল্পের মূল কান্ত। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী থেকেই এদের আগমন, কখনও এরা প্রধান ভূমিকায় কখনও বা পার্শ্বচরিত্রে অবতীর্ণ। বাউন্ডুলে থেকে শুরু করে স্থায়ী-হিসেবীদের ভিড় জমেছে গল্পে। এসেছে শ্রমজীবী, ব্রাত্য, যাযাবরের দল। মোটামুটি কে কোন পেশাভোগী হয়ে কোন গল্পে বিধৃত রয়েছে-তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ—

পেশা	গল্প	পেশা	গল্প
১। পন্ডিত মশাই	১) পন্ডিত মশাই	৪। গৃহভৃত্য/ঝি	১)আলো-আঁধারি।
	২) পিতাপুত্র		২) জলসাঘর
	৩) হরিপন্ডিতের কাহিনী		৩) পুত্রেষ্ঠী
	৪) গোপাল বাঁধের ইতিকথা		৪) সমুদ্র-মন্থন
			৫) হোলি
	১) প্রতিধ্বনি		৬) বন্দিনী কমলা
২। অধ্যাপক	২) সুখনীড়		৭) সনাতন
	৩) দীপার প্রেম		৮) মরামাটি
	৪) শিবানীর অদৃষ্ট		৯) সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার
৩। শিক্ষক	১) মধুমাস্টার		১০) জায়া
	২) পদ্ম বৌ		১১) শিবানীর অদৃষ্ট
	৩) নুটু মোক্তারের সওয়াল	৫। উকিল	১) খড়্গ
	৪) ইতিহাস		২) আলো-আঁধারি
	৫) রাণুর বিবাহ		৩) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
	৬) যাদুকরী		৪) মহুরবিষ
	৭) দেবতার ব্যাধি		৫) নুটু মোক্তারের সওয়াল
	৮) সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার		৬) ইতিহাস
	৯) হেড মাষ্টার		৭) রাণুর বিবাহ
	১০) কালোমেয়ে		৮) শ্যামাদাসের মৃত্যু
	১১) জগন্নাথের রথ		৯) প্রহ্লাদের কালী
	১২) শিবানীর অদৃষ্ট		

৬।	পোষ্টমাস্টার	১) রঙীন চশমা ২) ডাক-হরকরা
৭।	সাহিত্যিক	১) জায়া ২) কান্না ৩) কয়েক ফোঁটা রক্ত ৪) অভিনয় ৫) ভুলোর ছলনা
৯।	পুলিশের গ্রাম্য গোয়েন্দা	১) বোবাকান্না ২) প্রত্যাখ্যান
১০।	সন্ন্যাসী	১) আলো-আঁধারি ২) ট্যারা ৩) একরাত্রি ৪) পাটনী ৫) আলোকাভিসার ৬) সাপুড়ের গল্প ৭) এ মেয়ে কেমন মেয়ে
১১।	গণিকা/বাঈজী	১) মেলা ২) নারী ৩) মুহূর্ত ৪) আলো-আঁধারি ৫) জলসাঘর ৬) মুকুন্দের মজলিস
১২।	গায়ক	১) কবি ২) তমসা ৩) কয়েকফোঁটা রক্ত
১৩।	বাউন্ডুলে	১) সন্ধ্যামণি ২) বাউল
১৪।	ড্রাইভার	১) ইস্কাপন ২) আখরী ৩) বিস্ফোরণ ৪) এ্যাকসিডেন্ট
১৫।	লাঠিয়াল	১) রায়বাড়ি ২) ব্যাঘ্রচর্ম ৩) মতিলাল
১৬।	এল, আই, সি এজেন্ট	১) ভ্রমন কাহিনী ২) আধলা-পয়সা
৮।	ডাক্তার — নেটিভ	১) শ্মশানের পথে ২) শ্রীনাথ ডাক্তার ৩) শাপমোচন ৪) সনাতন ৫) বোবাকান্না
	ডাক্তার — পাশকরা	১) পদ্মবৌ ২) ইতিহাস ৩) বোবাকান্না ৪) তৃষ্ণা ৫) যাদুকরীর মৃত্যু ৬) নারী ৭) ডাইনীর বাঁশি
১৭।	স্বদেশী	১) মা ২) মানুষের মন ৩) প্রত্যাখ্যান ৪) গোপাল বাঁধের ইতিকথা
১৮।	পটুয়া/বাজিকর/মূর্তি শিল্পী	১) প্রতিমা ২) রাঙাদিদি ৩) বেদেনী ৪) পিঞ্জর ৫) যাদুকরী ৬) কামধেনু
১৯)	স্যাকড়া	১) পিতাপুত্র ২) বিষপাথর ৩) পুরোহিত ৪) শিবানীর অদৃষ্ট
২০।	ম্যাজিস্ট্রেট/D.S.P.	১) পিতাপুত্র ২) ভুলোর ছলনা ৩) আখড়াইয়ের দীঘি
২১।	স্টেশন মাস্টার/গার্ড	১) চরহাটির স্টেশন মাস্টার ২) গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী ৩) তমসা
২২।	ডাইনী	১) ডাইনীর বাঁশি ২) ডাইনী
২৩।	ওস্তাদ/গুণীন	১) ডাইনীর বাঁশি ২) বাউল ৩) নারী ও নাগিনী ৪) ডাইনী ৫) যাদুকরীর মৃত্যু

২৪।	কাবুলীওয়ালা	শ্মশানের পথে
২৫।	দোকানদার	১) সন্ধ্যামণি ২) মেলা ৩) পুরোহিত ৪) চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ৫) অগ্রদানী ৬) মহামারী ৭) রাজপুত্র ৮) দিল্লীকা লাড্ডু ৯) আখেরী ১০) দেবতার ব্যাধি ১১) জুয়াড়ী ১২) শঙ্করীতলার জঙ্গলে ১৩) আধলা ও পয়সা
২৬।	ঘটক	১) রাখাল বাঁড়ুজ্জে ২) সন্তান
২৭।	বাউল	১) রাইকমল ২) ডাইনীর বাঁশি ৩) বাউল ৪) কলকাতার দাঙ্গা ও আমি
২৮।	পুরোহিত	১) পুরোহিত ২) পঞ্চরুদ্র ৩) একরাত্রি ৪) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
২৯।	ধর্মশালার নোকর	১) ভ্রমণ কাহিনী ২) বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাহিনী
৩০।	ফেরিওয়ালা	১) মেলা
৩১।	জ্যোতিষী	১) উল্কা ২) মরামাটি
৩২।	ছবি আঁকা/বাঁধানো	১) আধলা ও পয়সা ২) শাপমোচন ৩) একটি মুহূর্ত ৪) রাঙাদিদি
৩৩।	ডাকাতি	১) স্রোতের কুটো ২) আখড়াইয়ের দীঘি ৩) যাদুকরী ৪) প্রহ্লাদের কালী
৩৪।	বাজীওয়ালা	১) মালাকার ২) আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি
		৩) যাদুকরী
৩৫।	কলাকার	রূপসী বিহঙ্গিনী
৩৬।	নট/নাট্যকার	১) অভিনয় ২) ঘাসের ফুল ৩) কলাকসরৎ ৪) রাজপুত্র ৫) চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা ৬) একরাত্রি
৩৭।	পাইকার	১) চিনু মন্ডলের কালাচাঁদ
৩৮।	পাহারাওয়ালা/চৌকিদার	১) আলো-আঁধারি ২) টহলদার ৩) ইস্কাপন ৪) প্রতিমা ৫) চৌকিদার ৬) মালাকার ৭) সুরতহাল রিপোর্ট
৩৯।	পিওন	১) সাবিত্রী চুরি ২) হেড মাস্টার
৪০।	রাণার	১) ডাকহরকরা
৪১।	মহুরী	১) স্রোতের কুটো ২) ব্যাধি ৩) রাখালবাঁড়ুজ্জে ৪) সমুদ্রমন্থন
৪২।	পুলিশ	১) কুড়ানো ঘড়ি; ২) কুলীনের মেয়ে
৪৩।	ভিক্ষাবৃত্তি	১) রাইকমল ২) কুলীনের মেয়ে
৪৪।	যাত্রাদলের কুশীলব	১) টহলদার ২) মহামারী ৩) রাধারাণী ৪) তৃষ্ণা ৫) শেষ অভিনয়
৪৫।	দারোগা	১) ব্যাধি ২) কুড়ানো ঘড়ি ৩) চোর ৪) ময়দানব ৫) সুরতহাল রিপোর্ট ৬) দেবতার ব্যাধি

৪৬।	চুরি	১) মরুরমায়া ২) ব্যাধি ৩) টহলদার ৪) কুলীনের মেয়ে ৫) চোরের মা ৬) চোর ৭) বোবাকান্না ৮) এ মেয়ে কেমন মেয়ে
৪৭।	চন্ডাল/পাটনী	১। সন্ধামণি ২) পাটনী ৩) বোবাকান্না
৪৮।	মুচি	১) অলো আঁধারি
৪৯।	বিজ্ঞান গবেষক	১। শ্যামাদাসের মৃত্যু
৫০।	জমাদার	১) আখড়াইয়ের দীঘি ২) চরহাটির স্টেশন মাস্টার ৩) দেবতার ব্যাধি ৪) বাবুরামের বাবুয়া
৫১।	লেখক	১) রাজা, রাণী ও প্রজা ২) কলকাতার দাঙ্গা ও আমি ৩) সন্ধ্যামণি ৪) ভুলোর ছলনা ৫) ভ্রমণকাহিনী ৬) বাণীমা ৭) হোলি
৫২।	দালালগিরি	১) হোলি ২) রাখাল বাঁড়ুজ্জে
৫৩।	মাহিন্দর/কৃষাণ	১) জায়া ২) এক পশলা বৃষ্টি ৩) উত্তর কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড
৫৪।	স্টেশনের খালাসী	১) আলো আঁধারি
৫৫।	মাঝি	১) তারিণী মাঝি ২) কমল মাঝির গল্প
৫৬।	মামলাবাজ	চন্ডীরায়ের সন্ন্যাস
৫৭।	মিস্ত্রী	১) স্থলপদ্ম ২) ইমারত ৩) এক পশলা বৃষ্টি

এছাড়া অন্যান্য অসংখ্য পাত্রপাত্রী আছে যারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। উল্লেখ্য যে তারাশঙ্করের ছোটগল্প বা উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য চরিত্রের আগমন, যেন চরিত্রের চিত্রশালা। এক একটি গল্পে অনেক বর্ণের, ধর্মের, পেশার মানুষের ভিড়। অনেক গল্পে লেখক নিজেকে বিভিন্নভাবে মেলে ধরেছেন। কামার, নাপিত, ময়রা, সরকারী খনির ম্যানেজার ও কর্মচারী ইত্যাদি বহু চরিত্রের আগমন ঘটেছে তাঁর ছোটগল্পে।

তাঁর গল্পগুলি মূলতঃ জমিদার, মহাজন, মোড়ল প্রভৃতি যাঁরা শোষক, অন্যদিকে শ্রমজীবী বা কৃষিজীবী অথবা দরিদ্র জনতা—অনেক মানুষ নিয়ে তৈরী, যাদের পৃথক করে চেনা যায় না—তারা কেউই জটিল বা প্রবল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে আন্দোলিত নয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ; যেন এক একটা যৌথ সত্তা। তারাশঙ্কর যেন ভাস্করের মত পাথর খোদাই করে জীবন্ত —মূর্তি বার করে আমাদের সামনে হাজির করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলির মধ্যে থেকে তাদের বর্ণভিত্তিক ও অবস্থানভেদে স্তর বিন্যাস করে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে—

সমাজে বর্ণ ভিত্তিক স্তর বিন্যাস—গল্পে

ব্রাহ্মণ	বৈষ্ণব	সদগোপ	ডোম	হাড়ি	মুচি	জমাদার	বাউরী	সাঁওতাল	মুসলমান	বাগদী	রাজপুত	মাঝি	বেদে	অন্যান্য
৫২	১৫	৪১	৩	৪	২	১	৭	২	৪৮	৪	২	২	৩	৩৯

সমাজে অবস্থানভেদে স্তর বিন্যাস—গল্পে

জমিদার	উচ্চবিত্ত	মধ্যবিত্ত	দরিদ্র	শ্রমজীবী	শিক্ষকতা	ভিক্ষাবৃত্তি	ভবঘুরে	বেশ্যাবৃত্তি	চৌর্যবৃত্তি	অন্যান্য
১৬	৯	৪৯	৫৬	৬	৪	৪	১০	৩	৬	২৭

গ. ব্রাত্যশ্রেণী

তারাশঙ্কর লোকায়ত জীবনের কথাকার। যারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, অসহায়, দুর্ভাগা, অবক্ষয়ের শেষ সীমায় দণ্ডায়মান— তাদের চিত্রকর তারাশঙ্কর। নিম্নবিত্ত, আদিবাসী, যাযাবর, বেদে—প্রভৃতি যারা চলমান সভ্যতার আলোকস্পর্শ বঞ্চিত তাদের জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন বাস্তব ও জীবন্ত করে। এই হিসেবে সমকালীন লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য তিনি। বিভিন্ন সময়ে তারাশঙ্কর ভবঘুরের মত কখনও প্রয়োজনে আবার কখনও সমাজসেবার দিক থেকে দিগন্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত। জনসাধারণের সঙ্গে খোলাখুলি মিশেছেন এবং যা দেখেছেন তাই গল্পে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৩৯৬ - এর তারাশঙ্করের জন্মতিথিতে লাভপুরে তারাশঙ্করের ছোটছেলে অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বাবা যা দেখেন নি, বাবা তা লেখেন নি।" [৪১] হয়তো সেই জন্যেই দেখা যায় তারাশঙ্কর যখনই শহুরে জীবনের চিত্র আঁকতে গেছেন তখনই তাতে অভিজ্ঞতার অভাব বা ভাবের দৈন্য ঘটেছে।

বীরভূমের লাল কর্কশ শুষ্ক মাটির ব্রাত্য বাসিন্দারা যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ফসিলের মত ছড়িয়েছিল, যাদের খবর কেউ রাখত না বা জানতো না তারাই তারাশঙ্করের লেখনীতে বাস্তবতায় রক্তমাংসের সজীবত্ব লাভ করলো। কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, "খুঁজে পেল সে মাটিকে, সলিল অথচ মহত্বময় মাটি, খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজেয় মানুষ।" [৫০]

বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা অখ্যাত নাম না জানা মানুষগুলোকে একেবারে জীবন্ত করে গল্পে হাজির করেছেন— যেন বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, কাহার, ডাকাত, ডোম, বাগদী, সাঁওতাল, গুণীন, ওস্তাদ ইত্যাদিদের এক বিরাট মিছিল। এদের মধ্যে অনেকেই আপন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং সকলেই রুক্ষ রাঢ়ের প্রতিবেশী। যেমন কালী বাগদী (আখড়াইয়ের দীঘি), রতনহাড়ি(ব্যাঘ্রচর্ম), দীনু ডোম (ডাকহরকরা), সাপুড়ে ও তার স্ত্রী (নারী ও নাগিনী), শম্ভু বাজিকর, শম্ভু-কিষ্টো বেদে (বেদেনী), বাবাজী (বাউল), ট্যারা বাউরী (ট্যারা) প্রভৃতি অসংখ্য গল্প। " তারাশঙ্করের গল্পে উপন্যাস খুঁটিয়ে পড়লে একটা বিশেষ অঞ্চলের সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশাল জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানা যায়।" [৫১] আর এই কারণেই শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এক সাহিত্য সভায় বলেছিলেন, "বঙ্গ সরস্বতীর খাসতালুকের মন্ডল প্রজা শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।" [৫২]

রাঢ়ের চৌহদ্দীতে বন্দী, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সীমাহীন দারিদ্র্যে পীড়িত, আদিমতায় পূর্ণ-অন্ত্যজ শ্রেণীর বন্ধু তারাশঙ্কর। তিনি দেখিয়েছেন আধুনিক পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশের ফলে সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়েছে, সামন্তজমিদার ধ্বংসের পথে দাঁড়াচ্ছে। প্রাচীন সংস্কার ও ব্রাত্যদের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নব্য ব্রাহ্মণ্য - সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দরিদ্র, নিম্নজ, যারা অসহায়, অত্যাচারিত, শোষিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য, মূক, যাদের সমাজে কোন মান-মর্যাদা নেই, যাদের সব থাকতেও কোন কিছুতেই কোন অধিকার নেই তাদের কথাই লিখলেন দরদী লেখনী দিয়ে মরমী তারাশঙ্কর। যারা রুক্ষ-ধূসর বীরভূমে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তাদের কথাই লিখলেন তিনি। তারাশঙ্কর উপলব্ধি করেছিলেন যে "জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস।" এই কারণে ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন, "তারাশঙ্করের

গল্প উপন্যাস শিল্পের চেয়েও জীবন যে বড় এই বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করে।" [৫৩] শরৎচন্দ্রের পর বাংলার সমাজ জীবনের এক বলিষ্ঠ রূপকার হলেন তারাশঙ্কর। বীরভূম বাংলার ক্ষুদ্র সংস্করণ, বিন্দুতে সিন্ধুর স্থাপয়িতা তিনি। ক্ষণকালের দর্পণে নিত্যকালের জীবন সত্যকে ফুটিয়ে তুলতে তিনি এক অনবদ্য কারিগর। " নিজের জেলা বীরভূম, নিজের গ্রাম লাভপুর, এরই মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর দেখেছেন সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রামের নীচুতলার মানুষ, তাদের সমস্যা সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খায় মেশানো পূর্ণ পারিবারিক জীবনের ছবি।" [৫৪]

সমাজের নিম্নশ্রেণীর জীবনবেদ লিখতে হলে তিনটি শর্ত পূরণের জন্যে লেখকদের যত্নশীল হতে হয়। যেমন " (১) তাদের জীবন-যাপন সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান। (২) তাদের মুখের ভাষায় পরিপূর্ণ অধিকার। (৩) তাদের যথাযথ চিত্রের পটভূমিকায় প্রাকৃতিক-গার্হস্থ, সামাজিক ও লৌকিক জীবনের অনুপঙ্খ আবেষ্ঠনী।" [৫৫] তাছাড় আর একটি গুণ থাকা প্রয়োজন তা হল এই অখ্যাতদের প্রতি গভীর আন্তরিকতা। এই অখ্যাত জনের বিষয়ে তারাশঙ্কর যে গল্প লিখেছেন তাতে তিনি শিল্প সুষমার পরিচয় দিয়েছেন বেশী। "গল্পে তিনি সংযমী, সংযতবাক-সন্দেহাতীত ভাবে অব্যর্থ।" [৫৬] এই জন্যেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন, " তিনি ততটা আর্টিস্ট নহেন, যতটা জীবন রসের রসিক"। [৫৭] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে বলেছেন, "গল্প লেখায় তুমি (তারাশঙ্কর) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অগ্রণীদের মধ্যে।" [৫৮]

সেই সব নীড়হারা, লক্ষ্যহারা, ছন্নছাড়ার দল, যাদের জীবন কেবল আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাম উল্লাসে মত্ত সেই সব-বেদে, ডোম, কাহার, বাগদী, মাঝি, চন্ডাল, সাঁওতাল, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি যারা সৃষ্টির আদি থেকেই দুর্জয়, দুঃসাহসী, বন্য, বর্বর, উদ্দাম, যারা আধিভৌতিকে দৃঢ় বিশ্বাসী, তাছাড়া গোষ্ঠী বদ্ধতা, সামান্যতেই পূর্ণতা, যৌন-আকাঙ্খা, ঝগড়া-বিবাদ, সরলতা, মদ্যাসক্ত, বিবেকহীনতা যাদের জীবনের আর এক নাম—তাদের কথাই লিখলেন তারাশঙ্কর। এই মানুষগুলো কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তা জানে না, আত্মবিশ্বাস একেবারেই নেই, প্রবৃত্তি তাড়িত নিয়তিই হল এদের জীবনের সম্বল; জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন অথচ প্রাচীনতার প্রতিগভীর শ্রদ্ধা, এদের দৈনন্দিন জীবনের কী অফুরন্ত গতিবেগ রয়েছে—তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন তারাশঙ্কর।

বিংশ শতকের শুরু থেকে জীবন ও মনের মধ্যে জটিলতা দেখা দেয়। মহাযুদ্ধোত্তর মুনাফালোভীদের লালসা, ব্যক্তি জীবনের বিকৃতি, বিলাসিতা, সীমাহীন বেকারত্ব, কালোবাজারীদের জন্ম হয়—সর্বত্র এক অসুস্থ পরিবেশ বিরাজ করেছে, ঠিক তখনই রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবে শ্রেণীহীন, মেহনতি ও অবহেলিতদের প্রতি সানুকম্পা বা সহানুভূতি জাগলো মানবতাবাদী লেখকদের হৃদয়ে । যার ফলশ্রুতিতে এদেশে আবির্ভাব হল "কল্লোলযুগ"। কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্য যদিও অবহেলিতদের নিয়ে পদচারণা, তথাপি তারাশঙ্করের লেখনী অবহেলিতদের দূর থেকে নয়, তাদের পাশে গিয়ে, তাদের ধূলিমলিন চিহ্নগুলিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরলেন। এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। শৈলজানন্দ কয়েকটি খন্ডচিত্রের মাধ্যমে কিছু তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু " তারাশঙ্কর তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবন রহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন। প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারো প্রতিধ্বনি নন—প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।" [৫৯]

শিবাজী যেমন মাতা জিজাবাঈ-এর কাছ থেকে গল্প শুনে ভবিষ্যতে রামায়ণ, মহাভারতের বীরের মত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারাশঙ্কর তেমনি মাতৃদেবীর কাছ থেকে অজস্র গ্রামীন গল্প শুনেছিলেন, যা কেবল রাঢ়ের মাটির ফসল। তিনি বলেছেন, " ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি, এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজও মনে পড়ছে, সেকালের গল্পগুলির মধ্যে অন্ততঃ আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি, তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।" [৬০] সামন্তগণ তাঁদের দাপট, শক্তি বজায় রাখতে অর্থ খরচ করে পশ্চিম ভারত থেকে এবং এদেশের এই ব্রাত্যদেরকে লাঠিয়ালের পদে বহাল করতেন, যা পরবর্তীকালে পুরুষপরম্পরায় চলে আসে। সামন্তদের বজায় রাখতে সামন্ত কর্তৃক সৃষ্ট এই লাঠিয়ালরাই সামন্তদের অবক্ষয়ের দিনে কাজ হারিয়ে সম্মান হারিয়ে পথে বসে। কিন্তু তাদের দেহে সেই জান্তব প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। তাই লাঠিয়ালের কাজ হারিয়ে তারা ঠ্যাঙাড়ে, দস্যু, ডাকাতে পরিণত হয়। সামন্ত-প্রধান অঞ্চলগুলোতে তাই দস্যুতা বা চৌর্যবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট। লাভপুরে তারাশঙ্করের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তারই প্রমাণ বহন করে, " দু-তিন মাসের মধ্যে তিনচার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত।" [৬১]

তারাশঙ্কর এই সমস্ত প্রাত্যহিক জীবনের লোমহর্ষক ও বাস্তব কাহিনী দেখেছেন, শুনেছেন এবং সেই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে হুবহু লিখেছেন, " তিনি, তাঁর দেশ, রাঢ়ের ঐ বিশেষ অঞ্চলকে ভালবেসেছিলেন, ভাল করে দেখেছিলেন বলেই যে শুধু মহৎ সাহিত্য রচনা করতে পেরেছেন তাই নয়, ওর মধ্যেই তিনি সবদেশে সর্বকালের মানবজীবনে যা শাশ্বত সত্য, যা চিরকালীন সংঘাত, তাও যেমন দেখাতে পেরেছেন, তেমনি এদেশের জাতীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আশা-আকাঙ্খার সংগ্রাম বিশেষ এক খন্ড কালের মহান ইতিহাসকেও ধরে রাখতে পেরেছেন

তাঁর রচনায়।" [৬২] রুক্ষ, কৃশ, লালমাটি, জলকষ্ট, কারখানার অভাবহেতু এবং শিক্ষার অভাবের জন্যে স্বভাব অপরাধিত্ব এখানে অতিমাত্রায় প্রকট; যাযাবর বলে এদের আদিমতা তীব্র কারণ এরা বন্ধনহীন। যেমন, "বেদেনী, নারী-নাগিনী, যাদুকরী, সাপুড়ের গল্প" ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। যা আমাদের অচেনা অদেখা, অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল, তারাশঙ্কর তা আমাদের দৃষ্টি তথা হৃদয়গোচর করান। "বোধহয়, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তাঁর মতো এত বড় দক্ষতার সঙ্গে ছোটগল্পের সীমাবদ্ধ আঙ্গিকের মধ্যে আর কেউ বিশাল বিচিত্রজীবনকে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।" [৬৩]

বীরভূমের গ্রামীনজীবন তাঁর সাহিত্যের লীলাভূমি। সারাজীবন ধরে তিনি এই ব্রাত্য বা যাযাবরদের জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন এমন কি স্বচ্ছন্দে মিশেছেন, তাই তাঁর লেখা এত জীবন্ত এবং মনোহরণকারী। "সমাজের সর্বনিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।" [৬৪] বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্করের ব্রাত্য প্রীতি সম্পর্কে বলেছেন, "তারাশঙ্কর মুখ্যতঃ জনসাধারণের শিল্পী, এই জনসাধারণ আবার নীচের তলার মানুষ।" [৬৫] বিশেষ করে বেদেদের প্রতি তাঁর অমোঘ কৌতূহল ছিল। 'আগুন', 'তামস-তপস্যা', 'নারী নাগিনী', 'বেদেনী' প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্পে বেদের জীবনযাত্রা আচার-অনুষ্ঠান, কথাবার্তা বারবার দেখা গেছে। বেদেদের প্রভাব বীরভূমে অত্যন্ত বেশী। বেদেদের ব্যতিরেকে লাভপুর তথা বীরভূমের মনসা পূজা কল্পনা করা হত না। "বেদিয়ারা আসত। দেশী বেদিয়া সাপুড়ে। এরা সাধারণতঃ আসত বর্ষার সময় মাঠে আল কেউটে ধরতে। গ্রামে সাপ দেখিয়ে, গান গেয়ে ভিক্ষা করত, বাঁদরও নাচাত, আরও চলত। ওরা যেত মেদিনীপুর পর্যন্ত।" [৬৬] আর একাদল বেদেদের কথা বলেছেন, তারা ইরানী নামে খ্যাত। "ইরানীরা আসত, তাদের অস্তিত্ব শহরের লোকের কাছে সুপরিচিত। ছুরি, কাঁচি বিক্রি করে, মাথায় ডবলবেণীর উপর রুমাল বাঁধে, ঘাঘরা, পাঞ্জাবী পরে।" [৬৭] বেদেদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তারাশঙ্কর কতকগুলো ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। আদিম উপজাতির দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন প্রবৃত্তিকে অতি বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষকরে 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'তামস-তপস্যা', প্রভৃতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "নাগিনী কন্যার কাহিনী" রাঢ়ের লোক সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ অধ্যায়"। [৬৮]

আর একশ্রেণীর দেশীয় যাযাবরদের তিনি উল্লেখ করেছেন, যারা এদেশে বাজীকর বলে খ্যাত। "আর একদল দেশী যাযাবর আমাদের দেশে আছে। আমাদের অঞ্চলে বাজীকর বলে। এরা ম্যাজিক দেখায়। মেয়েরা নাচে, গান গায়, পুরুষেরা ঢোলক বাজিয়ে গান গায়।" [৬৯] 'মরুরমায়া', 'পিঞ্জর' ইত্যাদি গল্পে এদের নিদর্শন মেলে।

পটুয়া শ্রেণীও লেখকের খুব পরিচিত সম্প্রদায়। লম্বা পটে তারা কৃষ্ণলীলা, যমরাজার দরবার ইত্যাদি এঁকে দেখাত আর গান গাইত। "কবি" গল্পে দ্বিজপদ পটুয়া লেখকের বাল্যবন্ধু ছিল। তারাশঙ্কর দ্বিজপদর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। "সুন্দর চেহারা ছিল তার, তেমনি সে গান গাইত। লম্বা পট খুলে কৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, গৌরাঙ্গলীলার পরপর সাজানো ছবি দেখিয়ে যেত, আর গান গেয়ে যেত—"আহা কি মধুর লীলা রে—" [৭০] পটুয়াদের মেয়েরাও পটে ছবি এঁকে বিক্রি করত। "রাঙাদিদি" গল্পে এর নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া 'কবি' গল্পের সতীশ ডোম ছিল লেখকের চেনা মানুষ। সতীশের কবি হওয়ার আকাঙ্খা ছিল, তাও লেখক জানতেন। ডোম হল বাগদীদেরই সমগোত্রীয়। একদিন এক ঝুমুরদল লাভপুরের কাছে বটতলায় নামে, তাদেরই একটি মেয়ের কলেরা হয়। এই মেয়েটিই "কবি" উপন্যাসের বসন।

এভাবে অজস্র চরিত্র আছে যাদের সঙ্গে লেখকের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল এমনকি হার্দিক সম্পর্ক ছিল। "যাদুকরী" গল্পের যে বাজিকর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাদের বেদেদেরই মতই চাল-চলন, অথচ ধর্মে তারা হিন্দু। বীরভূমের শীতল গ্রামের বাসিন্দা এরা। বর্তমানে এই সম্প্রদায় প্রায় অবলুপ্তির পথে, মাত্র চার/পাঁচ ঘর টিকে আছে।

বর্তমানে হাঁসুলি বাঁক সংলগ্ন মাস্তলী ও কাদপুর গ্রামে আজও প্রায় শ'তিনেক বাগদী বাস করে। এরা কাহার নামে পরিচিত, পাল্কী বয়। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে কাহারদের জীবনবেদ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত। "বাগদীদের মধ্যে যারা পাল্কী বয় তারা বাগদী কাহার, যারা বয় না তার শুধুই বাগ্‌দী।" [৭১] বাগদীরা মূলতঃ লাঠিয়াল, ভল্লারা এদেরই শাখা। 'পঞ্চগ্রাম', 'পদচিহ্ন', 'কালান্তর' উপন্যাসে বায়েনদের কথা আছে। "ভুবনপুরের হাট" এ কোড়া জাতিদের কথা আছে। "পাল ও সেন রাজাদের সময় থেকেই ডোমেরা বাংলায় বিভিন্ন রাজ্যে সৈন্যরূপে সমাদৃত ছিল।" [৭২] আজও বাংলাদেশে বিশেষ করে (বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া) রাঢ় দেশে এই অনুন্নত শ্রেণীর সংখ্যা বেশী রয়েছে। "বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মৎসজীবী, ধীবর, বাউরী, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশী পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষকরে রাঢ়দেশে। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গেছে যে এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুন্ন রয়েছে।" [৭৩]

রাঢ়ের আর একটি প্রধান জাতি হল সাঁওতাল। সাঁওতালদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ভাষা, সংস্কৃতি, দেব-দেবী, খাদ্য-খাবারের বর্ণনা, দেহের রং প্রভৃতি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর তাঁর 'অরণ্যবহ্নি' উপন্যাসের দশ-বারো পৃষ্ঠায়। এই সকল জাতি ও উপজাতিদের দ্বারা বাঙালী সংস্কৃতি ভীষণভাবে প্রভাবিত। "বাংলার লোকশিল্প, বাঙালীর বলবীর্য বীরত্ব, বাংলার লোকোৎসব, নানাদিক থেকে এই সব জাতির কাছে ঋণী। কেন ও কি জন্য বাঙালীর সংস্কৃতিতে এত লৌকিক উপকরণের প্রাচুর্য, তার কারণ অনেকাংশে রাঢ়দেশের ইতিহাস থেকেই (উত্তরবঙ্গ ছাড়া) পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে বিভিন্ন জাতির আনুপাতিক প্রাধান্য, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির সঙ্গে তাদের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থেকে বাঙালীর সংস্কৃতির লৌকিক উৎসের আভাস পাওয়া যায়।" [৭৪] এইসব অন্ত্যজ জাতিদের সার্বিক জীবন যাত্রার এমন পরিচয় তারাশঙ্কর দিয়েছেন তাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে সভ্যতার ক্রমোন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এইসব জাতি-উপজাতিদের প্রাচীন জীবনযাত্রা জনসাধারণের অন্তরালেই পরিবর্তিত হতে চলেছে, তারই প্রামাণ্য তথ্য ভবিষ্যতে যে কোন জিজ্ঞাসুর কাছে লেখকের উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি অমূল্য উপকরণ হিসাবে কাজ করবে।

তারাশঙ্কর যেন বীরভূমের আয়না। তারাশঙ্করকে জানলে বীরভূমকে জানা হয়ে যায়। বিশেষ করে আদিম অমার্জিত জীবনলীলার সার্থক চিত্রকর হিসাবে। "পুরাতন আদিমতম বৃত্তি আর প্রবৃত্তির সংঘাত রহস্যকে আধুনিক কালের জীবনদৃষ্টির সহযোগে নবরূপ দিয়েছেন—এই অর্থে তারাশঙ্করের ছোটগল্পকে এপিক ধর্মী বলছি।" [৭৫] এই প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন, "ছোট-বড়-ইতর-ভদ্র, ভূস্বামী, অভিজাত, ভূমিহীন রায়ত কৃষক—সকলের জীবনচিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি যে বলিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ রীতির সাহায্য নিয়েছেন; ইদানীং টেকনিক সর্বস্ব বাংলা কথাকারেরা তাঁর নাগাল ধরতে পারবেন না। তারাশঙ্কর বাংলাদেশের গৌরব, ভারতবর্ষেরও প্রধান কথাকার।" [৭৬]

সমাজের একপ্রান্তে পড়ে থাকা অখ্যাত, অজ্ঞাত জনের সহমর্মী হয়ে তারাশঙ্কর পরিণত হলেন সার্বভৌম কথাশিল্পী। "ভারতীয় মানবসমাজের আদিস্তর যারা রচনা করেছে, পরবর্তীকালে আর্যসভ্যতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ফলে যারা সমাজ বন্ধনের বাইরে অবজ্ঞাত অবহেলিত হয়ে পড়েছে, শিক্ষিত ও সভ্যতাভিমানী উচ্চমঞ্চের মানুষ যাদের দিকে মুখ তুলে তাকায়নি, তারাশঙ্কর বিশেষ করে সেই ব্রাত্য মানুষেরই কথাশিল্পী।" [৭৭]

ব্রাত্য, অন্ত্যজ যাযাবরদের নিয়ে তারাশঙ্কর অনেক গল্পও উপন্যাস লিখেছেন। তাদের মধ্যে তিনি প্রবৃত্তি তাড়িত আদিমতায় মিশ্রিত এক অত্যাশ্চর্য জীবনী-শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা যেন আদিম পৃথিবীর ফসিল। যেমন ঃ—

১। তারিণী মাঝি	ঃ জীবধর্মের জয়।
২। নারী ও নাগিনী	ঃ আদিম জৈব আসক্তির উপর মানসিকতার জয়।
৩। বেদেনী	ঃ অন্ধজৈবশক্তির মত্ততা।
৪। তিনশূন্য	ঃ বিকৃত-বীভৎস-ক্ষুধার্থ-কামার্ত, পশুস্বভাবের পাশবরূপ।
৫। যাদুকরী	ঃ নরনারীর বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণ।
৬। মতিলাল	ঃ ব্যর্থ বাৎসল্যপ্রেমে পিতৃহৃদয় বেদনার্ত ও ক্ষতবিক্ষত।
৭। তমসা ও কান্না	ঃ জীববৃত্তি থেকে মানবসত্তায় উত্তরণ।
৮। রাঙাদিদি কবি, প্রত্যাবর্তন	ঃ প্রেমের বিচিত্র লীলা।
৯। চৌকিদার	ঃ অন্ধসন্দেহে দাম্পত্য বিচ্ছেদ।
১০। সুরতহালরিপোর্ট	ঃ অন্ত্যজস্তরেও সতীত্বের মর্যাদা রক্ষা।
১১। চোর	ঃ চৌর্যবৃত্তির বিচিত্রলীলা।
১২। চোরের মা	ঃ প্রকৃত মাতৃত্বের বিকাশ।
১৩। কামধেনু	ঃ প্রবৃত্তিই নিয়তি

১৪। ডাকহরকরা ঃ কর্তব্যের এক মহিমময় পূজারী।

১৫। ডাইনী ঃ স্নেহ, ভালবাসা বঞ্চিতা হতভাগিনীর মর্মন্তুদকাহিনী।

১৬। সমুদ্রমন্থন ঃ প্রেমের জয়।

এছাড়া 'জটায়ু', 'স্রোতের কুটো', 'স্থলপদ্ম', 'ট্যারা', 'ঘাসের ফুল' প্রভৃতি বহু গল্প রয়েছে। প্রত্যেকটি স্বকীয়তার মাধুর্যে সমুজ্জ্বল।

তারিণী মাঝি ঃ- ময়ূরাক্ষীর তীরে একগ্রামে তারিণীমাঝি তার স্ত্রী সুখীকে নিয়ে এক অনুপম সুখে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। সন্তান নেই তথাপি কোন দুঃখ নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রিয়তমা সুখীকে সুখী করতে দিনরাত ময়ূরাক্ষীর দুকূলপ্লাবী জলস্রোতে নৌকা চালায়। দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে সুখী তার সমস্ত গয়না বিক্রি করে তারিণীকে সেবা করে। নিজের জীবন বিপন্ন করে এক চতুর্দশী বধূকে জল থেকে উদ্ধার করে তারিণী বিনিময়ে সুখীর জন্যে কানের নথ চেয়েছে।

কিন্তু একদিন ময়ূরাক্ষীতে হুড়পা বান আসে। গ্রাম, ঘর, বাড়ি, সব প্লাবিত হয়ে যায়। সুখীকে বাঁচাতে গিয়ে অভিজ্ঞ সাঁতারু তারিণী ময়ুরাক্ষীর গভীর জলে পড়ে। মাটি খুঁজতে থাকে, পিঠে তার সুখী। সুখী "নাগপাশের মত তারিণীকে জড়াইয়া ধরিতেছে।" সুখীর কঠিন বন্ধনে তারিণীর দেহ যেন কঠিন হতে শুরু করে, "বুকের হৃৎপিন্ড যেন ফাটিয়া গেল।" তারিণী সেই মুহূর্তে নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে। "দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীর গলা পেষন করিয়া ধরিল।" সুখীর দেহ ক্রমশ অসাড় হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল। সুখীর দৃঢ় বাহুবন্ধন শিথিল হল— "সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল।" মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের কাছে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সব তুচ্ছ হয়ে যায়, কেবল নিজের জীবন রক্ষাই মুখ্য হয়ে ওঠে। "অন্ধ জৈবসত্তার তাগিদেই সুখীর গলা টিপে নিজেকে বাঁচবার চেষ্টা করে।" [৭৮] এইসব ব্রাত্য শ্রেণীর জীবনেও যে বাঁচার তাগিদ তা জৈবিক ধর্মেরই অনুসারী, তারই সঠিক রূপায়ণ সুখীর গলাটিপে তারিণীর বাঁচার তীব্র ঐকান্তিকতায়। এখানে উচ্চ-নীচ, নৈকষ্য-কুলীন, ব্রাত্য-শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবই একাকার।

নারী ও নাগিনী ঃ- এক পা খোঁড়া, নেশাগ্রস্ত, সাপুড়ে, খোঁড়া সেখ। স্ত্রী জোবেদাকে প্রাণাধিক ভালবাসে, জেবেদাও খোঁড়া স্বামীকে হৃদয় উজাড় করে ভালবাসে। একদিন উদয়নাগ নামে এক সাপিনীকে ধরে এনে তাকে সিঁদুর পরিয়ে, নাকে ছিদ্র করে মিনি পরিয়ে দেয়। "তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—ওয়াকে আমি নিকা করলাম জোবেদা, ও তোর সতীন হল।" খোঁড়া শেখের স্ত্রী জোবেদা সাপিনীকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। জোবেদার অনুরোধে খোঁড়া সাপিনীকে জঙ্গলে রেখে আসে। কিন্তু সাপটি খোঁড়াকে ভুলতে পারেনি ও জাবেদাকেও সহ্য করতে পারেনি। তাই রাত্রির দ্বিপ্রহরে ঘরে ঢুকে জোবেদাকে দংশন করে পালাতে যায় কিন্তু খোঁড়া ধরে ফেলে, কিন্তু মারতে পারেনা হাঁড়িতে ঢেকে রাখে। এদিকে জোবেদার মৃত্যু হয়। খোঁড়া হাঁড়ি নিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে সাপটিকে ছেড়ে দেয় এবং বলে, " শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই এই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" এ প্রসঙ্গে বালজাকের বিশ্ববিখ্যাত গল্প "A Passion in the Desert" স্মরণে আসে। দলভ্রষ্ট এক সৈনিক মরুভূমিতে এক বাঘিনীর সঙ্গে প্রেমে বাঁধা পড়েছিল। " শিল্প কুশলতার দিক থেকে এইটিই তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প।" [৭৯]

বেদেনী ঃ- বহুভর্তৃক বেদেনী রাধিকা। বাল্যবয়সে স্বামীকে ত্যাগ করে সহজ সরল বলিষ্ঠ শম্ভুকে গ্রহণ করে। রাধিকা সংসারে প্রচলিত সংস্কার মানতে রাজী নয়। শম্ভুর সঙ্গে থেকে অর্থ, ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে। শম্ভু বৃদ্ধ হলে অনায়াসে প্রথম স্বামী শিবপদের মতই শম্ভুকে ত্যাগ করার সংকল্প করেছে। কঙ্কালীতলার মেলায় "ছয়ফুটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতিটি অবয়ব সবল এবং দৃঢ়, কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়"। সে তাই ব্যুঢ়োরস্ক কিষ্টো বেদের প্রেমে পড়েছে। আদিম জৈবিক তাড়নায় অন্ধ হয়ে গভীর নিশীথে নিঃশব্দে শম্ভুকে পরিত্যাগ করে উন্মত্ত যৌবনের প্রতীক কিষ্টোর কাছে চলে যায়। অন্ধ যৌবনের প্রবল আবেগে রাধিকা নিষ্ঠুরতার চরমে পৌঁছেছে। তাই শম্ভুকে ছাড়ার আগে ঘুমন্ত শম্ভুর তাঁবুতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং "খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।" জৈবলীলার দুরন্ত আকর্ষণে রাধিকা শম্ভুর ঘর ছেড়েছে। কোন নীতি-বোধ, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রথা, ভব্যতা তাকে নিরস্ত করতে পারেনি, এমনকি এতদিনের জীবন সঙ্গীর তাঁবুতে আগুন লাগাতে দ্বিধা করেনি। " শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয়। তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই বেদেনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে। [৮০] সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, " বেদেনী গল্পের রাধিকা যখন শম্ভুর তাঁবুতে আগুন দিয়ে কিষ্টো বেদের সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে, তখন ধর্মহীন, নীতিহীন জৈবশক্তির মত্ততা আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি মনে পড়িয়ে দেয়।" [৮১]

তিনশূন্য ঃ- দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এক ভয়াল ও বীভৎসতার চিত্র এখানে রয়েছে। এখানে লেখক জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করেছেন। বাইরে ভদ্রতার মুখোশ অথচ পশুস্বভাবের মানসিকতা কাজে লাগিয়েছে এক ভদ্রলোক। তিনি রাতের অন্ধকারে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এক যুবতীকে কাপড় ও খাবারের লোভ দেখিয়ে ভোগ করে চলে যান। সময় চলে যায় কিন্তু ঘটনার ফলশ্রুতি বয়ে বেড়িয়েছে সেই হতভাগিনী। জন্ম দিয়েছে এক বিকৃত জান্তব পশুত্ব স্বভাবের সন্তানকেঃ বিকলাঙ্গ, সর্বদা মুখদিয়ে লালা ঝরে পড়ে তার। তবুও ল্যালার জীবনে জন্মসূত্রে এসেছে অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা। তাই একদিন রাত্রে নর্দমায় ফেলে দেওয়া খাবারের সন্ধান করতে করতে এক অন্ধকার-ঘরে প্রবেশ করে চোদ্দ/পনেরো বছরের নিদ্রিত মেয়েকে দেখে। " পাশে আর দু'তিনটি ছেলে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তার সর্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে তার নগ্ন রূপ মৃদু আলোক ছটায় অপরূপ লাবণ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।" কামার্ত পশুর মতই সেই নিষ্পাপ বালিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুর্ভিক্ষের সন্তান, বিকৃত ব্যাধি ও অসুস্থ ল্যালা বা পশু মানব। যে অন্যায় ও কুৎসিৎ পরিবেশে সে পৃথিবীতে এসেছে তাতে এইরকম নগ্ন হিংস্র, ভয়াল, ভয়ঙ্কর ব্যবহারই প্রকাশ পায়— যা সমাজ জীবনে কখনই কাম্য নয়। তারাশঙ্কর এমন বীভৎস গল্প আর দ্বিতীয় লেখেন নি। এখানে পরোক্ষভাবে এই জঘন্য পাশব প্রবৃত্তির ধ্বংস কামনা করেছেন।

যাদুকরী ঃ- নিজেদের ঘরের ঠিক নেই, নেই দাম্পত্য জীবনে শান্তির লেশ, অথচ তারাই অপরের সংসারে, দাম্পত্য জীবনে আনন্দ বিধানের জন্যে জড়ি-বুটি; ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বেড়ায়, নিঃসন্তানদের সন্তানের ব্যবস্থা করে, অপরের প্রজন্মদের আগমন ঘটার ব্যবস্থা করে অথচ নিজেদের প্রজন্মের অভাবে সংসার ধ্বংস হয়ে যায়—এরাই হল যাদুকরী সম্প্রদায়। এই গল্পে যাদুকরী রমণী মুখুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে পরিবারের বিরোধ মীমাংসার জন্যে বিভিন্ন অলৌকিক ব্যবস্থা করেছে। চোর শশী বাগদীকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সেই মেয়েটিই কনস্টেবলের সম্মুখে অসঙ্কোচে নগ্নদেহে নৃত্য করেছে । সকলের কামার্ত চোখ দুটি লুব্ধ লালসায় তার দিকে চেয়ে থাকলেও মেয়েটি সহজ ও অবিকৃত ভাবে নেচে গেছে। উদাসীন, সমাজসংস্কার বন্ধনহীন, নির্লিপ্ত নির্বিকার উদার-মুক্ত এই সব ব্রাত্য শ্রেণী। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিমতার যূপকাষ্ঠে আজ এরা প্রায় লুপ্ত পথের যাত্রী।

মতিলাল ঃ- নিঃসন্তান হেতু সন্তান কামনায় উদ্ভ্রান্ত মতিলাল ও ভুবন হাড়ি। দুজনেই কুৎসিত বিকট দর্শন। মতিলাল গাজনে ভালুকের সঙ সেজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিয়ে বেড়ায়। সন্তানের জন্যে বিভিন্ন কবিরাজ, ঠাকুরের তুক-তাক গ্রহণ করে, ভুবনকে মাদুলী পরায়, নিজেও পরে। নিষ্পাপ দুরন্ত বালকের মত মতিলাল অন্যের ছেলেমেয়েকে নিয়ে নিজের সন্তানহীনতার দুঃখ ভুলবার চেষ্টা করে। একদিন অন্যায়ভাবে প্রেসিডেন্টবাবুর আদেশে প্রহৃত হয় মতিলাল, এমনকি প্রেসিডেন্ট বাবুর আদেশে গ্রামে ঢোকা তার নিষিদ্ধ হল। মতিলাল ভেবেছে সে কুৎসিত বলেই তার ভাগ্যে জুটছে এত বিড়ম্বনা। তাই বাড়ী ফিরে এসে দুঃখের অভিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে সন্তান কামনার তাবিজ হাতের থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে। ভুবন জিজ্ঞাসা করলে মতিলাল বলে, "আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন। কাজ নাই।" কুৎসিত কদর্য আবরণের আড়ালে মানবাত্মার চিরন্তনী উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে।

কান্না ঃ- অন্ধ গায়কের কাহিনী। স্থান কলকাতার গড়ের মাঠ। পিতৃ-মাতৃহীন জনিকে এক চুড়িওয়ালী মানুষ করে। একটু বড় হবার পরেই জন্মের অভিশাপ তাকে ঘিরে ধরে। সমাজ বিরোধীদের সাথে মিশে কোমরে চাকু নিয়ে শুরু করে গলিপথে যাত্রা। হঠাৎ এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর সুনজরে আসে এবং জনি নাম দিয়ে ফাদার তাকে কাছে রাখেন। হঠাৎ সমাজবিরোধী হালিমের দল টাকার লোভে চুড়িওয়ালীকে খুন করে। পুলিশকে জনি খবর দিয়ে হালিমকে ধরিয়ে দেয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হালিম জনিকে অন্ধ করে দেয়। মৃত্যুই হত তার, কিন্তু দেবরূপী ফাদার নিজের জীবন দিয়ে জনিকে রক্ষা করেন। ফাদারের আদর্শ নিয়ে অন্ধ জনি কলকাতার গড়ের মাঠে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়— সে গানের সুরে পৃথিবী, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, ময়দানের নীরবতাও কাঁদে। আদিম জিঘাংসার মধ্যে যারা অভিশপ্ত জীবন বয়ে নিয়ে ফেরে কান্না তাদের শুষ্কজীবনের মরুভূমিতে শান্তির প্রবাহ প্লাবিত করে।

রাঙাদিদি ঃ- বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে যুবতী সরস্বতী পটুয়ার যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ না হওয়ায় স্থানীয় যুবকবৃন্দের কাছে সরস্বতী রঙ্গিনী লাস্যময়ী হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর যুবকের দল তাকে সাঙা করতে চাইলে সরস্বতী যুবকদের বিবাহিত স্ত্রীদের তালাক দিতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু হঠাৎ সরস্বতী সকলের অজান্তে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। সে কারও ঘর ভাঙেনি। আসলে রাঙাদিদির জৈবিক সত্তার উত্তরণ ঘটে দৈবসত্তায়। সে যাকে পেতে চেয়েছিল, যা প্রায় অসম্ভব, সেই দুর্লভ দর্শনেই আনন্দ পেতে শহরে দোকান খুলে বসেছিল।

কবি ঃ- নিতাই বাগদী জন্মে নিম্নজ হলেও কর্মে ছিল উচ্চ কোটীর। সে পেতে চেয়েছিল তার ভালবাসার পাত্রী ঠাকুরঝিকে। তার আকর্ষণেই নিতাই উদ্দাম-দুর্দম প্রাণের আবেগে উচ্ছল ছিল। কিন্তু সেই ঠাকুরঝি যখন রাজাকে নিকে (বিবাহ) করে তখন ব্যর্থ প্রেমের তাড়নায় কবি নীরবে সব ত্যাগ করে অজনার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে। প্রেমিকা কাছে কাছেই থাকবে অথচ তাকে স্পর্শ করা যাবে না— এ ব্যথা ভীষণ মর্মন্তুদ তাই নিতাই দূরে চলে গেছে। বড় প্রেমের ধর্মই হল তাই।

প্রত্যাবর্তন ঃ- তিন তিনবার বিধবা হয়েও জেলের মেয়ে রমা পশুপতিকে পেয়ে গভীরভাবে সংসার পাতার আকর্ষণে প্রলুব্ধ হয়। দাম্পত্য জীবনে বারংবার ব্যর্থ নায়িকা রমা তাই হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ভাবী স্বামীর কল্যাণে দেবী মঙ্গলচন্ডীর কবচ বেঁধে দিয়েছে; তথাপি তার গার্হস্থ্য জীবন ইহজীবনে আর হয় নি। ভাবী স্বামীর তৈরী কুটিরে তিলে তিলে ক্ষয়ে শেষে আত্মহত্যা করেছে।

চৌকিদার ঃ- অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে বন্ধনহীন নেশাসক্ত জীবন শান্তির সংসারে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। সন্দেহ-বাতিক চৌকিদার প্রত্যহ রাতে গ্রাম পাহারা দিতে যাবার আগে স্ত্রীকে ঘরে রেখে নিজে শিকল তুলে দিয়ে যায়। একদিন মানসিক ভ্রান্তির বশে চৌকিদার সতীসাধ্বী কমলীকে সন্দেহ করে ত্যাগ করে। সুন্দর সাবলীল দাম্পত্য-সংসারে বিভিন্ন নেশা এই ভাবেই অশান্তি ডেকে আনে, বিচ্ছেদ ঘটায়।

সুরতহালরিপোর্ট ঃ- ভোলা বাউরী চৌকিদার। অত্যন্ত সৎ। তার স্ত্রী কড়ি। কড়ির স্বভাব চুরি করা। এই স্বভাবের জন্যে সে বহুবার স্বামীর নির্যাতন, প্রহার সহ্য করেছে তথাপি স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারেনি। স্বামীর মৃত্যুর পর সুন্দরী কড়িকে অনেকেই বিভিন্ন ভাবে প্রলুব্ধ করে ভোগ করতে উদ্যত হয়েছে। তীব্র অন্নাভাব অর্থাভাব সহ্য করেছে তথাপি কড়ি ব্রাত্য হয়েও নিজ সতীত্বকে বিলিয়ে দেয় নি। তাই শয়তান মহাজন হরেরাম পোদ্দারের খপ্পরে পড়ার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে আত্মহত্যা করেছে। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে আদিমতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি কড়ি বাউরী।

সমুদ্রমন্থন ঃ- 'তারিণীমাঝি' গল্পে জীববৃত্তির জয় হয়েছে, আর এই গল্পে জীবনের চেয়ে প্রেমই বড় বা মুখ্য হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, অনাহারে জীর্ণা-শীর্ণা স্ত্রী অস্থিমজ্জা সার করে অসুস্থ স্বামীর পথ্যের জন্যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করেছে অথচ নিজের পেটকে রেখেছে শূন্য করে। এমনকি ডাক্তারের দেওয়া প্রেসক্রিপ্শন অনুযায়ী স্বামীকে মাংস খাওয়ানোর জন্যে গভীর রাতে জমিদার উমানাথবাবুর বাড়ীতে ছাগল চুরি করতে গেছে। ধরা পড়ার সময়েও সে বলেছে, " মাংসের ঝোল এঁকটুকুন কঁরে না পেঁলে ওঁ বাঁচবে না।" এইভাবে নিজের জীবনের কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করে অসুস্থ মৃতপ্রায় স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। সমাজের অন্ত্যজ স্তরে কদর্য ও কুৎসিত জীবনচর্যার মাঝেও প্রাণধর্মের কী অনির্বচনীয় মহিমা স্বমহিমার আলোকে সমুজ্জ্বল।

ঘাসের ফুল ঃ- কোলিয়ারীর ঘটনা। সাঁওতাল কন্যা চুড়কি কোলিয়ারীর রেজিস্টার সুদর্শন গায়ক বিনোদকে ভালবাসে। একদিন অপরাহ্ন বেলায় খাদে আগুন লাগে। সেই খাদের গর্তে দুই প্রাণী চুড়কি ও বিনোদ। বিনোদ আত্মরক্ষার তাগিদে চুড়কির আবেদনের কোন মর্যাদা না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং আগুনের লেলিহান শিখা চুড়কিকে গ্রাস করে। যন্ত্রসভ্যতার যুগে উচ্চশ্রেণীর মানসিকতাও যন্ত্রের ন্যায় রূঢ় ও কদর্য হয়ে গেছে। তাইতো এত প্রগাঢ় ভালবাসা, গভীর প্রেম অনায়াসে তুচ্ছ বলে মনে করেছে বিনোদ। অথচ সহজ, সরল ব্রাত্য শ্রেণীর নায়িকা চুড়কি প্রেমের মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেনি।

তমসা ঃ- অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে রূপলোকের সাধনা করার অদম্য স্পৃহা থাকে। এই গল্পটির নায়ক পঙ্খী তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মনুষ্যলোক থেকে দেবলোকে উত্তরণের আকাঙ্খা। বীরভূমের অন্ধ ভিখিরি পঙ্খী বাস্তব নামেই তারাশঙ্করের গল্প সাহিত্যে এসেছে— যার সাধনা দেহাতীত সৌন্দর্যের আরাধনা। পঙ্খীর চেহারা বিকৃত " কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পা-গুলো অপুষ্ট অশক্ত।" অন্ধগায়ক সুরের মধ্যে দিয়েই প্রাণ ও জগতের সৌন্দর্যকে স্পর্শ করে। এই বীভৎস ঊনমানবটির অন্তরে যে স্বর্গীয় প্রেম সুধা ছিল তা সংগীতের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছে।

আদি নিষাদ ও দ্রাবিড় জাতি — বীরভূম তথা রাঢ়ের ব্রাত্যশ্রেণী

বীরভূমে প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি বসবাস করে আছে। বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের মধ্যেই বেশী জাতি ও উপজাতি আছে। এদের চাল-চলন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় ও লৌকিক সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান ছিল। যদিও বর্তমানে সভ্যতার উন্নতির পাশাপাশি সংযমের বাঁধন অনেকটাই শিথিল হয়ে পড়েছে। বিনয় ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, H. H. Risley- The Tribes & Castes of Bengal-Vol-I, II এবং ননীমাধব চৌধুরীর "ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়, গ্রন্থ চতুষ্টয়ের উপর নির্ভর করে যে ধারণা পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণিত হল ঃ-

বাগদী ঃ- অনার্য, প্রাচীনতম অধিবাসী। বর্তমানে হিন্দু, পূর্বে ডাকাতি ও লাঠিয়াল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল, বর্তমানে চাষবাস, মাছধরা, ও নৌকাচালনাই প্রধান বৃত্তি। কেউ কেউ অবশ্য ডাকাতি আজও করে। এদের অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। যেমন " তেঁতুলিয়া, লেটরা, ভল্লা, পার্শ্ববর্তী বাঁকুড়া জেলায় কশাইকুলিয়া, ডুলিয়া, মাছুয়া, গুলিমাঝি, ডাঁরামাঝি, কুশমাটিয়া, মাটিয়া বা মল্লা মাটিয়া ইত্যাদি।" [৮২]

লেটরা ঃ- লেটরা সম্প্রদায় নিজেদের উঁচু বলে দাবী করে। বাগদীদের সাথে নিজেদের ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় না। এদের অনেকেই চৌকিদারী করে। ভন্নারা পূর্বে ডাকাতি করত বর্তমানে চাষবাস করে, কিন্তু সুযোগ পেলেই দস্যুতা বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধে না। লেটরা সম্প্রদায় ধর্মরাজ ও মনসার পূজো করে। ধর্মরাজকে তাড়ির ভোগ দেয়।

ডোম ঃ- লাঠিয়ালবৃত্তি ও ডাকাতি প্রধান পেশা ছিল। বর্তমানে ঝুড়ি তৈরী ও চাষবাস করে, মাছধরে, নৌকা চালায়— বাগদীদের সমগোত্রীয়। এদের মধ্যে অনেকে ছুতোর ও কুমোরের কাজ ও চৌকিদারী করে।

হাড়ি ঃ- চুরি-ডাকাতি করত। বর্তমানে এদের অনেক শাখা বিদ্যমান। যেমন (ক) ভুঁইমালী/চাষবাস করে। (খ) ফুলহাড়ি/ধাইয়ের কাজ করে। (গ) মেথর/ঝাড়ুদার। (ঘ) কাহার/পাল্‌কী বয়। Sir Graves Haughton তাঁর বাংলা-সংস্কৃত অভিধানে বলেছেন, " যে শব্দটি স্কন্ধ > কাঁধ + ভর = কাহার অর্থাৎ যে ঘাড়ে বোঝা বহন করে।" [৮৩] হাড়িদের অনেক উপবিভাগ আছে।

বাউরী ঃ- শীর্ণ, ক্ষুদ্রকায়, অপটুদেহী, কৃষ্ণবর্ণ। ক্ষেত-খামারে মজুরের কাজ করে। মেয়েরা গৃহস্থের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে। এদের অনেকে বর্ধমান-হুগলী জেলায় খেত-খামারের কাজ করতে গিয়ে পুরুষানুক্রমে স্থায়ী ভাবে বাস করছে। "এদের নয়টি উপবিভাগ আছে। যেমন— মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া বা গোবরিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা, ধুলিয়া, মালয়া, জেঠিয়া, খাটুরিয়া, পাথুরিয়া।" [৮৪]

সদগোপ্ ঃ- সচ্চাষী, আদিনাম গোপ। গোভূম আদি নিবাস। পদবী এদের মন্ডল। এরা দুটি ভাগে বিভক্ত ঃ পশ্চিমকুলিয়া এবং পূর্বকুলিয়া। পেশা- গোপালন ও চাষবাস করা।

যদুপতিয়া ঃ- হিন্দু ও মুসলমানের মাঝামাঝি। আল্লার উপাসনা আবার কালীর উপাসনা দুই-ই করে। অনেকের হিন্দুয়ানি নাম অথচ মৃতদেহ কবর দেয়। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন কাজী। বিয়ের পর মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দেয়। বর্তমানে কেউ পিতলের জিনিস, বাজীকর, কেউ পটের ছবি, আবার কেউ ফকিরী গিরি করে।

চামার ঃ- চর্মকার। চামড়ার কাজ করে। তাঁতী সম্প্রদায়ের মধ্যেও চামার দেখা যায়।

রাজবংশী ঃ- কোচ, রাজোয়ার, তিয়োর ইত্যাদি নামে পরিচিত। চাষবাস করে।

লোহার ঃ- এই সম্প্রদায় " কনৌজিয়া, কোকা, মাঘইয়া, কামারকল্লা, মাহুলিয়া নামে পরিচিত। আবার অঞ্চলভিত্তিক নামও পাওয়া যায়। যেমন বীরভূমিয়া, গোবিন্দপুরিয়া, শেরঘরিয়া ইত্যাদি। লোহার কাজ, কাঠের কাজ করে। কিছু অঞ্চলে তারা চাষবাষ করে"। [৮৫]

কোরা ঃ- " উপবিভাগ চারটি, ধোলো, মোলো, শিখরিয়া, বাদামিয়া। বাঁকুড়ায় এরা সোনারেখা, জেঠিয়া, গুড়িবাওয়া ইত্যাদি নামে পরিচিত"। [৮৬]

মুচি ঃ- " বড়ভাগিয়া, ছোটভাগিয়া— যথাক্রমে চাষবাস ও চামড়ার কাজ ও বাজনা বাজায়। উপবিভাগ গুলি হ'ল চাষাকুরুর বা চাষা-কোনাই— চাষবাস করে। বেতুয়া—বেতের কাজ করে। মুচি বা কোরা—কাপড় তৈরী করে। টিকাকার কোনাই— টিকে তৈরী করে যা জ্বালানীর কাজে বিশেষ হুকো পানের জন্যে জ্বালানীর কাজে লাগে "। [৮৭]

মাল ঃ- " মল্ল, মালা, মাল প্রধান বিভাগ। উপবিভাগগুলি হ'ল— ধইয়া, গোবরা, ঘেরা, রাজবংশী, সনাগন্দ। বীরভূমে এরা খাটুরিয়া, মল্লিক, রাজবংশী নামে পরিচিত। বর্তমানে চাষবাস করে "। [৮৮]

সাঁওতাল ঃ- দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত। বীরভূম জেলার পাশেই সাঁওতালপরগণা যেখানে সাঁওতালদের বসতি। কালক্রমে এরা বীরভূমে এসে বসবাস করতে থাকে। কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, সাহসী, সহজাত সারল্যে ভরপুর। এদের অনেকগুলি শাখা আছে। যেমন-মাঝি, মুর্মু, কিসকু, সোরেণ, টুডু, মার্ডি বেসরা, হেমব্রম, হাঁসদা, বাস্কে, ওঁরাও, পাত্তরিয়া, চোরে, বেদিয়া ইত্যাদি। দেবতা শিঙে বোঙা (সূর্য), মারাংবুরু (পর্বত), জাহের এরা (শিবদুর্গা) প্রভৃতি। **উৎসব** এদের আনন্দের প্রধান অঙ্গ। বাঁদনা, ধরম, এখান, বাহা, সিমজন, দাঁসাই সেহরাই, নাইকি, নাউবাই, তীরবেঁধা— ইত্যাদি হল এদের পরব।[৮৯] " সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালী সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি অস্ট্রিক বা নিষাদ সংস্কৃতির ধারা যেন উত্থান পতনের বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে বাংলার সুসমন্বিত সংস্কৃতি-গঙ্গায় মিলিত হয়েছে।" [৯০]

মুসলমান ঃ- মুসলমানদের শাখা অনেক। তন্মধ্যে ঠাকুরযোগী বংশের সন্তান ও আগে মুসলমানদের ধর্মগুরু ছিলেন। পাঠান, সৈয়দ, জোলা, শেখ-ইত্যাদি। পূর্বে অনেকেই ভূস্বামী ছিল, বর্তমানে অনেকেই কৃষক শ্রেণীভুক্ত। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ হিন্দু ও মুসলমানদের সমন্বয়কারী দেবতা। দেবতার উৎসর্গীকৃত প্রসাদকে উভয় সম্প্রদায়ই সিন্নী বলে থাকে।

এইসব অবহেলিত, শোষিত, অশিক্ষিত শ্রেণীকে বর্তমানে শিক্ষার আলোয় নিয়ে প্রসার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন দেশের সরকার বাহাদুর। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। বর্তমান রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। অনেকেই সাম্যবাদী চেতনা লব্ধ হয়েছে, নিজেদের আভিজাত্য বা সম্ভ্রম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে; গ্রাম্য পঞ্চায়েত এ সক্রিয়ভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে; বিভিন্ন সরকারী অনুদান ও সাহায্য লাভ করে এবং সরকারী খাস জমি প্রাপ্ত হয়ে এই সম্প্রদায় বর্তমানে সভ্য জগতে আসতে আরম্ভ করেছে। এদের সামান্য অংশে জন্ম নিয়ন্ত্রণ চেতনা বেড়েছে। মদের নেশাও কমেছে। অবশ্য এক শ্রেণীর সাঁওতালদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা প্রকট ও সক্রিয়।

ঘ. কৃষক আন্দোলন—তেভাগা আন্দোলন

অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাজা ও প্রজা বা শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইউরোপীয় সভ্যতায় খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকেই কৃষকশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় যদিও তাদের নিজস্ব জমি ছিল না। বেগার (সার্ফ) খাটাই ছিল ভাগ্যলিপি। মধ্যযুগে 'ম্যানর' প্রথার উদ্ভব ঘটে। এই ব্যবস্থাতেও কৃষকরাই শোষিত হয়। কৃষকদের সঙ্গে ম্যানর মালিকদের কোন যোগ ছিল না। কিন্তু ভারতের কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃষকরা জমির মালিকের অধীন ছিল। তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমির মালিক ছিল ব্রাহ্মণ। তাঁদের জমিতে চাষীরা নির্দিষ্ট শ্রমের বা ফসলের পরিবর্তে চাষ করত। ফলে জমির মালিক চাষীদের বদলাতে পারতেন অর্থাৎ প্রজাদের উৎখাত করতে পারতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষকদের বেগার খাটতে হত। মধ্য ভারতে গুপ্তযুগীয় দানপত্রে দেখা যায় যে কৃষকদের বেগার খাটতে হত। মার্ক ব্ল্যাক বলেছেন, "এই বাধ্যতামূলক শ্রমদান ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে স্মরণ করায়। যেখানে প্রধানত দুপ্রকারের দায়িত্ব প্রজাদের পালন করতে হত (১) কর দেওয়া (২) মালিকদের খাস জমিতে বেগার খাটা"। [৯১] সুতরাং এই সময়ে কি ইউরোপে কি ভারতে-সর্বক্ষেত্রে কৃষকরা ছিল দাসের পর্যায়ে। জমির মালিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের চাষীরাও নতুন মালিকের অধীনস্থ হয়ে যেত। মধ্যযুগে কৃষকদের অবনতির মূল কারণ প্রসঙ্গে শ্রীরামশরণ শর্মা বলেছেন, " মধ্যযুগে কৃষকদের অবনতি ঘটে। এর মূল কারণ ছিল (১) করভার বৃদ্ধি (২) বেগার প্রথা (৩) দানলব্ধ জমি পুনরায় দান"। [৯২]

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কৃষির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যেতে পারে যে সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক, শেরশাহ ও আকবরের কৃষির উন্নতির জন্যে সদিচ্ছা ছিল। তখন অনেক গ্রামই স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে, গ্রামগুলো রাতারাতি উৎপাদনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। মোগল সাম্রাজ্য এইসব স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম-গঞ্জ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে অর্থে ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়। প্রশাসনিক রক্ষানাবেক্ষনের দুর্বলতার সুযোগে গ্রামশাসক ও কর-আদায়কারীগণ অত্যাচারী হয়ে ওঠে। "গ্রাম সমাজে কর আদায়কারী প্রধান ব্যক্তিগণ ব্যাপক ক্ষমতার বলে ক্রমশঃ উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে থাকে।" [৯৩] এই কর আদায়কারী শ্রেণীই পরে গোমস্তায় পরিণত হয়। সুবাদার, জমিদার, গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারী কর্তৃক গ্রামে চলতে থাকে অবাধ লুণ্ঠন ও উৎপীড়ন।

ফসলের মাধ্যমে রাজস্বদান প্রথাও কৃষকদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। নিরক্ষর, সরল চাষীদের কাছে থেকে ঠকিয়ে অনেক বেশী ফসল আদায় করতেন।

এরপর এল বৃটিশ সরকার। তাঁরা মুদ্রার প্রচলন করে রাজস্ব মুদ্রায় নিতে থাকেন। কারণ তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য এ দেশ থেকে অর্থ আদায় করে স্বদেশে নিয়ে যাওয়া। কাঁচামাল হিসেবে তাঁরা তুলাজাতীয় ফসল আদায় করতেন বা নগদ অর্থে ক্রয় করতেন। দেশীয় অধস্তন কর্মচারীরা রাজস্ব যাতে আত্মসাৎ করতে না পারে তার জন্যেও ইংরেজরা নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে জমি ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করে এবং বংশানুক্রমিক জমিদারী ব্যবস্থার সূচনা হয়। এই চিরস্থায়ী অথচ অভিজ্ঞতাহীন নব্য অযোগ্য জমিদারের কুচক্রে প্রচলিত গ্রামীণ সমাজ অর্থনীতি ও স্বয়ং নির্ভর কাঠামোকে ভেঙে দিতে শুরু করে। গ্রাম সমাজের ও জীবনের যাবতীয় কর্তৃত্বভার জমিদারীর কাছারীতে প্রবেশ করে। বৎসরান্তে খাজনা প্রদান করা ঠিক হল। ফসল কম উৎপাদিত হলে রাজস্ব প্রদানে অপারগ হলে কৃষকগণ জমি বিক্রয় বা বেশী সুদে জমি বন্ধক দিতে বাধ্য হয়। সেই সূত্রেই গ্রামীণ সমাজে আবির্ভাব ঘটল বিত্তবান মহাজনশ্রেণীর। যারা কালক্রমে কৃষকের পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়ে কৃষকদের নিঃস্ব করে জমি-জমা সব গ্রাস করে। **" Though the classes of money lenders and merchants existed in the rural area of pre-British India, their function and position in old economy, were substantially different from those in the new economy. The money Lender in the old Indian society played almost an insignificant role. He occasionally lent money to the village agriculturist or artisan, the interest strictly fixed by the village panchayet. Further the money lender could not annex the land or live stock in case a farmer did not meet the interest claim since the land belonged**

to the village community." [৯৪] জমিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভোগ বিলাসের জন্যে কৃষকদের কাছ থেকে নানাভাবে সর্বদা অর্থ আদায় করতে থাকেন। এইভাবে ইংরেজ সরকার, জমিদার ও মহাজন বা উপস্বত্ব ভোগীদের শোষণে ও শাসনে বাংলার কৃষককুল নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। "বঙ্গদেশের হতভাগ্য কৃষক ইংরেজ শাসন, জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যশ্রেণী— এই তিনটি শোষণ শ্রেণী লইয়া গঠিত বিশাল সামাজিক পিরামিড পৃষ্ঠে বহন করিয়া আসিয়াছে। বঙ্গদেশের কৃষকের সংগ্রাম এই শোষণের পিরামিডকে উহার পৃষ্ঠ হইতে অপসারণের, উহার কবল হইতে মুক্তিলাভের সংগ্রাম।" [৯৫]

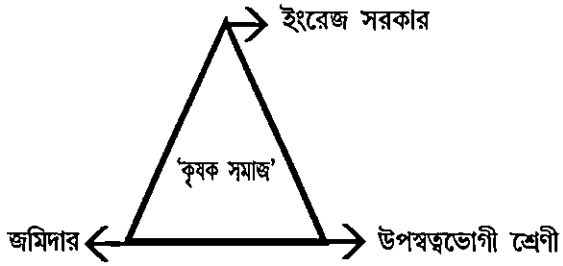

ইংরেজ কোম্পানী এদেশে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করে অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের জন্যে বাংলা বিহারের দায়িত্ব দেয় এখানকার নিষ্ঠুরঅ দুই দস্যু-সর্দার রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে। তারা 'নাজিম' নামে পরিচিতি লাভ করে। এদের অত্যাচারে জমিদার ও কৃষকদের নাভিশ্বাস ওঠে। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তখন পরের বছর ১৭৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নাজিমগণ রাজস্ব আদায় করে ২কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া মুনাফার লোভে কোম্পানীর লোকেরা এদেশে শস্যকে ক্রয় করে ও গুদামজাত করে। পরে দাম চড়া হলে তা বাজারে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে অনাবৃষ্টি ঘটে। যার বিষময় ফল "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"। তৎকালীন প্রশাসকগণ এই দুর্ভিক্ষকে দৈব দুর্ঘটনা বলে অভিহিত করতে থাকে। বাংলা বিহারের প্রায় দেড়কোটি কৃষক ইংরেজ কোম্পানীর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে প্রাণ আহুতি দেয়। হান্টার সাহেব দুর্ভিক্ষের সময় এদেশের বুভুক্ষু জনতার করুণ দৃশ্য অঙ্কন করে বলেছেন, "অনাহারক্লিষ্ট ও নিরাশ্রয় জনতা খাদ্যের সন্ধানে মরিয়া হইয়া জনমানবহীন গ্রামগুলিতে হানাদিয়ে ফিরিত। ক্ষুধার জ্বালায় উন্মত্ত হইয়া জীবন্ত মানুষের মৃতদেহ ও মুমূর্ষু মানুষের দেহ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া খাইত।" [৯৬] দুর্ভিক্ষের জন্যে শুধু ইংরেজরাই দায়ী ছিল না, দেশীয় অর্থ পিপাসু হৃদয়হীন জহ্লাদরূপী নরখাদকরাও দায়ী। এ প্রসঙ্গে 'ইয়ং হাজব্যান্ড' এর উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। "এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভিক্ষ কোন অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা নহে। কিন্তু দেশীয় জনশত্রুদের সহযোগিতায় একচেটিয়া শোষণের বর্বর সুলভ মনোবৃত্তির অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ যে অভূতপূর্ব বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখা দিল, তাহা এমনকি ভারতবাসীরাও আর কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই।" [৯৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিত্য নতুন অনভিজ্ঞ জমিদারের আবির্ভাব ঘটে, যারা অবাধ লুণ্ঠনের মাধ্যমে কৃষকদের চিরকালের জন্যে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত করে।

"এই বন্দোবস্তের প্রথম বৎসরেই জমিদার গোষ্ঠী কৃষকদের নিকট হইতে প্রায় তিনগুন খাজনা ও কর আদায় করে" [৯৮] এইভাবে জমিদার ও মহাজনশ্রেণী স্থায়ীভাবে শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ছলে-বলে কৌশলে ঋণদানের জালে আবদ্ধ করে তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন, গৃহহীন করে দেন। বাংলাদেশের সাবলীল সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় অধঃপতনের সম্মুখীন হয়। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র, কস্মিনকালে ফিরিবে না। ইংরেজ-দিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী কেননা এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।" [৯৯]

শিল্পবিপ্লব প্রসূত কিছু ব্যবসায়ী বুর্জোয়া শ্রেণীর কেন্দ্রে পরিণত হয় এই বাংলাদেশ। এদেশ থেকে কাঁচামাল অল্পদামে ক্রয়ে করে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে বস্ত্র সামগ্রী তৈরী করে তারা এদেশে উচ্চমূল্যে বিক্রি করে। ফলে এদেশের চিরকালীন ঐতিহ্য স্বরূপ কুটীর শিল্পের ধ্বংস হয়, বেকারত্বের সম্মুখীন হয় অসংখ্য কারিগর শ্রেণী, যাদের ভবিষ্যৎ কেবল গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। উপরন্তু "তখন বস্ত্র ব্যবসায়ী ইংরেজ বণিকেরা তাহাদের নিকট বাজার দরের অর্ধেক মূল্যে মসলিন ও কেলিকো বিক্রয় করিবার চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে ভারতীয় তাঁতীদের বাধ্য করিত। তাঁতীরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলে অমানুষিক দৈহিক পীড়নের দ্বারা স্বাক্ষর আদায় করা হইত।" [১০০] ফলে এদেশে কুটীর শিল্প বিশেষ করে তন্তুবায় ধ্বংস হয়ে গেল। "ব্যবসা বাণিজ্যের ইতিহাসে এই প্রকার দুর্দশার কোন তুলনা নাই। তন্তুবায়গণের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হইয়া গিয়াছে।" [১০১] এইসব কারিগর শেষ পর্যন্ত কর্মহীন হয়ে কৃষকে পরিণত হয়। "শিল্প প্রধান বঙ্গদেশ ইহার প্রধান শিল্পটি হারাইয়া কেবলমাত্র কৃষিনির্ভর দেশে পরিণত হয়।" [১০২] বৃত্তি হারিয়ে অজস্র শ্রমিক, কারিগর কৃষিতে ভিড় করে। "এখন হইতে কৃষক তন্তুবায়গণকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইল কেবল কৃষির উপর এবং ইহার ফলে জমিদার শ্রেণীর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে

চাষীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল।" [১০৩] এইভাবে ইংরেজ শাসনে ও শোষণে সর্বস্বান্ত, শোষণ ও পীড়ণে বন্দী, কৃষক ও কারিগরের উষ্ণরক্তে রঞ্জিত হল ভারতবর্ষ। বাংলার ঐতিহ্যবাহী ছন্দ ও সুরের পতন ঘটল। এইভাবে ধ্বংসলীলা চলতে থাকে, প্রায় শতাব্দীকাল ধরে, ধীরে ধীরে কৃষকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহে তাই কৃষকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮০ খ্রী: মধ্যবর্তী সময়ে করভারে জর্জরিত, পুঁজিহীন সর্বস্বান্ত কৃষক অনাহারে, অর্ধাহারে, ম্যালেরিয়া, মহামারীর শিকার হয়। এই সময়ে বাংলাদেশের ছোট-লাট চার্লস ইলিয়ট বলেছিলেন, "আমি মুহূর্ত মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিতে পারি, বৃটিশ ভারতের কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সারা বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কি সুখ, তাহা ইহারা কখনও জানিতে পারে না।" [১০৪] বৃটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান অবদান হল এদেশে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি। পূর্বে গ্রাম সমাজকে প্রাকৃতিক দৈব দুর্বিপাক থেকে রক্ষার জন্য গ্রামে গ্রামে ধর্মশালা থাকত যেখানে শস্য জমা থাকত। "বৃটিশ শাসনের পূর্বে গ্রাম সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশেষ অবস্থার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া শস্যভান্ডার থাকিত এবং তাহা দ্বারা দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীদের জীবন রক্ষা পাইত।" [১০৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গদেশে ছিল ইংরেজ কৃপাপুষ্ট ভূস্বামীগোষ্ঠী ও অন্যদিকে কৃষিকাজে নিযুক্ত কৃষক সম্প্রদায়। পরে রেনেসাঁসের দৌলতে এদেশে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হয়, যারা জমিদারের সহকারী—এরা কেউ শহরবাসী, আবার কেউ গ্রামবাসী। বিদেশী শাসকদের প্রতি ছিল মোহাচ্ছন্ন ও আস্থাবান। বিংশ শতকে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মনুষত্বহীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে।

১৯৩০ সালে চরম কৃষিসঙ্কট দেখা দেয়। কৃষকগণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে তাদের পাশে কেউ নেই; তাদের নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। চারদিকে অন্নাভাব, অর্থাভাব হাহাকার দেখা দিলেও কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তারাশঙ্কর এই কৃষকদের দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের বর্ণনা এমন দিয়েছেন যা যে কোন সুস্থ মানুষের চিত্তে চকিতে ভয়, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি সঞ্চারীভাবের সৃষ্টি হয়। অনেক ঐতিহাসিক বা লেখক কৃষকদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বহু তথ্য ও প্রমাণের সাহায্য নিয়েছেন অথচ বিনা তথ্যেই তারাশঙ্করের বর্ণনা অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তব বলে মনে হয়েছে। " সমস্ত গাঁ-টা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে, বাতাসে তপ্ত বালি হুহু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উড়ছে, শেয়াল, কুকুর, শকুনি চেঁচাচ্ছে, গাঁয়ের মাঝথেকে একটা সাড়া নাই কারু যেন সব মরে গিয়েছে,.....। (চৈতালী ঘূর্ণি)"

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে, অথচ কৃষকদের উন্নতির দিকে কেউ কর্ণপাত করেনি, সমাজের যেন তারা বোঝা। "কৃষক হইল বহুস্তরে বিভক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বন্ধনে আবদ্ধ, ক্ষুদ্র শোষক শোষিতের লইয়া গঠিত এবং মধ্যশ্রেণীর নিম্নস্তরের অবস্থিত একটি সম্প্রদায় মাত্র। [১০৬] ইংরেজ জমিদার, মহাজন, মধ্যস্বত্বভোগীদের নগ্নশোষণে মৃত্যু পথযাত্রী কৃষকের দল পাল্টা আঘাতও হেনেছে, যদিও তারা অর্থ, বুদ্ধি, ঐক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বিফল হয়েছে—সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে যার শুরু হয়। "বঙ্গদেশে বৃটিশ রাজত্ব কালে নীল বিদ্রোহই প্রথম বিপ্লব।" [১০৭] ওয়াহাবী, ফরাজী, সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা প্রভৃতি কৃষক বিদ্রোহ দিয়ে যার শুরু হয়, তা ক্রমশঃ দারিদ্র্যের চাপ থেকে বাঁচতে অনন্যোপায় হয়ে কৃষকেরা ডাকাতিতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে।

ভারতে কৃষক বিদ্রোহ প্রথমে শুরু হলেও স্থায়ী আন্দোলন শুরু করে শ্রমিকগণ; শ্রমিকদের ঐক্য ও উৎসাহে গ্রামের কৃষকরাও যৌথভাবে আন্দোলনে সামিল হয়। তাছাড়া শ্রমিকগণ তো গ্রামের সর্বহারা কৃষকদেরই সহধর্মী। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের ফলে এদেশে বহু কারখানা স্থাপিত হয়, এবং শ্রমিকের সংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। শোষণ ও উৎপীড়নের জন্যে শ্রমিকগণ বুর্জোয়া ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ১৯২০ সালে "ট্রেড ইউনিয়ন" প্রতিষ্ঠা হলে তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ১৯৩৬ সালে "নিখিল ভারত কৃষকসভা" প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে শ্রমিক সংগ্রামের সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশে তেভাগার দাবিতে প্রায় ৫০লক্ষ ভাগচাষীর ঐতিহাসিক সংগ্রাম শুরু হয়। " ভারতের শ্রমিক সংগ্রাম ও কৃষক সংগ্রাম পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং একটি বৈপ্লবিক সংগ্রামের দুই অচ্ছেদ্য অংশ। ইহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।" [১০৮] জমিদার, জোতদার, নিজেদের জমি কৃষকদের মধ্যে ভাগচাষের জন্যে দিত। কৃষকগণ রোদেপুড়ে, জলে ভিজে ফসল ফলিয়ে তার অর্ধেক মালিকদের দিত। এদিকে জমির চাষের খরচ ও বাবদ খরচ সুদসহ মহাজনদের মিটিয়ে চাষীর হাতে ফসলের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। তাই আধিদারগণ 'তেভাগা' আন্দোলনে মেতে ওঠে। মোট উৎপাদিত ফসলের চাষীরা তিনভাগের দু'ভাগ দাবী করে। মালিকপক্ষ পাবে একভাগ। অবশ্য যদি জোতদারগণ চাষের যাবতীয় খরচ বহন করে

তাহলে সেখানে ফসলের অর্ধেক পাবেন। জোতদারের হাতে তখন ২/৪ হাজার বিঘা জমি ছিল। "তখনকার দিনের এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় তৎকালীন যুক্তবাংলার শতকরা ৬৪ ভাগ জমি ছিল দেশের শতকরা ১৪জনের হাতে। .....বহু জোতদারের ৫/৬ হাজার বিঘা পর্যন্ত জমি ছিল। এক হাজার দুহাজার বিঘা জমির মালিক ২/৪ জন প্রায় প্রতি গ্রামেই ছিল। ভূমিহীন গরীব কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ ছিল।" (১০৯)

জোতদারগণ কোনরূপ কায়িক পরিশ্রম করত না, উৎপাদনের জন্যে কোনরূপ ক্যাপিটাল বিনিয়োগ করতেন না, উপরন্তু তাঁরা মহাজনী কারবার করতেন; অর্থাৎ অভাবের তাড়নায় ভাগচাষীরা তাঁদের দ্বারস্থ হলে, জোতদারগণ তাদের ধান কর্জা দিতেন। কর্জা ধানের সুদ 'দুন' অর্থাৎ একমন ধান ধার নিলে শোধ করার সময় চাষীকে দু'মন ধান দিতে হত। উৎপাদনের জন্যে যাবতীয় ঝুঁকি আধিয়ারদের নিতে হত । ফসল উঠলে তা বয়ে এনে জোতদারদের খামারে আনতে হত। সেখানে মাড়াই, ঝাড়াই করে শস্য মালিকের গোলায় ভরে দিতে হত চাষীদের। কোন কোন জোতদার উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ নিজে নিতেন। ফলে সব খরচ ও কর্জা মিটিয়ে আধিয়ার যা ফসল পেত তা বছরের ২/৩ মাসেই খরচ হয়ে যেত। এছাড়া জোতদারদের বাড়ীতে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ও অন্যান্য কাজের জন্যে আধিয়ারদের বেগার খাটতে হত। অবাধ্য হলে তাদের উপর চলত জুলুম ও অত্যাচার। ফলে জোতদার ও মহাজনদের এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময় বিভিন্ন দেশের কৃষকরা জোটবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের দাবী আদায় করে নিতে শুরু করেছে। এর প্রভাবও এদেশের কৃষকদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। শুরু হয় "তে-ভাগা আন্দোলন"। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের মোট তিনভাগের দুভাগ চাষীর এবং একভাগ জোতদারের।

তারাশঙ্করের গল্পে বা উপন্যাসে তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট খুব একটা বেশী নেই। কারণ হয়ত তে-ভাগা আন্দোলনের মূলকেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ, পূর্বাঞ্চল। রাঢ় বাংলার বেশীর ভাগ চাষীদেরই জমি ও ঘরে লাঙ্গল ছিল। তাই ভাগচাষী অনেক কম ছিল। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে কারখানার ব্যাপক প্রচলনও খনির প্রাচুর্য হেতু ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের কাছে ব্যাপৃত হয়েছিল। বর্তমানেও রাঢ়ের চিত্র পূর্ববৎ। কেবলমাত্র সেইসব পরিবারের জমি আধিয়ারের কাছে থাকে যারা বিভিন্ন কর্ম হেতু গ্রামের বাইরে থাকেন। বর্তমানে অনেকে চাকরী করেও বাড়ীতেই চাষের দায়িত্ব রাখেন। দ্বিতীয়তঃ এখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিমাণ খুব একটা বেশী ছিল না। তাই তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে রাঢ় প্রায় মুক্ত ছিল। যেহেতু তারাশঙ্করের সাহিত্যের বিচরণভূমির অধিকাংশ ক্ষেত্রই হল রাঢ় অঞ্চল তাই তাঁর লেখাতেও তেভাগা প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রকট নয়।

জমিদার সন্তান হয়েও তারাশঙ্কর ছিলেন খেটে খাওয়া মেহনতি কৃষকদের পক্ষে। তারাশঙ্কর বিশ্বাস করতেন, "লাঙ্গল যার জমি তার" হওয়াই উচিত। কিন্তু বিপ্লববাদে কোন দিনই বিশ্বাসী ছিলেন না। তে-ভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখকের গল্প "বরমলাগের মাঠ"।

বরমলাগের মাঠ ঃ-" চাষী কৃষাণদের মধ্যে ঢেউ উঠেছে তে-ভাগা। এতদিন মনিবে পেয়েছে দু'ভাগ, এবার তারা দাবি করছে দু'ভাগ।" রাজনৈতিক বিশেষ করে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী হয়েও লাভের লোভে বা কৌতূহলের বশে অল্পদামে সম্পত্তি নীলামে ক্রয় করেন শিবনাথ। বলরাম নিরীহ চাষী। বংশপরম্পরায় তারা বরমলাগের মাঠ চাষ করে আসছে। কোনদিনই তারা মনিবের প্রতি কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেনি। শিবনাথকেও সমাদরে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে সেবার্ঘ্য দিয়েছে। শিবনাথ ও বলরামকে অত্যন্ত ভালবাসেন। শিবনাথ বলরামকে তেভাগা আন্দোলনে সামিল হতে নিষেধ করেছেন। এমন কি শিবনাথ বলরামকে নায্য পাওনা দিতেও স্বীকৃত হয়েছেন। "দুভাগ যদি দেশ চলিত পাওনা হয় বলরাম, আমি তাই দোব তোমাকে। তাতে আমিও আপত্তি করব না। যদি নাও হয়, তবু ভাগ এবার তোমার বাড়িয়ে দোব, দোব নয়, দিলাম। আঠারো-বাইশ ভাগের তোমার বাইশ আমার আঠারো।" কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হ'ল শিবনাথ একান্ত উদার মানসিকতার লোক নন। কারণ ২২ ও ১৮ ভাগ তো কম, তিনি তো প্রকারান্তরে বলরামকে ঠকাতে চেয়েছেন। তে-ভাগ তো হল না। তাই হয়ত বলরাম অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপ্লবী কৃষক আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। তাই স্বার্থান্বেষী শিবনাথ বলরামকে গুলি করেছেন। বলরামের প্রতি শিবনাথের আচরণ মানবোচিত হয় নি। তা সত্ত্বেও " কিন্তু গল্প রস সৃষ্টিতে "বরমলাগের মাঠ" তারাশঙ্করের উত্তরজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।" (১১০)

শিবনাথ সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও তার বিপক্ষে ছিলেন বলে মনে হয়। কারণ তিনিও চার্চিলের "The brute fact is that, socialism means mismanagement, bad house keeping in competence and progressive degeneration"--এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। এই জন্যেই বোধ হয় সঠিক ভাগ দিতে নারাজ হয়েই বলরামকে হত্যা করেছিলেন। "তারাশঙ্করই প্রথম কথাশিল্পী, যিনি কৃষাণের জীবনের শরিক হয়ে, কর্মে ও কথায় তাদের সঙ্গে সত্য আত্মীয়তা অর্জন করে, বাংলা সাহিত্যকে অবজ্ঞাত পল্লীর অনভিজাত মানবসমাজে ছড়িয়ে দিলেন। সমাজের অন্তেবাসী ব্রাত্য ও গোত্রহীন মানুষের দল সরস্বতীর আঙিনায় প্রবেশাধিকার পেল, বিপুলায়তন জনপদের লক্ষ মানুষের কলধ্বনি শোনা গেল সাহিত্যে। তাঁর হাতে আমাদের মঞ্জুভাষী কথাশিল্প হয়ে উঠল সার্বভৌম জীবনশিল্পী।" (১১১)

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে চরিত্রাবলীর অর্থনৈতিক অবস্থাগত বিভাজন

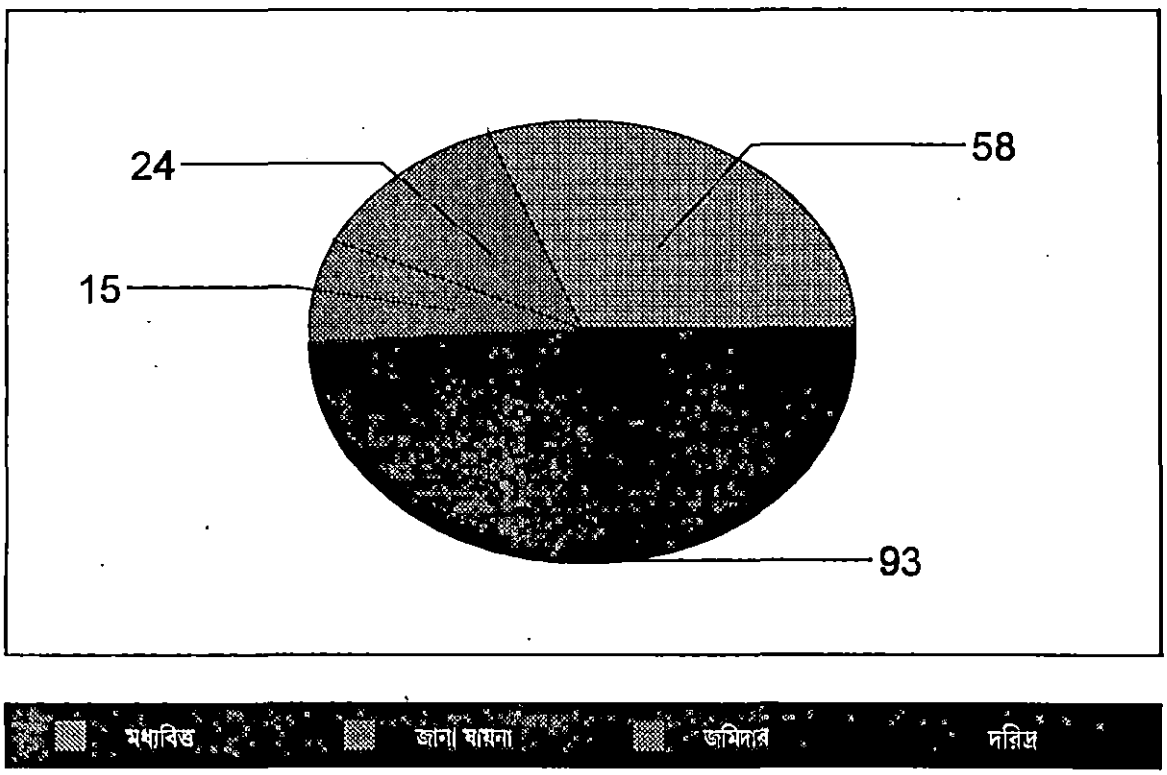

● তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে প্রায় ৩৪টি গল্পে জমিদার বর্তমান থাকলেও প্রধান হিসেবে মূলতঃ ১৫টি গল্পে আছেন। এমন প্রায় ২৪টি গল্প রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক অবস্থার মাপকাঠি জানা যায় না।

● শিক্ষকতা, ভিক্ষাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি, পৌরোহিত্য প্রভৃতি বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের দরিদ্র শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষক ও পুরোহিতদের চরিত্রগত আদর্শ থাকতে পারে কিন্তু প্রাত্যহিক অবস্থা তাদের মোটেই ভাল ছিল না বা সমাজে কোন সম্মান ছিল না।

● লেখকের আত্মকথন, শিশুদের নিয়ে বা পশুদের নিয়ে এবং বিভিন্ন ভ্রমণমূলক গল্পগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা জানা যায় নি।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে চরিত্রাবলীর শ্রেণীগত বিভাজন

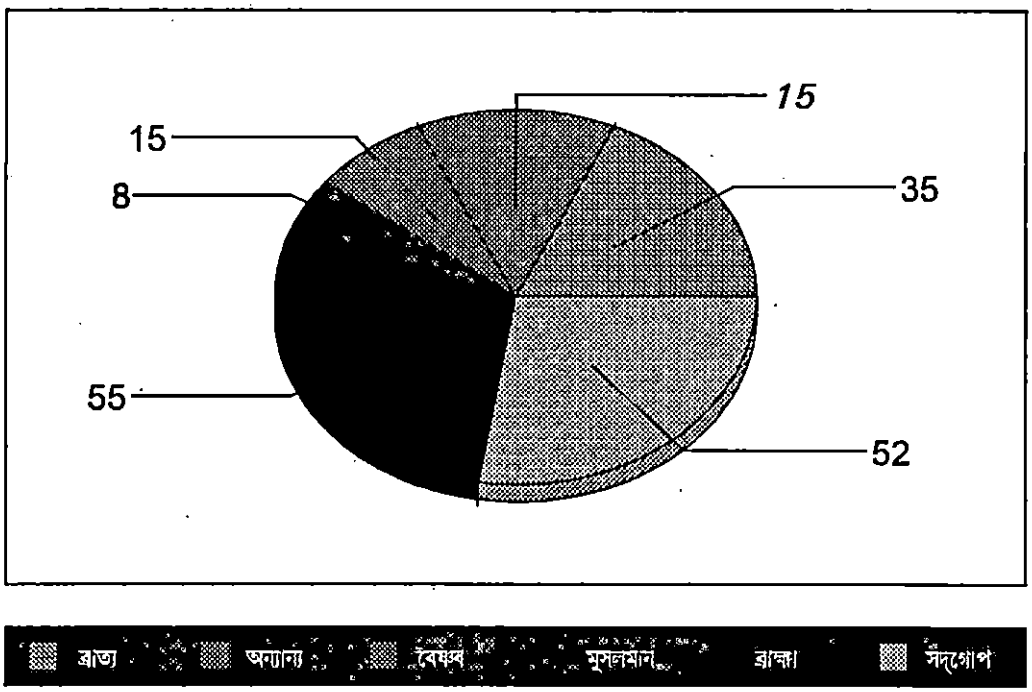

● তারাশঙ্করের ছোটগল্পের বিভিন্ন পদবীগত বিভাজন। মূলত: ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সদগোপপ, মুসলমান, ব্রাত্য শ্রেণী এবং অন্যান্য (অনেক গল্পে পদবীর উল্লেখ না থাকায় তাদের অন্যান্য হিসেব গণ্য করা হল)।

● একই গল্পে পৃথক পৃথক পদবী ধারী ব্যক্তির সন্নিবেশ আছে, তাদের পৃথক হিসেবে ধরা হয় নি, মূলত: গল্পের মুখ্য ভূমিকায় যিনি আসীন তাঁকেই ধরা হয়েছে।

● লেখকের বক্তা হিসেবে অনেক গল্প রয়েছে, যেগুলি ব্রাহ্মণ হিসেবে গণ্য করা হয় নি।

পাদটীকা ঃ-

১।	A History of Pol. Theory	:	Sabine, 3rd Edn 1963	P-213
২।	History of European Political Philosophy	:	D. R. Bhandari, 9th Edn-1967	P-109
৩।	রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত	:	প্রাণগোবিন্দ দাস 2nd Edn-1988	পৃ.-৫০
৪।	Political Science	:	Gettel, 6th-1961	P-87
৫।	প্রাগুক্ত	:		P-88
৬।	শুক্রনীতি সার-অনুবাদ	:	বিনয়কুমার সরকার, প্রথম	পৃ. ৩৬৫/৭, ৩৮১-২
৭।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ২২৩
৮।	হর্ষচরিত : অনুবাদ	:	অগ্রওয়াল	পৃ. ৪৩
৯।	হর্ষচরিত	:	অগ্রওয়ালঃ 'সামন্ত সেনামুকুট মণিময়ূরবাক্রান্তপাদার বিন্দু'	পৃ. ৪৩
১০।	মনস্মৃতি	:	অধ্যায় ৭ - শ্লোক	পৃ. ১১৫-২০
১১।	সি, য়্যু, কী	:	অনুবাদ, এস, বীল, খন্ড-১	পৃ. ৪৪
১২।	মোগল রাজত্বের ভূমিরাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা	:	এন, এ, সিদ্দিকী	পৃ. ১৫
১৩।	The Agrarian System of Mughal India	:	Irfan Habib	P-320
১৪।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ১২৯
১৫।	Social Background of Indian Nationalism	:	A. R. Desai	P-38
১৬।	আমার কালের কথা (রচনাবলী ১০ম)	:	তারাশঙ্কর বন্দোপ্যাধ্যায়	পৃ. ৩৫১
১৭।	প্রাগুক্ত	:	" "	পৃ. ৩৯৩
১৮।	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	:	ভূদেব চৌধুরী	পৃ. ৪৩১
১৯।	কালি ও কলম (কয়েক প্রহরের স্মৃতি) অগ্রহায়ণ ১৩৭৮	:	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	পৃ. ৭৯৩
২০।	"তারাশঙ্কর'	:	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ. ৩৭
২১।	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	:	ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৩৪
২২।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫১
২৩।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ১৫
২৪।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ৭৮
২৫।	আমার কালের কথা	:	তারাশঙ্কর স্মৃতি কথা ১ম খন্ড	পৃ. ৬
২৬।	বাংলো গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ৭৯
২৭।	গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ১৯
২৮।	কালিন্দী	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪১২/১৩
২৯।	V. I. Lenin, Marx, Engles: Marxism	:	Sixth English edition	P- 414 (1946)
৩০।	রায়তের কথা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)	:	প্রমথ চৌধুরী	পৃ. ২৩

৩১।	Notes on Indian History	:	Karls Marx	P- 101
৩২।	The Story of Labour & Capital in India Vol-I-Dewan Chamanlal Cooli			P- 16
৩৩।	তারাশঙ্কর রচনাবলী-১০ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩৫৪
৩৪।	কয়েক প্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম) তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা	:	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	পৃ. ৭৯৬
৩৫।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪৮
৩৬।	Land Problem of India	:	R. K. Mukherjee	P- 90-91
৩৭।	বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ২৭
৩৮।	কৃষকসভার ইতিহাস	:	আবদুল্লাহ্ রসুল	পৃ. ১৮
৩৯।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬
৪০।	History of freedom Movement in India	:	Tarachand (Vol-I)	P- 303
৪১।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৯
৪২।	শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ (৯ম)	:		পৃ. ৩১৫
৪৩।	India today & tomorrow	:	R. P. Dutta	P- 87
৪৪।	ধর্মকোষ	:	ভরদ্বাজ (খন্ড-১)	পৃ. ৭৩১
৪৫।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর	:	মুক্তি চৌধুরী	পৃ. ১৮
৪৬।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৪-৫
৪৭।	India Today & Tomorrow	:	R. P. Dutta	P- 88
৪৮।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ - ১ম খন্ড	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৫৩
৪৯।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ১০৮
৫০।	কল্লোলযুগ	:	অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত	পৃ. ১১৭
৫১।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	:	নিতাই বসু	পৃ. ১৫
৫২।	আমার সাহিত্য জীবন— ২য় খন্ড	:	তারাশঙ্কর	পৃ. ৮৯
৫৩।	কালি কলম (অগ্রহায়ণ-১৩৭৮)	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ৪৫৩
৫৪।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৫৯
৫৫।	প্রাগুক্ত	:	" "	পৃ. ৯৭
৫৬।	তারাশঙ্কর	:	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ. ৯০
৫৭।	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	:	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৩৩
৫৮।	তারাশঙ্কর : দেশকাল সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ১২৯
৫৯।	গল্প পঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ৫
৬০।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী -১০ম খন্ড (মিত্র ও ঘোষ)	:		পৃ. ৩৯২
৬১।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪০৩
৬২।	লাভপুর অতুল শিব ক্লাবের স্মরণিকা	:	গজেন্দ্র কুমার মিত্র ১৯৮০	
৬৩।	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	:	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৭০৫
৬৪।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ. ৫

৬৫।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২২
৬৬।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী ১০ খন্ড	:	মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স	পৃ. ৩৮৩
৬৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৩৮৫
৬৮।	তারাশঙ্কর : ও রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি (কালি ও কলম)	:	আশুতোষ ভট্টাচার্য	পৃ. ৫৪২
৬৯।	তারাশঙ্কর : রচনাবলী ১০ খন্ড	:	মিত্র ও ঘোষ	পৃ. ৩৮৪
৭০।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৩৮২
৭১।	আমার কথা (শনিবারের চিঠি) (১৩৭১)	:	তারাশঙ্কর	পৃ. ৮৮
৭২।	তারা : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৬৫
৭৩।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ৭০
৭৪।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৭২
৭৫।	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	:	ভূদেব চৌধুরী	পৃ. ৫৩৪
৭৬।	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	:	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৭০৫-৬
৭৭।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম খন্ড	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৬১
৭৮।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৭৯।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৩
৮০।	শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ১৭
৮১।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৮২।	The Tribes & Castes of Bengal	:	H. H. Risley Vol-I	P- 38
৮৩।	সূত্র প্রাগুক্ত	:		P- 16
৮৪।	প্রাগুক্ত	:		P- 78
৮৫।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 22-24
৮৬।	প্রাগুক্ত	:	Volume-1	P- 507
৮৭।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 96
৮৮।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 47
৮৯।	প্রাগুক্ত	:	Volume-2	P- 225-34
৯০।	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	:	বিনয় ঘোষ	পৃ. ১২৪
৯১।	মার্ক ব্ল্যাক ফিউডাল সোসাইটি পৃ. ৭৩	:	সূত্র ভারতের সামন্ততন্ত্র : রামশরণ শর্মা	পৃ. ৪৩
৯২।	ভারতের সামন্ততন্ত্র	:	রামশরণ শর্মা	পৃ. ২২৪
৯৩।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬
৯৪।	Social Back Ground of Indian Nationalism	:	A. R. Desai	P- 177
৯৫।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	:	সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ১৪৪
৯৬।	Annals of Rural Bengal	:	W. W. Hunter Vol-I	P- 218
৯৭।	Transactions in india (1786)	:	Young Husband	P- 123-24.

৯৮।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ১৬
৯৯।	বঙ্গদেশের কৃষক	: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পৃ. ৭০
১০০।	Consideration of Indian Affairs	: William Bolts	P- 63
১০১।	A quote from Karl Marks' Capital	: G. Allen & Unwin, Vol-I	P- 432
১০২।	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৬৫
১০৩।	Economic History of Bengal	: N. K. Sinha Vol-I	P- 169
১০৪।	দেশের কথা	: সখারাম গণেশ দেউস্কর	পৃ. ২৭
১০৫।	Starving Millions	: S. K. Chatterjee	P- 12
১০৬।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ৭
১০৭।	Amrita Bazar Patrika	: 22nd May 1874	
১০৮।	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস	: সুপ্রকাশ রায়	পৃ. ২০
১০৯।	উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন	: ধনঞ্জয় রায়	পৃ. ১৪৪
১১০।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ৩য় খন্ড	: জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৩৪
১১১।	তারাশঙ্কর বিচিত্রা	: বিশ্বনাথ দে (সম্পাদিত)	পৃ. ২৮

* * * * * * * * * * * * * * *

তৃতীয় অধ্যায়

গল্পের বিচিত্র বিন্যাস, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ধরণ-ধারণ
তথা বিচার বিশ্লেষণ

তৃতীয় অধ্যায়

গল্পের বিচিত্র বিন্যাস, সমাজতত্ত্বর ও মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ধরণ-ধারণ

কল্লোলীয় যুগে আবির্ভূত হয়েও তারাশঙ্কর ছিলেন একান্তভাবেই রাঢ়ভূমির লেখক। রাঢ় মাটির রুক্ষ, তৃষ্ণা সেখানকার অসংস্কৃত মানুষদের দেহমনের কামনা ও কান্না একটি নতুন ভাষা নিয়ে তারাশঙ্করের কথা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল। সেখানকার ভৌগোলিক ভূখন্ডের ইতিহাস-সংস্কার-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতি-বিশ্বাস ও সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে, বিশেষ করে সেখানকার উচ্চ-নীচ বিচিত্র জনসাধারনের সঙ্গে, তারাশঙ্করের যে গভীর মমত্ববোধ ও অভিজ্ঞতা ছিল, সেগুলোকে তিনি বিভিন্ন শাখায়-প্রশাখায় বিন্যস্ত করে ছোটগল্পে বিন্যাস করে পাঠকদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগতে দাঁড় করিয়েছেন। "তিনি একদিকে দেখেছেন স্বচ্ছল জমিদারী-বিস্তীর্ন কৃষিক্ষেত্র, প্রাচীনকালের শিক্ষা ও আভিজাত্য সম্পন্ন পরিবার, অন্যদিকে দেখেছেন সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত কয়লার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ সম্পন্ন ধনী পরিবার। জমিদারী আভিজাত্য, গর্ব ও দম্ভ যেমন দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন, তেমনি খুব কাছের থেকে রাঢ়ের জনজীবনের বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্র রূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন" (১)।

ছোটগল্প এবং উপন্যাস উভয়ক্ষেত্রেই তারাশঙ্করের লেখনী প্রতিভাস্পৃষ্ট এবং প্রায় একই উপকরণ এই দুই শিল্পরূপে সমভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে কিছুটা উপন্যাসের বিস্তৃতি ও ঘটনা বহুলতা, নাটকীয়তা ও বিশ্লেষণেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবুও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্পকার। আধুনিক ছোটগল্প ক্রমশঃ জনজীবনের বহুবিচিত্র মুহূর্ত, আঞ্চলিকরূপ, প্রকৃতি ও পরিবেশের খুঁটিনাটি বিবরণ, স্থানীয় বিশ্বাস ও জলবায়ু এগুলোর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসের পটভূমি নির্বাচন করেছেন রাঢ় অঞ্চল। সেখানকার গৈরিক শুষ্ক মৃত্তিকা, রুক্ষপ্রান্তর, বন্য গ্রাম্যনদী, রৌদ্রদগ্ধ প্রকৃতি, ধূসর দিগন্ত যেন মানুষের প্রাকৃত স্বভাবের মধ্যেও কিছু পরিমানে সঞ্চারিত হয়েছে। শ্রী ও শোভনতার পরিবর্তে এই অঞ্চলের মানচিত্রে আছে একপ্রকার আদিমতা, জনজীবনের মধ্যে রয়েছে এক জাতীয় আদিম প্রবৃত্তি। তাদের লোভ, ক্রোধ, প্রেম, মোহ এখানকার লালমাটির মতই দিগন্ত-প্রসারিত, রুক্ষ ও ধূসর। ভদ্রতার শ্যামশ্রী বা সভ্যতার কোমল দূর্বাদল তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। এখানকার অধিবাসীরা আবহমান কাল ধরে বহন করে চলেছে অনার্য রক্তধারা আর অনার্য সংস্কৃতি। কাহার, বাউরী, বীরবংশী, সাঁওতাল, ডোম, বাগদী, দুলে প্রভৃতিদের পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরে জমিদার, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শ্রমিক, কৃষক, তান্ত্রিক, কাপালিক, বেদে, সাপুড়ে—কতবৃত্তি ও মানুষ। ছাতিফাটার মাঠে থাকে ভয়ঙ্করী ডাইনী, শাল-মহুয়ার জঙ্গলে কালনাগিনী বশ করে কানা সাপুড়ে, বিষধরী বেদের মেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে লীলায়িত যৌবন খেলায় প্রলুব্ধ-পুরুষের চোখের সামনে। দূর থেকে চন্দনপুরে কারখানার বাঁশি বাজে। এরই মাঝে উঠতি বড়লোক মহিম গাঙ্গুলীর অট্টালিকায় পেটা ঘড়িতে প্রহর ঘোষিত হয়, অন্যদিকে বিগতশ্রী রায়বাড়ির শূন্য জলসাঘরের ঝাড়লণ্ঠন হাওয়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

এদেরই নিয়ে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের ছোটগল্প ও উপন্যাস। তিনি এই সব মানুষের ধাতু-প্রকৃতির দুর্মর বিকাশকেই তুলে ধরেছেন। তত্ত্বকথা তাই বড় হয়ে ওঠেনি। অখন্ড মানবজীবন স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি-কল্যাণও নয়, অকল্যাণও নয়। তাই তো তিনি শুধু শিল্পী নন, তিনি জীবন রসিক। তারাশঙ্করের সৃষ্টজীবনে মধুর আছে, রৌদ্র আছে, আছে ভয়ানক, আছে বীভৎস। তাই তাঁর জীবনের আরাধ্যা বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি। এই জন্যেই তাঁর ছোটগল্পে দেখা যায় চোর, খুনী, গুন্ডা, ভবঘুরে, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, দেশসেবক, উচ্চ-নীচ যে যেমন বৃত্তির প্রতিনিধি হোক না কেন, সকলেই এক প্রকার আদিম প্রবৃত্তির বশীভূত। এই প্রবৃত্তিরূপিনী নিয়তির কাছে মানুষ কত অসহায়, তার শিক্ষা-প্রেম-সংস্কার কত নিরর্থক। একটি বৃহত্তর ক্ষুধা যেন এখানকার আকাশ-বাতাস-মাটিকে গ্রাস করে মানুষের স্বভাবে করেছে প্রবেশ। এ ক্ষুধা অন্নের, স্নেহ-বাৎসল্যের, প্রেমের, জৈবিক প্রবৃত্তির, ইন্দ্রিয়ের, ভোগের, লালসার—সবই। "রাঢ়ের কঙ্কারাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ্য দাহ-যে বুক ফাটা পিপাসা, তাঁর গল্পের মধ্যে তারই জ্বালাভরা এক শুষ্ক লেলিহ রসনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ— সব কিছুই যেন এই খর রৌদ্ররসে অভিসিক্ত।" (২)

মজা নদী, শুষ্ক কাঠ ফাটা মাঠ, জনহীন দীঘি, প্রতিমাহীন ভাঙা মন্দির, ভেঙ্গে পড়া জমিদারদের বিলাসগৃহ, ঘোড়াহীন আস্তাবল, বিষধর উদয়নাগ সাপ, বিশালমোষ, দ্রুত-ধাবমান ঘোড়া,—এগুলো এখানে আঞ্চলিক প্রকৃতি ও জীবনের প্রতীকরূপে ইতস্ততঃ দেখা যায়। রূঢ় রুক্ষ মাঠে শোনা যায় কাপালিকের মন্ত্র, আখড়া থেকে ভেসে আসে বোষ্টমীর কীর্ত্তনের সুর কিংবা অন্ধ ভিখারীর ঝুমুরগান, ভাদু উৎসবে গ্রামের মেয়েরা ভাদু গান গায়। পাগলা কাহার ভাঁজোর সুরে পল্লী-জীবনের সরস কেচ্ছা গেয়ে বেড়ায়। সেই সঙ্গে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক সমাজব্যবস্থার সংঘাতের শব্দ শোনা যায়। ক্ষয়িষ্ণু অতীতের ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস পড়ে শূন্য জলসাঘরে অথবা যুদ্ধের জন্যে কেটে নিয়ে যাওয়া বাঁশবনের ফাঁকা জমির উপর দাঁড়ানো গ্রামের মোড়লের মুখ থেকে। "শৈলজানন্দ যার আভাস মাত্র দিলেন, তারাশঙ্কর

তাকেই সমগ্রতায়, গভীরতায়, জীবনরহস্যের নিগূঢ় অর্থদ্যোতনায় একটি বিশালতা দিলেন।" (৩) তারাশঙ্কর রাঢ়ের অশিক্ষিত অমার্জিত অপরাধ প্রবণ মানুষের সঙ্গে মিশেছেন। তাদের জৈবিক প্রবৃত্তি, কুসংস্কারে নিমজ্জিত চাল-চলন দেখেছেন এবং তাদের সেই জীবন যাত্রার রহস্যদ্বার উন্মোচন করেছেন আমাদের সামনে। কেবল ভোগের উন্মাদনায়, কামনার নাগপাশে জারিত গ্রাম্যজীবন কি ভাবে আলোড়িত, বর্ধিত, স্পন্দিত হচ্ছে তা তারাশঙ্করই প্রথম তুলে ধরেছেন। তাই "প্রথম থেকেই তারাশঙ্কর কারো প্রতিধ্বনি নন—প্রকৃতির সহজ শক্তির মতোই অরুগ্ন ও মৌলিক তাঁর শিল্পীসত্তা।" (৪) তাই তারাশঙ্করের লেখা পড়লেই সমগ্র রাঢ় বাংলা যেন জীবন্ত ও স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। রাঢ়ের জীবন, মাটির বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক সীমানা, ভাষা, আচার ব্যবহার—সবই চেনা যায়। "উত্তর রাঢ়ের মাটি ও সমাজ ঐ অঞ্চলের মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশে তাঁর রচনায় অবিনশ্বর হয়ে উঠেছে। রাঢ়ের মাটি আর মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং নিবিড় আত্মীয়তার ফলে বাংলার এই বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক রূপও এক অভিনব রসমূর্তি নিয়ে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। সমাজতন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা এবং সামাজিক ইতিহাসে উত্থান-পতনের কাহিনীও রসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। মাটির গন্ধ ও ঘ্রাণ এসেছে সাহিত্যে। প্রকৃতির প্রাণলীলার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রথিত হয়ে নতুন রূপ খুলেছে মানুষের। সাহিত্যের স্বাদ গিয়েছে বদলে। বাংলা সাহিত্যে তাই তারাশঙ্কর এক নতুন অধ্যায়।" (৫) মহাজন-জমিদার-সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে সাধারণ শ্রেণী, ধনী ও দরিদ্রের সংঘাত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্যা, বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ, মূল্যবোধহীন মানুষ কমিউনিজমে বিশ্বাসী বাঙালী—এই সবেরই চিত্র এঁকেছেন গ্রাম্যজীবনের কারিগর, মরমী হিয়ার দরদী-শিল্পী তারাশঙ্কর।

ক) জমিদার তন্ত্রের প্রকৃতি ও বিচিত্ররূপ

জমিদারীপ্রথা এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রাম বাংলার জীবনে এঁরাই ছিলেন প্রতিপালক, অভিভাবক স্বরূপ। জমিদারের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। কিন্তু কোম্পানীর শাসনে ১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে গ্রাম বাংলায় সৃষ্টি হয় অসংখ্য নব্য জমিদার। তাঁদের চরিত্রে ভাল-মন্দ দুটো দিকই ছিল। তাঁদের অত্যাচার, শোষণ, অবিচার যেমন সীমাহীন ছিল তেমনি ছিল তাঁদের গঠনমূলক মানসিকতা ও প্রগতিবাদী দৃষ্টি। তারাশঙ্কর জমিদারীর এই ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁদের প্রতি মমত্বও ছিল তারাশঙ্করের অসীম। এর কারণ তিনি ছিলেন জমিদার সন্তান। তাঁর লেখনীতে সর্বশ্রেণীর জীবনচর্যা বিধৃত হলেও। "কিন্তু তারাশঙ্কর স্বক্ষেত্রে অনেকখানি স্ফূর্ত বলে মনে হয়। সে ক্ষেত্র হলো ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনী রচনায়" (৬) তাই নব্য উদীয়মান ব্যবসায়ী তাঁর লেখনীতে শুধু অখ্যাতিই বহন করেছে।

শৈশবে মা ও পিসীমার কাছে অনেক গ্রাম্য গল্প তিনি শুনেছিলেন। তাছাড়া তাঁদের বাড়ীতে সকল শ্রেণীর মানুষ আসত। "তারাশঙ্করের বাল্যবেলায় তাঁদের বাড়ীতে সেতারি, জ্যোতিষী, পটুয়া, লাঠিয়াল, ডাইনী, বেদেনী আরও কত রকমের মানুষ আসতো। সবার গল্প শুনেই অভিজ্ঞতা বাড়তো তারাশঙ্করের।" (৭)। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তারাশঙ্করকে জমিদারী দেখাশুনা করতে হয়েছে। তিনি প্রজাদের কাছে গেছেন, খাজনা আদায় করেছেন, খাজনা বৃদ্ধি করেছেন, জমিদারীতে মহাজন বসিয়েছেন। যে প্রজা খাজনা দিতে পারেনি তাকে মহাজনের কাছে ঋণ দিতে বাধ্য করিয়েছেন। আবার তাঁর শরিক জমিদারদের অদ্ভুত চরিত্রের কর্মপদ্ধতি স্বচক্ষে দেখেছেন। বীরভূমের মধ্যে লাভপুর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত গ্রাম, কারণ এখানে অসংখ্য জমিদারের বাস। লাভপুরে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। প্রাচীন জমিদারগণ নিজেদের 'রাজা' বলে জাহির করতে ব্যস্ত আর নব্য ব্যবসায়ী-প্রধান জমিদারগণ চান সমাজে প্রতিষ্ঠা। ফলে লুপ্তপ্রায় সামন্ত জমিদারগণ আপন অস্তিত্ব রক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠেন। ব্যবসায়ীগণ যখন প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে গ্রামে ভাল কাজ করতে ব্যস্ত অন্য দিকে তখন স্থায়ীত্ব রক্ষার তাগিদে জমিদারগণ শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে স্বীয় দাপট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর—এমনই এক পরিবেশে তারাশঙ্করের আবির্ভাব। তিনি এই দ্বন্দ্ব দেখলেন এবং জমিদারদের চিত্র বাস্তব-দৃষ্টি নিয়ে গল্পে তুলে ধরলেন। যুগের পরিবর্তন লাভপুরে বেশী প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল বলে তারাশঙ্করের পক্ষে গল্প লিখতে সহজ হয়েছিল। তিনি নিজেই 'আমার কালের কথা'য় স্বীকার করেছেন—লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুতগ্রাম। আমার জন্মস্থান আমার মাতৃভূমি আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপ মহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।" (৮)

জমিদারগণের অধিকাংশই ছিলেন শাক্ত এবং প্রজারা ছিলেন বৈষ্ণব। শাক্ত জমিদারগণ ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক, একগুঁয়ে এবং অত্যাচারী। ধর্মভীরু প্রজাকুল সেই অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে। হঠাৎ ইংরেজ কোম্পানীর বদান্যতায় আবির্ভূত হলেন নব্য ব্যবসায়ী জমিদার। শুরু হল স্ব-মহিমা গরিমা প্রতিষ্ঠার লড়াই। জয় হল কাঁচাপয়সার অর্থাৎ নব্য জমিদারদের। "দেখেছি কি করে একটি পুরানো ঐতিহ্য ভেঙ্গে যায়, নতুন সভ্যতা গড়ে ওঠে, আমার জীবনেও তার ইঙ্গিত আছে বাপ-ঠাকুর্দার সামান্য জমিদারী ছিল। কিন্তু সেই আভিজাত্য তখন লুপ্তপ্রায়। ওঁরা (বাবা-মা)

ভেবেছিলেন আমি উকিল হবো ঘটনাক্রমে হলুম রাজনৈতিক কর্মী। দেখলুম কীভাবে গ্রামের সমাজ পাল্টে যাচ্ছে, শহর-জীবন হাতছানি দিচ্ছে ..... আমি ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ। বিত্ত ছিল না, অহংকার আর আভিজাত্যটাই পেয়েছি, অন্যদিকে আমার স্ত্রী ধনী পরিবারের সন্তান—পুরানো আভিজাত্যের সম্পর্কে সম্পর্কহীন। এই দ্বন্দ্ব আমার সারাটা জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত—প্রায় সারাটা জীবন উপলব্ধি করে এসেছি"। (৯) "পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, নৈতিক জীবন, কর্মজীবন, রাষ্ট্রজীবন কোন জীবনই বাদ যায় নি—ভূস্বামী-প্রজা-মূলধনী-শ্রমিক ও ধনী-দরিদ্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বর্তমান যুগে প্রবল হয়ে উঠেছে—জাতীয় জীবনের সাহিত্য প্রতিনিধির চিন্তাকে তা বিচলিত করেছে।" (১০) এই প্রত্যক্ষ সংঘর্ষই তারাশঙ্করের গল্পে বিধৃত। জমিদারগণের রক্ষণশীল মানসিকতা সমাজে প্রভুত্ব করার অদম্য ইচ্ছা, বিলাস-ব্যসন, অত্যাচার, আশ্রিত বাৎসল্য, সৌন্দর্যরুচি ইত্যাদি সবই জমিদারীচরিত্রে দেখেছেন তারাশঙ্কর এবং তাঁদের সেই চিত্রই তিনি বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান হলেও জমিদারী প্রথা, আদব-কায়দা, সংস্কার, ঐতিহ্য, পুরাতন-কীর্তির সজীবতার মধ্যেই তিনি বড় হয়েছিলেন। তাই তিনি বেশীর ভাগ গল্পেই জমিদারদের এনেছেন, দেখিয়েছেন তাঁদের বিভিন্ন চিত্র। "তাঁর রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘনিশ্বাসে ভরে উঠেছে"। (১১) "৫০০০ টাকা আয়ের জমিদার বংশে জন্মে এবং ধনী ব্যবসায়ী ঘরের জামাতারূপে তিনি অবক্ষয়ের আত্মগ্লানি এবং ধনতান্ত্রিক দাম্ভিকতা উভয়-ই পরখ করেছেন খুব কাছ থেকে, বিচিত্র মানুষকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। কংগ্রেসকর্মী থাকাকালীন এই সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে রঞ্জিত হয়েছে তাঁর জীবন, তাঁর সাহিত্য, তাঁর অভিজ্ঞতা।" (১২)

বাংলাদেশে গত কয়েক শতক ধরে জমিদারগণই ছিলেন গ্রাম্যজীবনের নিয়ন্ত্রক। পতনে-উত্থানে, দিবসে-নিশীথে সুখে-দুঃখে, দানে-গ্রহণে ভালোয়-মন্দয়, সৃষ্টিতে-ধ্বংসে সর্বত্রই জমিদারী ঐতিহ্য বেগবান ছিল। "গত দুই-তিন শত বৎসরের দেশকে বুঝিতে হইলে এই জমিদারদিগকে বুঝিতে হইবে তাঁহাদেরই কেন্দ্র বিকীরিত শক্তি দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ কোন আত্মস্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ধারণশক্তি ছিল না জমিদারের প্রভাবই তাহাদের প্রাণস্পন্দনের গতিবেগ ও ক্রিয়াশীলতার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দিত। দেশের মধ্যে যে দুর্ধর্ষ, নিয়ম শৃঙ্খলার পরিপন্থী বিদ্রোহশক্তি ছড়ান ছিল, তাহা জমিদারের অত্যাচারের দ্বারাই উত্তেজিত হইয়া ঐক্য ও সংহতি লাভ করিত"। (১৩) এই ঐতিহ্যবাহী জমিদারদের নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি গল্পে ও উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। কিন্তু "এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গনের চিত্র অঙ্কন করে তারাশঙ্কর বস্তুতঃ কোন অ্যানাক্রনিজমের পরিচয় দেন নি। তিনি যুগক্রান্তি পর্বের বাঙলাদেশেরই এক মর্মস্পর্শী বাস্তবসত্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন।" (১৪)

এবার তারাশঙ্করের বিভিন্ন জমিদার-প্রধান গল্প উত্থাপন করে তাঁদের বিচিত্ররূপ ও চাল-চলন দেখা যেতে পারে—

রায়বাড়ি ঃ লাভপুরের অসংখ্য ক্ষুদে তান্ত্রিক-জমিদারদের উগ্র-দাপট, আত্মম্ভরিতা, অত্যাচার প্রজাদের উপর নিপীড়ন স্বচক্ষে দেখে তারই বাস্তব চিত্র তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন 'রায়বাড়ি' গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের চরিত্রে। ১২৭০ সাল ইংরেজী ১৮৬৩ সালের ঘটনা। রাজারামপুরের মহাপ্রতাপশালী জমিদার রাবণেশ্বর রায়। রায়বংশের তিনি ৪র্থ পুরুষ। বয়স প্রায় চল্লিশ, কিন্তু শরীরে মেদের চিহ্ন নেই। দীর্ঘকায়, খড়্গের মত মত তীক্ষ্ম নাসিকা, আয়ত চোখ, বলিষ্ঠ দেহ, বুঢ়োরস্ক, ক্ষীণ কটি দেশ। পরণে গরদের কাপড়, গায়ে নামাবলী, শুভ্র উপবীত, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, দক্ষিণ বাহুতে সোনায় মোড়া একটি রুদ্রাক্ষ, অনামিকায় নবরত্নের একটি আঙটি। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জমিদার প্রায়ই 'তারা-তারা' বলেন। তিনি প্রজাপালনে যেমন রাজসিক, তেমনি দুর্বিনীত প্রজাশাসনেও ছিলেন মেধসের মত। একদিকে ভোগলিপ্সা, অন্যদিকে ভগবদ্ভক্তি। শোকে অবিচলিত, বৈরীনির্যাতনে নির্মম, কঠোর রাবণেশ্বর নিত্য পূজার্চ্চনা করে থাকেন। বাড়ির চারপাশেই রাধা-গোবিন্দজী, জগদ্ধাত্রী, কালী প্রভৃতি বিগ্রহের মন্দির। একাধারে তিনি তান্ত্রিক, আবার রাধাগোবিন্দের পুজোও করে থাকেন।

১০৯২ নম্বর লাট হুদা-শ্যামপুরের দুর্বিনীত প্রজারা জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। প্রথানুযায়ী জমিদারকে তারা নজরানার টাকা দেয়। জমিদার তাদের (হিন্দু-মুসলমান) পৃথকভাবে রাত্রিবাস করার ব্যবস্থা করেন। খেতে দেন উপাদেয় খাবার। নিজের বাড়ির জন্যে আনা দুধ প্রজাদের খাইয়েছেন। চল্লিশজন অতিথিকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেন না রায়বাবু। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রজাদের খাওয়ার তদারকি করেছেন। প্রজাদের মধ্যে রাধানাথ এই সময় বলে "রাজায়-প্রজায় সম্বন্ধ হল বাপ আর বেটা।" এই কথা শুনে গম্ভীর মুখে রায়বাবু বলেছেন, 'শুনে তো আসছি তাই চিরকাল। কিন্তু বেটায় এত বাপ-বদল করে কেন হে? পছন্দ হয় না?" (রায়বাড়ি) পরদিন প্রজাদের নতুন ধুতি চাদর ও বাড়ী ফেরার গাড়ী ভাড়া দিয়ে বিদায় দেন রায়বাবু।

সেই হুদা-শ্যামপুরের প্রজারা উত্তেজিত হয়ে রায়বাবুর গোমস্তাকে ফুটন্ত গুড়ের কড়াইয়ে ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই সংবাদ পেয়ে রাবণেশ্বর জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠে কালী বাগদীকে দিয়ে ছত্রিশ মৌজা জ্বালিয়ে দিয়েছেন। বৈষ্ণববংশের কন্যা রাণীমার শত অনুরোধ সেদিন রাবণেশ্বর কর্ণপাত করেন নি কারণ প্রজারা তাঁর মাথায় পা দিয়েছে। কর্তব্যনিষ্ঠাতেও রাবণেশ্বরের চরিত্র উজ্জ্বল। তাঁরই স্বার্থের জন্যে গোমস্তার মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি গোমস্তার বিধবা স্ত্রী

ও পুত্রের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কালী বাগদীর কাছ থেকে যখন মৌজা পোড়ানোর সংবাদ পেলেন তখন কালীমন্দিরের পরিচায়ক অক্ষয়কে রায়বাবু বলেছেন "কালীমায়ের প্রসাদী কারণ দাও গিয়ে।" তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সংঘর্ষের চিত্র, তান্ত্রিকগণ কালীমাকে কারণ (মদ্য) দিয়ে পূজো করেন তারও চিত্র তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন।

রথযাত্রার পর পুণ্যাহের দিন। রাণীমা পুত্রসহ বাপের বাড়ী গেছেন। আজই ফেরার কথা। রায়বাড়িতে দান-ধ্যান, কাঙালীভোজন, নাচ-গান, জলসাঘরে আলোর রোশনাই ইত্যাদির মহাসমারোহ চলছে। হঠাৎ কালীলেঠেল রায়বাবুকে সংবাদ দেয় যে নৌকাডুবিতে রাণীমা ও পুত্রের সলিল সমাধি হয়েছে। শোকে মুহ্যমান রায়বাবু তারপরে সংসার ত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেন, সর্বদা উচ্চারণ করতে থাকেন "তারা" "তারা"। যাবার আগে স্ত্রী-পুত্রের শ্রাদ্ধ বিরাটভাবে করেছেন, "রায়বাড়িতে এত বড় শ্রাদ্ধ যেন আর কেউ না করে থাকে।" হুদ্দা শ্যামপুরের প্রজারা এলে রাবণেশ্বর তাদের উদ্দেশ্যে বলেন "তোমরা দুঃখ পেয়েছো তোমাদের সে দুঃখে তিনি কাতর হয়েছিলেন। তোমাদের যার যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা তোমরা গ্রহণ কর।" এখানে তাঁর অনুতপ্ত ও পত্নীনিষ্ঠ চরিত্রের সন্ধান মেলে। ললিত কঠোরে রাবণেশ্বর চরিত্র তাই বড়ই বৈচিত্র্য বহুল।

এদিকে হঠাৎ বন্যার জলে দীঘলমারীর বাঁধ গেছে ভেঙে; তালগাছ প্রমাণ জলে ভাসিয়ে দেয় প্রজাদের ঘর-বাড়ি। অসহায় প্রজারা রায়বাবুর কাছে আশ্রয়ভিক্ষা চাইলে তিনি দরজা খুলে দিয়েছেন। এমনকি বৃদ্ধ প্রজা নবীন গাঙ্গলীর কন্যার বিবাহের জন্যে রায়বাবু রায়বাড়ির ঐতিহ্য সেই জলসাঘর খুলে দিয়েছেন গভীর নিশীথে একবস্ত্রে, নগ্নপদে, নিঃসম্বল অবস্থায় লাঠি হাতে খিড়কির দরজা দিয়ে বের হয়ে যান। নদীর খাট থেকে জমিদার দেখলেন জলসাঘরে তখনও বিয়ের আলো জ্বলছে। তিনি শুনতে পেলেন আহার তৃপ্ত ক্ষুধার্তের জয়ধ্বনি, "অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক; আমরা সুখে বেঁচে থাকি।" বিচলিত হয়ে রায়বাবু আবার বাড়িতে ফিরে আসেন। শ্যালকের অবেদনে সাড়া দিয়ে শ্যালিকার পাণিগ্রহণ করেন, আবার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করেন। কারণ রায়বংশের ধ্বংস হতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। রাবণেশ্বর রায় এক বিরাট চরিত্র। "চারিত্রিক আভিজাত্য, সমুন্নত মহিমা তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্ব, আতিথ্য-নিষ্ঠা, নির্মম প্রতিহিংসা পরায়ণতা, বজ্রকঠোর দৃঢ়তা, নিদারুণ শোকের মধ্যেও অবিচলিত ধৈর্য এই বিচিত্র দোষগুণের সমন্বয়ে রাবণেশ্বর রায়ের চরিত্র অসাধারণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।" [১৫] তদানীন্তন মেজাজী জমিদারতন্ত্রের যাবতীয় গুণাবলী এই গল্পে বিদ্যমান। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলেছেন, "রাবণেশ্বর রায়ের দৃপ্ত শৌর্য, ভোগলিপ্সার মধ্যে অটল ভগবৎভক্তি, শোকে অবিচলিত ধৈর্য, দানে মুক্তহস্ততা, ও বৈর নির্যাতনে অনমনীয় দৃঢ় সংকল্প এই সমস্ত দোষগুণ মিলিয়া তাঁর চরিত্রকে রাজোচিত বিশালতা দিয়াছে।" [১৬] রাবণেশ্বর-চরিত্রে যে ত্রুটি ছিল তা হল তাঁর প্রতিহিংসা কাপুরুষোচিত। এই ত্রুটির কথা রথীন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও স্বীকার করেছেন। "কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই অসঙ্গতিই সে যুগের জমিদার শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করে তুলেছে। ঔদার্যের সঙ্গে নির্মমতার বিচিত্র মিশ্রণে রাবণেশ্বরের চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।" [১৭]

এই গল্পটি কবিগুরুর হৃদয়কে দারুণভাবে নাড়া দেয়। রাবণেশ্বর সংসার ত্যাগের জন্যে নৌকায় উঠতে গিয়ে আবার প্রত্যাবর্তন করেন। এই অংশটুকু পড়ে ইরিসিপ্লাসের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবার পর রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছে "এরই মধ্যে অচৈতন্যের অন্ধকার থেকে চৈতন্যের দীপ্তির মধ্যে তাঁর নিজের ফিরে আসার একটি মিল খুঁজে পেয়েছেন।" [১৮]

জলসাঘর ঃ জমিদার-চরিত্র ও আভিজাত্য নিয়ে লেখকের সংশয়ের অন্ত ছিল না। তিনি জানতেন যে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী চরিত্রকে সমর্থন করা যায় না। তাই সমাজ-সেবী তারাশঙ্কর জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি কামনা করেছেন আবার জমিদারদের অবক্ষয় দেখে মানবতাবাদী লেখক হা হুতাশ করেছেন। কারণ লেখক ছিলেন সমন্বয়বাদী ও শান্তিপ্রিয়; তাই কোন ব্যক্তিরই ধ্বংস বা মৃত্যু তিনি কোনদিনই চান নি। সুতরাং নতুন ও পুরাতনের সংঘর্ষে নবীনের অনিবার্য জয়কে যেমন, স্বীকার করেছেন, আবার বিলীয়মান অতীতকে স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। ১৯৩০ সালের পর এদেশের সমাজ, অর্থ, ধর্ম, মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে যে পরিবর্তন এসেছিল সেই সঙ্গে নতুনের প্রতি ঝোঁক বা আকর্ষণ এবং প্রাচীনকে অনীহা করার এক দৃঢ় প্রত্যয় জেগে ওঠে। "আধুনিক পশ্চিমী ধনতন্ত্র ও যন্ত্রসভ্যতার চাপে গ্রাম-নির্ভর দেশের ভিত্তিমূল শিথিল হওয়ার ঐতিহাসিক চেতনা" [১৯] —একথা অনস্বীকার্য। আভিজাত্যহীন আধুনিকতা ও প্রতিপত্তিহীন আভিজাত্যের লড়াই শুরু হয়েছে—মাঝখানে ঋজুবাক তারাশঙ্কর রচনা করলেন অসংখ্য তারামঞ্জরীর শ্রেষ্ঠ মঞ্জরী জলসাঘর। "বিখ্যাত জলসাঘর গল্পটি রায়বাড়ি গল্পের পরিপূরক বলা যেতে পারে।" [২০] এই গল্পের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়—রায়বংশের সপ্তম পুরুষ। তিন পুরুষ ধরে সঞ্চয় করে যে বিশাল জমিদারী গড়ে তুলেছিলেন তা চতুর্থ পুরুষে ঠিক থাকলেও পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরুষের আমলে ম্লান হতে থাকে। কারণ তাঁদের আকণ্ঠ ভোগ বিলাস। ফলে ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন। সেই ভগ্নস্তূপে আবির্ভূত হন বিশ্বম্ভর রায়। যেটুকু জমি-জমা-পুকুর বাগান ছিল তাও প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে চলে যায়। ঋণের সাগরে তিনি ডুবতে থাকেন। পুত্রের উপনয়নের পরে মাত্র সাতদিনের মধ্যেই দুই পুত্র এক

কন্যাসহ স্ত্রী কলেরায় মারা যান। ছন্নছাড়া, শ্রীহীন বিশ্বম্ভর এবং তাঁর প্রিয় তুফান (ঘোড়া) ও ছোটগিন্নী (হস্তিনী, মায়ের বিবাহের যৌতুক) দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে কোনরকমে বেঁচে থাকেন। লোকজন বলতে তারাপ্রসন্ন (নায়েব) অনন্ত (চাকর), রহমত (সওয়ার) এরা সকলেই পুরোনো দিনের কর্মচারী। নয়টি ঘোড়ার মধ্যে মাত্র তুফানই টিকে আছে। কিছুদিন আগেও সুদর্শন রাজপুরুষের মত বিশাল বপু নিয়ে তুফানের পিঠে চড়ে শিকারে যেতেন আজ তিনি কেবল দো-তলাতেই থাকেন। রায়বাড়ি জৌলুসহীন, আলোঝলমল জলসাঘর আজ অন্ধকার যেন সারা মহলটাই প্রেতপুরী। ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামীর অন্তিম আর্তনাদ সর্বত্র প্রসারিত। গ্রামে এসেছে নতুন ধনতান্ত্রিক যুগের জেহাদ। তাই রায়দপ্তরের সামান্য মহাজন মহিম গাঙ্গুলী আজ কাঁচাপয়সায় ধনী হয়েছে। রায়-বাড়ির হৃতসম্পত্তির গাঙ্গুলী দখল নিয়েছে। ক্রোধে, ক্ষোভে অভিজাত বিশ্বম্ভর মহিমের পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমন্ত্রিত হয়েও যান নি। নায়েবকে দিয়ে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। অন্যদিকে মহিম সমাজে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব। বাধা কেবল রায়বাড়ি, তাই মহিম ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করেছে—রায়বাড়ির "মরা পাহাড়ের চুড়ো ভাঙতেই হবে।"

অন্যদিকে আভিজাত্য ও আত্মমর্যাদায় অটুট বিশ্বম্ভর ঘরের এক কোণে আত্মগোপন করে কেবল অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন। কিন্তু নীতিজ্ঞানহীন উগ্র আধুনিক মহিমের অভদ্র আচরণ ও বিদ্রূপের অগ্নিজ্বালে ধৈর্যচ্যুত হয়ে বিশ্বম্ভর একদিন অসম প্রতিযোগিতায় নামেন। জলসাঘরে আবার আলো জ্বলে, বসন্তের এক সন্ধ্যায় কৃষ্ণা বাঈজীর নাচের আসর বসে। বকসিস দিতে বিশ্বম্ভরের শেষ সম্বল স্ত্রীর সামান্য অলংকার নিঃশেষ হয়ে যায়। সাময়িক যৌবনের তাড়নায় আকণ্ঠ সুরাপান করে এস্রাজে সুর তোলেন, স্মৃতিতে ভেসে ওঠে পূর্বের দিনগুলো, এমন সময় মহিমের বাড়ি থেকে শোনা যায় রাত তিনটার ঢং ঢং আওয়াজ। অসহ্য হয়ে পাগড়ি, চাদর ও সওয়ারের পোষাক পরে, পায়ে জরিদার নাগরা ও হাতে চাবুক নিয়ে তুফানের পিঠে চড়ে কীর্তিহাট লাটে এসে থামেন। যে লাটটি তাঁদেরই ছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখেন জলসাঘর তখনও খোলা, অভিসারিকা চলে গেছে। ক্ষীণ আলোয় দেওয়ালে পূর্বপুরুষদের চিত্রগুলির মুখে মত্ত হাসি দেখে সভয়ে পিছিয়ে যান। "সহসা মনে হইল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন! মোহ! কেবল তাঁহার নহে, সাত রাজের মোহ ঐ ঘরে জমিয়া আছে।" হাতে চাবুকটা দরজায় আছড়ে পড়ে যেন একটি কালের অন্তিম আঘাত হানে। বিশ্বম্ভর বাবু মদ্যপ, সৌখিন, মার্জিতরুচি সম্পন্ন সদাচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিলেন কিন্তু মহিমের উগ্র আস্ফালনের পর একেবারে গুটিয়ে নেন নিজেকে। মিতভাষী বিশ্বম্ভর এতই অভিমানী যে তিনি দু'বছর নীচেয় নামেন নি; অর্থহীন হলেও মর্যাদাহীন হন নি। তাই মহিমের পুত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে ১টি মোহর ও কাঁসার থালা এবং সেইসঙ্গে ছোটগিন্নীকে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। মহিম রায়বাবুর বাড়িতে গিয়ে অমার্জিত কথা বলেছে অথচ রায়বাবু অন্তরে ব্যথিত হলেও মধুর ব্যবহার করেছেন। সর্বত্রই এক চাপা ক্ষোভ ও দীর্ঘশ্বাস বিরাজমান। একালের আভিজাত্যহীন ধনী ব্যবসায়ী মহিমের সঙ্গে অতীত আভিজাত্য-দম্ভ-গর্ববাহী বিশ্বম্ভরের সংঘর্ষ এবং পুরাতনের পরাজয়। উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, বিলাস-ব্যসনে মত্ত থেকে অভিজাত বংশের যে শক্তি-মহিমা অপচিত হয়েছে তারই সার্থক রূপায়ণ জলসাঘর। তুফান ও ছোটগিন্নী এই মূক প্রাণী দুটির আবির্ভাবে গল্পটি যেমন রসঘন হয়েছে, তেমনি তারাপ্রসন্ন ও অনন্তের মধ্যে ফুটে উঠেছে সামন্তযুগীয় সহানুভূতি ও প্রভুভক্তির উজ্জ্বলতা, "তারাশঙ্কর পুরাতনের অন্তর্জীর্ণতা ও তার মহিমা-সগম্ভীর আভিজাত্যের মধ্যে যেমন এক মর্মান্তিক ট্রাজিক চেতনাকে রূপ দিয়েছেন, তেমনি নূতনের সম্ভাবনাদীপ্ত আবির্ভাবকেও তাঁর রচনায় অনিবার্য করে তুলেছেন।" [২১] 'জলসাঘর' মূলতঃ অর্থনীতিগত বিরোধের দর্পণ। কাঁচা পয়সা মানুষকে উগ্র আধুনিক ও কৃত্রিম করে তোলে, মানসম্ভ্রম ভুলিয়ে দেয়, সর্বত্র নষ্টালজিক মানসিকতা গড়ে ওঠে—তা তারাশঙ্কর ঋজু-দৃষ্টি নিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং বিভিন্ন গল্পে তা তুলে ধরেছেন।

রাজা, রাণী ও প্রজা ঃ তারাশঙ্কর ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণীর অন্তিম প্রতিনিধি। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মা ও পিসীমার স্নেহে ও শাসনে বড় হয়ে ওঠেন। প্রতিবেশীদের ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভাতুর দৃষ্টি তারাশঙ্করকে নির্মম আঘাত হানে। উদীয়মান ব্যবসায়ীর সঙ্গে জমিদারদের বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও দম্ভে যখন লাভপুর সমাজ জীবন উদ্ভ্রান্ত; সৌজন্য, কীর্তি, কৌলিন্য বজায় রাখতে উভয়ে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে বৃটিশ সরকার বিলীয়মান ভূস্বামী গোষ্ঠীকে নির্মমভাবে করের বোঝা চাপিয়ে নিত্য হয়রাণি করছে। স্বয়ং লেখকও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন খাজনার টাকা জোগাড়ের জন্যে।

১৯৪৬ সালের ঘটনা। সম্ভবতঃ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-জনিত কারণে প্রজারা খাজনা দিতে অক্ষম, আবার কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বলেই জমি বা অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করতে নারাজ। অথচ সরকারী সদনে রাজস্ব দাখিলের দিন সমাগত। তাই রাজা প্রাসাদ ছেড়ে মহলে খাজনা আদায় করতে গেছেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে যত গণ্ডগোলের মূল পাণ্ডা গোমস্তা। বাজীকরের মত রাজা ও প্রজাকে খেলাচ্ছেন। গ্রামের মোড়ল রাইবল্লভ সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে; গ্রামে ধর্মঘট করিয়েছে, খাজনার টাকা দিতে রাজী হয় না। গোমস্তা যখন রাইবল্লভকে ছেলেকে পড়ানোর টাকা জোটে অথচ জমিদারের খাজনা জোটে না বলে ধমকান তখন রাইবল্লভ বলে "বুদ্ধিমান ছেলে, মাইনরে বৃত্তি পেলে তাকে পড়াবার সাধ হয় বৈকি। লেখাপড়া শিখলে ভদ্রসমাজে বসতে পারে, আমাদের মত মাটিতে বসবে না।" এই রকম অনেক ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় রাজাবাবু ক্ষিপ্ত হয়েছেন। এমনকি রাইবল্লভের ইঙ্গিতে কাছারিতে

আগুন লাগানো হয়েছে। তাই ধৈর্য হারিয়ে স্নেহপ্রবন রাজার হৃদয়ে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। রাইবল্লভকে শাস্তি দিতে তিনি মরিয়া। অথচ রাইবল্লভ জমি বিক্রি করে অন্যত্র চলে যাবে এই কথা শুনে রাজাবাবু জমিবিক্রি বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এখানে রাজাবাবুর হৃদয়ে একদিকে কঠোর শাসক ও অন্যদিকে স্নেহপ্রবণ পিতার চরিত্র প্রতিফলিত হয়। রাজাবাবু হিংসার পরিবর্তে শান্তি চান। তাই শিকার করতে গিয়ে নাগালের মধ্যে হরিয়াল পাখিদের পেয়েও হত্যা করতে পারেন নি। নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে তিনি বলেছেন—"পৃথিবীর আদিকাল হইতে এই শান্তিময় স্থানটায় রক্তাক্ত হত্যা কেহ কখনও করে নাই। আমি সে স্থানটাকে রক্ত-কলঙ্কে কলঙ্কিত করব?" রাজাবাবু নির্দয় হয়েছেন তার কারণ বৃটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়ের প্রবল তাগিদ। বিদ্রোহী রাইবল্লভের ব্যবহারে রাজাবাবু যখন অতিষ্ঠ তখন রাইবল্লভের স্ত্রী রাণীমার কাছে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে। দয়াবতী রাণীমা তাকে সপুত্র আশ্রয় দিয়েছেন, এমন কি নিজ পুত্রসম রাইবল্লভের পুত্রকে পালন করেছেন। রাইবল্লভও শেষে রাণীমার কাছে নাক, কান মলে ক্ষমা চেয়েছে। এখানে সহজ, সরল প্রজানুরঞ্জক, অহিংস, সংবেদনশীল জমিদারের চিত্র পাওয়া যায়। গল্পটি লেখকের নিজের জীবনের বাস্তব চিত্র।

খড়্গ ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জমিদার রায়জীবন রায়। বর্তমানে অর্থ, সম্পদ, অস্ত্র, লোক-লস্করহীন শিক্ষিত উকিল রাজাবাবু রায়বংশের আলোকবাহী। ধর্মভীরু সরল, উদার মানুষ। বর্তমান জমিদারের চরিত্রের বিশেষ পরিচয় নেই। গল্পটির উত্তরণ অহিংসার দিকে। গল্পের মূল নায়ক ছেত্তা কর্মকার জাতিস্মর। সে পিতার অনুরোধে আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবহত্যায় রত হয়। অবলীলাক্রমে বড় মহিষ বলি দিলেও একদিন কলেশনাথের পূজোতে ছোট একটি পাঁঠাকে দ্বিচ্ছেদ করে। মনের দুঃখে খড়্গখানিতে পাথরবেঁধে রামসাগরের জলে নিক্ষেপ করে এবং ঐ জলে নিজেও আত্মহত্যা করে। দীর্ঘ ২৫০ বছর পর রাজাবাবু খড়্গখানিকে উদ্ধার করেন ও সংস্কারের জন্যে এই কর্মকারের কাছে নিয়ে আসেন। কালদণ্ড ও যমদণ্ড খড়্গ দুটি একই ধাঁচের। সংস্কারের জন্যে তাই যমদণ্ডকে দেখার প্রয়োজন। অথচ সেটি আছে রামজীবনের আরেক বংশধরের কাছে নওয়াপাড়ায়। সেই উদ্দেশ্যেই ঢেকায় গমন। রামসাগরের বাঁধানো ঘাটে সন্ধ্যাকালে এক মায়াময় পরিবেশে ছেত্তা শয়ন করে এবং স্বপ্নে বিগত জীবনের কথা স্মরণ করে। জ্ঞান হলে সে বর্তমান খড়্গটিকেও রামসাগরের জলে নিক্ষেপ করে।

এই গল্পটি লেখার জন্যে তারাশঙ্কর বীরভূমের প্রাচীনকালের রাজধানী রাজনগরের ধ্বংস-প্রায় দো-তলার ঘরে ও কালীদহের সামনে গিয়েছিলেন।

ব্যাঘ্রচর্ম ঃ অজ পাড়াগাঁ মজিদপুরঃ অন্ধকুসংস্কারে গ্রামবাসী বন্দী। সেখানে ইট তৈরী, কয়লা পোড়ানো বা শেয়ালে ছাগল ধরলে তাকে তাড়ানো এ-সবই নিষিদ্ধ। সেই গ্রামে নব্য শিক্ষিত হেমাঙ্গবাবু জমিদারীর কাজে কাছারিতে এসেছেন। দুটি এ্যালশেসিয়ান কুকুর এবং বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। দুটি বন্দুক ছিল তা নিয়ে শিকার করাও তাঁর প্রিয় সখ ছিল। হঠাৎ অদ্ভুত প্রকৃতির হৃষ্টপুষ্ট প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা মাথায় ঝাকড়া চুল, হাতে লাঠি, কপালে কাটা দাগ নিয়ে হাজির হয় রতন হাড়ি, জমিদারের কাছে দাঙ্গা-খুন-জখমের আস্ফালন করে। হেমাঙ্গবাবু তার কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজ মহালে বহাল করেন। স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে রতন। কিন্তু যখন তার উপর দুঃসাহসিক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তখনই রতন মহাল ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

একদিন হেমাঙ্গবাবু তাঁর হুগলী জেলার কোন এক গ্রামে জমিদার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যান। যেখানেই রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। তখন রতন বলে যে সে কখনই খুন জখম করেনি। অনাহারে পুত্রের মৃত্যুর পর ভিক্ষে চেয়ে যখন ভিক্ষে পেল না তখনই যে এই মিথ্যার আশ্রয় নেয়। "আমি সব মিথ্যে করে বলতাম। যেখানে যে খুন দাঙ্গা হত, সব আমি নিজের নাম দিয়ে মিথ্যে করে বলতাম।" এই ঘটনা শুনে জমিদারবাবু রতনকে কিছু বলেন নি এমনকি তিনি রতনকে নিজমহলায় যেতে বলেছেন। দরিদ্র রতনের অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করেছিলেন হেমাঙ্গবাবু। এখানে জমিদারবাবুর বিরাট উদার-হৃদয়ের ইঙ্গিত আছে। রতন চরিত্রটি সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন," চরিত্রটির এই কৌতুককর অসঙ্গতিই গল্পটির প্রাণ।" (২২)

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা" গ্রন্থে বলেছেন "রতনের মুখর আত্মপ্রচারের সহিত" রায়বাড়ি'র কালী বাগ্‌দীর নীরব অথচ ভয়াবহ আজ্ঞানুবর্তিতা তুলনীয়।" (২৩)

কুলীনের মেয়ে ঃ বংশপরম্পরায় খামখেয়ালী, বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, কৌলিন্যের অহংকারী রাঢ়ের ব্রাহ্মণ জমিদার। ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি, ধ্বংসোন্মুখ জমিদার ধনদা মুখুজ্জে। রেজিস্টারী অফিসে কাজ করতেন। লোকে তাঁদের মাথাখারাপের বংশ বলে। ধনদার তিনপুত্র কেউ মানুষ হয় নি। বড়টি মাতাল, মেজ গোঁয়ার, ছোটটি গাইয়ে। লেখাপড়ার প্রতি ধনদার মোটেই আগ্রহ ছিল না। ধনদার জ্ঞাতি জমিদার কৃষ্ণবাবুর শত নিষেধ সত্ত্বেও পেশাদার দুশ্চরিত্র বিপদতারণের সঙ্গে একমাত্র কন্যা তরুলতার বিয়ে দেন। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তরুর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। শাশুড়ির অত্যাচার, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তরুর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। পিতামাতার মৃত্যুর পর একা তরুকে বিপদতারণ ভালবাসার অভিনয় করে সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়। নিজ দাদার ঋণ পরিশোধের জন্যে জমিটুকু তরু খুইয়ে ফেলে।

শেষে ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে। পাড়ার যোগীন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর এয়ো-সংক্রান্তির ব্রতের দিন তরু সোনার তাগা চুরি করে। ধরা পড়ার আগে সেটি ড্রেনে ফেলে দেয়। চৌর্য বৃত্তির কলঙ্কের জ্বালায় ক্ষতবিক্ষত তরু বাড়ীতে গিয়ে বিষ খেয়ে মারা যায়। জমিদার ধনদার অবিমৃষ্যকারীতার জন্যেই এমন করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সঙ্গে হৃদয়হীন নির্লজ্জ কৌলিন্যপ্রথার বিষময় পরিণাম তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর।

সমুদ্রমন্থন ঃ এই গল্পে আছে ১৩৩০ সালের অনাবৃষ্টির তাপদাহ ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র। জমিদার উমানাথ তাঁর স্ত্রী রমা। এখানেও আছে উঠতি ধনী পিতার কন্যার সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার স্বামীর মনোমালিন্য। অর্থের অহংকারে রমা স্বামীকে মর্যাদা দেন নি; একদিকে সরকারী খাজনা দাখিলের দিন সমাগত। অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় না দেখে উমানাথ দিশাহারা। অন্যদিকে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত স্ত্রী রমার শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ, তথাপি উমানাথের ধৈর্য অপরিসীম, সেইসঙ্গে হৃদয়বান তিনি। একসময় উমানাথ স্ত্রীর গয়না চুরি করে ধরা পড়েছিল। গত বছরে স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে খাজনা মিটিয়েছিল। সে গয়না এখনও ছাড়িয়ে আনতে পারে নি; আবার এ বছরে অর্থাভাব। নায়েব সিংহ মশাই, তারিণী চাপরাশী, চাকর সতীশ সকলেই প্রভুভক্ত। পূর্বপুরুষের জমিদারী হাতছাড়া করতে নারাজ তাই উমানাথ স্ত্রীর অজান্তে গয়নাচুরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ নীচে আওয়াজ শুনে উমানাথ টর্চ ও তরোয়াল নিয়ে নীচে নামেন সঙ্গে রমাদেবীও হাজির হন। উমানাথ দেখেন গোয়ালঘরে এক শীর্ণা ভিখারিণী। তিনি জানতে পারেন যে অসুস্থ স্বামীকে ডাক্তার মাংস খেতে বলেছে বলে সে ছাগল চুরি করতে এসেছে। 'ডাক্তার উয়োঁকে মাংসের ঝোঁল দিতে বঁলেছে মঁশাই।" রুগ্নস্বামীকে সুস্থ করতে ভিখারিণীর আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে রমাদেবীর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। রমা নতুনভাবে স্বামীকে ভালবাসতে শিখেছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর দাম্পত্য প্রীতি, স্বামী সেবা ও পারস্পরিক অনুরক্তি অন্যদিকে জমিদার দাম্পত্যে অন্তঃসারশূন্যতা লেখক তুলে ধরেছেন এখানে।

পুত্রেষ্টি ঃ- এই গল্পে জমিদার গণেশ বাঁড়ুজ্জের চরিত্রের নানা দিকের সন্ধান মেলে। শাক্তবংশীয় তিনি। সুরাপানে অভ্যস্ত। অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধকী কারবারও করেন। কিন্তু নিঃসন্তান জমিদার সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। বন্ধ্যা স্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করেন নি। অথচ বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে গণেশ ছিলেন অন্য মানুষ। খরচ-খরচায় তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। আচারে-ব্যবহারে, কথায়-বার্তায়, আদব-কায়দায় মেজকর্তা গণেশ ছিলেন আধুনিক মানুষ। মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত সেতারী আলী নেওয়াজ খাঁর কাছে সেতার শিখতেন। ছোটভাইয়ের ছেলেকে পোষ্য নিতে চান। কিন্তু ছোটভাই কার্তিকের অমতে তা পূরণ হয় না। তারপর থেকেই গণেশ অন্য মানুষ হয়ে যান। সকলে তাঁকে ক্ষ্যাপা গণেশ বলে ডাকে। কেবল অর্থ জমানোর চিন্তায় পাগল থাকেন। মেজগিন্নী পাড়ার চাটুজ্জেদের অনাথ ভাগ্নেকে পোষ্য নিতে চাইলে বাঁড়ুজ্জে অসম্মতি জানান। তিনি বলেন 'ওসব কলুমে চারায় কাজ নেই আমার।" গঙ্গাস্নানে গিয়ে এক সন্ন্যাসী তান্ত্রিকের সান্নিধ্য লাভ করেন বাঁড়ুজ্জে। তান্ত্রিকের কথায় পুত্রকামনা জেগে ওঠে কিন্তু অপরের পুত্রকে বলি দিতে হবে শ্মশানে। বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে এসে কৌশলে স্ত্রীকে চাটুজ্জেদের ভাগ্নেকে পোষ্য নিতে বাধ্য করান। অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ চলছে। সুরাসক্ত হয়ে মেজকর্তা বলির জন্যে পোষ্য পুত্রটিকে নিতে নীরন্ধ্র অন্ধকারে বাড়ীতে এসে মেজোগিন্নীর ঘরে প্রবেশ করে "দেখিলেন মেজোগিন্নীর বক্ষদেশ সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, মুক্ত। তাঁহার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শিশুটি দুই হাতে মেজোগিন্নীকে জড়াইয়া ধরিয়া একটি স্তন মুখে পুরিয়া অগাধ নিশ্চিন্ত ঘুমে মগ্ন। মাঝে মাঝে স্বপ্ন ঘোরে মৃদু হাস্যরেখা তাহার অধরে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতেছে। মেজোগিন্নীর মুখে অতি তৃপ্তির হাস্যরেখা যেন তুলি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে।" দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে মেজোকর্তা ছেলেটিকে নিয়ে দ্রুতবেগে রাস্তায় নামেন কিন্তু তাঁর মনে হয় তাঁর স্ত্রী আর্ত-চিৎকার করে সন্তানকে ডাকছেন। মেজোকর্তা স্তম্ভিত হয়ে ভাবেন হয়ত ছেলেটির মাতাপিতার আত্মা সন্তান ভিক্ষে চাইছে। ফিরে আসেন তিনি। সেই সময় সন্তানহারা কুক্কুরীর বেদনার্ত চিৎকার শুনে ধর্মান্ধতার নেশা টুটে যায় এবং শিশুর মত ঝরঝর করে কেঁদে কুক্কুরীকে বলেন, তোর তো আমি নিই নি মা—তোর ছেলে আমি নিই নি।" আপাত দৃষ্টিতে মেজোকর্তাকে হৃদয়হীন কঠোর বলে মনে হলেও তাঁর হৃদয়পূর্ণ ছিল স্নেহ ও মমতায়। ভাইয়ের ছেলেকে না পেয়ে প্রথমেই যে আঘাত তিনি পান তার থেকেই পোষ্যপুত্রের প্রতি বাসনা দূর হয়। অথচ সন্তানহারা কুক্কুরীর ক্রন্দন তাঁর হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে; শিশুর মত কেঁদেছেন। এইভাবে "অমারাত্রির ঘনতমিস্রায় মেজকর্তার দুঃসংকল্প চাপা পড়ে।" (২৪)

সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার ঃ- এই গল্পে প্রৌঢ় বনবিহারী সরকার বংশের ষষ্ঠপুরুষ—বয়স পঞ্চাশ। প্রভাব, প্রতিপত্তি, সবই নিঃশেষিত, আছে মিথ্যা দাম্ভিকতা ও আত্মম্ভরিতা। সরকার বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল বিত্ত ও ভূমির তুলনায় অনেক বেশী। বর্তমানে উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারী ভাগ হতে হতে বনবিহারীর ভাগে এসেছে মাত্র সাড়ে সাতগণ্ডা। বনবিহারী নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। একমাত্র ভাগ্নে রমেন্দ্রকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তিনি এখন কাটোয়ায় এক স্কুলে পঞ্চান্ন টাকা মাইনেতে শিক্ষকতা করেন। বনবিহারী একরাশ কাগজ পত্তর নিয়ে জমিদারীর আস্ফালন করে বেড়ান যা ঢোঁড়া সাপের মত নির্বিষ গর্জনের মত শোনায়। গ্রামবাসী তাঁকে ঠাট্টা করে কাগুজে সরকার বলে। নানাভাবে অপমান, বিদ্রূপ করে। এই প্রচ্ছন্ন অপমান বনবিহারী নীরবে সহ্য করলেও ভাগ্নে রমেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী সহ্য করতে পারেননি। তাই

মামাকে জমিদারী বেচতে অনুরোধ করেন। যে জমিদারীতে প্রজারা খাজনা দেয় না, বাড়ি বাড়ি গিয়ে অপমানিত হতে হয়, প্রজাদের শায়েস্তা করতে হলে নালিশ করতে হয়—তার জন্যে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তাও নেই। তাই এভাবে জমিদার —নিজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে প্রজাদের পেছনে পেছনে—এ এক চরম অপমান। তাই জমিদারী বিক্রি করাই শ্রেয়। উত্তরে নিঃস্ব, উপাধিমাত্র সর্বস্ব বনবিহারী বলেন "জমিদারী সম্পত্তি বেচ কি বলতে আছে—ছিঃ। লাভের সম্পত্তি একশো টাকার উপর লাভ, জমিদারী স্বত্ব—পাকা সোনা।" তখন রমেন্দ্র বলেন "আরে বেশ। বিক্রি করতে হবে না, পত্তনি দিয়ে দেন।" তখন বনবিহারী বলেন,"আরে সেতো বিক্রির সামিল। গবর্ণমেন্টের ঘরে নাম, প্রজার কাছে সম্মান, চলে যাও তুমি আপন এলাকার মধ্যে, দুধারের লোক প্রণাম করবে।" তিনি আরও বলেন "তোমরা হলে উড়ো পাখির জাত কুলীনের ছেলে তোমার বাপ দাদার ছিল পেশা বিবাহ।" তথাপি মিথ্যা, নিমজ্জমান জমিদারীর তকমা ত্যাগ করতে পারেন নি বনবিহারী। আধুনিক শিক্ষিত রমেন্দ্র চান নি যে জমিদার নিজে খাতাপত্তর নিয়ে পথে নামেন বা প্রজারা অপমান করুক। তাই তিনি মামাবাবুকে বলেছেন,"আপনি খান দান আর পূজা অর্চনা করুন"। গোমস্তা রেখে খাজনা আদায় করতে হবে। তা না হলে রমেন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে কর্মস্থলে চলে যাবে। জমিদারী বৃত্তি পরিত্যাগ করে পুজো অর্চনা—এই মর্মান্তিক প্রস্তাবে নিরাবলম্ব বনবিহারী তাই "শেষ পর্যন্ত প্রজাদের অবাধ্যতা, নিজ পরিবারের বিরোধিতা, ধনী অংশীদারদের অবজ্ঞা. মিশ্রিত অনুকম্পা, এমনকি নিজ পেয়াদার পর্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ অসহযোগ" [২৫] ক্ষতবিক্ষত হয়ে আর্তকণ্ঠে ভাগ্নেকে বলেন "আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।" জমিদারী সর্বস্ব বনবিহারী জমিদারী ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পান নি। তাই নিঃশব্দে বিদায় নিতে চেয়েছেন। "ভগ্নকীর্তি দুর্বল জমিদার পুঙ্গব তাঁর পূর্বপুরুষের প্রচণ্ড উক্তির কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করতেন "মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।" এ সত্য তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বদ্ধ তাঁর নিজের গ্রামের জমিদার সন্তানদের উক্তি এবং বিশ্বাস।" [২৬]

বন্দিনী কমলা ঃ রাজহাটের প্রাচীন বনেদী এ দেশের প্রথম কোম্পানী প্রদত্ত জমিদার রায়বাড়ির গোপীবল্লভ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে রায় খেতাব পান। অতি দরিদ্র কোম্পানীর দেওয়ান থেকে মস্ত জমিদার হন। গোপী বহুপত্নীক; তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন মাণিক বৌ। অকালে বিধবা হলে সমুদয় সম্পত্তি নায়েব কীর্ত্তি ঘোষ আত্মস্যাৎ করতে উদ্যোগী হলে গোপীর পুত্র নায়েবকে হত্যা করেন। এই ঘটনায় নির্বংশের ভয়ে মাণিক বৌ আটদিন উপবাসী থাকেন। কোজাগরী পূজার রাত্রে জেগে থাকেন মাণিক বৌ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শুরু হয় প্রবল বর্ষণ। এমন সময় এক সুন্দরী মেয়ে আশ্রয় চাইতে আসে। রাণীমা লক্ষ্মী ভেবে মেয়েটিকে বলেন, আশ্রয় দিতে পারেন কিন্তু এক শর্তে। "তুমি এইখানে বস। আমি একটু বাইরে যাব। যতক্ষণ না ফিরব আমি ততক্ষণ কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে।" মেয়েটি রাজী হলে মাণিক বৌ তাকে তালা বন্দিনী করে ছেলের হাতে চাবি দিয়ে বলেন "তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা লক্ষ্মীকে আমি বন্দিনী করে গেলাম।" এবং তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। অলক্ষ্যে থেকে এইসব দৃশ্য দেখে পুত্রও চাবি জলে নিক্ষেপ করেন।

বর্তমান জমিদার চতুর্থ পুরুষ বিরাট পরিবার। তিন ভাই বৌ ছেলে পুলে নাতি-নাতনী দাস-দাসী ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়া আরম্ভ হয় দেড়টায়, বাবুদের আড়াইটায়, মেয়েদের সাড়ে তিনটায়, আর চাকরবাকরদের পৌনে চারটায়। মাণিক বৌ এ বাড়ির লক্ষ্মী ছিলেন মনে করে এ বাড়ির বৌদের নামকরণ হয় বিভিন্ন মণি-মাণিক্য-হীরা-আতর-বেল-চাঁপা ইত্যাদি দিয়ে। কাঞ্চন বৌ তার দিদি শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে শুনেছিল কেমন করে তার শ্বশুরের মত লোকেরা সেকালে কোম্পানীর দাদন দিতে না পারা লুকিয়ে থাকা তাঁতীদের ধরে এনে খুঁটিতে বেঁধে দাদন আদায় দিতেন এবং কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ান প্রভৃতি পদ লাভ করতেন। বর্তমানে বাড়িখানি যে প্রেতপুরী।

বর্তমানে এবাড়ির পুরুষেরা নেশাসক্ত ও চরিত্রহীন। কুলধর্মে তান্ত্রিক তথাপি বড়বাবু শিবভক্ত ও গুলিখোর। স্ত্রীকে প্রহার করে থাকেন কাজকর্ম কিছুই করেন না। মেজবাবু অশ্রাব্য ভাষায় সকলের সামনেই কথা বলেন অথচ তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ছোটবাবু সর্বদা শিকারে ব্যস্ত থাকেন। বড়বাবুর বড় ছেলে থিয়েটারে অভিনয় করেন। বড়বাবুর ঘোড়া ছিল, বর্তমানে মৃত। বাড়ীতে রাজহাঁস, চন্দনা, কাকাতুয়া, ময়না ও পায়রা আছে। ছোটবাবুর ছিল গোটাআষ্টেক কুকুর। বাড়িতে অভাব অথচ মোটর কেনার পরিকল্পনা করে কাঞ্চন বৌ-এর স্বামী। লক্ষ্মী বাঁধা আছে বলে তাদের সকলের বিরাট অহংকার বিশেষ করে পুরুষদের। এদিকে মহাজন তাদের নামে ছয়লক্ষ টাকা ঋণের নালিশ করেছে। সেই টাকার জন্যে মেজকর্তা লক্ষ্মীর সেই ঘরের চাবি খুলতে আগ্রহী হন। তাঁর বিশ্বাস গুপ্তধন অনেক আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুত্রদের মঙ্গলের জন্যে ও ঋণমুক্তির উদ্দেশ্যে বৃদ্ধা কর্ত্রী ক্ষয়ে যাওয়া তালা খোলেন। মেজকর্তা প্রথমেই ঘরে ঢোকেন এবং দেখেন একটা নরকঙ্কাল, একরাশি বিবর্ণচুল, ছিন্ন বস্ত্র ও একটা নামাবলী। অমিতব্যয়িতা, ব্যভিচারিতা, কর্মবিমুখতা ও মিথ্যা অহংকারে বহু জমিদার যে ধ্বংস হয়েছে, 'বন্দিনী কমলা' তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। "গল্পশেষে এই আকস্মিকতা সৃষ্টি করে লেখক জমিদার বাড়িতে লক্ষ্মীকে অচলা করে রাখা, সম্পত্তি লাভের কারণে প্রিয়জন হত্যা, যক্ষ করে রাখার বিশ্বাস ইত্যাদি সামন্ত সংস্কারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।" [২৭]"লক্ষ্মীকে বন্দিনী করার রীতি-পদ্ধতি বীরভূম জেলার একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান।" [২৮]

না ঃ- "মানুষের হিংস্র প্রতিহিংসা পরায়ণতা যে এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি সংকেতে পরম ক্ষমায় রূপান্তরিত হয় তারই সাক্ষী ব্রজরাণীর জীবনবৃত্তান্ত"। [২৯] জমিদার অনন্তপুত্র—বয়স কম, তথাপি সারল্যে পরিপূর্ণ। শিকার করাই ছিল প্রিয় সখ। মামাতো ভাইকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। কিন্তু সেই মামাতো ভাই অনন্তের জীবনকে মূল্যহীন করে তোলে বিবাহের নির্দিষ্ট পাত্রী বদল করে বিয়ে করে। প্রকৃত নেশাখোর কালীনাথ মিথ্যার প্রশ্রয় নিয়ে অনন্তের ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে অনন্তের নামে নেশাখোর চরিত্রহীন গোঁয়ার ইত্যাদি লিখে পত্র দিয়ে অনন্তের নির্বাচিতা পাত্রীকেই বিয়ে করে। ফলে কালীনাথের দাম্পত্য জীবন সুখের হল আর অনন্তের হল সাহারার মরুভূমি। একদিকে বাবার তিরস্কার অন্যদিকে শ্বশুর ও স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট অনন্ত কালীনাথকে ব্রজরাণীর সম্মুখেই গুলি করে হত্যা করে। আদালতে বিচারের দিন স্বামী হত্যার শাস্তি বিধানের জন্যে ব্রজরাণী আসেন কিন্তু দেখেন "শুভ্র কেশ শীর্ণ ন্যুব্জ দেহ, স্তিমিত বিহ্বল দৃষ্টি, হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।" হঠাৎ তাঁর চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায়, যে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর সে কই? "পৃথিবীর দীনতা পুঞ্জীভূত হীনতায় জীর্ণ ঘৃণাহত এই হতভাগ্য'টিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি লাভ?" অন্যদিকে অনন্ত যেন, "পরমদৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধায় তাহার দিকে চাহিয়া বারবার ঘাড় নাড়িয়া যেন নিজেকেই সমর্থন করিয়া বলিল দেবী, দেবী স্বর্গের দেবী। তুমি বৌদি।" ব্রজরাণীর সব পরিবর্তন হয়ে যায় তাছাড়া তিনি তাঁর স্বামী কালীনাথের জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা জেনেছিলেন। সরকারী উকিল অনন্তকে দেখিয়ে ব্রজরাণীর স্বামী হত্যাকারী কিনা জানতে চান। তখন ব্রজরাণী বলেন 'না'। "অসৎ থেকে সত্যের পথে, হিংসা থেকে ক্ষমার পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে শুভঙ্করী শক্তি তারই জয়।..... কীর্ণাহারের সরকার বাবুদের প্রত্যক্ষ ঘটনা অবলম্বনেই গল্পটির শরীর গড়ে উঠেছে।" [৩০] "না" শব্দটির মাধ্যমে দুটি যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের মর্মান্তিক অনুভূতি প্রতিফলিত হয়েছে। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ব্রজরাণীর 'না' শব্দটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন "প্রথম স্তর দৃঢ়তার ও সংকল্প কঠোর মনের। দ্বিতীয় স্তর ক্ষমার। তৃতীয় স্তর গভীর প্রশান্তির।" [৩১] "তবে মনে হয় ক্ষমা এবং প্রশান্তিই এই 'না' শব্দটির মধ্যে সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে।" [৩২] অনন্ত নেশাগ্রস্ত যা তাঁর বাবা ক্ষমা করতে পারেন নি, এমনকি অনন্তের শিক্ষিত জমিদার শ্বশুর মূল কারণের অনুসন্ধান না করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কালীনাথ অনন্তের কাছে নত হয়ে বিষয়টাকে হাল্কা করার চেষ্টা করেন নি এমনকি তাঁর এই জঘন্য কৃতকর্মের কথা ব্রজরাণীকেও বলেন নি। বললে হয়তো ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ব্রজরাণী নিতে পারতেন। অনন্তের শ্বশুর যদি হিন্দুধর্মের বিবাহের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন ও নিজ কন্যাকে বোঝাতেন তাহলে এমন করুণ পরিণতি হত না।

বিষধর ঃ-বিনয়কৃষ্ণ রায় সাতআনির এক আনির অর্ধেকের মালিক—সরকারী চাকুরে। কথায় কথায় ইংরেজীর ফুলঝুরি গ্রামের কাউকে ভালোচোখে দেখে না, কেবল চারিত্রিক দোষ ত্রুটি দেখে বেড়ানোই তাঁর একমাত্র কর্ম। এক অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মৃত নলিনীশ বাবুর মেয়ে বিরাজের বাড়ী আসেন। তা নিয়েই বিনয়বাবু সারাগ্রামে কুৎসা রটনা করে বেড়ান, এমনকি শহরে দরখাস্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। গ্রামে এইসব অপকীর্তি তিনি ঘটতে দেবেন না—তিনি সম্মানের ভিখারী। নিজেকে একজন সৎ আদর্শবান ব্যক্তি বলে জাহির করতে উৎসাহী অথচ তিনিই যুবা বয়সে জ্ঞাতি দাদা গোষ্টবিহারীর স্ত্রীকে সন্তানসহ প্রলুব্ধ করে কোলকাতার নিয়ে যান এবং তাকে শেষে ত্যাগ করে আসেন। সমাজসেবকের মত উদার চরিত্রের পরিচয় দিলেও তিনি যে মনুষ্যত্ব হীন ও মানবীয় মূল্যবোধহীন তা জানা যায় যখন এক দরিদ্র প্রজা জোড়হাতে খাজনা দিতে পারব না বলে। তখন বিনয়বাবু বলেন, 'এ্যাঃ দিতে পারব না হুজুর। অঙ্গ আমার শীতল হয়ে গেল আর কি। বস বেটা চাষা, বস।"

নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ- কঙ্কণা গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার মুখুজ্জে পরিবার। প্রচুর অর্থের মালিক। বহু জমিদার পরিবারই মুখুজ্জেদের কাছে ঋণ দায়ে আবদ্ধ। সুদের কারবার ও তাঁদের আছে। কিন্তু গ্রামে কোন স্কুল, ডাক্তারখানা বা হাট-বাজার কিছুই নেই। আছে কেবল খান দুই দই-মিষ্টির দোকান। কুসংস্কারবাদী তাঁরা। স্কুল স্থাপন করলে লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন এই ভেবে গ্রামে স্কুল স্থাপন করেন নি। সেই গ্রামে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে। নুটু এই জমিদারদের দেশী আঁটিসার খেজুর গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেশী খেজুর গাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না; তেমনি এই জমিদারগণ শোষণ ও সুদের বেড়াজালে প্রজাদের মৃত্যুপথযাত্রী করেছে। এই তির্যক কথায় জমিদার নুটুর জমির ভাগিদার মহাভারতের বাড়ি পুড়িয়েছে, নুটুর পুকুর লুট করেছে। নুটু মোক্তার আপীল করে জয়ী হলেও জজ আদালতে হেরে যান। তখন মুখুজ্জেরা নুটু ও মহাভারতের সমূহ ক্ষতি করে সর্বস্বান্ত করতে উদ্যোগী হন। নুটু পরে কলকাতায় আইন পাশ করে দেশে ফিরে রামপুরে আপীল করেন। বিচারে জমিদারদের পরাজয় হয়। কিন্তু পনেরো বছর পর জমিদারগণ নিজ আভিজাত্য ও দাম্ভিকতা ভুলে মান সম্মানের মাথা খেয়ে ধনী নুটুর বাড়ী গেছেন নাতনীর সঙ্গে নুটুর পুত্রের বিয়ে দেবার প্রস্তাব নিয়ে। শুধু প্রস্তাব নয় ভিক্ষে চেয়েছেন, এমনকি বড়কর্তার পুত্র নুটুর হাত চেপে ধরেছে। নুটু ধনী ও বিখ্যাত উকীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারবাবু নির্লজ্জের মত বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। একদিকে নাতনী সুখে থাকবে আবার অন্য দিকে বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্যে বিনা পয়সায় ভাল উকিল পাওয়া যাবে।

খ. ব্রাহ্মণ সমাজের অধোগতি

তারাশঙ্কর ছোটগল্পের চরিত্রগুলি সংগ্রহ করেছেন রাঢ়ভূমের চলমান গ্রামীণ জীবন থেকে। রাঢ় মাটির স্বভাব রুক্ষতায় চরিত্রগুলিও আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত। গ্রাম্যজীবনের কৃষক, শ্রমিক, নানা নিম্নবৃত্তিধারী মানুষ, কাহার, বাউরী, বাগদী,

ডোম-শ্রেণীর প্রতিনিধি, সন্ন্যাসীতান্ত্রিক, কাপালিক, ব্রাহ্মণ, জমিদার, ক্ষত্রিয়-ভূস্বামী, নূতন ব্যবসায়ী বৈশ্য-গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত আদিম সমাজের অধিবাসী। এরাই এই অঞ্চলের জনজীবন গড়ে তুলেছে। এদের মধ্যে স্রষ্টা তারাশঙ্কর দেখেছেন মানুষের রিক্ত অমার্জিত জান্তব রূপ। ধর্মনীতি, মানবনীতি, উচ্চ-আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের জীবনাদর্শ তাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তাদের জৈবিক ক্ষুধা ও পাশব প্রবৃত্তি সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে ভেদ করে বেড়িয়ে আসে হিংস্র আদিম বেশে। তাদের সেই আদিমতাই নিয়তিরূপে যে জীবননাট্য রচনা করে চলেছে তারাশঙ্কর তারই সার্থক রূপকার।

সভ্যতা ও শোভনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্তরালে মানুষ যে আদিম প্রকৃতিও আদি প্রবৃত্তির পঙ্কতিলক বহন করে চলেছে, তারাশঙ্কর যেন তার উন্মেষকার, উদঘাটক। রাঢ়ের দগ্ধতৃষ্ণ প্রান্তরের শুষ্ক জ্বালা ও পিপাসা যেন তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলিরই প্রতীক। তাদের ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, তাদের জৈব ক্ষুধা, লোভ, মোহ, তীব্র স্নেহ ও দুরন্ত বাৎসল্য—সবই যেন চূড়ান্ত পর্যায়ের—Extreme ঃ যেন বর্ষার মত প্রমত্ত, গ্রীষ্মের মত দহনকারী, রৌদ্রের মত ভয়ানক।

বীরভূমের গ্রামীণ সমাজের শীর্ষে অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। অথচ তাঁদের চারিত্রিক, মানবিক-অধোগতি একেবারে অমানুষে পরিণত করেছিল। তাঁদের লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা, ভোগ যেন আদিম বর্বর যুগের মানুষকেও হার মানায়। সমাজের উচ্চ বর্ণাসনে আসীন থেকে সামাজিক বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন প্রণয়ন করেছেন যেগুলি একমাত্র তাঁদেরই স্বার্থে নিয়োজিত। গ্রামজীবনে ব্রাহ্মণরাই ইংরেজদের মতই শোষক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। গ্রামে নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা জীবন্ত সন্তান বলে জাহির করতেন। প্রাচীনকাল থেকেই এই সুবিধা ভোগ করে এসেছেন। ক্ষত্রিয় নৃপতির কুলগুরু ব্রাহ্মণ শক্তি ও ক্ষমতায় রাজা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিলেন না। ইংরেজ আমলেও তাই সুবিধাবাদী এই সম্প্রদায়ই প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে অধিক সক্ষম হয়েছিলেন। বীরভূম একটি পীঠস্থান—অসংখ্য দেবদেবী স্নাত এই অঞ্চল। স্বভাবতঃই এখানকার সমস্ত মানুষ দেবত্বে অধিক বিশ্বাসী ও সেই সুযোগেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ চূড়ায় স্থাপন করার অবকাশ পেয়েছেন। দিনের পর দিন বীভৎস রসে অবগাহন করতে করতে ব্রাহ্মণ সমাজ একদা বীভৎস হয়ে যান। দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব, সম্পর্ক বিস্মৃত হয়ে এক কদর্যজীবে পরিণত হয়েছিলেন। একদিকে সর্বস্তরের মানুষ অর্থে, শক্তিতে শিক্ষায় দুর্বল অন্যদিকে বীরভূমে খরদীপ্ত আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে প্রাণহীন, হৃদয়হীন কর্তব্যহীন এক ব্রাহ্মণ সমাজ। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "বীরভূমের রোদে-পোড়া কাঁকুরে মাটিতে চলতে ফিরতে, ফসিলের টুকরো পাওয়া যায় আদি পৃথিবীর সঙ্গে আজও যেন তার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি।" [৩৩] লেখক নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সেই সম্প্রদায়ের অধোগতিকে নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। কর্মবিমুখ, অনাচারী, চরিত্রভ্রষ্ট, লোভাতুর, কদর্য ব্রাহ্মণ চরিত্রগুলিকে তারাশঙ্কর নির্মোহ দৃষ্টিতে অঙ্কন করেছেন। যাঁরা সমাজের অভিভাবক শিষ্টাচারও সৌজন্যবোধের জাগ্রত পুরুষ হিসেবে নিজেদের জাহির করতেন অথচ ভালোমানুষের আবরণ ঢেকে পুষে রাখত হিংস্র জান্তব পাশব প্রবৃত্তিগুলোকে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতেন। ফলে ঘটে চারিত্রিক অধোগতি। নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে এই অবজ্ঞা তারাশঙ্কর সহ্য করতে পারেন নি। তাই নিজে কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও "কুলীন জমিদার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ ছিল না"..... তাদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, আত্মপ্রতারণা, শূন্যগর্ভ আস্ফালন আর প্রবঞ্চনা পরায়ণতার ছবি আঁকতে পেরেছেন অকম্পিত লেখনীমুখে। যে সম্প্রদায় যে আর্থনীতিক আশ্রয়, যে পটভূমি থেকে তিনি এসেছিলেন, তাকেই তিনি নির্মম-নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন।" [৩৪]

পুজো-পাঠ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ মহাজনী কারবার করেছে, মন্দির থেকে বিগ্রহের অলংকার চুরি করেছে, সাধনা করে বহু অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে জামাইকে হত্যা করিয়েছে; কেউ আবার ডাক্তারী করতে গিয়ে বিধবা-যুবতীর ধর্ম নষ্ট করেছে; কোন ব্রাহ্মণ নির্লজ্জ ক্ষুধার বশবর্তী হয়ে নিজপুত্র অন্যকে দিয়েছে, এমন কি নিজপুত্রের পিণ্ড গলাধঃকরণ করেছে; কেউ পাত্রীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিয়ে পণ্ড করতে চেয়েছে, কেউ সম্পত্তির লোভে বিধবা রমণীকে বাস্তুচ্যুত করেছে, কেউ বিধবা অনাথা ভাগ্নীকে পথে বসিয়েছে, কেউ মিথ্যে জমিদারীর অহংকারে বুক ফুলিয়েছে, কেউ কৌলিন্যের অহংকারে সরল মেয়েদের সর্বনাশ করেছে, কেউ চাকরী হারিয়েও পদবীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে—এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শ্বেত শুভ্র উপবীতের অন্তরালে কদর্য নোংরা প্রবৃত্তি চাপা থাকলেও মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে।

শ্মশান বৈরাগ্য ঃ অর্থ মানুষকে বিবেকহীন, হৃদয়হীন পশুত্বে পরিণত করে তোলে, মৃত্যু চেতনা বা আত্মীয় ভাবনা সবই অভিনয়ে পর্যবসিত হয় এমনই এক চরিত্র মহিম বাঁড়ুজ্জে—জীবিকায় কুসীদজীবী। অর্থগৃধ্নুর মত শুধু অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয় করেছেন। বহু মানুষকে টাকার জন্যে ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত করেছেন। ইনকামট্যাক্স অফিসারের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত গ্রাম ছেড়ে দূরবর্তী শহর সংলগ্ন হরিহরপুরে দূর সম্পর্কীয়া বিধবা দিদির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। সেখানে গিয়েই তিনি বিধবা ভাগ্নীর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা বর্বরোচিত। দিনের পর দিন অসহায়া দিদির বাড়ীতে নির্লজ্জের মত আকণ্ঠ ভক্ষণ করেছেন অথচ একটা পয়সাও কোনদিন খরচ করেন নি। হঠাৎ অসুস্থ দিদির মৃত্যু হল। মৃত্যুকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে সাময়িকভাবে মহিমের চরিত্রে বৈরাগ্য এসেছে। তিনি বলেছেন, "এই তো মানুষের জীবন। অ্যাঁ? এর জন্য এত? টাকা-বিষয়, ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন, কিছুই না, কিছুই সঙ্গে যায় না।" তাই দেখা

যায় কৃপণ বাঁড়ুজ্জে অধমর্ণ মুকুন্দকে সুদের পঞ্চাশ টাকা মুকুব করেছেন। পূজারী ভট্টাচার্যকে দিয়ে মৃতাদিদির শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন করেছেন। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ সমাধা হয়। খরচ হয় পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা। কিন্তু প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। তাই অচিরেই অর্থ পিশাচ মহিমের জীবনে পরিবর্তন আসে। শ্মশান-বৈরাগ্য তাঁর কাছে ক্ষণিকের দুর্বলতা মাত্র। আবার মহাজনী ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলেন। নিরীহ দরিদ্র জগাই মজুমদারকে দশ টাকা বহু অনুরোধ সত্ত্বেও মাফ করেন না। অপমানে জর্জরিত করে জগাকে কাঁদান। মুকুন্দকে ছেড়ে দেওয়া পঞ্চাশ টাকা আবার আদায়ের জন্যে ভৃত্য যোগীকে পাঠান। দিদির শ্রাদ্ধের খরচের টাকার জন্যে হাত কামড়ান এবং বলেন, "ঘাড়ে ভূত চেপেছিল আমার। অনর্থক এই পাঁচ-পাঁচশো টাকা।" মহিম যোগীকে বলেন, "তুই একবার বলিস কেন যোগী, বিভাকে। ওদের গয়না টয়নাও তো আছে।" বিধবা বিভা হয়তো আড়াল থেকে মামার সব কথা শুনেছিল। তাই রাত্রে মামাকে খেতে দিয়ে গয়নার পুঁটলিখানি এনে বলে, "মা তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে কখানা গয়না রেখেছিলেন। সে কখানা তো তাঁরই শ্রাদ্ধে দিতে হয়।" এই বলে ছোট্ট একটি পুঁটুলি মাটিতে নামিয়ে রাখল। মহিম তাড়াতাড়ি সেটিকে তুলে নিয়ে সেটির ওজন অনুমান করে খুশী না হয়ে পারল না। "অভ্যাসই যে মানুষের অলঙ্ঘ স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়, এই মানবসত্যেরই শিল্পরূপ" শ্মশানবৈরাগ্য।" [৩৫]

ব্যাধি ঃ- চৌর্যবৃত্তি মানুষকে কত নীচ করে তোলে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গল্পের হারাণ আচার্য ওরফে নারায়ণচন্দ্র রায়। মন্দিরের বিগ্রহের অলংকার চুরি করাই ছিল তার অদ্ভুত নেশা। বহু বিগ্রহের অলংকার চুরি করে বেশ ধনী হয়ে যায় অথচ ঘর বাড়ি তৈরী বা সংসার করা তার লক্ষ্য ছিল না। কাঠ বা পাথরের বিগ্রহে দামী দামী অলংকার সে সহ্য করতে পারত না। সে বলে "কাঠ আর পাথরের গায়ে রাজ্যের সোনাদানা রামচন্দর।" তাই হারাণ ঘোষালদের মন্দিরে ঢুকে শালগ্রাম শিলায় জড়ানো সোনার পৈতা হাতিয়েছে যদিও, অল্প সোনা বলে বাড়ীতে না এনে মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত পুষ্পকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দেয়। ঘোষাল পায়ে ধরে কেঁদেছেন, অভিশাপ দিয়েছেন, তথাপি হারাণ তানপুরা বাজিয়ে চলেছে। স্বর্ণকার নিশি, বোন হৈম গয়নাচুরি করতে নিষেধ করেছে, তবুও হারাণের পরিবর্তন ঘটেনি। হারাণের বিধবা বোন হৈম পুত্রসহ আশ্রয়ের জন্যে আসে। দিদি ও ভাগ্নের থাকা, খাওয়া ও পড়ার খরচ অন্যদিকে পুলিশের ভয় তাই সে গোপনে সামান্য টাকায় মহাজন ভবী মিশ্রকে বাড়িটি বিক্রি করে কাশী যাবার নাম করে মুর্শিদাবাদে হাজির হয়। সেখানে মনোহর বাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হন। নাম পরিবর্তন করে নারায়ণচন্দ্র রায় বলে। সঙ্গীতের আসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মনোহরের সুনজরে পড়ে। মনোহর জমিদার হলেও বর্তমানে অত্যন্ত হীনাবস্থা। রাজস্ব বাকী—অনেক টাকার প্রয়োজন, অন্ততঃ দশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন। হারাণ মনোহরকে সে টাকা দেব বলেও যখন রাত্রে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা সোনার বাট চোখে পড়েছে তখনই তার অন্তরের কুপ্রবৃত্তি তাকে পাগল করে তুলেছে। সে টাকা মনোহরকে দেব বলেও দিতে পারেনি, চলে গেছে কাশী। গেরুয়া পরে সাধু সেজে এক অন্ধের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ চুরি করেছে। সুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মাঝে মাঝে ভাগ্নে ও মনোহরের জন্যে চিন্তা করে। শেষে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে বর্ধমান হাসপাতালে মৃত্যুর পূর্বে মনোহরবাবুও দিদিকে পত্রপাঠ বর্ধমানে ডাকে। তখন হারাণের দিন শেষ। মনোহরকে টাকার কথা বলব বলব করেও হারাণ বলতে পারে নি। বলার সময়েই অন্য কথায় ভুলিয়ে দিয়েছে। অথচ হারাণ মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে চুরি করার যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। মনোহর হারাণকে সেই টাকায় ভাল কাজ করার উপদেশ দিলে ব্যাগ্রভবে হারাণ বলে "উদ্ধার করুণ বাবু। আমায় উদ্ধার করুণ। ওগুলো যেন বুকে চেপে বসে আছে আমার, প্রাণ আমার বেরুচ্ছে না।" হারাণ নিজে আর পারবে না তাই মনোহরকেই দায়িত্ব দিতে চায় কিন্তু টাকা রাখার সঠিক সন্ধান দিতে পারে নি। ভাগ্নে তমোরীশ কাছে এলে তাকেও হারাণ বলে, "তমোরীশ আমার টাকা আছে তোকে বলে যাই।" কিন্তু সে বলতে পারে নি। কোনদিন বলাও হবে না কারণ সেই রাতেই হারাণের মৃত্যু হয়। যক্ষের ধনের মত সম্পদ সঞ্চয় করলেও ব্যয় করা হয়নি। অসৎ মনোবৃত্তির সঞ্চিত অর্থ সৎকার্যে ব্যয়িত হতে পারে না, বিশেষ করে হারাণের অর্থে আছে বহুজনের বুকের রক্ত ও বুকফাটা কান্না। সে নিজেও ভোগ করতে পারেনি আবার অন্যের জন্যে ব্যয় করতেও পারে নি। অথচ সঙ্গীতে ছিল তার অগাধ পাণ্ডিত্য। কথায় আছে "স্বভাব যায় না মলে" অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও হারাণ তার গুপ্ত-সম্পদের কথা কাউকেও বলতে পারে নি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাই বলেছেন "হারাণ আচার্য গুণী শিল্পী, কিন্তু মানসিক ব্যাধি তাকে করে তোলে অমানুষ। সে ব্যাধি তার মনের অবচেতন লোকে বাসা বেঁধে আছে; তাই মরণকালেও সঞ্চিত ধন কাউকে দিয়ে যেতে তার মন সায় দিল না।" [৩৬]

ছলনাময়ী ঃ- প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। প্রবৃত্তির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ মানুষ সর্বদা ভয়াবহ পরিণামের দিকে এগিয়ে চলে। আমৃত্যু স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। যেমন হয়নি "ব্যাধি" গল্পের হারাণ আচার্যের, ঠিক তেমনি 'ছলনাময়ী'র কয়লাখনির ম্যানেজারের। জীবনে প্রভূত অর্থ, ভোগ, সম্মান, প্রভুত্ব লাভের জন্যে তিনি ছলনাময়ীকে পাবার জন্যে সাধনায় লিপ্ত হন। "ছলনাময়ী নারী যেমন পুরুষের মনে প্রবৃত্তির ঝড় তোলে, এই রহস্যময়ী শক্তির ছলনাময়ী মূর্তিও তেমনি ম্যানেজারকে ক্রমশই অজানা অন্ধকারের দিকে অমোঘ আকর্ষণ জানিয়েছে।" [৩৭] স্ত্রী-কন্যা-সংসার সব জীর্ণ বস্ত্রের মত অক্লেশে ত্যাগ করে ব্যর্থ সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন। এক অমোঘ মোহে আচ্ছন্ন ম্যানেজার শত বাধাতেও

নিরস্ত হন নি। অমিয়বাবু তাঁকে নিরস্ত করতে উপদেশ দিলে, তিনি বলেন 'বুঝবেন না, আপনি সে বুঝবেন না অমিয়বাবু। আনন্দ-অমৃত ওইখানে আছে। ঐ শক্তি তার উৎস। এর স্বাদ আপনি পান নি, আপনি এর আকর্ষণ জানবেন না। অভিসারের আকর্ষণের মত্ততা অভিসারিকা ভিন্ন অপরে অনুভব করতে পারে না অমিয়বাবু।" এই অলৌকিক শক্তির সামান্যমাত্র ম্যানেজার লাভ করেছিলেন। তিনি কেবল জলকে সরবতে এবং হাতের তালুতে বিচিত্র গন্ধ সৃষ্টি করতে পারতেন। অথচ সম্রাটের মত ভোগ ও প্রভুত্ব তাঁর চাই। তাই তিনি কলিয়ারীর পাশেই নদীর ধারে শ্মশানে সাধনা করেন। সংসারের শুভাশুভের চিন্তা বা উপযুক্তা কন্যার বিয়ের চিন্তা করেন না, এমনকি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত প্রহার করেন। শব সাধনার জন্যে উপযুক্ত শব সংগ্রহের জন্যে কিছুদিনের জন্যে নিরুদিষ্ট হলে তাঁর স্ত্রী কলিয়ারীর কম্পাসবাবু কানাইয়ের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। হঠাৎ খনিতে ধস নেমে কানাইয়ের মৃত্যু হয়। লাশ পাওয়া যায় না। তাই হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সদ্যবিধবা কন্যা শ্মশানে কুশপুত্তলিকা দাহ করতে যায় কিন্তু সেখানে দেখে তার পিতা তারই মৃত স্বামীর শবাসনে সাধনায় প্রবৃত্ত। পরে জানা যায় যে জামাইয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছেন ম্যানেজারবাবু, কারণ কানাইয়ের শরীরটা ছিল তন্ত্রোক্ত সাধনার শুভ লক্ষণযুক্ত।

দীর্ঘ দশ বছর পর অমিয়বাবু বালিগঞ্জে ভিক্ষুক বেশী ম্যানেজারকে দেখতে পান। পাগলের মত হা-হুতাশ ও মাঝে মাঝে হাতের মাংস কামড়ে রক্ত ঝরাচ্ছেন। ছলনাময়ী কদর্য ও নির্মমভাবে ম্যানেজারকে ছলনা করেছে তাই তিনি অমিয়বাবুকে বলেছেন। "রাক্ষসী ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছে মনে করেছে কিন্তু না আবার আমি দেখব।" সর্বস্বান্ত হয়েও ব্রাহ্মণ ম্যানেজার আবার হীন কর্মে আসক্ত হতে উদ্যোগী হয়েছেন। বীরভূমে এই তান্ত্রিক বীরাচারী বহু চরিত্রের সাক্ষাৎ লেখক পেয়েছিলেন বা গল্প শুনেছিলেন। যারা একেবারে—Extreme Character। তথাপি শান্তিপ্রিয় সহানুভূতিশীল লেখক এইসব জঘন্য পাপীষ্ঠ শয়তান হীন-চরিত্রগুলোর প্রতি সানুকম্পা দেখাতে বিস্মৃত হন নি। তাই গল্পের শেষে ম্যানেজার যা বলেছেন তা মনে হয় লেখকেরই মনের কথা—"মানুষ তো আমি অমিয়বাবু।"

দেবতার ব্যাধি ঃ-জীবধর্মের নাগপাশে কত দেবোপম মানুষও অমানুষে পরিণত হয়ে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "দেবতার ব্যাধি" গল্পটি। সৎ ব্রাহ্মণ গড়গড়ি ডাক্তার। রোগের উপশমের জন্যে উৎসুক-চিত্তে রোগীর দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। মানুষ তাঁকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা করে পূজো করেছে, অগাধ সম্মান প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ডাক্তার দেবতার হৃদয়ে দেখা দেয় আদিমতার সুতীব্র জৈবিক ক্ষুধা। এক বিধবা যুবতীর কৃতজ্ঞ আত্মবিনোদনের মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের হয় পদস্খলন। শুরু হয় দেবাসুরের সংগ্রাম। চরিত্র হয়ে ওঠে রুক্ষ, কর্কশ, উগ্র। তাই সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারেন নি। স্ত্রীকে বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে রাঢ়দেশের এক গণ্ড গ্রামে হাজির হন। সেখানেই গল্পের কথক হেডমাস্টারের সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখানে এসে গড়গড়ি ডাক্তার সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রোগী দেখতে শুরু করেন। কিছুদিন পর এক রোগীর মায়ের রূপে আকৃষ্ট হন। কিন্তু সেই রাতেই ডাক্তার নিরুদ্দেশ হন। প্রাণপণে দুর্বলতার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। দেবতুল্য সেবাপরায়ণ মনোভাব নিয়েও জান্তব প্রবৃত্তির বেগকে দমন করতে পারেন নি। মানুষের ধর্মই হল তাই। সে ব্রাহ্মণ হোন আর যে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ হন। এ প্রসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "মানবজীবনে এই সংগ্রামের রস রহস্যটি সত্য সত্যই বিস্ময়কর। জীবধর্ম ও মানবধর্মের এই দ্বন্দ্বে কেউ অবনমিত হয় পশুস্তরে, কেউ উত্তীর্ণ হয় মনুষ্যত্বের নব নব সোপানপরম্পরায়।" [৩৮] গড়গড়ি ভাল হতে নিরন্তর সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু নিয়তি তাঁকে ভাল হতে দেয় নি। "দ্বন্দ্ব জর্জরিত অসহায় মানুষের এই আর্তি তীক্ষ্ণতায় ও জ্বালাময়তায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। ডাক্তার গড়গড়ি তারাশঙ্করের অন্যতম চরিত্র।" [৩৯] এই ডাক্তারবাবু তারাশঙ্করের অত্যন্ত চেনা চরিত্র। "ডাক্তারবাবু বলতেন, "তারাশঙ্করবাবু, এই তামসীকে আমি মহাশক্তি বলে গণ্য করিনি। চিনতে পারিনি, তাই তাকে পূজায় প্রসন্ন করি নি। তাকে **Sublimate** না করে **eliminate** করতে চেয়েছিলাম।" [৪০]

অগ্রদানী ঃ- প্রবৃত্তি-রূপিনী নিয়তি শাস্তিরূপে নেমে এসে এক উদরসর্বস্ব ব্রাহ্মণকে নির্লজ্জ করে তুলেছে, 'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের সব রস তার রসনাতেই সীমাবদ্ধ। লোভের দুর্জয় আকর্ষণে চক্রবর্তী ধ্বংসের শেষ ধাপে নেমেছে। লোকের বাগানে ফল চুরি করতে গিয়ে মৌমাছি বোলতার আক্রমণেও নিরস্ত হয়নি, উচ্ছিষ্ট গোগ্রাসে গিলতে তার লজ্জা হত না, বিবেকেও বাধে নি। নিমন্ত্রণ বাড়ী থেকে বাড়ীর জন্যে ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গিয়ে সন্তানদের বঞ্চিত করে গোপনে সব খায়। দশবিঘা জমি আর নিত্য সিংহবাহিনীর একথালা ভোগের লোভে পূর্ণ রাতের অন্ধকারে নিজের সদ্যোজাত সুস্থ শিশুকে অচৈতন্য স্ত্রীর পাশ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জমিদার শ্যামাদাসবাবুর স্ত্রীর পাশে এবং শিবরাণীর অসুস্থ শিশুকে নিজের স্ত্রীর পাশে রেখে দিয়ে আসে। পূর্ণর ছেলে মারা যায়, শ্যামাদাসের ছেলে বাঁচে। এরপর শুরু হল নিয়তির নির্মম খেলা। শ্যামাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হলে নিজ পুত্রের হাত থেকে পিণ্ড নিয়ে গোশালায় বসে সে ভক্ষণ করেছে। বিনিময়ে পেয়েছে পাঁচ বিঘা জমি আর বছরে পঞ্চাশ টাকা। নিয়তির বিড়ম্বনা এখানেই শেষ হয়নি। শ্যামাদাসবাবুর সেই পুত্র (পূর্ণ চক্রবর্তীর পুত্র) একটি দু বছরের পুত্র রেখে অকালে মারা যায়। প্রথমে রাজী না হলেও শেষে বিধবা পুত্রবধূর হাত থেকে সে পিণ্ড গ্রহণ করেছে। তখন পুরোহিত বলেছেন, "খাও হে

চক্রবর্তী"। "উদর সর্বস্ব, লজ্জাহীন, হীনচিত্ত পূর্ণ চক্রবর্তীর এই ভয়ঙ্কর কুৎসিত পরিণাম পাঠক চিত্তকে বিমূঢ় করে তোলে।" [৪১] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "এই গল্পে লেখক ক্ষমাহীন এক নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় চক্রবর্তীর ওপরে নিষ্ঠুরতম দণ্ড বিধান করেছেন।" [৪২] ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র "তারাশঙ্কর" গ্রন্থে এই ধরনের আদিম প্রবৃত্তিকেই Elemental Passion বলে উল্লেখ করেছেন।" [৪৩] ভূদেব চৌধুরীও বলেছেন, "এই Elemental Passion মানুষের মৌলিক বৃত্তি এবং প্রবৃত্তি জীবদেহের মতই যা তার অস্তিত্বের সহজাত উপাদান, তারই অনাবৃত বস্তুশরীরের উপরে তারাশঙ্কর সৃষ্টিদেবী রচনা করেছেন।" [৪৪] ব্রাহ্মণের এই অন্যায় অপরাধ, জঘন্য লালসার জন্যে শাস্তি একান্ত অপরিহার্য। নিজপুত্রের পিণ্ড-গ্রহণ মৃত্যুরই নামান্তর যা তারাশঙ্করের অকম্পিত লেখনীতেই সম্ভব। "অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তিমান কোনো লেখক কিছুতেই নির্মমতার এই স্তরে নামাতে পারতেন না কিন্তু তারাশঙ্করের লেখনী অকম্পিত। তান্ত্রিক সুলভ নিরাসক্তি নিয়ে তিনি লোভের খড়্গে চক্রবর্তীকে বলি দিয়েছেন। গল্পটি তাঁর নির্ভীক শিল্পীসত্তার আর এক নির্ভুল নিদর্শন।" [৪৫]

পুরোহিতের শেষ কথাটি "খাও হে চক্রবর্তী" সম্বন্ধে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, "যেন নির্মম নিয়তির নিষ্ঠুর বিদ্রূপ—বজ্রবিদ্রূপের অগ্নিরেখায় জ্বালাময় যেমন বীভৎস তেমনি সুন্দর।" [৪৬]

রাখাল বাঁড়ুজ্জে ঃ- লোভী, নির্লজ্জ ব্রাহ্মণ শুধু পূর্ণ চক্রবর্তীই একা নন, এমন চরিত্র বহু আছে—যেমন স্বভাবদুর্বৃত্ত, অমানুষ হাজার টাকা আয়ের জমিদার রাখাল বাঁড়ুজ্জে। সংসার স্বচ্ছল, তথাপি ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অমানবিক লোলুপতাই তাকে হিংস্র করে তোলে। একদিন সদর থেকে বাড়ী ফেরার পথে রাত হয়ে যাওয়ায় "গোলাপ জল" পাতানো বন্ধুর ভাগ্নে হারাণের বাড়ীতে ওঠে। স্বার্থপর বাঁড়ুজ্জে সেদিন হারাণের উপর অনেক অত্যাচার করে এমন কি মদ আনিয়েও খায়। সেদিন হারাণের কাছ থেকে জানতে পারে যে হারাণের সৎমা বিধবা হৈমর একমাত্র কন্যাকে ঘরের পুত্রবধূরূপে আনতে পারলে বেশ কিছু সম্পত্তি পাওয়া যাবে। ঘটকী মোক্ষদার সহায়তায় হৈমর কন্যা মেজপুত্রবধূ হয়ে রাখালের বাড়ী যায়। বিয়ের দিন থেকেই রাখালের মনোবৃত্তি ও স্বভাব জানতে পারে হৈম। রাখাল হৈমর সমস্ত সম্পত্তি, পুকুরের মাছ গ্রাস করতে উদ্যত হয়। হৈম কিছুতেই রাখালের মানসিকতাকে বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই হৈম কিছুটা শক্ত হলে শয়তান-ব্রাহ্মণ অষ্টমঙ্গলার পুণ্যবাসর থেকেই নিজ পুত্রকে বাড়ী নিয়ে চলে যায়। কিছুদিন পর রাখাল হৈমর বাড়ীতে এসে বৌমাকে নিয়ে যেতে চাইলে হৈম মেয়ে পাঠাতে চান না। বিফল মনোরথ রাখালের নষ্ট চিত্তে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। রাখাল সৎ-চরিত্রা হৈমকে দুশ্চরিত্রা বলে গ্রামে প্রচার করতে থাকে।

ব্যর্থ মনোরথ বাঁড়ুজ্জের পাশব হিংস্রতা প্রকট হয়েছে শেষ অনুচ্ছেদে। হৈম স্থানীয় জ্ঞানাঞ্জন দত্তকে সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি জীবনস্বত্ব লিখে দিয়ে কাশী চলে যান। সঙ্গে মেয়েকেও নিয়ে যান। রাখাল বেয়ান বাড়ীতে যখন আসে তখন সব শেষ। শূন্য বাড়ীতে কেবল বাড়ীর বেড়ালটা কাঁদছে; বাঁড়ুজ্জেকে দেখেই বিড়ালটা ক্রোধে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসে। বাঁড়ুজ্জে দরজার অল্প ফাঁক করে দেখতে থাকে; বিড়ালটা দরজার ফাঁকে মুখ ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধোন্মত্ত রাখাল দুহাতে চেপে ধরে দরজা দুটি। কঠিন পেষণে বিড়ালটির কণ্ঠনালী পিষ্ট হয়ে যায় এবং একটি চোখ ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। সমাজের উচ্চাসনে আসীন থেকে ব্রাহ্মণদের প্রাত্যহিক জঘন্য কর্মের দ্বারোদঘাটন এইভাবেই করেছেন তারাশঙ্কর। "রাখাল বাঁড়ুজ্জের হিংস্র পশুস্বভাবের বীভৎস স্বরূপ উন্মোচনে এ যেন অভিনব চরিত্র স্রষ্টা বাণী শিল্পীর শেষ তুলির টান।" [৪৭]

চণ্ডী রায়ের সন্ন্যাস ঃ- সাতপুরুষ তান্ত্রিক বংশ। এই বংশেরই সন্তান মদ্যপ ব্রাহ্মণ চণ্ডীচরণ। বিরাট জমিদারী ছিল এককালে, বর্তমানে যা সামান্যটুকু ছিল তাও আবার চণ্ডীচরণ বিধবা ভাগ্নী চিন্ময়ীকে লিখে দেন। চিন্ময়ীকে চণ্ডীচরণ অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই দানপত্রে লেখেন "স্নেহে তুমি আমার আপন কন্যারও অধিক, মমতায় যত্নে আমার মায়ের মত মমতাময়ী, তুমি ছাড়া আমার আপনও কেহ নাই ইত্যাদি।" চণ্ডীর কাছে শুধু নেশা, অর্থ সম্পদ সবই মাটির সঙ্গে তুলনীয়। অত্যন্ত সারল্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ তাঁর হৃদয় তথাপি বিষয়সক্তিতে আকৃষ্ট চিন্ময়ীকে তিনি চেনকা বলে ডাকতেন। সর্বদা কালীর পূজা নিয়েই থাকতেন। কিছুদিন পর মদের দোকানের মালিক গিরীশ আশি টাকা চণ্ডীর কাছে চাইতে আসে। সেই টাকা চণ্ডী ভাগ্নীর কাছে চাইলে পায় না। তখন চণ্ডী গিরীশকে দলদলি জলার পনেরো কাঠা জমি দিয়ে দেয়। গিরীশের লোক জমিতে গেলে চিন্ময়ী বাধা দেন। চিন্ময়ী মামাকে বলেন, "সম্পত্তি এখন আমার। আমি যদি না দিই।" চণ্ডী এরপর ক্ষেপে গিয়ে আদালতে চিন্ময়ীর নামে মিথ্যে আপীল করেন যে তাঁকে মত্ত অবস্থায় দেখে চিন্ময়ী তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়েছে। আদালতে চণ্ডীর জয় হয়। সেদিন মধ্যাহ্নে মাতাল হয়ে চণ্ডী নিত্যদিনের মত টলতে টলতে বাড়ীতে এসে 'চেনকা' বলে ডাকে। কিন্তু অনেক আগেই চিন্ময়ী নিজের জিনিসপত্র নিয়ে কোথায় চলে যান। চণ্ডী ঘর খুলে দেখেন, "মুক্তদ্বার শূন্য, সেই পিতৃপিতামহের আমলের পুরানো ঘরখানা যেন কোন দন্তহীন জরতী জাদুকরীর মত কদর্য মুখগহ্বর মেলিয়া ব্যঙ্গ হাস্যে তাহাকে উপহাস করিতেছিল।" এই শূন্যতা রায়ের কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। বাড়ীর বাইরে দু-চার পা বেরিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এসে খুঁজতে থাকে; "কুলুপ চাবিটা কোথায়

গেল?" দিনরাত কালীপূজা ও অনাসক্তের ভাব দেখিয়ে ফিরলেও বিষয়াসক্তির মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি চণ্ডীচরণ। বৈরাগ্যের নামাবলী গায়ে দিয়ে ফিরলেও মোহবন্ধনে আসক্ত বলেই মিথ্যা ছলনার ও কদর্য মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছেন অনায়াসে।

রঙীন চশমা ঃ-পরশ্রীকাতরতা, অন্যের অনিষ্টসাধন, মিথ্যা কুৎসাপ্রচার, জটিল হৃদয়ের ব্রাহ্মণ রাইকিশোর। ছিপছিপে সোজা দুর্বল চেহারা, মাথায় টাক। টিপটিপে চোখ, দেখলে সরল মনের হলেও অন্তরে ছিল পরনিন্দা, পরচর্চা করার অদম্য প্রয়াস। কৃতঘ্ন চরিত্র। দানে, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় চৌধুরী বংশ। জমিদার চৌধুরী বাড়ির বড়কর্তার একমাত্র কন্যা রাধারাণীর বিবাহ। কন্যাসুন্দরীর কিন্তু পায়ের উপরে কোন কারণে আগুনে পুড়ে যায়। ক্ষত শুকালেও দাগ থেকে যায়। সেটা শ্বেতকুষ্ঠের মত মনে হয়। রাইকিশোর সকলকে এই শ্বেতকুষ্ঠের কথা বলে বেড়ায়। জমিদারের আত্মীয় হরসুন্দর ব্রাহ্মণ সন্তান। তারও ভূমিকা আত্মীয়ের মত হয় নি। বিবাহ শান্তিতেই হয়ে যায়। কিন্তু জানা যায় যে উভয় পক্ষের বাড়ীতেই বেনামী পত্র দেওয়া হয়েছে। অনেকে রাইকিশোরকেই সন্দেহ করেছে। মিথ্যা প্রচার করতে করতে রাইকিশোর এমন পর্যায়ে পৌঁচেছেন যাতে সকলেই তাকে সন্দেহ করেছে। অবশ্য গল্পে জানা যায় যে রাইকিশোর নির্দোষ। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে জমিদার কন্যার বিয়ে দেবার জন্যে পোস্টমাষ্টারই এই জঘন্য বৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে। সমাজের উঁচুস্তরে আসীন থেকে ব্রাহ্মণদের এই অপকর্ম সত্যই নিন্দনীয়। এই বাস্তব ও জীবন্ত চরিত্র রাঢ়ের এক স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্কর অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছভাবে তা প্রকাশ করেছেন।

কুলীনের মেয়ে ঃ- এই গল্পের নায়িকা তরু— ধনী জমিদারের একমাত্র কন্যা। পিতা ধনদা কুলীন বিপদতারণকে "রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে" রাখতে চাইলেও চরিত্রহীন, লম্পট, লোভী শয়তান, বহুপত্নীক জামাইকে আটকে রাখতে পারেন নি। অবশ্য এর জন্যে দায়ী ব্রাহ্মণ জমিদার ধনদাবাবু নিজেই, —কৌলিন্যের আভিজাত্যে অন্ধ হয়ে একমাত্র কন্যার জীবন মরুভূমি করেছেন। অনেকের নিষেধ তিনি শোনেন নি। কৌলিন্য-প্রথার চাপে এইভাবে শত শত পিতা কন্যাদের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করেছেন। বিপদতারণ পাঁচটি বিয়ে করেও আবার তরুর জীবনে এসেছে। বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও পরী নামে এক নীচবংশীয়া কন্যার সাথে মেলামেশা করে। ফুলশয্যার রাতে তরুর সঙ্গে যে ব্যবহার বিপদতারণ করেছে তা মনুষ্য-সমাজে অবর্ণনীয়। তরুর জীবনে এসে তরুকে সর্বস্বান্ত করে চুরি করে জীবনের মত পালিয়েছে। তবু তরু সহ্য করেছে। ছোট ভাই সঙ্গীতচর্চায় ব্যস্ত, অথচ বিবাহিত স্ত্রী-পুত্রদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অক্ষম। সেও তরুর জীবনে এসে তরুর যাবতীয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়েছে। শেষে তরুকে ভিক্ষা-বৃত্তি এমন কি চৌর্যবৃত্তি করতে হয়েছে। ধরা পড়ার ভয়ে আত্মহত্যা করেছে। তরুর জীবনে এই অন্ধকার সৃষ্টির জন্যে দায়ী ব্রাহ্মণ সমাজ। বহুবিবাহ ও ভোগ-তৃষ্ণা নিবারণই ছিল অধিকাংশ ব্রাহ্মণদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীনাথ ডাক্তার ঃ- শ্রীনাথ বাঁড়ুজ্জে ডাক্তারি পড়াকালীন হঠাৎ বাবার প্রতি প্রতিশোধ নিতে মেডিকেলে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দেন, পরে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ শুরু করেন। ভীষণ একগুঁয়ে ও জেদী প্রকৃতির মানুষ। সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, কিন্তু নতুন ঔষুধ তৈরী করে বাড়ীর পোষা বিড়ালের উপর সেটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা করেন। সেই থেকে সংক্রামিত —হয়ে স্ত্রী মারা যায়—শিশুপুত্রেরও মৃত্যু হয়। তারপর ডাক্তার বেপরোয়া জীবন যাপন শুরু করেন। নিত্য মদ্যপান করে যাযাবরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গল্প-কথকের গ্রামে এসে কিছুদিন থাকেন এবং বেশ পসার জমিয়ে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হন। পরে গ্রামের ষ্টেশনে বক্তা দেখেন যে শ্রীনাথ ডাক্তার মদ্যপ অবস্থায় "এই—এই—একটা পয়সা দাও না, একটা পয়সা দাও না"—বলে চিৎকার করছেন।

পিতার উপর জেদ, মদ্যপান, যাযাবরী জীবনযাপন শেষে ভিক্ষুকের ভূমিকায় রূপান্তর—কোনদিনই কোন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়োচিত কর্ম নয়। আত্মমর্যাদা, শিক্ষা মান-সম্মান সবই তিনি বিসর্জন দিয়েছেন।

মুখুজ্জে মহাশয় ঃ- পরের সম্পত্তিকে নিজের মত করে প্রচার করা, মিথ্যার জাল বুনে বিষ্ণু মুখুজ্জে জমিদারের কাকা বলে জাহির করেছেন। এতটুকু আত্মমর্যাদা থাকলে কখনই এমনটি করতে পারতেন না। শেষে যেদিন প্রকৃত মালিক হরেন্দ্র তাঁকে কাজ থেকে অবসর নেবার কথা বলেছেন, সেদিনই বিষ্ণুবাবু বেলুনের মত চুপসে গেছেন; তথাপি প্রকৃত সত্য চেপে রেখেছেন— প্রজাদের কাছে সত্যটি বলতে পারেন নি। কলকাতা থেকে বাড়ী ফেরার পথে বিষ্ণুবাবু প্রজা শিবু ঘোষকে বলেছেন, "বয়স তো কম হল না, তাই বললাম আজ হীরুকে বাবা, উপযুক্ত হয়েছ। সব দেখে শুনে নাও। আমি এইবার কাশী যাব। হীরুর চোখ ছল ছল করে উঠল।" শিবু টাকার কথা বললে মুখুজ্জে মিথ্যেকে সত্যি করে বলেছে যে, হীরুর টানাটানি চলছে। তাই হীরুকে তার কথা বলতে পারেন নি। শিবুকে নিজের গিন্নীর গয়না বেচে টাকা দেবার কথা বলেছেন। তিনি জানেন যে তাঁর জমিদারী-গর্ব শেষ হয়ে গেছে তবু নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন নি। হীরুর কাছে অপমানিতহওয়ার পর তাঁর আর গ্রামে থাকা অসম্ভব, তাই তিনি কাশী যাবার মনস্থ করেছেন। সেই সঙ্গে শিবুকে বলেছেন, "আমি মরে গেলে কিছু কিছু করে কিন্তু বুড়ীকে দিবি কেমন?" তিনি ছোট হলেও পিছুপা হন নি। তাঁর দিন শেষ হয়ে গেছে জেনেও সত্য প্রকাশ করতে চান না। এইভাবেই ব্রাহ্মণদের অধোগতি ঘটেছে। "সব কিছু হারিয়েও বিষ্ণু মুখুজ্জে অন্যের কাছে আত্মমর্যাদা হারাতে প্রস্তুত নন। এই প্রবঞ্চনাপরায়ণ মানুষটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখকের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও শিল্প সুন্দর পরিবেশ গুণে অপূর্বত্ব লাভ করেছে। লেখকের সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন কারুণ্যে সহৃদয়চিত্তেও সঞ্চারিত হয়।" (৪৮)

উল্কা ঃ- এই গল্পের নায়ক বিমল ব্রাহ্মণ সন্তান, বেকার অথচ নেশাখোর। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাকা-কাকীমার সামনে সে দাঁড়িয়েছে। আবার বৃদ্ধ রামেশ্বর চাটুজ্জ্যের বুড়ো বয়সেও ভীমরতি যায় নি। তার বয়স ষাট। ঘরে চারপুত্র ও চার পুত্রবধূ বর্তমান থাকতেও দ্বিতীয় পক্ষে সামান্য ৫০০ টাকার জন্যে বিমলার মত নিষ্পাপ মেয়েকে বিয়ে করতে দ্বিধা করেন নি। সমাজের শীর্ষস্থানে চিরকাল থাকার সুবাদে ব্রাহ্মণগণ এইভাবেই সমাজে যথেচ্ছচার চালিয়েছেন।

পুত্রেষ্টী ঃ-অর্থ আর পরমার্থের লোভে বাঁড়ুজ্জে বাড়ির আঁটকুড়ো মেজকর্তা তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পুত্রেষ্ঠী যজ্ঞের আয়োজন করেছেন শ্মশানে; নিজ পুত্রকামনার জন্যে এক মায়ের কোল শূন্য করতে উদ্যত হয়েছেন—পোষ্যপুত্রে তাঁর মন ভরেনি।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর চারিত্রিক অধোগতি সংশ্লিষ্ট আরও অনেক গল্প রয়েছে; যেমন বিবাহ করে ও শিক্ষিত হয়েও সামান্য কারণে গৃহত্যাগ করেছেন "আলো আঁধারি" গল্পে সুখময়। ব্রাহ্মণ সন্তান জমিদার সরকারী চাকুরীরতা, মুখে সমাজ সেবামূলক ও প্রগতিমূলক কথাবার্তা বললেও চরিত্রহীন 'বিষধর' গল্পের 'বিনয়কৃষ্ণ'। চরিত্রহীন মদ্যপ লম্পট জমিদার তনয় 'প্রতিমা' গল্পের অমূল্য। পঞ্চরুদ্রকে নিয়ে দেড়শ বছর ধরে ব্রাহ্মণদের অধোগতির বর্ণনা 'পঞ্চরুদ্র' গল্প। টাকার অহংকারে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নরহত্যা করেছে, জেল জরিমানায় ভিখারীতে পরিণত হয়েছে, শেষে দালালগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করেছে 'হোলি' গল্পের কানাই মুখুজ্জে। জাতিতে ব্রাহ্মণ কিন্তু বৃত্তিতে ভৃত্যেরও অধম, আত্মমর্যাদাহীন, সপ্তম কন্যার পিতা "চরহাটির স্টেশন মাষ্টার" গল্পের স্টেশনমাষ্টার। স্ত্রীকে মিথ্যা সন্দেহ ও তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এবং সেই বিষপানে আত্মহত্যা করেছে "শাপমোচন" গল্পে দেবীচরণ। গুরুগিরি করা সত্ত্বেও একজন মদ্যাসক্ত, অন্যজন গঞ্জিকাসক্ত "ট্রিটি" গল্পের কালী চাটুজ্জে ও রাধা গাঙ্গুলী। পুত্রের দেশ জোড়া খ্যাতিতে ঈর্ষাপরায়ণ পিতা "পিতাপুত্র" গল্পের শিবশেখর ন্যায়তীর্থ। উচ্ছৃঙ্খল, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান "জন্মান্তর" গল্পের নীলু। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন ও মদ্যপ হয়ে প্রাচীন আদর্শকে বিসর্জন দেয় "মানুষের মন" গল্পে ভবেন্দ্র। সম্ভ্রান্ত হয়েও ভিক্ষে করে সেই টাকায় মদ খান "গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী" গল্পে জনার্দন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গ। অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবনে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র

প্রবৃত্তি-লীলায় আবদ্ধ মানুষ। প্রবৃত্তির আকার ও প্রকার ভেদে মানুষেরও স্বভাব, চরিত্রের পার্থক্য সূচিত হয়। প্রবৃত্তির কাছে মানুষ একান্ত অসহায়। সামাজিক রীতি-নীতি, আদর্শ, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, ধর্মনীতি, মানবনীতি সমস্ত কিছুই তাদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই প্রবৃত্তি মানুষকে যেমন মধুর থেকে মধুরতম করে গড়ে তোলে আবার তেমনি রৌদ্র থেকে ভয়ানক, ভয়ানক থেকে ভীষণ করে গড়ে তোলে। এই জীবন প্রণালী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত গোষ্ঠী থেকে দরিদ্রতম কৃষক প্রজা পর্যন্ত প্রসারিত। রাঢ়ের অসংখ্য বিকৃত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত চরিত্রকে মাধুর্য ও স্নিগ্ধতার গোপন স্রোতে মহিমময় করে তুলেছেন লেখক তারাশঙ্কর। তিনি বলেছেন—"জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। সেখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র্য ধারায়। কোথাও জিতেছে কোথাও হারছে।" [৪৯] তারাশঙ্কর বীভৎসকে সুন্দর করতে জানেন। তাঁর অনাসক্ত দৃষ্টি অন্ত্যজ শ্রেণীর কদর্যতার মধ্যেও সুন্দরকে দেখেছেন। "তাই তারাশঙ্করের গল্পে এই মধুর আর ভয়ঙ্করের মিলন, সুন্দর আর অসুন্দরের মিলন।" [৫০] ভূদেব চৌধুরীও তাই বলেছেন, "তিনি (তারাশঙ্কর) কেবল ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারের স্তূপীকৃত বস্তু সঞ্চয় নিয়েই হাজির হন নি, সেই সঙ্গে এনেছেন সেই জীবন সম্পর্কে নিজের প্রত্যয়, হৃদয়াবেগ-ও সৌন্দর্যবোধের পসরা সাজিয়ে, গল্পের শরীরে খড়ের ওপরে একমাটি দো-মাটির মূর্তি গড়েছেন সেই বস্তুপুঞ্জের সঞ্চিত সম্ভারে। কিন্তু প্রতিমার চক্ষুদান করেছেন—প্রাণসঞ্চার করেছেন নিজের স্বপ্ন-কল্পনার মাধুরী দিয়ে।" [৫১] সাহিত্য কর্মকে কেবল জৈবরসের দীঘিতে ডুবতে দেন নি তারাশঙ্কর। তাই পুলিনের জৈব ক্ষুধার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চকিতে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় শিকল দিয়ে রসকলির ঢেঁকিশালে শয়ন—এতো জীবনেরই জয় (রসকলি)। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তির জন্যই তো মানুষ পশুর থেকে পৃথক। এই কারনেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তারাশঙ্করের পার্থক্য। কল্লোল যুগের হয়েও তারাশঙ্কর কল্লোলোত্তর। আধুনিক কথা সাহিত্যে বাস্তবতার আন্দোলন, দেহ সচেতনতা রোমান্টিকতা বিরোধিতা, নাগরিক জীবনের ক্লেদ, নৈরাশ্য-অবক্ষয় ইত্যাদি বহন করাই ছিল কল্লোল পত্রিকার দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য। পুরাতনের প্রতি অবিশ্বাস করাও ছিল তার সহজাত প্রবৃত্তি। তারাশঙ্কর কল্লোলে আত্মপ্রকাশ করেও কল্লোলের হন নি। কারণ সম্পর্কে কল্লোল যুগ গ্রন্থে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, "আসলে যে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির, সে স্থৈর্যের, উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা বলি, তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের।" [৫২] সেই কথার সূত্র ধরেই তারাশঙ্কর লিখেছেন, "বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয় নি। আমার রচনার সমাপ্তি পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে একথা বোধ হয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।" [৫৩] তাই তাঁর চোখে "স্বর্ণ" ডাইনী নয়, মানবী। অখ্যাতজনের নির্বাক মনের তিনি সার্থক রূপকার। জীবনের ভিতর আর এক জীবনকে গড়ে তোলা, ইংরেজীতে যাকে বলে "Creating one's own world"—এই ছিল তারাশঙ্করের জীবনব্যাপী সাধনা ও অন্বেষণ। তারাশঙ্কর মানুষকে কেবল রক্তমাংসের দেহধারী জৈবিক বৃত্তিতে মগ্ন হিসেবে

দেখেন নি। মানুষই যে মহিমময় প্রকাশের ধারক এবং বাহক, সকলের উর্ধ্বে মানুষ-তাও তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর দৃষ্টি রাঢ়ের উচ্চশ্রেণী থেকে একেবারে নিম্নজ ও যাযাবর শ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজেই বলেছেন, "পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে, তেমনিভাবে এই পাপ পুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার ধাত্রীদেবতায় আছে।" [৫৪]

তারাশঙ্করের অনেক অন্ত্যজ শ্রেণীর গল্প আছে যেখানে জৈবিক প্রবৃত্তি তাড়িত হয়েও মানুষগুলোর মধ্যে থেকে দেবত্বের মহিমা বিচ্ছুরিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বহু গল্প উত্থাপন করা যেতে পারে—

স্রোতের কুটো ঃ- এই গল্পে নিরক্ষর সাধা সিধে গোপালের জীবনকাহিনী বিবৃত। ভাইঝির উপর অন্ধভালবাসায় তার জীবনে বিরাট Tragedy সৃষ্টি হয়েছে। অন্ধভালবাসায় সে তার দাদার গায়ে হাত তুলেছে, স্ত্রীকে ভুলেছে। জমি জায়গা নষ্ট করেছে। এমনকি সে জেল খেটেছে, নেশাগ্রস্ত হয়েছে অথচ সেই ভাইঝি তাকে মর্যাদা দেয় নি, অপমান করে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। স্ত্রীর কাছ থেকে সে চরম আঘাত পেয়েছে। সে আপন মনে তাই বলেছে "তোমার মন, তুমিই বা কার, এ মায়ার জগৎ ফক্কিকার।" এই নিম্নজ অজ্ঞ মানুষটিরও এক বিরাট হৃদয় ছিল- মন, প্রেম, ভালবাসা সবই ছিল বিনিময়ে সে শুধু সারাজীবন ধরে সকলের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছে। কেউ তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। তাই সে চুরি করে জেলে গেছে। ত্রিশ বছর পর গ্রামে ফিরে এসে স্ত্রী কাতির জলে ডুবে মরার সংবাদ শুনে গোপালও অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।

স্থলপদ্ম ঃ- এই গল্পে এক সন্তান বুভুক্ষা বাউরী রমণীর বেদনাবহ চিত্র রয়েছে। বিধবা বেলে হারা বাউরীকে বিবাহ করে। স্বামীকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখলেও তা সার্থক হয় না। সন্তান পাগলিনী বেলে সন্তান চায় কিন্তু হারা চায় প্রথমে দারিদ্র্য দূর করতে। ফলে শুরু হয় অশান্তি। হারাকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলে। অন্য নারীতে আসক্ত না হয়ে অর্থোপার্জনের আশায় হারা শহরে চলে যায়। জীবনে মরণে হারা স্ত্রীকে বিস্মৃত হতে পারে নি। এদিকে বেলে সন্তান-সম্ভবা অথচ চরম দারিদ্র্যে দিগভ্রান্ত হয়ে শেষে রাজমিস্ত্রী গণির দলে কাজ করতে গিয়ে ইটের গাদায় পড়ে যায়। সকলে বেলেকে অজ্ঞান অবস্থায় ঘরে আনে, বেলের জ্ঞান ফিরলেও তার সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। ওদিকে শহর থেকে ৫০০ টাকা আয় করে হারা স্ত্রীকে সুখী করতে ও নতুন ঘর বানাবার আশায় গ্রামে আসে। আসার পথে শ্মশানে নারীর কণ্ঠস্বর শুনে কাছে গিয়ে বেলেকে দেখে চিৎকার করে ওঠে। বেলে তখন মৃত্যু পথ যাত্রী। "জীবন্তের রাজ্যের আহ্বান বুঝি মরণের দ্বারপ্রান্তবাসিনী নারীটির কানে পৌঁছিল না।" একদিকে পত্নীপ্রেম ও অন্যদিকে বাৎসল্য রসের অভিব্যক্তি এখানে প্রকাশিত।

মেলা ঃ-গল্পটি একটি মেলার প্রেক্ষাপটে লিখিত। দৈধা বৈরাগী তলায় বৈষ্ণব সাধক গোপাল দাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথিতে বিরাট মেলা বসেছে। লক্ষ, লক্ষ লোকের সমাগম। লেখক স্বয়ং মেলায় দুদিন উপস্থিত থেকে এই গল্পটি লেখেন। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবন গ্রন্থে বলেছেন, "রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের-জুয়ায়-উন্মত্ত মানুষদের-লক্ষ্য করেছি, পাপ পঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যাবাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছি।" [৫৫] মেলা দেখতে গিয়ে অমরের ছোটবোন মণি হারিয়ে যায়। মণিকে গণিকা কমলি দেখতে পেয়ে কোন কুমতলব ছাড়াই তাকে ঘরে নিয়ে যায়। খেতে দেয়, শুতে দেয়, মুখে চুম্বনে ভরিয়ে দেয়। মণি বলে "মাও ভাল, তুমিও ভাল।" কিন্তু কমলির মাসী জানতে পেরে মণিকে বিক্রি করার ফন্দী করে তাই ভোরবেলায় মণিকে নিয়ে কমলি অজানার উদ্দেশ্যে চলে যায়। এই গল্প বেশ্যাবৃত্তিতে আশ্লিষ্ট হলেও কমলির হৃদয়ে যে মানবতার ও মাতৃত্বের উজ্জ্বল দিক ফুটে উঠেছে। চরিত্রহীনা হলেও এই নিম্নজ শ্রেণীর মধ্যেও উদারতা, ত্যাগ, কত মহত্ব, কত মমতার ফল্গুধারা নিয়ত বর্ষিত হচ্ছে যা উচ্চশ্রেণীর চরিত্রকেও অতিক্রম করে। এই প্রসঙ্গে "এক পশলা বৃষ্টি" গল্পের জয়া চরিত্রটিও উল্লেখ্য।

ট্যারা ঃ- প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট বাউরী পুত্র ট্যারা। এক চোখও তার ট্যারা; জিভের জড়তা বেশী; শৈশবেই অনাথ হয় এবং ভিক্ষে করে বেঁচে থাকে। আর পাশেই এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে থাকে ও খায়। কিন্তু জান্তব প্রবৃত্তি ও উদ্ভ্রান্ত জীবনযাত্রা সে কিছুতেই ভুলতে পারে নি তাই সন্ন্যাসী পুত্র-সম তাকে ভালবাসলেও ট্যারা কিন্তু অদ্ভুত কৌশলে গরুর দুধ চুরি করে খেয়েছে। তাড়া খেয়ে ট্যারা হরিদ্বার, কাশি, বদ্দিনাথ, কামরূপ, অযোধ্যা, দ্বারকা ইত্যাদি তীর্থস্থান ঘুরে পরে আশ্রমে ফিরে আসে। ট্যারা মোহান্তকে প্রকৃতই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, কিন্তু আশ্রমের কর্মচারী ভোলা বামুনের ব্যবহার সে সহ্য করতে পারেনি। তাই সে গাঁয়ে নিজের সমাজে ফিরে গিয়ে ঘর বানাতে শুরু করে; নোটন বাউরীর মেয়ে পরীকে বিয়ে করার মনস্থ করে। হঠাৎ সন্ন্যাসীর মৃত্যু হলে জঙ্গলের একপ্রান্তে নীরবে কেঁদে চলে ট্যারা—"গোঁছাই বাবা, গোঁছাই বাবা গো।" "উনমানবের স্তরে অবনমিত থেকেও অগ্নিশিখার মতো ঊর্ধ্বমুখী অবজ্ঞাত ট্যারা।" [৫৬] সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে ট্যারার হৃদয় বিগলিত হয়েছে।

ডাকহরকরা ঃ- কর্তব্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বলতম চরিত্র দীনু ডোম। সরকারী ডাক ও তার বিভাগে রাণারের কাজ করে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বাধা-বিপত্তি দীনুকে নিরস্ত করতে পারেনি। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে, পিঠে অজস্র সংবাদ ও অর্থ বয়ে নিয়ে চলে দীনু রাতের অন্ধকারে হাতে বর্শা ও লণ্ঠন নিয়ে। মতিচ্ছন্ন পুত্র নিতাই রাত্রে দীনুকে আক্রমন করে মেলব্যাগ ছিনতাইয়ের জন্যে। দীনুর মাথা ফেটেছে তথাপি সে ব্যাগ ছাড়ে নি। হাসপাতালে শুয়ে পুলিশের জেরার মুখে সে পুত্রের নাম বলেছে। পুত্র ফেরার হয়। দীর্ঘ এগার বছর পর পুত্রের মৃত্যুসংবাদে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সন্তান হারানোর ব্যথায় ক্ষত-বিক্ষত দীনু নিজের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ

নিজেই বয়ে এনেছে। আকাশের দিকে চেয়ে সে ভাবে, "উঃ, এমন সংবাদ এই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিত্য নিত্য কত সে বহিয়া আনিয়াছে। কত-কত-কত সংখ্যা হয় না। মনে হইল আজও পর্যন্ত যত রোদন ধ্বনি সে শুনিয়াছে, সে সমস্ত দুঃসংবাদ সে-ই বহন করিয়া আনিয়াছে।" মূর্খ দীনু তাই পোষ্টমাষ্টারকে বলেছে, "আমি আর কাজ করব না বাবু। কাজে জবাব দিলাম।" আসলে এই চাকরির প্রতি দীনুর বিতৃষ্ণা জেগেছিল। এই চাকরীর জন্যেই তার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তাছাড়া সন্তান নেই—কাদের জন্যেই এই পরিশ্রম? তাই সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ঘাসের ফুল ঃ- কলিয়ারীর লেবার রেজিস্টার বিনোদ সুগায়ক। কুলীর মেয়ে চূড়কী সাঁওতাল তাকে ভালবাসে। হঠাৎ একদিন কলিয়ারীর খনির খাদে আগুন লাগে। যে কোন মুহূর্তে সমস্ত কলিয়ারী চিরদিনের জন্যে ধ্বংস হতে পারে। একমাত্র উপায় পনেরো নং গ্যালারীর মুখ বন্ধ করা। গ্যালারীর মুখ বন্ধ হচ্ছে এমন সময় কাদামাটি বইতে গিয়ে ঐ খাদের ভিতর চূড়কী বিনোদের চোখ চেপে ধরে। বিনোদ জুতোর ডগা দিয়ে চূড়কীর মুখ ঠেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে। চূড়কীর ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে বিনোদ উপরে উঠে আসে। রুদ্ধশ্বাস পাতালের সুড়ঙ্গ পথে চূড়কীর ভালবাসার উচ্ছ্বাসকেমর্যাদা না দিলে চূড়কীর মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে। অগ্নিগর্ভে চিরদিনের জন্যে ধ্বংস হয়েছে ঘাসের ফুল চূড়কী। ভালবাসার চিরন্তন মাধুর্য নিম্নশ্রেণীর চরিত্রে মধ্যেও কত বড় মহৎ হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত চূড়কী। সে বিনোদকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল অথচ উচ্চকোটী বংশ জাত বিনোদ তাকে জুতো মেরেছে, কত সহজে প্রত্যাখ্যান করেছে।

নারী ও নাগিনী ঃ- জৈব আসক্তিতে সদামত্ত, যৌবনে বিকৃত জৈব আসক্তিতে নিমজ্জমান হয়ে খোঁড়া শেখ একপা ও নাক হারায়। খোঁড়া শেখকে তার স্ত্রী জোবেদা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। খোঁড়া শেখ জোবেদাকে তাই "জানের চেয়ে বেশী" বলেছে। অথচ এই খোঁড়া একদিন এক কালনাগিনীকে ঘরে এনে তাকে সিঁদুর ও কানে নথ পরিয়ে সাঙা করে। জোবেদা খোঁড়ার এই সর্পিনী প্রীতি সহ্য করতে পারেনি। সে খোঁড়াকে সাপটিকে ছেড়ে দিয়ে আসতে বলে। সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এলেও সেই রাতেই জোবেদাকে এসে দংশন করে। জোবেদা মারা যায়। খোঁড়া সাপটিকে ধরেও হত্যা করে নি। নারীর চিরন্তন ঈর্ষার পরিচয় পেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে জঙ্গলে। সে বলেছে, "শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।" খোঁড়া অসংস্কৃত স্থূল জৈব-বৃত্তির মাধ্যমেই মানবিক হৃদয়াশক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছিল। নারী জাতির প্রতি এই বিশ্বাসহীনতা ইমারত গল্পে জনাব শেখের, "যা তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি" চরিত্রকেও স্মরণ করায়—এ প্রসঙ্গে ব্যালজাকের A Passion in the Desert গল্পটি মনে হয়। মরুভূমিতে দলভ্রষ্ট সৈনিকটির কাছে বাঘিনী –**"It was a female. The fur upon her breast and things shown with whiteness. The number of little spots like velvet looked like charming bracelet around her paws..... The presence of the panther even sleeping made him experience the effect which the magnetic eyes of the serpent are said to exercise upon the nightingale."** (৫৭) গল্পটি রোমান্টিকতায় অনন্য, অনবদ্য। তথাপি নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও পরিচিত জগৎ থেকে তারাশঙ্কর যে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তা সত্যই মনোহরণকারী। "কত সামান্য উপকরণকে আশ্রয় করে তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর গল্প রচনা করেছেন, ভাবলে বিস্মৃত হতে হয়। তীক্ষ্ণতায় ও অন্তর্ভেদী শিল্পদৃষ্টিতে তারাশঙ্কর ব্যালজাককে এখানে অতিক্রম করেছেন।" (৫৮)

বেদেনী ঃ- অদৃশ্য স্রষ্টার দুর্জ্ঞেয় রহস্যলীলার সার্থক সৃষ্টি 'বেদেনী' গল্পটি। এখানে নায়িকা রাধিকা কেবল জৈব আসক্তির তাড়নার শিকার। আদিম প্রবৃত্তির লীলারসে মোহাচ্ছন্ন। তাই সে অনায়াসে শিবপদ, শম্ভুকে ভোগ করেছে আবার ত্যাগও করেছে। তাদের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করেছে। তবুও রাধিকার যৌবনবেগ প্রশমিত হয়নি। হৃদয়ের দুর্দাম প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে দীর্ঘদেহী কিষ্টোবেদের বাহুবন্ধনে নিজেকে ধরা দিয়েছে। এক লহমায় দীর্ঘদিনের একান্ত আপনার সাথী শম্ভুকে ত্যাগ করেছে। গভীর রাত্রে কিষ্টোর সঙ্গে পালিয়ে গেছে। বৃদ্ধ অর্থহীন শম্ভুকে ত্যাগ করতে এতটুকু হৃদয় কাঁপেনি। প্রবৃত্তি মানুষকে কত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর করে তোলে তাও রাধিকার জীবনে দেখা যায়। শম্ভুকে ছাড়ার মুহূর্তে শম্ভুর তাঁবুতে কেরাসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়েছে উদ্দেশ্য—শম্ভুকে জীবন্ত দগ্ধ করা। তাই সে যাবার সময় বলে "মরুক বুড়া পুড়্যা" "এই চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর আদিম নারীমনের চিরন্তন অভীপ্সার ইতিহাসকেই রূপ দিয়েছেন। রাধিকা চরিত্রটির আপাত অসঙ্গতির মাধ্যমে যে সমন্বয় সূত্রটি আছে তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব সম্মত।" (৫৯) ধর্মহীন, নীতিহীন জৈব শক্তির এই প্রমত্ত পিপাসা রাঢ়মাটির চিরন্তন লক্ষণ। যেখানে "শুধু আপনার বেগেই আপনি ধাবিত হয় তার স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী মূর্তিই বেদেনীতে স্বীকৃতি পেয়েছে।" (৬০)

জুয়াড়ী ঃ- এই গল্পে রাখাল জুয়াড়ীর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিস্ফুট। জুয়া খেলার রণকৌশল মদ্যপ রাখাল বেশ রপ্ত করেছে। খেলায় জিতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জুয়াড়ী প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় সে বলে, "পাই একবার যমের সঙ্গে জুয়া খেলতে।" কিন্তু এই খেলোয়াড়টি জুয়াড়ী হলেও মানবিক সত্তায় সমুজ্জ্বল ছিল। যেখানে সে উদার। তাই সে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হওয়া অনুতপ্ত মানুষটিকে একমুঠো সিকি ও আধুলি অনায়াসে দিয়ে দিয়েছে। রাখাল জুয়াড়ী হলেও জুয়া খেলার সর্বনাশা দিকটি সম্পর্কে সচেতন ছিল।

ডাইনী ঃ- গ্রাম্য কুসংস্কার এবং অতি প্রাকৃতের উপর বিশ্বাসে এক সাধারণ গ্রাম্য অন্ত্যজশ্রেণীর নারী নিজেকে দেহ রসলোলুপা রাক্ষসী ডাইনী ভেবেছে। সে হল এই গল্পের নায়িকা সুরোধনী। চল্লিশ বছর ধরে সে একইভবে নিজের স্বামী বামুনপুত্র ও অনেকেরই রক্ত শোষণ করে হত্যা করেছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে নিজেকেও সে আজ ডাইনী ভাবতে দ্বিধা করে না। অথচ সে এই বিড়ম্বিত,

কুৎসিত, কদর্য জীবন চায়নি। সে ভাল হতে চায়। তাই সে দেবতার কাছে সকরুণ প্রার্থনা জানায়, "মা আমাকে ডাইনী থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব।" এই ডাইনীটি তারাশঙ্করের খুবই চেনা। তিনি (স্মৃতিকথা-৪৬) তা সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। ডাইনীর অন্তরালে যে মানবিকসত্তা ছিল তা লেখক উপলব্ধি করেছিলেন এবং সুরোধনীর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। "অসহায় বৃদ্ধা ডাইনীর মানবিক আর্তির কাহিনী লেখক এখানে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।" (৬১) "মানুষের প্রতি কি মমত্ববোধ, অসহায়, আতুরের জন্য সে কি উৎকণ্ঠা, কি উদ্বেগ, তার কোন তুলনাই মেলে না।" (৬২)

মালাকার ঃ- এই গল্পের নায়ক রজনী মালাকার অকৃতদার— বংশানুক্রমিক ডাকসাজ ও আতসবাজির কারিগর। পিতা ও পিতামহের মতই রজনী প্রতিভাধর হয়েও নেশা ও নারীতে আসক্ত। তাই উপার্জন প্রচুর করেও আজ রজনী সর্বস্বান্ত। একাধিক নারীদের মন জয় করতে কাপড় ও অর্থ অনায়াসে দিয়ে দেয়। প্রতিভার অহংকারে সে বলে, "হাত আর চোখ—এ থাকতে তোয়াক্কা কারু করি না।" কিন্তু কালের পরিবর্তন ঘটে। স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতিমার সাজে বিদেশী চুমকী ও রাংতার ব্যবহার নিষিদ্ধ হলে রজনী ডাকসাজেই প্রতিমা সাজাবার বায়না নেয়। রজনী তার সাঙাৎ কালী সিংয়ের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা নিয়ে সাজের জিনিস কিনতে মেলায় যায়। কিন্তু মেলায় জুয়ার আড্ডায় ও রূপোপজীবিনীদের মোহে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়। পরদিন পূজার্থিনীর এক শিশু - কন্যার গলার হার চুরি করে বিক্রিত অর্থে বাবুদের প্রতিমা সাজায়। প্রতিমা দেখতে আসা শিশুদের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে শুধু কাতর স্বরে বলে, "ডাক দাও মালাকার। ওই এমনি হার দাও।" এই আর্ত কণ্ঠস্বর রজনীর জীবনের ধারা বদলিয়ে দেয়। জমিদার খুশী হয়ে যে টাকা বকসিস দেন, সে টাকায় রজনী তার প্রেমিকাদের জন্যে কাপড়চোপড় না কিনে কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে কাপড় জামা কেনে। রজনীর মিতেনী এর কারণ জানতে চাইলে সে বলে "এবার থেকে মামণি খুকুমণিদের সাজাব মিতেনী। তোমাদের তো সাজালাম অনেক।" রজনীর অপরাধপ্রবণ মানসিকতা ও জৈব আসক্তির দ্বন্দ্বে এক কল্যাণসুন্দর মানবিকতার দিক প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

ইমারত ঃ- এখানে এক রাজমিস্ত্রীর জীবনের কার্যকলাপ বর্ণিত। জনাব শেখ, জাত শিল্পী। বেশভূষায় ও আচরণে শৌখিনতা, সংযম স্পষ্ট। সে ষোল আনা কাম দিয়ে ষোল আনা মজুরী নেয়। যে কোন অবস্থাতেই তার কাজে একেবারে ফাঁকি নেই। এই বিপত্নীক ব্যক্তিটি প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী। তাই মতি, রঙ্গু, সৌরভী, রোশনী, টগর বৌ, জোবেদা, রাণীসই প্রভৃতি মহিলা শ্রমিকদের নিয়েই তার দিন কাটে। তথাপি সে পশু নয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকের গূঢ় তাৎপর্য আরাধনায় বিভোর চোখ দুটি তাকে তন্ত্রাচারী করেছে। নারী তার উপাচার মাত্র। তাই শেষ পর্যন্ত তার শিল্পীসত্তারই জয় হয়েছে— জয় হয়েছে আধ্যাত্মিকতার। "তারাশঙ্করের ছোট গল্পে এই যে আধ্যাত্মিকথার উপলব্ধি—এই যে গ্লানিহীন, ক্ষোভহীন, এক উদার শান্তি বিকীর্ণ হয়েছে তার ধারা আজ পর্যন্ত চলেছে।" (৬৩)

যাদুকরী ঃ- এই গল্পে অতি প্রাচীন যাযাবরী সম্প্রদায় যাদুকরীদের কথা আছে। এদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ইতিহাস বলে রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট নিজের স্বার্থে এক অতি নিপুণ গুপ্তচর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের নিয়ে গঠিত। নারী-পুরুষ উভয়েই গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করত। এরা ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক, চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা নিয়ে গ্রাম গঞ্জে ঘুরে ঘুরে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কৌশলে সব খবরাখবর সংগ্রহ করত। নারীরা নৃত্যে গীতে সুনিপুণ ছিল। কালক্রমে এরাই বাজীকরে পরিণত হয়। বীরভূমের সীথল গ্রামের আশেপাশে এদের বসতি। বর্তমানে প্রায় অবলুপ্তির পথে। এক যাদুকরী দল গ্রামে আসে। তাদেরই এক রমণীর ত্যাগ, প্রেম ও ভালবাসার কাহিনী বিধৃত। এক যাদুকরী গ্রামে ভিক্ষে করতে এসে রমা ও দেবনাথের দাম্পত্য জীবনের মিল ঘটায়, মুখুজ্জে ও বাঁড়ুজ্জেদের মধ্যে মিল করে দেয়। একটি টাকার জন্যে সিপাহীদের সামনে অনায়াসে নগ্ন হয়ে নাচ দেখায়, চোর শশীডোমকে নিজের পোষাক পরিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছাড়া করে দিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচায়। বিনিময়ে কোন প্রত্যাশা করেনি। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও ত্যাগ, অসহায়দের প্রতি মর্মবেদনা, মানবিকতা সুন্দরভাবে এখানে পরিস্ফুট। "অরণ্য প্রকৃতির এই আনন্দময় সার্থকতাবোধ যাদুকরী গল্পের প্রাণ।" (৬৪)

চোরের মা ঃ- চোরের মাও যে সত্যকারের বিশ্বজননী হতে পারে তা এই গল্পে দেখানো হয়েছে। প্রথম দিনে পুত্র ফিঙে চুরি করতে গিয়েছিল কৃপণ ফ্যালারাম চৌধুরীর বাড়ী। কিন্তু ধরা পড়ে গ্রামবাসীদের প্রহারে মারা যায়। চোরের মা বলে বুক ফাটে, তবু প্রকাশ্যে কাঁদতে পারে না। এমনিভাবে এক বছর কেটে যাবার পর যে বাড়ীতে ধান চুরি করতে গিয়ে ফিঙে মরেছিল, সেই চৌধুরীর দশ বছরের ছেলেটি হঠাৎ মারা যায়। খবর পেয়ে ফিঙের মা গিয়ে দেখে চৌধুরীর স্ত্রী মরা ছেলেটার বুকের উপরে শবদেহের মত পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে ফিঙের মায়ের হৃদয় এক অব্যক্ত বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফেটে পড়েছে। বাড়ী ও গ্রাম থেকে পালিয়ে বাইরে এক নির্জন প্রান্তরে গিয়ে সে চিৎকার করে কাঁদে আর বলে, "ওরে বাবা আমার, ও মানিক রে।" এ কান্না তার পুত্র ফিঙের জন্যে নয়, এ কান্না চৌধুরীর ছেলেটার জন্যে। অন্ত্যজ শ্রেণীর মা হয়েও বিশ্বজননীর স্তরে উন্নীত হয়েছে এই গল্পে।

চোর ঃ- লাভপুরে ডোমেদের বাস বহুকাল আগে থেকেই। এরা জমিদারদের লেঠেলের কাজ করত ও পরে চুরি-ডাকাতি শুরু করে। লাভপুরে এমন অনেক চোরডাকাত ছিল। শশী ডোম ছিল চোর হিসেবে বিখ্যাত। শশীকে নিয়ে তারাশঙ্কর কয়েকটি গল্প লিখেছেন। "চোর" গল্পটি তাদের অন্যতম। এছাড়া "বোবাকান্না", "চোরের মা" প্রভৃতি গল্পেও শশীর ভূমিকা রয়েছে। এই গল্পে শশীর চৌর্যরীতির বিচিত্রলীলা বর্ণিত। প্রথমে ধানচুরি, শেষে থালা চুরি। জীবনের শুরুতে অভাব পূরণের জন্যে চুরি আরম্ভ করলেও

শেষে নেশায় পরিণত হয়, অথচ অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত উচ্ছৃঙ্খলতা সে সহ্য করতে পারত না। তারই শাসনে পালিয়ে যায় যৌবন মদিরা সুরোধনী ধান কলের এক ছোকরা মিস্ত্রীর সাথে। শশীর কন্যা সরলা এক পুলিশের কনস্টেবলের সাথে মেলামেশা করে সেটাও শশী দুচোখে দেখতে পারে না। শশী চোর হলেও তার হৃদয় ছিল, যদিও বংশের পাপ তাকে ছাড়ে নি। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবা বাড়ীর দুঃখের কাহিনী শুনে তিনটি টাকা দিতে গিয়েও দিতে পারে নি। আবার বাৎসল্য প্রেমের ফল্গু ধারায় শশীর হৃদয় ছিল স্নাত। তাই জেলে যাবার আগে শশী সেই কনস্টেবলকে ডেকে তার শেষ সম্বল দু'টাকা সরলাকে দিতে বলেছে। "দাগী চোরের কাহিনীর উপসংহারে এই বাক্য-দুটি হৃদয় মাধুর্যে শশী ডোমকে মানবিকতায় অভিষিক্ত করেছে।" (৬৫)

রাঙাদিদি ঃ- বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার যৌবনবতী স্ত্রী সরস্বতী। বৃদ্ধ স্বামীর জন্যে তার দেহজ ক্ষুধা অপরিতৃপ্ত। তাই সে পাড়ার যুবকদের কাছে রাঙাদিদি সাজে। অনেক যুবকই তাকে আপনার করে পেতে চায়, তার জন্যে তারা নিজেদের বিবাহিত স্ত্রীকে তালাক দিতেও প্রস্তুত হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর রঙ্গিনী লাস্যময়ী সরস্বতী কারও ঘর ভাঙে নি। নিজেই সমস্ত মায়া, মোহ জৈবিক ক্ষুধাকে জয় করে শহরে চলে যায়। কারও ভোগের সামগ্রী হয় নি। দেহাতীত সৌন্দর্যের আরাধনায় বাকী জীবন দোকানী হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছে।

চৌকিদার ঃ- জীবধর্ম ও মানবধর্মের দ্বন্দ্বে কেউ অবনমিত হয় পশুস্তরে, কেউ উত্তীর্ণ হয় মনুষ্যত্বের নব নব সোপানে। গাঁয়ের সহজ-সরল বনোয়ারী বাগদী চৌকিদারী করে সন্দেহ প্রবণ হয়ে পড়ে, নিজেও চুরি করতে আরম্ভ করে। স্ত্রীর চরিত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ জাগলে যে রোজ রাতে পাহারা দেবার জন্যে বাইরে যাবার আগে কমলির ঘরে শিকল তুলে দিত। একদিন এই শিকল তোলার সন্দেহে সে স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করেছে কমলি নীরবে সব সহ্য করে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত চৌকিদার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি যে সে নিজেই শিকল তুলে দিয়েছিল। অশিক্ষিত, নেশাগ্রস্ত অন্ত্যজ-স্তরে এভাবেই শতশত রমণী মিথ্যা কলঙ্কের শিকার হয়েছে।

কবি ঃ- কবি গল্পের নায়ক নিতাই কবিয়াল। সতীশ ডোম লাভপুরের সত্যে ডোম বিড়ি বাঁধতো। আপনমনে কবিগান লড়াই করত। যশঃ প্রার্থী ছিল কিন্তু বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ঠাকুরঝি, রাজা সবাই লাভপুরের মানুষ। লেখকের চেনা। গল্পটি উচ্চকোটি প্রেমের গল্প। হাড়ির ছেলের মধ্যে লেখক কবিয়ালের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লাইলম্যান রাজন নিতাইয়ের বন্ধু। ভিন গাঁয়ের মুচির মেয়ে ঠাকুরঝি রোজ দুধ বিক্রি করতে আসে, সে বিবাহিতা। তার সাথেই শুরু হয় নিতাইয়ের প্রেম। ঠাকুরঝি শ্বশুরবাড়ীতে দুধের হিসেব মিলাতে না পেরে বন্দিনী ও বিতাড়িতা হয়। ঠাকুরঝিকে পাবার বাসনায় উদগীব নিতাই বন্ধু রাজনকে তার শ্বশুরবাড়ি পাঠায় ঠাকুরঝিকে আনবার জন্যে। তৃতীয় দিনে ফিরে আসে রাজন ঠাকুরঝিকে নিয়ে কিন্তু নিজের স্ত্রী হিসেবে বিয়ে করে। ঠাকুরঝি নিতাইকে দেখে বলে, "জামাই ভারি ইয়ে। দিদি এল না তো আমাকে বলে, তোকেই সাঙা করব। করতেই হবে, কিছুতেই ছাড়ে না। বলে—কবিয়াল বলেছে।" হতবাক নিতাই পকেট থেকে সদ্য পাওয়া মেডেলটা রাজনকে দিয়ে ঠাকুরঝিকে (রাজনের স্ত্রী) দিতে বলে ট্রেনে উঠে বসে এবং বলে "জংশন চললাম।" নিতাইয়ের অব্যক্ত প্রেমের মাধুর্যেই গল্পের পরিসমাপ্তি। অন্ত্যজস্তরেও যে মহৎ প্রেম হতে পারে তাই লেখক 'কবি' গল্পে দেখিয়েছেন। মহৎ প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয়। যেমন দিয়েছিল শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে। কবিয়াল বলেছে বলেই হয়ত অভিমানাহত হয়ে ঠাকুরঝি রাজাকে সাঙা করেছে। এক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে রাজন। "না" গল্পের কালানাথের মতই রাজন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করেছে। "তোমারে যে ছেড়ে যাই তোমারি প্রেমে"—এই অনুচ্চারিত ভালবাসায় নিতাইয়ের প্রস্থান ঘটেছে। **"তাঁর (তারাশঙ্করের) গল্পে যা মুর্হুমুহু দেখা দেয়, বিশেষ একটি গোষ্ঠী এবং বিশেষ একধরণের সমাজের ছবিই তিনি এঁকেছেন বটে, কিন্তু ধ্রুব, অখণ্ড মানব-সত্যের দিকে সে গল্পের উন্মুখতা চিনে নিতে দেরি হয় না। সেখানে আবেগ প্রগাঢ়, আখ্যান সীমিত, ভঙ্গি রসিকের।"** (৬৬)

প্রতিমা ঃ- এই গল্পে প্রতিমা তৈরীর কারিগর কুমারিশ মিস্ত্রীর সৌন্দর্য উপাসনার চিত্র বর্ণিত। জমিদার অমূল্যের ব্যভিচারী জীবনযাত্রায় ক্ষতবিক্ষত দ্বিতীয় পক্ষের লাবণ্যময়ী স্ত্রী যমুনা। যমুনার দুঃখময় জীবন ও তার মিষ্টি মুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কুমারিশ দুর্গা প্রতিমার মুখমণ্ডল যমুনার মুখাবয়বের মত করে। যমুনার অভিশপ্ত জীবনের প্রতি সহানুভূতিতে দরিদ্র কুমারিশের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একাকীত্ব জীবনকে সহজ করার জন্যে কুমারিশ মাটি দিয়ে নানাধরণের পুতুল তৈরী করে দিত যমুনাকে। প্রতিমার মুখের আদল যমুনার মত দেখে ইতর সন্দেহ পরায়ণ পরিবারবর্গের কুৎসিত মন্তব্যে যমুনাকে জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। কুমারিশ স্নেহ করত যমুনাকে কিন্তু ঘটনার এমন Tragic পরিণতি হবে তা সে ভাবতে পারেনি তাই সে "বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।"

প্রত্যাবর্তন ঃ- এই গল্পের নায়ক পশুপতি। সংসারের তাড়নায় পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় গৃহত্যাগ করে প্রথমে পুরীর পাণ্ডার দলে পরে জাহাজের খালাসী হয়ে নানা দেশ ঘুরে উচ্ছৃঙ্খল, ভবঘুরে, বেপরোয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে দেশে ফিরেই পাড়ায় মদের আসরে মেতে ওঠে। কুড়ি টাকা দিয়ে 'বেলাত' গমনের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। সাহেবী ঢং-এ নাচতে নাচতে নবীন জেলের কন্যা রমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। রমার তৃতীয়বার বিয়ে হলেও সে বিধবা। তাই এই বিয়ের প্রস্তাবে পশুপতির মা রাজী হয় না। প্রেমের মোহে অন্ধ হয়ে পশুপতি বাবা মাকে ছেড়ে গাঁয়ের প্রান্তে একখণ্ড জমি কিনে পৃথক ঘর তোলে। বিবাহের দিন স্থির করে জিনিসপত্তর কিনতে কলকাতা যায় পশুপতি। যাবার আগে রমা পশুপতির হাতে মা চণ্ডীর কবচ বেঁধে দেয় যা নাকি পশুপতিকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। পশুপতি আর ফিরে আসে না। লজ্জায়, ঘৃণায়, প্রতিবেশীদের কুৎসিত মন্তব্যে রমা নতুন

ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। দীর্ঘকাল পরে লেখকের সঙ্গে পশুপতির আলাপ হয় কলকাতায়। তখনই পশুপতি বলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে একমাত্র রমার দেওয়া কবচখানির পুণ্যে। লেখকের কাছ থেকে রমার মৃত্যুর সংবাদ শুনে কবচটি গঙ্গায় ফেলে দিয়ে পুনরায় জাহাজের কাজে যোগ দিতে চলে যায় পশুপতি। বেপরোয়া পশুপতির প্রেমিক চিত্তের উদঘাটন হয়েছে গল্পের সমাপ্তি-পর্বে। রমা চরিত্র গ্রামের চোখে "বেহুল্যা" হয়েও ভাগ্যবিড়ম্বিতা। তাই চতুর্থবারের আঘাত সে সহ্য করতে পারবে না বলেই আত্মহত্যা করেছে। সে স্বামী নিয়ে সুখে সংসার করতে চেয়েছিল, কিন্তু বারবার সে প্রত্যাহত হয়েছে। "একটি সাধারণ মেয়ের নীরব-প্রেম গল্পটির মধ্যে এক বেদনাঘন সূক্ষ্ম সুরভি সঞ্চারিত হয়েছে।" (৬৭)

ময়দানব ঃ- আধুনিককালের যন্ত্র শুধু প্রগতির বাহন নয়, দানবের মত লোল জিহ্বা বিস্তার করে সে মানবতাকে গ্রাস করে। এই গল্পে ব্রাত্য শ্রেণীর ফণী মিস্ত্রী নায়ক। ফায়ার ব্রিকস তৈরীর কারখানা, আকারে ছোট। সেখানেই দীর্ঘ ষাট বছর ধরে কাজ করে আজ যে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় দণ্ডায়মান। যার নিজস্বতা বিকিয়ে গেছে ঐ সামান্য মেশিনটায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কারখানা বিরাট হয়। বিদ্যুৎ শক্তির দয়ায় মেশিন চলবে। মিস্ত্রী মজুরের প্রয়োজন মেটাবে এই যন্ত্র। তাই ফণীর আর প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধ ফণী স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাকে ছাড়াই কারখানা চলবে এ সে ভাবতে পারে না। চোখের জলে সব ঝাপসা হয়ে যায়। পুরানো স্মৃতি রোমন্থণ করতে করতে চলন্ত মেশিনের মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ পথে চলতে থাকে। হঠাৎ মেশিনের বিস্ফারিত দন্তরাজি ফণীকে গ্রাস করে। যন্ত্র শুধু শোষণের হাতিয়ার। শত শত ফণীদের রক্ত আর চর্বি নিয়ে চাকা মসৃণ হয়, মালিকদের মুনাফার বৃদ্ধি ঘটে। কুটিরশিল্পের সৌন্দর্য যেমন আধুনিক রুচিহীন, যন্ত্রদানব গ্রাস করে ধ্বংস করেছে। গ্রামের সহজ সরল মানুষটার সারা জীবন যাদের জন্যে সেবা করে গেল। যাদেরকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল, সেই ফণী যখন গুণীর মর্যাদা দিয়ে তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের পিঠ চাপড়ে ছিল তখনই তার সরলতার মূল্য না দিয়ে তাকে বিদায় করে দেয় নব্য যুগের নব্য ম্যানেজার।

পৌষলক্ষ্মী ঃ- ময়দানবের মতই এই গল্পটির প্লট। এখানে মার্জিত প্রবীণের সঙ্গে ভুঁইফোর আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। আধুনিক যুগের প্রতিভূ চেকার জয় ঘোষিত হলেও তা ঐতিহ্যহীন দম্ভস্ফীত আধুনিকতার ঔদ্ধত্য ব্যতীত কিছুই নয়। মুকুন্দ পাল ঐতিহ্যবাহী প্রবীণ তাই তাঁর পরাজয়কে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন লেখক। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ভূমিকায় বলেছেন, "মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের পতনের মতই এই মৃত্যুর মহিমা।" (৬৮) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা গল্প বিচিত্রা গ্রন্থে একে "অতীতের মহিমান্বিত মৃত্যু" (৬৯) বলেছেন। আবার গোবিন সিংহের প্রবীণ ও জলসাঘরের তুফান যেন আধুনিক যুগের নবীনের আস্থাহীন কৃত্রিম সৌন্দর্যে মোড়া নতুন ঘোড়া ও মহিমের সদ্য ক্রীত সাইলেন্সার লাগানো মোটর গাড়ী। এই গল্পটি যদিও ব্রাত্য শ্রেণীর অন্তর্গত নয়, আলোচ্য "ময়দানব" গল্পে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে প্রবীণের অমর্যাদা, মূল্যহীন বলে অতীতকে ঘৃণা করা হয়েছে এই পর্যায়ে উল্লেখ্য বলে পৌষলক্ষ্মী গল্পটি তুলে ধরা হল।

প্রহ্লাদের কালী ঃ- প্রহ্লাদ ভল্লা তরুণ বয়স থেকেই দুর্ধর্ষ ডাকাত। বাঘের মত ভয়ঙ্কর। তারা বাবাও ছিল লাঠিয়াল। প্রহ্লাদের উপাস্য দেবী কালী। শেয়ালদহের জঙ্গলের এক আশ্রমে ফৌজদার বাবার কাছ থেকে এক লোভনীয় বিরাট তরোয়াল পায়, যে-খানি কেবল মায়ের কাজ ছাড়াও অন্য কাজে ব্যবহার করা চলবে না। তাই প্রহ্লাদ কালী প্রতিষ্ঠা করে। অসংখ্য খুন ও ডাকাতি করে আজ বয়সের ভারে নুব্জ। কিন্তু সেই তলোয়ারটিকে অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখে। এদিকে সদ্য গজিয়ে ওঠা তরুণ ডাকাত ঘনশ্যামদাস সেই তরবারি কেড়ে নিতে এসেছে। প্রবীণের পরাজয় আর নবীনের জয় হয়েছে। ঘনশ্যামের গুলিতে আহত প্রহ্লাদ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জ্ঞান হলে দারোগা প্রহ্লাদকে কে গুলি করেছে তা জানতে চাইলে সে বলে "কালী, মা কালী।" প্রহ্লাদ ও তো একদিন লোভের বশে ফৌজদার বাবার কাছ থেকে একপ্রকার জোর করেই কেড়ে নিয়েছিল। সেই অপরাধবোধ প্রহ্লাদের মগ্ন চৈতন্যের গভীরে সতত ক্রিয়াশীল ছিল। প্রহ্লাদ তলোয়ার খানির সঙ্গে মা কালীর সংযোগ উপলব্ধি করেছিল। সেই তরবারি যখন অন্যের হাতে চলে গেছে তখন মা কালী ও তার কাছ থেকে অন্তর্ধান করেছে বলে মনে করে মুহ্যমান হয়ে গেছে।

তিনশূন্য ঃ- দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় বীভৎসতার এক করুণ চিত্র। খাদ্যাভাবে জর্জরিত অসংখ্য মানুষ। দিনান্তে নিশান্তেও খাবার জোটে না। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় যুবক যুবতীর দল যারা অনাথ, সামান্য খাবারের লোভে নিজেদেরকে পশু স্বভাব মানুষের কাছে বিকিয়ে দেয়। কামান্ধ পশুস্তরের মানুষগুলোও খাদ্যের, অর্থের ও নিরাপত্তার লোভ দেখিয়ে ভোগ করে। আদিম লালসার তৈরী ফসল কখনই উৎকৃষ্ট হতে পারে না। এই গল্পে এক সুন্দরী মেয়েকে রাতের অন্ধকারে একবাবু একটি শাড়ি ও কিছু টাকা এবং এক ঠোঙা খাবরের বিনিময়ে দৈহিক অত্যাচার করে চলে যায়। মেয়েটির এক বিকৃত, বিকলাঙ্গ, রোগগ্রস্ত সন্তান হয়। যাকে সকলে ল্যালা বলে ডাকত। খাদ্যের সন্ধানে ল্যালা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নর্দমায় ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবারের সন্ধান করে বেড়ায়। পনেরো বছর পর ল্যালা এক জীবন্ত পশু হয়ে ওঠে। খাদ্যের সন্ধানে রাতের অন্ধকারে এক ঘরের দরজা খোলে। ভেতরে দেখে বিস্রস্ত বসনে ঘুমন্ত এক নিষ্পাপ পঞ্চদশী মেয়ে। দুর্ভিক্ষের বিকৃত সন্তান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ভোগ করে। "জীবধর্ম, সমাজধর্ম ও মানবধর্মের একটা চূড়ান্ত নেতিবাদী শূন্যতায় মিলিয়ে যাওয়া ও মন্বন্তরের ফলে সমগ্র দেশের একটা ন্যাক্কারজনক নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ "তিনশূন্য" গল্প।" (৭০) তারাশঙ্কর বিকৃতও বীভৎস শরীর অংকন করেছেন অনেক। কিন্তু, "লোভ-লালসার এমন আদিম ও হিংস্র রূপ তারাশঙ্কর রের আর কোন গল্পে নেই।" (৭১) "আসলে লেখক বীভৎসতার পূজারী নন। তিনি বীভৎসতার মাঝেও সুন্দরকে খোঁজেন, কুশ্রীতার মধ্যেও খুঁজে নেন প্রসন্নতা। যেমন 'মতিলাল' গল্পে মতিলাল।" (৭২)

মতিলাল ঃ- এই গল্পে নিম্নশ্রেণীর এক চরিত্রের ঔদার্য, হৃদয় উজাড় করা ভালবাসার চিত্র পরিস্ফুট। মতিলাল ও ভোবন হাড়ি উভয়েই বিকৃত, কদাকার দেখতে। মতিলাল চতুর্থ বারে ভোবনকে বিয়ে করে। উভয়েই সুখে শান্তিতে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে। মতিলাল বিভিন্ন সঙ্ সেজে ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেয়; হৃদয় দিয়ে অপরের ছেলেদের ভালবাসে। তাদের কিন্তু সন্তান নেই। তার জন্যে মানত, কবচ ধারনেও কসুর করে নি। পরের ছেলেদের ভালবাসতে গিয়ে কুৎসিতের জন্যে মতিলাল প্রহৃত হয়। তার গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। এই মর্মান্তিক আঘাতে মতিলালের হৃদয় থেকে সন্তান কামনা চিরতরে দূর হয়। সে ভুবনের হাত থেকে সন্তান কামনার জন্যে বাঁধা দৈবমাদুলি ছিঁড়ে দিয়ে বলে "আমাদের ছেলে আমাদেরই মত কুচ্ছিৎ হবে তো ভোবন! কাজ নাই।" মতিলাল তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভেবেছে এবং চিন্তা করেছে যে নবাগতকে কুৎসিত ও নিম্নজাতীয় বলে হয়ত তার মতই সাড়াজীবন লাঞ্ছনা বয়ে বেড়াতে হবে। তাই মতিলালের এই উক্তি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মানবিক। "কুৎসিত আবরণের অন্তরালের আহত মানবাত্মার আর্তকণ্ঠকে ফুটিয়ে তুলে তারাশঙ্কর তাঁর মানবীয় সহানুভূতিকেই শিল্পিত করে তুলেছেন। কদাকার দেহ, অথচ অন্তরে সুস্থ স্বাভাবিক মানবীয় আকুতি, এই বিপরীতের দ্বন্দ্বে পীড়িত তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি তীক্ষ্ণরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মতিলালের চরিত্রটি ভিক্তর হুগোর নতরদামের সেই বিখ্যাত কদাকার কুব্জ চরিত্র "কোয়াসেমাদো" চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" (৭৩)

সন্তান ঃ- কুৎসিত্ব কদাকার বলে মতিলাল বুঝলেও 'সন্তান' গল্পে গোবিন্দ বোঝে নি। কদাকার হয়েও সন্তান কামনায় পাগল গোবিন্দ ছোট জাত হয়েও জমিদারবাবুর বাড়ীতে চাকরের কাজ করার সময় সে জমিদারের ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটাকে নিজের ছেলে ভাবতে শিখেছে। জমিদারবাবু একথা শুনেই তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেন। গোবিন্দর জেদ চেপে যায়। সে জমিদারবাবুর ছেলের মত ছেলে পেতে উদগ্রীব হয়। তাই সে সম্পত্তি বিক্রি করে ঘটক নরহরিকে পাত্রীর সন্ধান করতে বলে। এমনকি নরহরির নির্দেশে গোবিন্দ ধর্মান্তরিত হয়ে বৈষ্ণবের ঘরের বাল্যবিধবা মঞ্জুরীকে বিয়ে করে। যথাসময়ে বাপের বাড়িতে মঞ্জুরী এক পুত্রের জন্ম দেয়। মহাআনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলের জন্যে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি সন্তান দেখতে যায়। কিন্তু "কুৎসিত বিকৃতাঙ্গ শিশু, অবিকল তাহার প্রতিমূর্তির এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব" দেখে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে গোবিন্দ শিশুটিকে আঁতুড় ঘরেই হত্যা করে। সে তো এমন কুৎসিত সন্তান চায় নি। সে নিজে জন্ম থেকেই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। সরল, শান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়েও তার রূপের জন্যে বিবাহিত প্রথমা স্ত্রী ঘর করেনি, মঞ্জুরীকে বিয়ে করার একমাত্র কারণ হল জমিদারবাবুর পুত্র মানিকের জন্যে। এই মানিকের জন্যেই তার চাকরী গেছে আবার কিছুদিনের মধ্যেই মানিকও মারা গেছে। তাই গোবিন্দ মঞ্জুরীর গর্ভে মানিকের উপস্থিতি কল্পনা করেছিল। সবই যখন তার জুটল না তখনই সে শিশুকে হত্যা করেছে। এরপর গোবিন্দ পাগল হয়ে যায়, তাকে পাগলা গারদে রাখা হয়। মানসিক চিকিৎসকের নির্দেশে তার ঘরের চার দেওয়ালে সুন্দর শিশুদের চিত্র টাঙানো হয়েছে— যাদের সঙ্গে গোবিন্দ কথা কয়, নাচে, হাসে। "এখানে দেহমনের বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর বাৎসল্য রসের একটি তির্যক অভিব্যক্তিকে মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় রূপ দিয়েছেন।" (৭৪)

বাবুরামের বাবুয়া ঃ- লাভপুরে স্টেশনের জমাদার বাবুরাম, বিরাট চেহারার মানুষ। সুখীয়া তার স্ত্রী। উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। ছোটকাজ করলেও তাদের মানসিকতা ছোট নয়, তাই লেখক পাঁচ টাকা বক্শিশ দিতে গেলে তারা নেয় না— বলে বকশিশ তো এক রকম ভিক্ষের সামিল। বাবুরাম ও তার স্ত্রী দুজনেই মদ খায়। নিঃসন্তান হলেও তাদের স্নেহ বাৎসল্যের বিচিত্র ভী উৎসারিত হয়েছে। এই দম্পতি পরের নিঃস্ব ছেলেদের বাড়ীতে এনে মানুষ করে। বড় হলেই তাদের ফেরৎ দিয়ে আসত। দুই থেকে তিন বছর বয়স হলেই দিয়ে দিত। এর বেশী বয়স হতে দিত না, কারণ এই বয়স পর্য্যন্ত তারা বাচ্চাটাকে শুধু দুধ খাইয়ে রাখত। ভাত খাওয়াত না, কারণ বড় হলেই চলে যাবে তাই ভাত খাইয়ে জাত খোয়াতে দিত না। ছেলে ফেরৎ দেওয়ার পর বাবুরাম উন্মাদের মত আচরণ করত, আবার অন্য একটি ছেলে পেলেই পূর্বের মত শান্ত ও আদর্শ সেবক হয়ে উঠত। বাৎসল্য-প্রেমের এই অনুপম বৈচিত্র্য তারাশঙ্কর নিজের চোখে দেখেছেন। দয়ায়, সেবায়, পরার্থপরতায় অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ মানুষ লুকিয়ে থাকে এই গল্পটি তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একপশলা বৃষ্টি ঃ- অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও শুধু জৈবিক প্রবৃত্তির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই গল্পের নায়িকা জয়া বাড়রী। কিষাণ শান্ত বাউরীর কন্যা। কালো হলেও বেশ সুন্দরী। তাই সকলে তাকে বলত "কালো সরস্বতী।" বাবা-মায়ের সঙ্গে জয়াও মজুরী করত। বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায় কিন্তু স্বামী ছেড়ে চলে যায়। বাবার মৃত্যুর পর জয়া ছাদ পেটার কাজ করতে যায় এবং তাকে নষ্ট করে রাজমিস্ত্রী। তারপর হঠাৎ যুদ্ধের বাজারে কন্ট্রাকটরী করে সদ্য গজিয়ে ওঠা ধনী চন্দ্র চৌধুরীর নজরে পড়ে। একদিন চন্দ্র চৌধুরীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায় জয়া। চন্দ্র তাই জাত খুইয়ে জয়াকে বিয়ে করতে চায়। জয়া তাকে বিয়ে না করলেও তার সঙ্গেই থেকে যায়। গ্রামের মানুষের সমালোচনার জন্যে চন্দ্র স্থানান্তরে বাসা নিয়েছিল। জয়া চন্দ্রের বিয়ে দেয়। যে বছর আনি-সেরের হিসেব উঠে গেল, সে বছরে ব্যবসায় ফেল পড়ে ভিখারী হয়ে যায় চন্দ্র। চন্দ্র দুই পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে মারা যায়। চন্দ্রের অসুখের জন্যে জয়াও কপর্দকশূন্য হয়ে যায়। দেশে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। মজুরী খেটে জয়া বিধবা স্ত্রী আর সন্তানদের মুখের গ্রাস জোগায়। অনাবৃষ্টি শুরু হলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় ধনী আড়তদার দে' দের সেজবাবু জয়াকে কাছে ডাকে। জয়া কিন্তু তাতে সাড়া দেয় না। নিজে ২/৪ দিন অনাহারে থেকে চন্দ্রের সংসারটাকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। অনন্যোপায় জয়া এরপর চুরি করার মনস্থ করে। দে বাবুদের বাড়ীর দিকে যায় কিন্তু দে বাবুদের ট্রাকের ধাক্কায়

ছিটকে পড়ে যায়। যখন জ্ঞান ফেরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে। সে বাঁচলে সংসারটাও বাঁচবে। জয়া নিজের জীবনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দকে ত্যাগ করে চন্দ্রের কথামত সে অন্যপুরুষের সঙ্গ করেনি বা চন্দ্রের সংসারটাকে ত্যাগ করে যায় নি। জয়ার তখনও যৌবন ছিল। দে, সাধু খাঁ প্রভৃতি ধনীদের ডাকে সে সাড়া দেয় নি— লোভ, কামনা, বাসনা, ক্ষুধা সব কিছুকেই জয় করে জয়ী হয়েছিল চিরন্তন মানবসত্যে পৌঁছাতে। মানুষের চরম বিপর্যয়ে ঈশ্বরের করুণাই এক্ষেত্রে জয়যুক্ত হয়েছে।

জটায়ু ঃ- মানুষ যা ভাবে তাই হয়ে যায় — এর সার্থক উদাহরণ এই গল্পটি। জটা কর্মকার প্রায় জন্মপাগল। বাবা শিবু কর্মকারের সঙ্গে বিশ/বাইশ বছর পর্য্যন্ত জটা লোহার কাজ করত। বিশাল চেহারা ছিল তার। বাবুদের থিয়েটারে সীতাহরণ পালা দেখার পর জটা যেন কেমন হয়ে যায়। জটায়ু পাখির আত্মত্যাগের কাহিনী অবিরাম স্মরণ করতে থাকে। এমন কি সে জটায়ুর দু/একটা কথা মুখস্থ করে ফেলেছিল। থিয়েটারের সর্বময় কর্তা শিবনাথকে পুনরায় সীতাহরণ নাটকটি মঞ্চস্থ করতে এবং সে নিজে জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে অনুরোধ করে। এক বছর পর শিবনাথ সিনেমায় অভিনয় করে বহু অর্থের মালিক হয়ে, সুদর্শনা, সুগায়িকা কল্যাণীকে বিয়ে করে দেশে আসেন। স্ত্রীর ইচ্ছেমত শিবনাথ গ্রামে ঘর তৈরী করে। জায়গাটা ছিল বদমায়েস কালাগোঁসাই ওরফে নেপাল ভাণ্ডার শিবমন্দিরের পাশে। তার থেকেই কালাগোঁসাই শিবনাথের উপর চটে যায়। একদিন কাজে কলকাতায় যায় শিবনাথ। কালাগোঁসাই কল্যাণীকে একা পেয়ে তার মুখ বেঁধে পূর্ণিমার রাত্রে পালানোর চেষ্টা করে। হঠাৎ জটে পাগলা কোথা থেকে এসে রামায়ণের জটায়ুর মত রাবণরূপী কালাগোঁসাইয়ের পথ আগলায়। সে তখন জটায়ুর কণ্ঠে বলে, "কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ, নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণপ্রতিমা, শুচিতার প্রতিমূর্তি নবনীত তনু দেবীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিস।" উভয়ের আক্রমণে উভয়েই মারা যায়। রামায়ণের জটায়ুর মতই যে অসহায়া এক নারীকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রাণ দেয়। তার জটায়ুর চিন্তা সার্থক হয়েছে। জটে জীবনে এমন অভিনয় করতেই চেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে এইরকম চরিত্রাঙ্কনে তারাশঙ্কর অদ্বিতীয়।

তারিণী মাঝি ঃ- তারিণী ও সুখী মাঝি। সুখী দাম্পত্যজীবন কিন্তু নিঃসন্তান। ময়ূরাক্ষীতে নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। কোন এক গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের নববধূ একদা নদীতে ডুবে যাচ্ছিল, তারিণী তাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচায়। বিনিময়ে তারিণী সামান্য আট আনা চেয়েছে আর সুখীর জন্যে চেয়েছে নাকের নথ। এইভাবে তারিণী নিজের জীবন বিপন্ন করে বহু মানুষের উপকার করেছে অনাবৃষ্টি শুরু হলে তারিণী সুখীকে নিয়ে বর্ধমান জেলায় কাজের জন্যে চলে যায়। কিন্তু মাঝপথেই বৃষ্টির লক্ষণ দেখে গ্রামে ফিরে আসে। একে অপরকে প্রাণাধিক ভালবাসলেও ময়ূরাক্ষীর বন্যায় পিঠে সুখীকে নিয়ে ডুবন্ত অবস্থায় প্রাণের মায়ায় বাঁচার তাগিদে তারিণী সুখীর গলা টিপে হত্যা করে।

বেদের মেয়ে ঃ- চন্দর বেদের ভাগীর মেয়ে শিবি। চন্দর ডাকাতি করে জেলে যায়। তার কাছেই শিবি ও তার মা থাকত। শিবির বাবা কে তা কেউ জানে না। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তা-হল মেয়েদের পুরুষেরা যখন বাড়ীতে থাকে তখন তারা হিংস্র ব্যবহার করে । পুরুষেরা যখন জেলে যায় তখন মেয়েরা পোষ-মানা হরিণীর মত অবস্থাপন্ন ছেলেদের পেছনে ঘুরে বেড়ায় মন জয় করার জন্যে। দেহ নিয়ে এরা খেলা শুরু করে। শিবির মা শিবিকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই পথে নামায়।

মায়ের সঙ্গে গুপ্তিপাড়ায় রামায়ণ গান শুনতে যায় শিবি। গান শোনা উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্য হল ভদ্রলোকেদের মন হরণ করা। শিবির নজরে আসে স্থানীয় বিত্তশালী গুপ্তমশাইয়ের দৌহিত্র সদ্য আগত শহুরে উকিলবাবুর পুত্র প্রভাত। কিন্তু প্রভাত শিবির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে— এই আঘাতেই জন্ম হল প্রেমের। শিবি ভালবাসল সদ্য জেল ফেরত ভোলাকে। ভোলা জাত খুইয়ে শিবিকে সাঙা করে। শিবি কিন্তু প্রভাতকে ভুলতে পারে না। ডাকাতির অপরাধে ভোলার পাঁচ বছরের জন্য জেল হয়। "ভোলা যখন ঘরে থাকে, শিবি তখন ব্যাঘ্রী। যখন সে জেলে যায়, তখন সে স্বৈরিণী।" 'বিয়াল্লিশ-এর আন্দোলনে ফেরার হয়ে গ্রামে আত্মগোপনের জন্যে আসে প্রভাত। স্বৈরিণী শিবি একদিন টাকার বিনিময়ে গ্রামের ডাক-বাংলোয় আসা ইনসপেকটরের মন ভোলাতে গিয়ে জানতে পারে যে তারা প্রভাতকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। সেই রাতেই ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে প্রভাতের বাড়ী এসে প্রভাতকে সব কথা বলে ও লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে আসে। প্রভাত কিছুক্ষণ শিবির ঘরে থাকার পর বেরিয়ে পড়ে। শিবির বাধা মানে না, কিন্তু পালাতে গিয়ে প্রভাত ধরা পড়ে।

এরপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। গাঁয়ে নতুন হাসপাতাল হয়েছে। ডাক্তারবাবু বেশ ধনী— প্রচুর রোজগার করেন। তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন স্বদেশী প্রভাতবাবু। সেই রাতেই ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে ভোলা ডাকাতি করতে গেলে প্রভাতের ছোঁড়া বন্দুকের গুলিতে ভোলা আহত হয়ে ঘরে আসে। বন্দুকটা প্রভাতের নয়, ডাক্তারবাবুর। শিবি তাকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখে যেমনটি প্রভাতকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। প্রভাত পুলিশ নিয়ে শিবির বাড়ি যায়। শিবি দরজা না খুললে প্রভাত দরজা ভাঙে এবং প্রভাত আগে ঢোকে। বিপদ বুঝে শিবি ক্ষিপ্রগতিতে প্রভাতের বুকে ছুরি বসায় এবং ভোলাকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। শিবি বন্দিনী হয়। প্রভাতের উষ্ণ রক্ত তার মুখে লেগে থাকে। জেলে বসে শিবি কাঁদে আর বলে, "রক্ত লোনা, চোখের জল তাও লোনা।" প্রভাতকে শিবি শুধু অর্থের লোভে পেতে চায় নি, সে অন্তর দিয়ে পেতে চেয়েছিল। প্রভাতের ঘৃণা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব শিবিকে রাক্ষসীতে পরিণত করেছে। শিবির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "বেদের মেয়ে শিবির প্রেমের এই সর্প কুটিল স্বরূপ রচনায় তারাশঙ্কর ছোট গল্পের সার্থক শিল্পরীতির মাধ্যমে যে জীবন সত্যকে প্রকাশ করেছেন তা স্বভাব স্বৈরিণীর অভিশপ্ত প্রেমের ট্র্যাজেডিকে মূর্ত করে তুলেছে। রক্তের সঙ্গে চোখের জলের মিশ্রণ তারই অসংশয়িত প্রতীক।" (৭৫)

কামধেনু ঃ- এই গল্পের নায়ক নাথু পটুয়া। তার জীবনের দ্বন্দ্বই গল্পটির মূল উপজীব্য বিষয়। যে দ্বন্দ্ব মানবজীবনেরই চিরন্তন দ্বন্দ্ব। একদিকে সুরভিমঙ্গল গান গাওয়ার ফল স্বরূপ লক্ষ্মীস্বরূপিণী কামধেনু লাভ করে। কামধেনু সুরভি যা ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডারের প্রতীক, অন্যদিকে কামনারূপিণী ফুলমণি যা মানুষের চিরদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিপথগামীর প্রতীক। কামধেনুর দয়ায় নাথুর সংসার অর্থে ও শান্তিতে ভরে উঠল। গ্রামে ঘুরে কামধেনুর মাহাত্ম্য দেখিয়ে অর্থ আদায় করতে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে উঠল। **"পৃথিবীর মাটি গেল শুকিয়ে হল কাঠ, তেতে হল আগুন, আকাশ গেল ঘন কুয়াশায় ভরে—মেঘ গেল উড়ে, বাতাস হয়ে উঠল আবিল, পুকুরে দীঘিতে জেগে উঠল পাঁক, শুকিয়ে শুকিয়ে তাও ফেটে হল চৌচির। মাটি, জল, বাতাস দূরের কথা নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে।"**

ভূমিকম্পে নাথুর স্ত্রী মারা যায়; জীবনে এসে দাঁড়াল জগদীশ পটুয়ার বিবাহিতা কন্যা ফুলমণি। হাঁপানি স্বামীর কবল থেকে বাপের বাড়ী পালিয়ে আসে। সেই ফুলমণির মোহে মোহান্ধ হয়ে নাথু টাকার জন্যে রায় বাড়ীর গিন্নীমার কাছে সুরভিকে বিক্রি করে। মাসখানেক পরে নিকা করা স্ত্রী ফুলমণির প্রতি মোহ ঝাপসা হল এবং জমিদারবাড়িতে সুরভির স্বাস্থ্য, রূপ, যৌবন দেখে ঈর্ষান্বিত হয় নাথু। তার আদিম জান্তব প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। সে গোপনে সুরভিকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। সুরভির সুন্দর চামড়া খানি নাথু গোপনে ক্রয় করে, চামড়ার ব্যবসা শুরু করে নাথু। পাইকার হেফাজ্জদির কাছে দু'শো টাকার বিনিময়ে ফুলমণিকে বিক্রি করে, অথচ ফুলমণির জন্যে কাঁদে।

শান্তিতেই অতিবাহিত হচ্ছিল নাথুর জীবনের দিনগুলি। ধীরে ধীরে কামধেনুকে হত্যা করার পাপ ও ফুলমণির মায়াবী চোখ দুটিকে ভুলতে বসেছিল। কিন্তু একদিন এক গো হত্যাকারী গ্রামে ভিক্ষে করতে এলে নাথু বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাকে গলা টিপে হত্যা করে। জেল হয় ও বিচারে তার ফাঁসির হুকুম হয়। নারীর প্রতি আকর্ষণ ও পশুর প্রতি আসক্তি—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে প্রথমে নারী-আকর্ষণ, শেষে অর্থাসক্তি ও পশুপ্রীতি-আসক্তির জয় হয়েছে। **"ফাঁসির মঞ্চে অপেক্ষমান নাথু পটুয়া সব অশান্তি পেরিয়ে এক প্রশান্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায়শ্চিত্তে তার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই।"** (৭৬) **"নাথুর জীবনে সমুদ্র মন্থন করে বিষামৃতময় যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে লেখক অসাধারণ দক্ষতায় তাকে রূপ দিয়েছেন। গল্পটির উপসংহারের মধ্যেও মানুষের বিষামৃতময় জীবনের রহস্যলীলা চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"** (৭৭) তারাশঙ্করের জীবনবেদ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস—তার উজ্জ্বল প্রমাণ এই গল্পটি। নাথুর জীবনে যে পাপ জমেছিল তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল নাথু। নিজে গোহত্যা করে মহাভুল করেছিল তাই সে অন্য গোহত্যাকারীকে দেখে স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে তাকে হত্যা করেছিল। ফাঁসি যেতে তার ক্ষোভ নেই, তবে ফাঁসির দড়িটা গরুর আঁতে তৈরী হলে আর কোন খেদ থাকত না নাথুর। **"ফাঁসির জন্যে অপেক্ষমান নাথু এমন এক মানসিকস্তরে পৌঁছে যায় যেখানে সব প্রশ্ন, সব ক্ষোভ, নতুন-পুরাণোর সব দ্বন্দ্ব এক পরম প্রশান্তিময় সমাধানে উন্নীত।"** (৭৮)

তমসা ঃ- অন্ধ পঙ্ক্ষী চরিত্র স্বনামে তারাশঙ্করের গল্পে বর্তমান। পঙ্ক্ষী বাগদীর বাড়ি কীর্ণাহার জুবুটিয়ার কাছে জামনা গ্রামে। লাভপুর স্টেশনে পঙ্ক্ষী গান গাইত। তার চেহারা অদ্ভুত। **"কুৎসিত চেহারা, চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট, অশক্ত।"**

সে অন্ধ হলেও ভালবাসার বোধকে সে ধরে রাখে, গান গেয়ে ভিক্ষে করে দিন কাটায়। একদিন প্লাটফর্মে দুটি খেমটাউলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সুন্দরী যুবতীর কাছে অন্ধপঙ্ক্ষীর সভয় নিবেদন, **"আপনি একটি গান যদি গাইতেন। সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালবাসি আমি।"** সুন্দরী অন্ধ পঙ্ক্ষীর বাসনা পূরণ করে। সে গায় **"কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।"** এই গানের সুর যেন সহস্র ধারায় পঙ্ক্ষীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অন্ধের জগৎ কেবল শব্দ আর স্পর্শময়। এই দুইয়ের দ্বারাই অন্ধ সুন্দরকে ধরে রাখতে চায়। তাই খেমটাউলীর গাওয়া গান পঙ্ক্ষী নিজের গলায় তুলে নেয়। যে সুন্দরীকে কেউ কোনদিন প্রণাম করেনি, পঙ্ক্ষী তাকে প্রণাম করেছে। সুন্দরী অবাক হয়ে যায়। গানের দল চলে যায়। কিন্তু পঙ্ক্ষীর ভালবাসার শিকড়ে ধরে টান। তাই সে ছোট স্টেশন ছেড়ে আহমদপুর জংশনে গিয়েছে। চোখে তার বর্ধমান যাওয়ার স্বপ্ন, কারণ খেমটাবাউলীর বাড়ি বর্ধমান। যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটার মানসে পঙ্ক্ষী ফুল্লরাতলায় তীর্থক্ষেত্রে বসে ভিক্ষে করে, আর সেই গান গেয়ে চলে।

পঙ্ক্ষী আনুমানিক পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যায়। সালটা ছিল ১৯৭৯ ডিসেম্বর। জীবনের শেষ তিনমাসে সে আর ভিক্ষে বা গান গাইতে পারত না। লাভপুরের কাছেই ঠিবা গ্রামে দিদি ও জামাইবাবুর কাছে থাকত। পঙ্ক্ষীকে অনেকেই দেখেছেন। বিশেষ করে লাভপুর স্টেশনের চায়ের দোকানদার শশাঙ্কশেখর সরকার মশাই (৬০ বঃ) সব দেখেছিলেন। কদর্য, কুৎসিত পরিবেশ ও আবরণ ভেদ করে উনমানবের স্তর ছিন্ন করে মানবসত্তায় উত্তরণের সাথী পঙ্ক্ষী। আহার-নিদ্রা-মৈথুনের অন্ধ শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারলেই মানুষ পশুত্ব স্বভাব থেকে উঠে আসে। হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ, আত্মপরতার সীমা লঙ্ঘন, পাশবতার স্তর অতিক্রমণে প্রেরণা পায়, জয় হয় পাশব-প্রকৃতির উপরে মানবিকতার।

আখড়াইয়ের দীঘি ঃ- এই গল্পের নায়ক ডাকাত কালী বাগ্‌দী। চার পুরুষ ধরে ডাকাতি খুন ও রাহাজানি করে। এদের পূর্বপুরুষ একসময় নবাবের পল্টন ছিল। চাষবাসকে তারা ঘৃণা করত। বৃটিশ আমলে নবাবী লুপ্ত হলে এরা আইনের চোখকে ফাঁকি

দিয়ে খুনে ডাকাতে পরিণত হয়। রাতের পর রাত জমাট অন্ধকারে আত্মগোপন করে নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকত। পথিকের আগমন জানতে পারলেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ত। বাঁশের পাবড়া ছুঁড়ে পথিকের পায়ে মারত— পথিক মাটিতে পড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে একখানা বড় লাঠি দিয়ে পথিকের ঘাড়ের ওপর দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে তার পা দুটো উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিত। তখনই পথিকের ঘাড় ভেঙে যেত ও মারা যেত। তারা সর্বস্বলুণ্ঠন করত এমনকি পরিধেয় বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত। তারপর মৃতদেহকে আখড়াইয়ের দীঘির পাঁকে পুঁতে দিত। এইভাবেই চারপুরুষ ধরে তারা জীবিকার্জনের পথ তৈরী করে। এদের মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে লাশ গায়েব করত। একদিন গভীর রাত্রে শ্বশুরবাড়ীতে অপমানিত হয়ে কালীর ছেলে তারাচরণ স্ত্রীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে আসবার সময় বৃষ্টি নামে, পথে গুনগুন স্বরে গান গাইতে গাইতে তারাচরণ আখড়াইয়ের দীঘির পাশ দিয়ে আসে, কিছুদূরে তার স্ত্রী এলোকেশী। পথিক ভেবে কালী পুত্রকে একই কৌশলে হত্যা করে। মরার পূর্বে তারাচরণ 'বাবা বাবা' বলে নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে। কালী তখন বলে, "এ সময়ে বাবা সবাই বলে।" বিচারে যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়। সাজার শেষে উন্মাদের মত কালী আখড়াইয়ের দীঘিতে এসে পুত্রের নাম ধরে লাশ খুঁজতে গিয়ে রাতের অন্ধকারে খাদের মধ্যে পড়ে মারা যায়। যেমনভাবে সে শত শত পথিককে হত্যা করে সেইভাবেই কালীর ঘাড় ভেঙে মৃত্যু হয়। মানুষ তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেই- অন্যায়কারীকে কখনই বিধাতা মাপ করেন না। তাই নির্মম নিয়তির মত আখড়াইয়ের দীঘির হিংস্র মুখবিবর কালীকেও গ্রাস করেছে।

তারাশঙ্কর প্রায়ই এই আখড়াইয়ের দীঘির পথ ধরেই এড়োয়ালী গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ীতে যেতেন। তখনই এখানকার ঘটনা শুনেছিলেন। তা থেকেই তিনি 'আখড়াইয়ের দীঘি' ও 'দ্বীপান্তর' নাটকের প্লট তৈরী করেন। এখানে ডাক-অন্তর মসজিদ বাংলার সম্রাট হুশেন শাহ তৈরী করেন। কথিত আছে যে এক ফকিরের নির্দেশে সম্রাট বাদশাহী সড়কের দুধারে ক্রোশ অন্তর মসজিদ ও পুকুর তৈরী করেন। এই অঞ্চলের প্রবাদ আছে যে 'আখড়াইয়ের দীঘি বাহাদুরপুরের লাঠি আর কুলির খাঁটি'-এই তিনের সংযোগে এখানে অসংখ্য নরহত্যা হয়েছে। কুলি থেকে মাত্র তিন কি.মি. উত্তরে বাদশাহী সড়কের ধারেই খড়গ্রাম যাওয়ার পথে আখড়াইয়ের দীঘি। বর্তমানে এর নাম আইড়্যাদীঘি। এই এলাকা আজও অশান্ত, অবশ্য মাঝে মধ্যেই খুন ছিনতাই লেগেই আছে।

ঘ. সমাজবিবর্তনে ক্ষয়িষ্ণু ও ক্রমবিলীয়মান গোষ্ঠী।

চিরচঞ্চলা এই প্রকৃতি। সুখ-দুঃখ, দিন-রাত্রি, পূর্ণিমা-অমাবস্যা ইত্যাদি যেন প্রকৃতির এক গূঢ় নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা। কত সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটেছে, কত শত প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে— পূর্ণ করেছে অনাগত ভাবীকালের আর্বিভাবকে। দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে জমিদারী সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। এদেশের অর্থনীতিতে ও সামাজিক জীবনে এই প্রথাগত প্রভাব ওতপ্রোতভাবে বিধৃত ছিল। তারাশঙ্কর কেবল জমিদারী প্রথার শক্তি সম্পদ ও ঐতিহ্যের চিত্র আঁকেন নি, সামন্ততন্ত্রের ভেঙে পড়া জৌলুসহীন বিবর্ণ সমাপ্তির চিত্র অঙ্কন করেছেন; চকিতে সেকালের বৈভবের অসীম দীপ্তি উদ্ভাসিত করেছেন। সূর্য যতই কাম্য হোক তথাপি সে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে, তেমনি অতীতকেও চলে যেতে হয় নবীনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে।

কল্লোলীয় যুগে আবির্ভূত হয়েও তারাশঙ্কর রাঢ়ের কথাকোবিদ। রাঢ়ের সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী ব্যবস্থায় তাঁর কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। সামন্তযুগীয় অবক্ষয়ের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়েই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার সব অর্জিত হয়েছে, সঞ্চয় করেছেন অভিজ্ঞতা। অসংখ্য স্বল্প আয়ের জমিদার তাদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিকে প্রবল শক্তি দিয়ে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যেমন জমিদারী প্রথাকে স্থায়ী স্বীকৃতি দিয়েছিল, তেমনি রাজানুগ্রহ ভোগী জমিদারগণ ইংরেজ প্রভুর কৃপাপুষ্ট হয়ে গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত নিয়ম রীতিকে পরিবর্তন করেন। তাঁদেরই দয়ায় জাঁকিয়ে বসে মহাজন শ্রেণী। মহাজনী কারবার নির্লজ্জের মত শুরু করে মহাজন শ্রেণী বিপুল অর্থের মালিক হন। ধীরে ধীরে অর্থশালী হয়ে ভূস্বামীতে পরিণত হন। এদিকে নিমজ্জমান জমিদারগণ সরকারী খাজনা প্রদানে অসমর্থ হলে মহাজনদের শরণাপন্ন হন। অমিতাচারী, ব্যভিচারী জীবন পুরুষ পরম্পরায় ভোগ করার ফলে জমিদারগণ দেউলিয়া হয়ে যান এবং মহাজনরাই তাঁদের রক্ষাকর্তা হয়ে ওঠেন।

জমিদারগণ নিজেদের খেয়াল খুশির রসদ জোগাতে, ঋণ পরিশোধ করতে দিনের পর দিন জোর-জুলুম করে নিত্য নতুন কর স্থাপন করে নিরীহ রায়তদের কাছ থেকে আদায় করতেন। অসমর্থ হলে রায়তদের ঘর বাড়ি, পুকুর, জমি নীলামে বিক্রি করে দিতেন, নির্মম অত্যাচার করতে দ্বিধা করতেন না।

ধনতন্ত্রের আগমনে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তাতে জমিদারী দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। ঐতিহ্যবাহী জমিদারী আভিজাত্যের এই নিঃশব্দে বিদায় তারাশঙ্করের মনঃপুত হয়নি তথাপি বস্তুগত অবস্থাকে তিনি স্বীকার করেছেন। শুধু ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের প্রতিই তাঁহার সানুকম্পা ছিল না, সেই সব আদিম প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ কেবল ভোগের মাঝে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেত, সেই সব বেদে যাদুকরী সম্প্রদায়ের অবক্ষয়ের জন্যেও তিনি হা হুতাশ করেছেন। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন, "আমার সাহিত্য কর্মের মধ্যে কালের বিবর্তনে সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিলীয়মান গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বিশেষ ধারার ব্যক্তিত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এসব আমার নিজের চোখে দেখা। ক্রমশঃ বিলীয়মান জমিদারশ্রেণী আমার সাহিত্যে খুব বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।" [৭৯] তার কারণ হল লেখক একই সঙ্গে জমিদার ও বণিকতন্ত্রের ভাগীদার ছিলেন। নিজের চোখের সামনে এঁদের পড়ন্ত সূর্যের মত ম্লান হতে দেখেছেন। তাই "তাঁর রচনায় জমিদার সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের

যুগ যেমন মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে, তেমনি তার বিলীয়মান শেষ রশ্মির অপরাহ্নিক ম্লানিমা দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে।" [৮০] তাই বলে, "এই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের ভাঙনের চিত্র অঙ্কন করে তারাশঙ্কর বস্তুতঃ কোন "এ্যানাক্রনিজমে'র পরিচয় দেন নি। তিনি যুগক্রান্তি পর্বের বাঙলাদেশেরই এক মর্মস্পর্শী বাস্তব সত্যকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই অর্থে রোমান্টিক হলেও তারাশঙ্করের শিল্পদৃষ্টি একান্তভাবে বাস্তব নির্ভর।" [৮১] তারাশঙ্করের উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'য় (১৯৩৯), 'কালিন্দী'তে (১৯৪০), 'পদচিহ্ন'তে (১৯৫০), অর্থনীতি ও যন্ত্রসভ্যতাজনিত বিচিত্র চাপে সামন্ততন্ত্রের ক্রমবিলোপের ছবি পরিস্ফুট।

অতএব ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে ক্রমবর্ধমান কৃষি সংকট দেখা যায় যা বিংশ শতকের মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে আরও প্রকট হয়, এছাড়া জমিদারীর উত্তরপুরুষের ভোগ তৃষ্ণা আদিম পর্যায়ে নেমে আসে। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবলুপ্তি হয়ে তাঁরা পাশ্চাত্যের অন্ধমোহে মোহান্ধ হয়ে পড়েন। প্রগতিশীল কর্ম অপেক্ষা ধ্বংসকামী অর্থে আসক্ত হয়ে যান। কিছু কিছু জমিদার পরিবারে স্বাদেশিক মনোভাবও গড়ে ওঠে। জমিদারীকে অবহেলা করে দেশের কাজে বা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে। এর ফলেও জমিদারী ধ্বংস হয়। যেমন তারাশঙ্করের 'ফল্গু' গল্পটিতে জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের একপুত্রের প্রজাহত্যার দায়ে দ্বীপান্তর হয় ও অন্য পুত্রটি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ফাঁসিতে প্রাণ দেন। ফলে এই জমিদারী ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেছে।

পুরুষানুক্রমে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের ফলে নিরীহ কৃষকদের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেন জমিদারগণ, সেই সঙ্গে জমিদারীর আয় বহুগুণ বাড়ালেও কৃষির উন্নতির জন্যে কোন উন্নয়নশীল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নি। এর সাথে যুক্ত হয় ইংরেজদের নগ্ন শোষণ এবং অত্যাচার। তাই বাঁচার শেষ চেষ্টা করতে প্রায়শই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। অনেক জমিদার জমিদারী বজায় রাখতে গিয়ে বহু যুগ সঞ্চিত স্বর্ণালংকার বিক্রি করে ইংরেজদের তুষ্ট করেছেন। এত গেল প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কারণ কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আধুনিক সভ্যতার আলো সঠিকভাবে পৌঁছাত না। কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি শিক্ষার বিস্তারের কচ্ছপগতি— এতাদৃশ কারণেও গ্রামবাংলার সম্ভ্রান্ত জমিদারদের অনেকেরই কালসলিলে সমাধি রচিত হয়।

তারাশঙ্কর শুধু ক্রমবিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের সাহিত্য রচনা করেন নি, তিনি সমাজের নাম না জানা অখ্যাত, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজশ্রেণীর কথাও লিখেছেন— যারা ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক কারণে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে অবলুপ্তিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারাশঙ্কর নিজেই তা স্বীকার করে বলেছেন, "জমিদার শ্রেণী ছাড়াও বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করেছেন।" [৮২] যাদের কথা অনেকেরই কাছে অজানা অথচ এদের সঙ্গে রাঢ়ের প্রাণের যোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য, এদের বাদ দিলে রাঢ়ের সংস্কৃতি অসম্পূর্ণ হয়ে যেত। তাদের কথাই তারাশঙ্কর রচনা করেছেন। তাদের জীবন্ত করে সকলের কাছে পরিচিতি দান করেছেন।

ক্ষয়িষ্ণু, ক্রমবিলীয়মান, গোষ্ঠীতন্ত্রের মধ্যে সামন্ততন্ত্র প্রধান। এই পর্যায়েন্দ গল্পগুলি হল, 'জলসাঘর', বন্দিনীকমলা, রাজপুত্র, খড়া, সাড়ে সাতগণ্ডর জমিদার, মুখুজ্জেমহাশয়, রঙীন চশমা, ফল্গু, ময়দানব ইত্যাদি।'

জলসাঘর ঃ- এই গল্পে বিশাল ঐশ্বর্যের সগর্ব আড়ম্বরের ক্রমশঃ লীন হয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ। প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে রায়বাবু বিশ্বম্ভরের সব সম্পত্তি চলে যায়। সমৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠার আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে রায়বাবু প্রাসাদের এককোণে আত্মগোপন করে থাকেন। আর অতীতের উজ্জ্বল দিনের অনুধ্যান করেন। অন্যদিকে এককালের ক্ষুদ্র মহাজন আজকের শ্রেষ্ঠ ধনী মহিম গাঙ্গুলীর সোনার দেউল ওঠে, উৎসবে ব্যাণ্ড বাজে, ঝকঝকেআধুনিকতার বাহন মোটর গাড়ী ঘুড়ে বেড়ায়। ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের সঙ্গে নব্য শ্রেষ্ঠীর দম্ভ মুখোমুখি সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিশাল বিস্তৃতি, বনেদি আভিজাত্য, বংশানুক্রমিক গৌরব এখন সংকীর্ণ হয়ে পুঞ্জীভূত হয়েছে একমাত্র জলসাঘরে। সেই জলসাঘরে হঠাৎ নব্য আড়ম্বরহীন জৌলুসের প্রত্যুত্তর দিতে অসমপ্রতিযোগিতার শেষ রশ্মি জ্বলে ওঠে। বাঈজীর গানে, নূপুরের নিক্কনে, সুরার মাদকতায় ভরে ওঠে জলসাঘর। কিন্তু সেই শেষ। অতীতের দাম্ভিক শাসনদণ্ড নিরুপায় বেদনায় নিয়তির পাষাণ মূলে আঘাত হেনেছে। উদীয়মান রুচিহীন ব্যবসায়ী বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের অন্তিম ঘন্টা বাজিয়েছে। আদিত্য মুখোপাধ্যায় তাই বলেছেন, "জমিদারী মহিমার অস্তমিত পরাজয়কে নাটকীয় বিন্যাস রোমান্টিক পরিবেশ আর নিপুণ বর্ণনাভঙ্গীর ভিতর দিয়ে এক অখণ্ড শিল্পরূপ প্রদান করেছেন তারাশঙ্কর।" [৮৩]

বন্দিনী কমলা ঃ-রাজহাটের বনেদি জমিদার রায়বাড়ির লক্ষ্মীছাড়া বংশধরদের নিয়ে গল্প। অকর্মণ্য, উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা উদ্ভট চিন্তা আর বিলাসে মত্ত। বাড়ীর কাঞ্চনবৌ তার দিদিশাশুড়ীর কাছ থেকে তাদের পূর্বপুরুষের পাইক থেকে নায়েব ও দেওয়ান হওয়ার গল্প শোনে। কোম্পানীকে খুশী করতে দরিদ্র তাঁতীদের খুঁটিতে বেঁধে প্রহার করত তারা। কাঞ্চন আরও শুনেছিল কেমন করে এই বাড়ীতে লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে রাখা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে বর্তমানে সেই ঘরের মরচে পড়া তালা খুলে যায়। সম্পদের লোভে সেই তালা খুলে পাওয়া যায় কেবল নরকঙ্কাল, নামাবলী আর একগোছা বিবর্ণ চুল। সামন্তযুগে অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মাধ্যমে লক্ষ্মীকে ঘরে বন্দিনী করে রাখার ব্যর্থপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে বিশাল প্রতিপত্তি রায়বাড়ী ধ্বংসের পথে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ঋণজালে আবদ্ধ।

রাজপুত্র ঃ- জমিদারী না থাকলেও বংশকৌলিন্যকে আশ্রয় করে দরিদ্র হয়েও রাজপুত্র হয়ে থাকার কাহিনী। বিশ্বনাথ আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে বাধ্য হয়েছে হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে। সকলের হাস্যস্পদ হয়েছে। বিশ্বনাথ রাজপুত্র হয়েও বর্তমানে জুতোর দোকানের অশ্রুসজল হাস্যরসের ক্যারিকেচারিস্ট।

এমনই আর এক গল্প "খড়্গ"— যেখানে জমিদার বংশে জন্মেও জমিদারী নেই, ওকালতি করেন। সকলে অবশ্য তাঁকে 'রাজাবাবু' বলেই সম্বোধন করে।

সাড়ে সাতগণ্ডার জমিদার ঃ- জমিদারীর দাপট, অহংকার, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি ক্রমশঃ সন্ধ্যারক্তরাগসম বিলীন হয়ে যাচ্ছে তারই এক করুণচিত্র এই গল্পটিতে আছে। জমিদারী বংশপরম্পরায় ভাগ হতে হতে বনবিহারীর ভাগ্যে মাত্র সাড়ে সাত আনি জুটেছে। ব্যাপ্তিহীন কীর্তিহীন হয়েও নির্বিষ সাপের গর্জনের মত বনবিহারীর ব্যর্থ গর্ব, প্রজাদের অবাধ্যতা, ভাগ্যের বিরোধিতা, গ্রামের ধনীদের অবজ্ঞামিশ্রিত সহানুভূতি, সামান্য পেয়াদারা পর্যন্ত জমিদারকে হেয় জ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিয়ত সংগ্রাম করতে করতে "মাটি বাপের নয়, দাপের" মুখে বললেও শেষে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে জমিদারী ছেড়ে কাশীবাসী হয়েছেন।

রঙীন চশমা ঃ- চৌধুরী বৈষ্ণব জমিদার। প্রাচীন বংশ ও যশের ভাণ্ডার ছিল কিন্তু বর্তমানে ধ্বংসপ্রায় অবস্থা। বিশাল অট্টালিকা শেওলায় মলিন। বড় ও ছোটকর্তা এখানে থাকেন, বাকীদের মধ্যে দুই ভাই নির্বংশ আর এক ভাইয়ের দু'সন্তান মাতুলালয়ে থাকে। মাত্র দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে বড়কর্তার প্রাণান্তকর অবস্থা হয়েছে।

"আরোগ্য" গল্পেও রাসুঠাকরুণ বা তার বড় মামার জমিদারী প্রায় অবলুপ্তির পথে। 'মা বা ফল্গু' গল্পটিতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মহাবিষ্ণুবাবুর হাতে কুষ্ঠ হয়েছে, তাঁর দুই সন্তান প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী। জমিদারী দাপট শূন্য। যেটুকু ঐতিহ্য রয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরেই সব শেষ হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎচালিত বৃহৎযন্ত্রের আগমনে হস্তশিল্পী-বা কুটির শিল্পের কারিগরদের পতন অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে তার ইঙ্গিত রয়েছে 'ময়দানব' গল্পে।

তারাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের ধারাটি যেমন স্পষ্ট তেমনি বেদে 'বাগদী' পটুয়া 'মালাকার' 'লাঠিয়াল' 'ডাকহরকরা' প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন যাপনের চিত্র, তাদের বর্তমান সভ্যতার দ্বন্দ্বে হারিয়ে যাওয়ার চিত্রও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। রাঢ় বাংলায় বিশেষ করে বীরভূমের মানচিত্রে জড়িয়ে ছিল যারা সেই অন্ত্যজ শ্রেণীকে তারাশঙ্কর দেখেছেন এক ঐতিহ্যরূপে। আদিম ও অমার্জিত রূপ চিত্রণ করে রাঢ়বাংলার এক অবিচ্ছেদ্য রূপে এদের অবস্থান দেখিয়েছেন। তাই "তারাশঙ্কর রের গল্পে প্রকৃতির রূপে-রঙে বেড়ে ওঠে জীবন। উপকথায় রূপকথায় গাঢ় বর্ণ তার প্রকৃতি। প্রকৃতির বুক থেকেই চরিত্রগুলির উৎপত্তি বলেই মাটি মাখা মানুষের কাজে, কথায়, ভাবনায় তারাশঙ্কর রের সর্বদেহ ধূলি-ধূসর।" [৮৪] এইজন্যেই ভূদেব চৌধুরী বলেছেন, " কী প্রসঙ্গে, কী প্রকরণে তারাশঙ্কর রের গল্প যেন আদিম মহাকাব্যধর্মী।" [৮৫] সাহিত্যিকের জীবনে তন্ময়তার যোগ ঘটলে পাত্র-পাত্রীর জীবনের সঙ্গে অর্থাৎ তাদের সুখ-দুঃখের মাঝে বিলীন হয়ে যায় শিল্পীর শিল্পসত্তা। তারাশঙ্করের জীবনে এই তন্ময়তার সংযোগ ঘটেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, "এই কারণেই আমার পাত্র-পাত্রীর মুখে আমার ভাষার কথা আমি বসাতে পারি না, তাদের নিজেদের ভাষা আমার ভাবনায় রচনায় বেরিয়ে আসে। মহান পূর্বাচার্যগণের মত নিজস্ব একটি ভাষা আমি এই কারণেই করতে সক্ষম হইনি।" [৮৬] অর্থাৎ মৃত্তিকা সম্ভূত মানবজীবনই লেখকের অন্বিষ্ট ছিল। ভারতবর্ষের যারা কারিগর অর্থাৎ প্রাচীনসভ্যতার ধারক-বাহক, আর্যোত্তর যুগে যাদের স্থান সমাজজীবনের বাইরে নয়, যারা অবহেলিত, অবজ্ঞাত হয়ে ক্রমশ নিশ্চিহ্নের পথে এগিয়ে চলেছে— তারাশঙ্কর সেই বিলীয়মান ব্রাত্য শ্রেণীর কথাশিল্পী। তাই সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "তারাশঙ্কর মুখ্যতঃ জনসাধারণের শিল্পী। এই জনসাধারণ আবার নীচের তলার মানুষ।" [৮৭] রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, "সমাজের সর্ব নিম্নস্তরের জীবনযাত্রার রহস্যদ্বার সর্বপ্রথম উদঘাটিত হয়েছে তারাশঙ্করের গল্পে।" [৮৮],

যাযাবর বেদেদের জীবনযাত্রা, তাদের ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার খাদ্য সম্বন্ধে তিনি "তামস তপস্যা" উপন্যাসের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে লেখকের যেন নাড়ীর যোগ ছিল। তাই তাঁর সাহিত্যকীর্তি পাঠ কালে মনে হয় তিনিও যেন একই পরিবারের বাসিন্দা। বেদেরা সবার অলক্ষ্যে বিলুপ্তির পথগামী দেখে তারাশঙ্কর বেদনা অনুভব করেছেন। কারণ তিনি বেদেদের সঙ্গে রাঢ়ের সাংস্কৃতির এক নিগূঢ় যোগ দেখেছিলেন। তাই হয়ত লেখক তাদের জীবনাচরণ আমাদের সামনে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। ফলে হারিয়ে যাওয়া সম্প্রদায়টি আমাদের কাছে চিরজাগরুক থেকেছে। এই বেদেরা ধর্মে মুসলমান, আচারে হিন্দু, জীবিকায় বাজিকর; সাপ ধরে, বাঁদরের খেলা দেখায়। পুরাণ কথা এদের কণ্ঠস্থ। ১৯২৩/২৪ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে তিনি বেদেদের সংস্পর্শে কিছুদিন আসেন। সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই তিনি "নাগিনী কন্যার কাহিনী" উপন্যাস, বেদেনী, সাপুড়ের গল্প, নারী ও নাগিনী প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি বাউণ্ডুলের মত সারা বীরভূম জেলা ঘুরে বেড়াতেন কখনও রাজনৈতিক কাজে কখনও বা সমাজসেবায়। ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি প্রতিটি গ্রামের পুকুর, নালা, গাছপালা সব অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। বীরভূমের বাস্তব ভূগোল চিনিয়ে দেবার সময় "চিত্র পরিচালক বীরভূমের হিলোরা গ্রামের সুসন্তান তপন সিংহকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "জানো তপন, এই লাভপুরের আশেপাশে পাঁচ-ছখানা গ্রামে কতগুলো গাছ আছে সেটা আমি বলে দিতে পারি।" [৮৯] এই হলেন তারাশঙ্কর। এইসব অন্ত্যজ শ্রেণী কুসংস্কার আর অশিক্ষার প্রভাবে বিচিত্র পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। অন্নসমস্যা, যৌনসমস্যায় মানস বিকৃতি ঘটেছে। এদের জীবনের বিচিত্রগামী পথের দৃশ্যাবলী অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর। এই কারণেই শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "দীর্ঘ শতাব্দী পরম্পরা ধরিয়া গড়িয়া ওঠা এক সাম্প্রদায়িক জীবনক্রম এইভাবে চিরবিলুপ্তির অন্ধকার গর্ভে বিলীন হইয়াছে—এক ধর্মকেন্দ্রিক, আচারে-সংস্কারে দৃঢ়বদ্ধ, সমষ্টিগত জীবননাট্যের উপর যবনিকা পড়িয়াছে। তারাশঙ্করের ইতিহাসজ্ঞান ও ঔপন্যাসিক প্রতিভার বিরল সমন্বয়েই এই প্রাচীন ঐতিহ্যময় জীবনকাহিনী

ভবিষ্যৎকালের জন্য সাহিত্যেও স্বর্ণপেটিকায় অবিস্মরণীয়ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। আমরা সর্পবিদ্যা, বিষচিকিৎসার মন্ত্রৌষধি চিরকালের জন্য হারাইয়াছি কিন্তু বেদে জীবনের সংস্কৃতি বাস্তব জীবন হইতে লুপ্ত হইলেও যে সাহিত্যে নিজ স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া গেল। সেজন্য আধুনিক পাঠক তারাশঙ্কর নিকট চিরঋণী থাকিবে।" (৯০)

এরপর দেশী যাযাবর বাজীকরদের উল্লেখ করেছেন— এরাও আজ বিলুপ্তির পথে। "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে বিভিন্ন দেশীয় বিলীয়মান অন্ত্যজশ্রেণীর উল্লেখ আছে।

এছাড়া মল্লারপুরের ঝুমুর দলেরও উল্লেখ করেছেন— যেখানে মেয়েরাও নাচে, গান করে, নানা সাজে সুসজ্জিতা হয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর ঘুরে মেয়েরা নেচে বেড়াত।[১৩] আজ সেইসব পুরাতন মানুষ প্রায় কেউই বেঁচে নেই। 'কবি উপন্যাসের বসন মল্লারপুরের ঝুমুর দলের নাচনী গায়িকা। নিঃসন্তান বসন্তর বিয়ে হয়েছিল খরবোনার নন্দ বায়েনের সঙ্গে। মধ্যবয়সে পায়ে চোট লেগে বসন্ত বা বসন মারা যায়। তার বাবার নাম পূর্ণচন্দ্র, মা পদ্মাবতী। পরবর্তী প্রজন্ম চপলা, বীণা, বিদ্যুৎ, কৃষ্ণা, গোপাল, ভুবন প্রমুখ নায়ক, নায়িকা এখনও জীবিত। এদের কেই কেউ বোলপুরে কীর্তন ও যাত্রাপালায় অংশগ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অবশ্য গোপাল ও ভুবন মল্লারপুরেই ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন, অনেকে চাষবাসও শুরু করেছেন। "পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আবিষ্কার করেছেন ঃ এককালে, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গে তখন বৈষ্ণবধর্ম ও কীর্তনের সমাদর বেশী, সেইকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু কীর্তনীয়ার দল ছোট-বড় ভালমন্দ নির্বিশেষে ওই অঞ্চলে যেত এবং যথেষ্ট উপার্জন করে দেশে ফিরত। ওই ছোট বড়দের মধ্যে ছোটরা শেষ প্রসার ও সমাদরের জন্য দলের মধ্যে গায়িকা গ্রহণ করে। ক্রমে গায়িকারাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তার থেকে ক্রমে নাচ, তারপর হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্য ধর্মবাদ দিয়ে নিছক নাচগানের দলের পরিণতিতে পৌঁছাল। ফোঁটা তিলক মালা ফেলে কেশ বিন্যাস হল, স্বৈরিণীর উপযোগী গায়ে উঠল পিতলের গহনা চুড়ি, বালা, বাউটি , বাজুবন্ধ, চিকহার, কানে কান, কপালে ঝাপটা। পায়ের নুপুর ঘুচে উঠল ঘুঙুর। তবুও আজও এরা গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহাপ্রভুর বন্দনা না করে গান শুরু করে না।" (৯১)

পাইক নামে খ্যাত বাগ্‌দী, ডোম সম্ভূত তারাও আজ অবলুপ্তির পথে। সামন্ততন্ত্রের অস্তাচলের সঙ্গে সঙ্গে এদেরও হারিয়ে যেতে হয়, কারণ সামন্তদের সঙ্গেই এদের জীবনযাত্রা ছিল সংশ্লিষ্ট।

এছাড়া রামায়ণ গান ও কীর্তনীয়ার দলের কথাও তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে অঙ্কন করেছেন যাঁরা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে গান করতেন বংশপরম্পরায়। এঁরা অত্যন্ত মেধা, ব্যুৎপত্তি ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের পরবর্তী সন্তান সন্ততি সেই বৃত্তি ত্যাগ করে অন্য জীবিকায় নিমগ্ন হয়েছে।

এই ক্রমাবলুপ্তির মূল কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমস্যা, ঐতিহ্যের প্রতি অবিশ্বাস, বিজ্ঞানবুদ্ধির অভাবনীয় উন্নতি, পশ্চিমী মোহের প্রতি আকর্ষণ, শহুরে ঝোঁক, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, সংগ্রামশীল জীবিকার পথ ইত্যাদি ।

তারাশঙ্করের রচনায় বর্তমানে বিলীয়মান অন্ত্যজশ্রেণীর অনেক গল্প পাওয়া যায়। যেমন নারী ও নাগিনী, যাদুকরী, সাপুড়ের গল্প, মালাকার, বেদেনী, কবি, মরুর মায়া, পিঞ্জর, তৃষ্ণা, ডাকহরকরা, কামধেনু, তমসা, আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি প্রভৃতি।

লোকায়ত জীবনের নায়ক নায়িকা

'নায়ক' শব্দটির অর্থ বড়ই তাৎপর্যবহ। গল্পে বা কাব্যের সংহতি সাধনে এবং সম্পূর্ণতা দান করেন যিনি; যাঁকে নির্ভর করে কাব্যের সৃষ্টি, বৃদ্ধি, পরিসমাপ্তি ঘটে। যিনি সমগ্র কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ, বর্ধন করেন এমন চরিত্রই নায়কের মর্যাদা লাভের অধিকারী হন। বৃহৎ বনস্পতির মত কাব্যে অবস্থান করে শাখা প্রশাখার মত অন্যান্য চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেন নায়ক। তাই কাব্যের সঙ্গে নায়কের সম্পর্ক জলঅচল। নায়ক কাব্যের গতিপ্রবাহ দান করে কাব্যকে পরিসমাপ্তির আলোকে আলোকিত করেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নাকে আত্মস্থ করে সদা সত্য সুন্দর হয়ে প্রতিভাত হন নায়ক। আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণে' নায়ক সম্বন্ধে বলেছেন—

"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহ।
দক্ষোহনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যলবাণ্ সেতা।"

সেই সঙ্গে তিনি নায়কের শ্রেণীভাগ করেছেন মূলতঃ চারটি। যথা ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। আত্মশ্লাঘাহীন ক্ষমাবান অতি গম্ভীর মহাসত্ত্ব, ধীর প্রকৃতি, বিনয়াচ্ছন্ন গর্ব ও দৃঢ়ব্রতগুণান্বিত নায়ক হলেন ধীরোদাত্ত। প্রতারক, উগ্রস্বভাব, চঞ্চল প্রকৃতি অহংকার দর্পচূর্ণ আত্মশ্লাঘাকারী নায়ক হলেন ধীরোদ্ধত। নিরুদ্বেগ চিত্ত, মৃদুস্বভাব, সর্বদা-নৃত্য গীতাদি কলাপরায়ণ নায়ক হলেন ধীরললিত। বিভাদি সাধারণ গুণসম্বিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নায়ক ধীরপ্রশান্ত নামে খ্যাত হন।

"প্রতিটি নায়ক আবার দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ ইত্যাদি ভেদে নায়ক মোট আটচল্লিশ প্রকার হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।" (৯২)

নায়িকা সম্বন্ধে বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে বলেছেন—'অথনায়িকা ত্রিবিধা, স্বাহন্যা সাধারণী স্ত্রীতি।
নায়ক সামান্য গুণৈর্ভবতি যথাসম্ভবৈর্যুক্ত। ৬৯
অর্থাৎ নায়িকা ত্যাগাদি যথাসম্ভব নায়কগুণ সংযুক্ত স্ত্রী স্ব-স্ত্রী, অন্য স্ত্রী ও সাধারণ স্ত্রী ভেদে নায়িকা ত্রিবিধ। নায়িকার

শ্রেণীবিভাগ তিনশত চুরাশি হয়ে থাকে।" (৯৩)

ইউরোপীয় সর্বপ্রাচীন তত্ত্বগ্রন্থকার এ্যারিস্টটল তাঁর "পোয়েটিকস্" গ্রন্থে ট্র্যাজেডি ও নায়কের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলা হয়েছে, **"deals with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions।"** হিরো সম্পর্কে বলেছেন, **"Spondaious"–exalted above the average or his Tragedy cannot produce "the catharsis of pity and fear."**

Not an absolutely goodman.

Not an absolutely bad man.

..........intermediate kind of personage.

..........a bigman and a great man with a flaw in character. "hamartia." (৯৪) অ্যারিস্টটলের এই মতবাদকে Milton অন্যভাবে বলেছেন যে "calm of mind, all passions spent." সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব' গ্রন্থে বলেছেন, 'ট্র্যাজেডির নায়ক বিষয়ক আলোচনার সূচনায় (মুখবন্ধ হিসাবে) এ্যারিস্টটল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ট্র্যাজেডি **"imitations which excite pity and fear, this being the distinctive marks of tragic imitation"**। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির বৃত্তনায়কের ভাগ্য বিপর্যয়াদি এমন ধরণের হওয়া চাই যাতে করুণা ও ভয় জাগ্রত হয়। কারণ ট্র্যাজেডির বিলক্ষণ-বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে করুণ ও ভয়ানক ঘটনার উপস্থাপনা।" (৯৫) অ্যারিস্টটল নায়ককে ট্র্যাজেডির প্রাণ বলেছেন। কারণ নায়ককেই আশ্রয় করে ট্র্যাজেডির অনুকৃতি, করুণা, ভয়ের সঞ্চার হয়। অতিশয় ধার্মিক বা অতি দুর্বৃত্ত কখনই নায়ক হবে না। সেই সঙ্গে তিনি নায়ককে সাধারণ স্তর অপেক্ষা উচ্চস্তরের হতে হবে বলেছেন। যেমন ওয়েদিপাস, হিপ্পোলিতস্, থিয়েসতেস প্রমুখ। আধুনিককলে এ্যারিস্টটলের বক্তব্যের অনেকাংশে অপ্রযোজ্য বলে মনে হয়। এর কারণ মানব চরিত্র সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন যেমন ঘটেছে। তেমন সাহিত্যে মানব চরিত্রের অত্যন্ত জটিল রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে।

অতএব যে কাব্যে বা গল্পে বা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি , পার্শ্বচরিত্র, নায়িকা, ঘটনা সমস্ত কিছুকেই প্রভাবিত করেন যিনি-তিনিই নায়ক। সবক্ষেত্রেই নায়ক ও নায়িকা উভয়েই থাকবেন এমন কথা নেই। কোন ক্ষেত্রে নায়ক আবার কোন ক্ষেত্রে নায়িকা প্রধান হতে পারে। আবার কোন ক্ষেত্রে উভয়েরই সমান গুরুত্বপূর্ণ সহাবস্থান হতে পারে।

বিশ্বসাহিত্যে বাংলা ছোটগল্পের এক বিশেষ স্থান আছে। বঙ্কিমের রচনায় সমাজের উচ্চমঞ্চের মানুষের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরে পল্লীর নগণ্য মানুষকে গল্পে ঠাঁই দিলেন। কিন্তু তাদের ভূমিকা গল্পে প্রাধান্য দিলেন না। এরপর শরৎসাহিত্যে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে ওঠে। কিন্তু শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত সমাজের নীচে বেশী দূর নামতে পারলেন না। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে সমাজভীরুতা ও সংস্কারানুগত্য প্রধান ছিল, তাই তাঁর "পল্লীসমাজে"র রমা ও রমেশের প্রেম কোনদিন আত্মপ্রকাশ করেনি। রমাকে বৈধব্যের সংস্কার থেকে উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। 'কল্লোল' 'কালিকলম' প্রগতি অধ্যায়ে সাহিত্যে ঠাঁই পেল অভদ্র ইতরজন। এরপর এলেন তারাশঙ্কর। তাঁর কলম স্পর্শ করল সমাজের ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন অন্ত্যজশ্রেণীর জীবন চিত্র। ডোম, বাগদী, কাহার, বেদে, সাঁওতালরা হলেন তাঁর সাহিত্যের নায়ক। "তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় যে নৈতিক মানুষ (Ethical man) ধরা দিয়েছে, সেই মানুষই জীবন-স্বপ্নে সুন্দরের লীলায় রসিক মানুষ (Aesthetical man) হিসেবে ধরা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথে। আবার এই মানুষ-ই শরৎচন্দ্রের কল্পনার মূলে এসেছে 'প্রেমিক মানুষ' (Emotional man) হয়ে। শরৎ-পরবর্তী শিল্পিমানসে এসেছে 'জৈবিক মানুষ'। আর 'অর্থনৈতিক মানুষ' অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক মানুষের 'সত্তা'। তারাশঙ্কর এই জীবনরসের লীলাকে স্বীকার করে নিলেন। তাই তাঁর সাহিত্যে সুন্দর আর অসুন্দরের কোন প্রভেদ রইলো না। মধুরে ও মনোহরে যে শক্তি ভীষণে এ ভয়ানকে সেই শক্তিরই প্রকাশ। তাই অখণ্ড মানব জীবনই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। অসুন্দর বলে সেখানে কেউ ব্রাত্য নয়। আপনার প্রবৃত্তিই তাঁর সাহিত্যে চরিত্রের নিয়তি। মানুষ আপনার কর্মের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করেছে তার অন্তর্নিহিত মানবত্বকে মনুষ্যত্বকে।" (৯৬)

এই অবহেলিত অনাদৃত মানুষের চিত্রকর তারাশঙ্কর। সমাজের একপ্রান্তে আবর্জনাসম পড়ে থাকা জঞ্জালকে অপসারিত করে পঙ্কে পদ্ম বিকশিত করেছেন। তাদের জীবনচর্যা, আচার-ব্যবহার, ত্যাগ, সততা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি গুণে তারা নিজেরাই স্বয়ম্ভূ। শিক্ষিত সমাজের চলমান নায়ক নায়িকার সমগোত্রীয় তারা। কলিন্দ্রীর গভীর-গর্ত থেকে শুরু করে রাঢ়ের রুক্ষ ধূসর ছাতিফাটা মাঠ কিংবা আখড়াইয়ের দীঘি অতিক্রম করে ময়ূরাক্ষীর উদ্দাম জলস্রোতে সন্তরণকারী মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত। জাতি-ধর্মে হীন হয়েও তাদের জীবনের গতি প্রকৃতি, ছদ্ম-সৎ বংশীয় নায়ক-নায়িকাদের সমমর্যাদা দাবী করার মত সাহস রেখেছে এবং সে দাবী সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর বলা বাহুল্য। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা হুবহু তিনি রচনা করেছেন যার ফলে চরিত্রগুলি শুধু মৃন্ময়ী হয়নি, হয়েছে চিন্ময়ী। "ব্রাহ্মণধর্মের উদার আমন্ত্রণের ফলেও যে ব্রাত্য গোত্রহীন মানুষকে সমাজ গণ্ডীর ভিতরে আনা সম্ভবপর হয়নি অথচ যারা এই দেশেরই মাটির বুকে যুগ যুগ ধরে লালিত হচ্ছে, তাদের আদিম অসংস্কৃত প্রকৃতি নিয়ে একেবারে মাটির সঙ্গেই মিশে আছে, তাদের তিনি সাহিত্যের আঙ্গিনায় আহ্বান করেছেন। ডোম, বাউরী, বাগদী, কাহার, বেদে, সাঁওতালেরা এই নতুন সাহিত্যের নায়ক হয়েছে।" (৯৭)

তারাশঙ্করের উপন্যাসের নায়কেরা প্রাচীন বাংলাকাহিনী কাব্যের নায়কের মতো সর্বদাই ধীরোদাত্ত, রূপবান, গুণবান, অক্রোধী, দৃঢ়চেতা এবং মেধাবী। মধ্যবিত্ত নায়কেরা সবসময়েই অভিজাত বংশোদ্ভূত। "তাঁর (তারাশঙ্কর নায়কেরা কোনো পর্যায়েই নুতন

বরণ-কারী রোমান্টিক বুর্জোয়া নয়—একান্ত ভারতীয় জীবন থেকে উদ্ভূত ব্যক্তি। 'সন্দীপন পাঠশালা'র নায়ক সীতারাম গণদেবতার নায়ক দেবু এরা কেউই গ্রামীণ বা নাগরিক এলিট শ্রেণীর অন্তর্গত নয়— বর্ণীয় এলিটও নয়, আর্থিক ষ্ট্যাটাসের এলিটও নয়।" [৯৮] অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের সাহিত্যে নায়ক অপেক্ষা পটেরই গুরুত্ব বেশী মনে হয়। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসের নায়ক দেবু ঘোষ বটে তথাপি প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজই নায়ক। এখানেই তারাশঙ্কর যথার্থ আধুনিক জীবন শিল্পীর দাবী রাখেন। এখানেই তিনি শরৎচন্দ্রকে অতিক্রম করে গেছেন।

এবার লোকায়ত জীবনের নায়ক নায়িকা প্রধান গল্পগুলি দেখা যেতে পারে ঃ—

গল্প	নায়ক	নায়িকা
১। কবি	নিতাই কবিয়াল (ডোম)	
২। তারিণী মাঝি	তারিণী মাঝি (নৌকার মাঝি)	সুখী (স্ত্রী)
৩। স্রোতের কুটো	গোপাল কোনাই (চাষী)	
৪। সমুদ্রমন্থন	—	খনা ভিখারিণী
৫। স্থলপদ্ম	হারা (বাউরী) (মজুর)	বেলে বাউরী (রাজমিস্ত্রীর কাছে মজুরি খাটে)
৬। ডাইনীর বাঁশি	—	স্বর্ণ (সোনার বেনে)
৭। আখড়াইয়ের দীঘি	কালী বাগ্‌দী (ডাকাত)	
৮। নারী ও নাগিনী	খোঁড়া সেখ (সাপুড়ে)	জোবেদা (সাপুড়ের স্ত্রী)
৯। ঘাসের ফুল	—	চুড়কি (কলিয়ারীর নারী শ্রমিক)
১০। মতিলাল (সঙের ছদ্মবেশী)	মতিলাল (ডোম)	ভুবন (ঐ স্ত্রী)
১১। প্রতীক্ষা (মজুর)	আখনা (বাউরী)	পরী (ঐ নিকা করা স্ত্রী)
১২। ডাকহরকরা	দিনু ডোম (রাণার)	
১৩। শ্মশানের পথে	সুবল দাস (বৈষ্ণব)	দামিনী (গোষ্টর স্ত্রী)
১৪। প্রতিমা	কুমারিশ (প্রতিমার কারিগর)	
১৫। সন্তান	গোবিন্দ (বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ। চাষী)	
১৬। মালাকার	রজনী (মালাকার)	
১৭। বেদেনী		রাধিকা (সাপুড়ে)
১৮। ডাইনী		সুরোধনী (ডাইনী)
১৯। রাঙাদিদি		সরস্বতী (পটুয়া)
২০। যাদুকরী		যাদুকরী
২১। প্রত্যাবর্তন	পশুপতি জেলে (জাহাজের খালাসী)	রমা (পশুপতির ভাবী স্ত্রী)
২। সনাতন	সনাতন (চাকর)	
২৩। ময়দানব	ফণী মিস্ত্রী	
২৪। ইমারত	জনাব সেখ (রাজমিস্ত্রী)	
২৫। তমসা	পঙ্কী (অন্ধগায়ক)	
২৬। কামধেনু	নাথু পটুয়া	
২৭। বেদের মেয়ে	প্রভাত (স্বদেশী)	শিবি (বেদের মেয়ে)
২৮। জটায়ু	জটে কর্মকার (জন্মপাগল)	
২৯। বাবুরামের বাবুয়া	বাবুরাম (জমাদার)	সুখীয়া (ঐ স্ত্রী)
৩০। সাপুড়ের গল্পে		কালী বেদেনী (সাপুড়ে)
৩১। একটি প্রেমের গল্প		ফুলমণি সাঁওতাল
৩২। এক পশলা বৃষ্টি		জয়া বাউরী
৩৩। সুরতহাল রিপোর্ট		কড়ি বাউরী (চৌকিদারের স্ত্রী, চোর)
৩৪। এ মেয়ে কেমন মেয়ে		বিশালাক্ষী

কবি ঃ— তারাশঙ্কর কেবল উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত, উচ্চশ্রেণী, সুদর্শন, আচার সর্বস্ব শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণ করেন নি, কিংবা কেবল সুউচ্চ অট্টালিকার সুসজ্জিত শৌখিন, দাম্ভিক, জমিদার, ব্যবসাদারদের জীবনচর্যায় ব্যাপৃত হন নি। তিনি রাঢ়ের রুক্ষধূলি ধূসর কঙ্কালসার রুচিমার্জিতহীন, কদর্য 'অশিক্ষিত' অভদ্র অন্ত্যজশ্রেণীর জীবনবেদ এমন শৈল্পিক নিদর্শনে চিত্রিত করেছেন যাতে ব্রাত্য হয়েও বেশ কিছু চরিত্র উচ্চশ্রেণীর নায়ক নায়িকাকেও অতিক্রম করে গেছে। 'কবি' গল্পটি তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। নায়ক নিতাই কবিয়াল বাগ্‌দী পরিবারের ছেলে। কবি যশঃ প্রার্থী হবার বাসনায় নিতাই (লোভপুরের সতীশ ডোম) পরিবার ও গোষ্ঠীগত চৌর্যবৃত্তির

প্রভাব মুক্ত হয়েছিল। বাগ্‌দী সম্প্রদায় ছিল আদিমতায় পরিপূর্ণ। সর্বত্র ব্যভিচারী জীবন-যাপন মদ্যপান, কামুক, ভোগেচ্ছু মানসিকতা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ইত্যাদি কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিতাই লেখকের লেখনীর যাদুস্পর্শে পঙ্কে পদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে। নিতাই তাই জাত বাগ্‌দী নয়, সে একজন কবিয়াল, দার্শনিক। ঠাকুরঝিকে না পেয়ে নিতাই হা হুতাশ করেনি, সে আত্ম-আবিষ্কার করেছে, দার্শনিকের মত প্রকৃতি সৌন্দর্যে নিজেকে বিলীন করতে চেয়েছে। "জীবন এত ছোট কেনে," "কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে।"— এই মহিমময় শাশ্বত উক্তির মাধ্যমে সতীশ ডোমকে পূর্ণ নায়কোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাশঙ্কর। সকল প্রকার দুর্বলতা হীনতা, দৈন্য, আকাঙ্ক্ষাকে জয় করে দেহাতীত সৌন্দর্য সাধনায় রত হয়েছে নিতাই।

তারিণী মাঝি ঃ- ময়ূরাক্ষীর গুনটিয়া ঘাটের মাঝি তারিণী। নিরক্ষর, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ, সহজ, সরল। সংসারে তার নিঃসন্তানা সুশ্রী, তন্বী, সুখী। উভয়েই উভয়কে ভালবাসে ঠিক যেন শরতের মেঘের মত। তাদের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ছিল ময়ূরাক্ষীর। ময়ূরাক্ষীর দৌলতেই তাদের পেটের ভাত হয়। অভাব, অনটন, থাকলেও তারিণী সুখীকে নিয়েই আনন্দে থাকে আর আকণ্ঠ মদ খায়। দরিদ্র হলেও তারিণী লোভী নয়। ময়ূরাক্ষী একবার শুকিয়ে গেলে তারা দুজন জীবিকার সন্ধানে বর্ধমানের দিকে যায়, কিন্তু পথে বৃষ্টি নামলে ফিরে আসে। ময়ূরাক্ষীতে যেবার হড়াপা বান আসে, সেবার তারিণী সুখীকে পিঠে নিয়ে ডাঙ্গার দিকে যেতে থাকে। হঠাৎ পথ ভুলে রাক্ষসী ময়ূরাক্ষীর ঘূর্ণি স্রোতের মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকে। একদিকে প্রিয়তমা পত্নী, অন্যদিকে নিশ্চিত মৃত্যুর পদধ্বনি। প্রেম ও আত্মরক্ষার দ্বন্দ্বে তারিণী শেষ পর্যন্ত সুখীকে গলা টিপে হত্যা করে নিজে বাঁচে। আত্মরক্ষার আদিম প্রবৃত্তির হাতে প্রেমের পরাজয় ঘটেছে। যে তারিণী সুখীকে বলেছিল, "ভয় কি, আমি তোর সঙ্গে রইছি," সেই তারিণীই বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সখীকে হত্যা করেছে। গল্পের শেষে এই চকিত চারিত্রিক পরিবর্তন সহৃদয় পাঠকবর্গকে এক অনির্বচনীয় সত্যে উপনীত করেছে। তারিণী ও সুখী ট্র্যাজিক নায়ক নায়িকার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

স্রোতের কুটো ঃ- পল্লীবাংলার ব্রাত্যশ্রেণীর গল্প। নায়ক গোপাল কোনাই। মূর্খ, অভদ্র, গাঁজাখোর, মাতাল অথচ সৎ, সহজ ও সারল্যে ভরপুর। দাদা রাখাল তার মেয়ে গৌরীকে অপাত্রে বিয়ে দেয়। তাই নিয়ে স্নেহপ্রবণ গোপালের অসংবৃত আক্রোশ ও প্রমত্ত আচরণ এই গল্পের মুখ্য বিষয়। পরের মেয়ের জন্যে অর্থ সম্পত্তি এমনকি স্ত্রীকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছে, জেলে গেছে অথচ সেই ভাইঝিই তাকে অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সহধর্মিনী ও গোপালের ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে, অনন্যোপায় হয়ে জেলেপাড়ায় মদ খেতে গিয়ে ডাকাত দলে যোগ দিয়েছে— ধরা পড়ে জেলে যায়। বিশ বছর পর রুক্ষ শুষ্ক পাকা চুল দাড়ি নিয়ে স্ত্রীর আকর্ষণে বাড়ীতে আসে কিন্তু প্রতিবেশীর কাছে জানতে পারে যে তার স্ত্রী জেলে যাবার দিনেই জলে ডুবে আত্মহত্যা করে এবং বাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে বর্তমানে জমিতে পরিণত হয়েছে। কাউকে পরিচয় না দিয়েই সে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। একদিকে গভীর বাৎসল্য, প্রেম ও রূঢ় আঘাত অন্যদিকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা জনিত কারণে স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত গোপালের দুঃখময় জীবনের করুণ এখানে কাহিনী বিধৃত।

সমুদ্র মন্থন ঃ-সমাজের অন্ত্যজস্তরে কদর্য, কুৎসিত জীবনচর্যার মধ্যেও প্রাণধর্মের এক মহিমা লুক্কায়িত এই গল্পে। পটভূমি দুর্ভিক্ষের ভয়াল ও ভয়ঙ্কর পরিবেশ। জমিদারী রক্ষায় খাজনা টাকা জমা দিতে উমানাথ হালাকান; ধনীর কন্যা রমা তাঁর স্ত্রী। অহংকারে, দম্ভে পরিপূর্ণা। এরই ফাঁকে চকিতে আবির্ভূত ব্রাত্য শ্রেণীর নায়ক- নায়িকা। যেখানে স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে নায়িকার কী অমলিন জীবন সংগ্রাম। জীববৃত্তিকে তুচ্ছ করে প্রেমবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে। অসুস্থ স্বামীর জন্যে রুগ্না স্ত্রী ছাগলচুরি করতে এসে ধরা পড়ে। 'তারিণী মাঝি' তে জীববৃত্তির জয়, কিন্তু এখানে প্রেমের জয় হয়েছে। রমা ভিখারিণীর পতিভক্তি দেখে দর্প, অহংকার আভিজাত্য সব বিসর্জন দিয়ে উমানাথকে নতুন করে ভালবেসেছে। গল্পের রসমোক্ষে ও ধনী দাম্পত্য জীবনে মিলন ঘটাতে এই দুই স্বামী-স্ত্রীর আবির্ভাব যথার্থই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

স্থলপদ্ম ঃ- নারী জাতির চরম সার্থকতা হল মাতৃত্বলাভে। সন্তান কামনায় কত নারী আত্মসুখ বিসর্জন দিয়েছে। পুত্রকামনার বিধবা বেলে বাউরী ব্যাকুল হয়ে দ্বিতীয়বার সাঙা করেছে হারা বাউরীকে। দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি, কারণ তাদের চাহিদা ছিল ভিন্ন। তাদের প্রেমের বৃক্ষে হারা ফুল চেয়েছিল বেলে চেয়েছিল ফল। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। আর্থিক কারণে অশান্তির ফলে হারা স্থানান্তরী হয় তখন বেলে অন্তঃস্বত্তা। কিন্তু সে সন্তান মাটিতে নামার পূর্বেই মারা যায়। বেলে শ্মশানে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদে ঠিক সেই সময় শহর থেকে হারা হাজার টাকা উপায় করে বহু স্বপ্ন দেখতে দেখতে গ্রামে ফেরার পথে শ্মশানে মৃত্যুপথযাত্রী বেলেকে দেখতে পায়। সন্তান কামনায় বেলের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়েছে; হারা অর্থ রোজগার করে স্ত্রীর আকর্ষণে ফিরে এসেছে মহাজীবনের মহা উপকূলে। উভয়ের মিলন কিন্তু ঘটেনি।

নারী ও নাগিনী ঃ- খোঁড়া সেখ ও স্ত্রী জোবেদার সুখের সংসার। সাপ নিয়ে খেলার করে খোঁড়া। তার বিশ্বাস হয় না যে সাপও পোষ মানে, ভালবাসে। এই বিশ্বাসেই খোঁড়া এক উদয় নাগ সর্পিণীর প্রতি আসক্ত হয়। ঘরে এনে তাকে সিঁদুর পরিয়ে বিয়ে করে, জোবেদার সতীন হয়। দুই সতীনে বনিবনা হয় না, খোঁড়া সর্পিণীকে ভালবাসে, ততোধিক ভালবাসে জোবেদাকে। তাই জোবেদার কথামত খোঁড়া সাপটিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসে। কিন্তু সতীনের প্রতি ক্রোধবশতঃ সর্পিনী মধ্যরাত্রে জোবেদাকে দংশন করে। জোবেদা মারা যায়। জোবেদার মৃত্যু খোঁড়ার চরিত্রে পরিবর্তন আনে। তাই খোঁড়া সর্পিণীকে ধরেও হত্যা করে নি; জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। মানবীয় প্রেমের লীলা মানবেতর জগতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। খোঁড়া দরিদ্র, আদিমতার জগতে বন্দী তবুও সে চেয়েছিল শান্তি। সাপিনীকে সে জোবেদার মত ভালবাসলেও সাপিনী সতীনকে জোবেদা সহ্য করতে পারেনি। নারী জাতির ধর্মই হল সে চায় স্বামীর উপর তার

পূর্ণ অধিকার। এখানে সাপিনী যথার্থ নায়িকার স্তরে উন্নীত হয়েছে। অনেকে এই গল্পটিকে ব্যালজাকের A Passion in the desert-এর সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু হৃদয়াকর্ষণের উভয় ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অমিল আছে অনেক।

ঘাসের ফুল ঃ- 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না; দূরেও ঠেলে দেয়'। নিম্ন বর্ণের মানুষের মধ্যেও হৃদয় আছে, তারাও ভালবাসতে জানে, তারাও জানে উজাড় করে সর্বস্ব দিতে, বিনিময়ে হয়ত অনেকেই ঘাসের ফুলের মত অকালে মূল্যহীন ভাবে ঝরে পড়ে। এই গল্পটি কলিয়ারী অঞ্চলে। কলিয়ারীর লেবার রেজিস্টার বিনোদকে ভালবাসে এক কুলির মেয়ে চুড়কি। সে বিনোদের কাছে গান শুনতে চায়। সে বিনোদকে বলে, "একটি গান তু কেনে বলবি না বাবু? সোবাই তুর গান শুনেছে। আমাকে আমার মাঝি শুনতে দেয় না; বলে কি জানিস-বলে তু বাবুকে ভালোবেসে ফেলবি।" তাই চুড়কি বিনোদের সাথে দেখা করবার জন্যে কলিয়ারীর সুড়ঙ্গ পথে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই পথে হঠাৎ আগুন লাগে। সকলে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করতে থাকে। চুড়কির প্রগল্‌ভতাকে প্রত্যাখ্যান করে বিনোদ। এমন কি বিনোদ জুতোশুদ্ধ পা দিয়ে চুড়কিকে ঠেলে দেয়। অভিমানাহতা চুড়কি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বিনোদ বাইরে বেরিয়ে আসে। সুড়ঙ্গের মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়, নিঃশেষ হয়ে যায় ঘাসের ফুলের মতই চুড়কির নিষ্পাপ জীবন। শুভ্র প্রেমের পরাজয় ঘটেছে স্বার্থপর প্রেমিকের কাছে। চুড়কি তার সব কিছু সমর্পণ করেছিল— বিনিময়ে পেয়েছে হতাশা ও নির্মম মৃত্যু।

মতিলাল ঃ- এই গল্পের নায়ক মতিলাল। গাজনে সঙের ভাল্লুক সেজে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দেয়। যেমনি তার কুৎসিৎ বিকৃত চেহারা তার স্ত্রী ভুবনেরও তেমনি কদাকাররূপ। তাদের দুঃখ যে তারা নিঃসন্তান। সন্তান কামনায় উদগ্রীব হয়ে তারা দৈবমন্ত্রপুত মাদুলী ধারণ করেছে। তাদের বিকৃত রূপের ভিতরে লুকিয়ে থাকে বেদনাময় এক কোমল বাৎসল্য ক্ষুধা। তাই তারা অপরের ছেলেমেয়েদের ভালবাসে। কিন্তু বিকৃত, কদাকার রূপের জন্যেও নীচ বংশোদ্ভূত হবার ফলে পরের ছেলেকে সামান্য স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ অন্যায়ভাবে জোটে লাঞ্ছনা, প্রহার— নিষিদ্ধ হয় গ্রামে প্রবেশাধিকার। তারা কুৎসিত বলে এই আঘাত পেতে হয়-তাই মতিলাল ভাবে যে তাদের সন্তানও এমনি কদাকার হবে এবং অনাদৃত হবে। তাই হাতের মাদুলী ছিঁড়ে ফেলে দেয়। বিড়ম্বিত স্নেহক্ষুধা ও অতৃপ্ত বাৎসল্যের নিরূপায় হাহাকার মতিলাল চরিত্রকে যথার্থই নায়কের মর্যাদা দান করেছে। সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "বিকৃত, কদাকার প্রায় পাশবিক চরিত্রের প্রতি তারাশঙ্করের যে একটি বিচিত্র আসক্তি আছে সেটা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এদের কারো কারো অঙ্গবিকৃতি আছে, কেউ কেউ বা অমিত শক্তিধর। মোটের ওপর, সব মিলিয়ে তাদের জৈবিক বলে মনে হয়। বীরভূমের রোদে-পোড়া কাঁকুরে মাটিতে চলতে ফিরতে ফসিলের টুকরো পাওয়া-যায় আদি পৃথিবীর সঙ্গে আজও যেন তার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নি।" [৯৯] এ প্রসঙ্গে 'সন্তান',' বাবুরামের বাবুয়া' গল্প দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

ডাকহরকরা ঃ- বর্তমান শিক্ষিত সভ্য মার্জিত সৎ বলে জাহির করেও যখন অনেকেই অসৎ পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না, তখন হত দরিদ্র, মূর্খ, পল্লীর অখ্যাত দীনু ডোম (সরকারী রাণার) অভূতপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেয়। পিঠে শত সহস্র অর্থ, বিচিত্র সুখদুঃখের সংবাদ দায়িত্বের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে বয়ে নিয়ে শহরের স্টেশনে গেছে। শ্বাপদসঙ্কুল, ঝড়-বৃষ্টি, চোর-ডাকাতের ভয়কে উপেক্ষা করে উল্কার মত গভীর নিশীথে লণ্ঠন ও বর্শা নিয়ে শহরে গেছে। এক রাতে নিজপুত্র নিতাই মেল ব্যাগ ছিনতাই করতে এলে দীনু ব্যাগ কামড়ে পড়ে থাকে বিনিময়ে পুত্রের লাঠির ঘায়ে মাথা ফেটে যায়। হাসপাতালে চৈতন্য ফিরে এলে পুলিশের কাছে নিজ পুত্রের নাম বলেছে। কর্তব্যরক্ষার জন্যে দীনু পুত্রের আকর্ষণকে জয় করেছে। এই কর্তব্যপরায়ণ দীনু ডোম সুখ, স্বপ্ন, প্রেম ও বাৎসল্য প্রেমকেও জয় করেছে। আবার পুত্রের মৃত্যু সংবাদে ক্ষতবিক্ষত দীনু নিজেকেই দায়ী করেছে— ঘৃণা জেগেছে এই চাকরীতে। তার যখন সবই গেল তখন কি প্রয়োজন আর চাকরীতে। তাই দীনু চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছে।

শ্মশানের পথে ঃ- বস্তুমুখ্য গল্প। অনাবৃষ্টির দাবদাহ— "এ যেন বসুন্ধরার রক্তহীন বিবর্ণ রোগগ্রস্ত দেহ।" হতদারিদ্র্য, দৈন্য-প্রপীড়িত পল্লীজীবন। পাওনাদারদের শোষণ ও শাসন সব মিলিয়ে এক পল্লীর পরিবার নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী। আট বছর বয়সে গোষ্টর সংসারে দামিনী বধূ হয়ে এসেছিল। আজ সে ত্রিশের কোঠায়। দারিদ্র্য যতই বাড়ে, দামিনী গোষ্টকে ততই ভালবাসে কিন্তু দামিনীর জীবনে হাজির হয় প্রতিবেশী অকৃতদার সুবল বোষ্টম। দামিনীকে বউ বলে ডাকে। দামিনী খেলাঘরের সঙ্গী হিসেবে সুবলকে দেখেছে। দামিনী না চাইতেই সুবল তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। দামিনী ভীতা হয় কারণ সুবল তাদের জন্যে এত করছে বিনিময়ে যদি কিছু দাবী করে। দামিনী নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় নি অথচ রাতের অন্ধকারে সুবল দামিনীকে ভোগ করে। এরপর দামিনী লজ্জায়, ঘৃণায় পাথরের মত বসে থাকে। গোষ্ট কখন এসে দামিনীকে গ্রামে বন্যার সংবাদ দিলে দামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "আর কত দেরী—?" দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সুবল দামিনীর সর্বস্ব লুঠ করেছে, তাই মৃত্যুই শ্রেয়। বন্যার সংবাদে দামিনী তাই উল্লসিত হয়েছে। সমগ্র গল্পটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে দামিনী। এই গল্পটি তাই নায়িকা-প্রধান।

বেদেনী ঃ- এই গল্পে শম্ভুবাজিকর তার স্ত্রী রাধিকা কিম্বা রাধিকার প্রেমিকা কিষ্টো বাজিকর স্বকীয় প্রবৃত্তির লীলার দ্বারা চালিত হয়ে নিজ স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। স্রষ্টার দুর্জ্ঞেয় রহস্যলীলা চরিত্রগুলিতে প্রকাশিত। নায়ক-নায়িকা সংসারে প্রচলিত সংস্কার মানে না, তাই শান্ত শৈল্পিক মানসিকতার চরিত্র শিবপদকে নিয়ে রাধিকা সুখী হতে পারে নি। তাই সে, "উগ্র পিঙ্গলবর্ণ উদ্ধত দৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠ দেহ" শম্ভু বাজিকরকে গ্রহণ করে। কিন্তু তাতেও রাধিকার কামনা প্রশমিত হয় না। জৈবিক প্রবৃত্তিতে আসক্তা রাধিকা অনায়াসে শম্ভুকে ত্যাগ করে সমস্ত স্মৃতি বিসর্জন দিয়ে সবল ও দৃঢ় কিষ্টোকে বরণ করে। শম্ভুর জন্যে তার সামান্য করুণাও

বর্ষিত হয় নি এমন কি ঘুমন্ত শিবুকে পুড়িয়ে মারার জন্যে রাত্রে তাঁবুতে কেরাসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় আর "খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়্যা পুড়্যা।" কামনালুব্ধ নারীহৃদয়ের চিরন্তন আদিম প্রবৃত্তিকে লেখক তুলে ধরেছেন এখানে। শুধু আপনার বেগে আপনিই ধাবিত হয় স্বৈরিণী রাধিকা।

যাদুকরী ঃ- অদ্ভুত চরিত্রের নায়িকা যাদুকরী রমণী। সংস্কারহীন, নির্লিপ্ত, নির্বিকার উদার। অপরের দাম্পত্যজীবন যাতে সুখে থাকে তার জন্যে কী অমলিন প্রয়াস, অথচ নিজের ব্যাপারে কত উদাসীন। কনস্টেবলের সম্মুখে সামান্য এক টাকার জন্যে নগ্ন নৃত্য করেছে। তাদের কাছে শশী চোরকে গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে তাকে অদ্ভুত কৌশলে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছে, বিনিময়ে কিছুই চায় নি। শুধু মুখে তার চটুল হাসি ফুটে উঠেছে।

প্রত্যাবর্তন ঃ- জেলে পরিবারের মদ্যপ সৎ ছেলে পশুপতি বাবার অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে পালিয়ে যায়। দেশবিদেশ ঘুরে একদিন ফিটফাট বাবু সেজে ফিরে আসে। সন্ধ্যাবেলায় তারই সম্মানে মদের মজলিসে হয়। সেখানে বিদেশী কায়দায় পশুপতি নাচে এবং বহুপত্নীক বিধবা রমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। বাবা মার অমতে সে তাকে বিয়ে করবে স্থির করে এবং আলাদা ঘর তৈরী করে জিনিস পত্তর কিনতে কলকাতা যায়। যাবার সময় রমা তার হাতে চণ্ডীঠাকুরের কবচ বেঁধে দেয়— যাতে কোন অমঙ্গল পশুপতিকে স্পর্শ করতে না পারে। কিন্তু পশুপতি ফিরে আসেনা। তাই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে নতুন ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে রমা।

কিছুদিন পর খিদিরপুরে লেখকের সঙ্গে পশুপতির পরিচয় হয়। পশুপতি বলে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে রক্ষা পেয়েছে। তার বিশ্বাস রমার দেওয়া কবচই তাকে রক্ষা করেছে। লেখকের কাছ থেকে রমার মর্মান্তিক সংবাদ শুনে কবচটা ছিঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে খালাসির কাজ নিয়ে চলে যায়। সংসার হল না। উচ্ছৃঙ্খল পশুপতির রমার তিনবার বিয়ে হলেও সে বিধবা হয়। পশুপতিকে পেয়ে সে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে ছিল কিন্তু বাস্তবায়িত না হলে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। রমার নীরব প্রেম গল্পটির মধ্যে এক বেদনাঘন সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। আবার বেপরোয়া, হৃদয়হীন পশুপতির চরিত্র শেষ মুহূর্তে প্রেমিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে; পথভ্রষ্ট জীবনে প্রেমের সন্ধান পেয়েও প্রেমিকার মৃত্যুতে পুনরায় নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেছে।

বেদের মেয়ে ঃ- এই গল্পের নায়িকা বেদের মেয়ে শিবি। ভদ্র সমাজের বিত্তশালী শহুরে যুবক প্রভাতকে ভালবাসে। প্রভাত তা প্রত্যাখ্যান করে। তথাপি প্রভাতকে ভুলতে পারে না। তাই '42'এর আন্দোলনে ফেরার হয়ে গ্রামে এলে পুলিশের হাত থেকে প্রভাতকে রক্ষার জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সেই রাতে প্রভাতকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখতে চায়। প্রভাত সে আবেদনে সাড়া দেয় না। প্রভাত চলে যায় ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। শিবি ভোলা ডাকাতকে বিয়ে করে। ভোলা জেলে গেলে শিবি স্বৈরিণী জীবন যাপন করে। দেশ স্বাধীন হবার পর প্রভাত গ্রামে এক নব্য ডাক্তারের বাড়ী বেড়াতে আসে। সেই রাতেই ভোলা ডাক্তারের বাড়ী চুরি করতে গেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘরে আসে। শিবি ভোলাকে প্রভাতকে যেমন লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল ঠিক তেমনি বিছানায় লুকিয়ে রাখে। প্রভাত পুলিশ নিয়ে শিবির বাড়ি সার্চ করতে এলে নিরুপায় হয়ে শিবি প্রভাতকে ছুরি মেরে হত্যা করে। সেই সুযোগে ভোলা পালিয়ে যায়; শিবি জেলে যায়।

শিবি প্রভাতকে অন্তর দিয়ে পেতে চেয়েছিল। জাত-পাত-বর্ণকে উপেক্ষা, করে অথচ ভদ্রবংশীয় প্রভাত তাকে ঘৃণা করে। ফলে ব্যর্থপ্রেমের যন্ত্রণায় বিবিক্ত হৃদয়ে শিবি রিরংশার পাশব প্রবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে ভোলাকে বাঁচাতে প্রভাতকে হত্যা করে জেলে যায়। নারী চরিত্রের বিচিত্র লীলা ও প্রেমের নানা গতিপ্রকৃতি ধরা পড়েছে এখানে, যাতে যথোচিত নায়িকার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে শিবি। "ঘাসের ফুল" গল্পে চুড়কি নীরবে প্রাণ দিয়েছে। এখানে শিবি ব্যর্থ হলে প্রেমিককে নির্মমভাবে হত্যা করে স্বামীকে বাঁচিয়েছে।

এক পশলা বৃষ্টি ঃ- আদিম জীবনের অভিশাপ বুকে নিয়ে মানবিক স্তরে উন্নীত হওয়ার সার্থক চরিত্র জয়া বাউরী। রং কালো হলেও সুন্দরী। ছোটবেলায় মিস্ত্রীদের সাথে কাজ করতে গেলে সে সতীত্ব হারায়। বিবাহিত স্বামীও তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। এরপর সে ধনীকনট্রাক্টর চন্দ্র চৌধুরীর নজরে পড়ে। চন্দ্রকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে চন্দ্র জয়াকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু জয়া রাজী হয় না, অবশ্য চন্দ্রের কাছেই থেকে যায়। চন্দ্র চৌধুরীকে বিয়ে দেয় জয়া। দুই পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রেখে মারা যায় চন্দ্র চৌধুরী। দেশে আকাল নেমে আসে। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জয়া নিজের সব কিছু ব্যয় করে সংসারটাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে তবুও সে ধনী দে বাবুদের সেজকর্তার ডাকে সাড়া দেয়নি। অনাহারে থেকে শেষে জয়া চুরি করার মনস্থ করে। এইভাবে নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সতীত্ব, মাতৃত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে যথার্থ প্রেমের মর্যাদা রেখেছে সে । চন্দ্রকে পূর্ণসত্ত্ব দিয়ে ভালবেসেছিল বলেই তার স্মৃতি বুকে নিয়ে বিরাট দায়িত্ব মাথায় নিয়ে তা পালন করেছে। এখানে মূল ঘটনা প্রবাহকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছে জয়ার নিঃস্বার্থ প্রেম।

সাপুড়ের গল্প ঃ- কালী বেদেনী, বয়স তার ষোল সতের অসাধারণ বুদ্ধিমতী কিন্তু স্বৈরাচারিণী। অসংখ্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না থেকেও তার কামনার বাসনা পরিতৃপ্তি হয় না। "নারী ও নাগিনী"তে খোঁড়া শেখের সাপিনী প্রীতির মতই কালীও এক পুরুষ সর্প (কালীনাগ) কে ভালবাসে। সর্বদা ঝাঁপিতে রাখে। সাপটি একদিন মারা যায়। পথে চলতে চলতে শুশুনিয়া পাহাড়ে আলাপ হয় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। উভয়েই সাপুড়ে, আলাপ থেকে প্রেম। শেষে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে মদ খায়। গাছে হাড়িতে রাখা বিরাট শঙ্খচূড় সাপ। ভৈরব ভৈরবীকে বন্ধ্যার ওষুধ খাওয়াতে চায়। ভৈরবী তাতে আপত্তি করে। ভৈরবী (কালী) ভৈরবের (সন্ন্যাসী) ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে দেয়। মদ খেয়ে সন্ন্যাসী বেহুঁশ হলে কালী তার ক্ষতস্থানে বিষ ঢেলে দেয়। ভৈরব পড়ে থাকে। কালী সাপের হাড়িটি মাথায় নিয়ে চলে যায়। এখানে কালী বেদেনীর আদিম জৈবিক প্রবৃত্তিতাড়িত হিংস্র আচরণ তুলে

ধরা হয়েছে। তার কাছে প্রেম, ভালবাসা সব তুচ্ছ— ক্ষণিকের মোহ মাত্র। ভৈরবের সঙ্গে তার দেওয়া শঙ্খচূড় সাপটাকেও হত্যা করেছে। কালী মা হতে চেয়েছিল। সন্ন্যাসীর কাছে থাকলে এই আশা কোনদিন তার পূর্ণ হবে না জেনেই তাকে ত্যাগ করেছে। শুধু ত্যাগ করেই তার হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত হয় নি, তাই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

একটি প্রেমের গল্প ঃ- গল্পের নায়িকা ফুলমণি। ফুলমণির সঙ্গে সাঁওতাল পাড়ার সর্দার মেঘলাল মাঝির দৌহিত্র বুধনের বিয়ে হয়। ফুলমণি স্বামীকে নিয়ে সুখের নীড় গড়তে চেয়েছিল কিন্তু দুশ্চরিত্র বুধন পালিয়ে গিয়ে হাসি মেঝেনকে সাঙা করে। ফুলমণি প্রতিহিংসায় কাটারি দিয়ে সতীনকে খুন করতে গিয়ে নিজেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কারণ সে ভাবে যে বুধন হাসিকে নিয়ে সুখী হোক নিজেই সে দুনিয়া থেকে সরে যাক। আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধে তার জেল হয়। আশ্চর্য চরিত্র ফুলমণির। নিম্নশ্রেণীর নায়িকা তথাপি কত মহান আত্মত্যাগ, শুধু তাই নয় জেল থেকে ফিরে নব জীবন লাভ করে সে। সে আর বুধনের সংসারে যায় না। নার্সের কাজ করে। একজনকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি, তাই সে দ্বিতীয় বার বিয়ে বা প্রেমের পথে যায় নি। সে গ্রামের বাবুদের ছেলে প্রশান্তকে তার অজান্তে ভালবেসেছিল। সে হয়তো ভেবেছিল প্রশান্ত বিয়ে করেনি কিন্তু যখন সে প্রশান্তর বিয়ের কথা শুনেছিল তখন ফুলমণি স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশান্ত সুখী হোক। তাই সে প্রশান্তর নার্সিং হোমে কাজ করতে চায় নি, দূরেই থাকতে চেয়েছে ফুলমণি। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, **"আদিম সমাজস্তরের আত্মরতিপরায়ণা ফুলমণি প্রেমের স্পর্শে সকলের শুভৈষিণী সেবিকা রূপেই মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।"** (১০০)

ইমারত ঃ- পল্লীবাংলার একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রী জনাব শেখ এই গল্পের নায়ক। সে একজন শ্রেষ্ঠ কারিগর। বেশভূষা, আচরণে বেশ শৌখিন। নতুন সৃষ্টি করার মোহে সদা মগ্ন থাকে। মালিকের ক্ষতি করে না, কম মজুরী নিয়ে সে ভাল কাজ করতে চায়। সে সুদ খায় না, ঘুষ নেয় না, চুরি করে না। কিন্তু তার চরিত্রের একটা অন্ধকার দিক ছিল। দিলদার লোক বলে অসংখ্য রমণীর সঙ্গ করেছে। খোদাতালার কাছে এই কর্ম-গুণাহ জেনেও সে নিজেকে সংযত করতে পারে নি। এই চরিত্রটিতে শিল্পীসত্তা ও লম্পট সত্তার অপূর্ব দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে। শেষ বয়সে শিল্পীসত্তারই জয় হয়েছে। সারা জীবন সে অন্যের ঘর বানিয়েছে কিন্তু নিজের শেষ সময়ে তার মাথার উপর পাকা ছাদ ছিল না, নিজের জন্যে বাড়ি তৈরি করে নি— বটতলাই তার আশ্রয়। খোদাতালার কাছে জনাবের শেষ নিবেদন, **"জনাব আলির জেনার গুনাহ যেন মাফ করেন, আর কোন গুনাহ তার নাই। ঝপ ঝপ করে বৃষ্টি নেমে আসছে। আসুক। জনাব তাকালে মাথার উপরে-বুড়া বটগাছের পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদা তালার নিজের হাতে গড়া ইমারত। সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে এইটুকু ছাড়া।"** শেষ বয়সে শিল্পীসত্তারই জয় হয়েছে। আধ্যাত্মবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে জনাব। দুঃখ, জ্বালা, কামনা, অনটন এসবের উপরে শিল্পের পবিত্রতা স্থায়ী আসন পেয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে দিন কাটিয়েও জনাবের শেষ জীবনে এই যে পরিবর্তন তা এক অর্থে অভূতপূর্ব। **"ইমারত গল্পের নায়কের জীবনের এই পরিণতি তারাশঙ্করের জীবনদর্শনেরই অন্যতম প্রতিফলন মাত্র।"** (১০১)

ডাইনীর বাঁশি ও ডাইনী ঃ- গ্রাম্য কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া অন্ত্যজশ্রেণীর মানবমানবীর জীবন কত অসহণীয়, অসহায় বিকৃত করে তোলে, সেরকমই গল্প দুটি। বীরভূমের তাপদগ্ধ অনুর্বর প্রান্তরের পটভূমিকায় 'ডাইনী' গল্পটি গড়ে উঠেছে। রাধানগরের বেনেদের নিঃসহায় মেয়ে স্বর্ণ। হাটে তরিতরকারি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করত। স্বর্ণ নিজে জানে না অথচ সমাজ তাকে ডাইনী আখ্যায় ভূষিত করে। তাই সে ছোট শিশু টুকুকে ভালবাসতে চাইলেও পায় না। স্বর্ণ এই অপবাদের জন্যে তার মাকে অভিসম্পাত দেয়। গল্পের শেষে অবশ্য স্বর্ণর নিখাদ বাৎসল্য প্রেমের জয় হয়।

কিন্তু 'ডাইনী' গল্পের নায়িকা সুরোধনী। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে রামনগরের সাহাদের আমবাগানে বাস করেছে। পাশেই ভয়াবহ ছাতিফাটার মাঠ। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে যে এই ডাইনী তিন চারখানা গ্রাম ধ্বংস করে অবশেষে গাছ চালিয়ে এখানে বাস করছে। কিন্তু সুরোধনী আজও নিজেকে ডাইনী ভাবতে পারে না। তথাপি অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার সুরোধনীর মানবিক সত্তার মৃত্যু ঘটিয়ে জীবনকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করেছে। সকলের বিশ্বাসকে সেও আজ মেনে নিয়েছে যে সে ডাইনী। মানুষের নিত্য ঘৃণা, সন্দেহ বিদ্বেষের ফলে সে নরদেহরক্ত লোলুপা রাক্ষসী ভাবতে থাকে। তথাপি সে ঈশ্বরের নিকট দিনরাত প্রার্থনা করে **"মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও; আমি তোমারে বুক চিরিয়া রক্ত দিব।"** বুড়ো শিবতলায় সে অঝোর ঝরে সারারাত কেঁদেছিল। তার সামনে বাউরী বধূর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে এক বাউরী প্রেমিকের। গ্রামবাসীরা তাকেই দায়ী করেছে। কেউ তার অন্তরের ব্যথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। শেষে এক প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে তার নির্মম ও শোকাবহ মৃত্যু হয়। পরদিন গ্রামবাসী দেখে যে ছাতিফাটা মাঠের ধারে খৈরীগুল্মের ভাঙা ডালের সুচালো ডগায় বিঁধে ঝুলছে ডাইনী। প্রেম ভালবাসা বঞ্চিত অসহায় দরিদ্র মেয়েদের করুণ কাহিনী এখানে বিধৃত। লেখকও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ডাইনীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। **"অতীতকালের মহানাগের বিষের সহিত ডাকিনীর রক্ত মিশিয়া ছাতিফাটার মাঠ আজ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে।"**

সুরতহাল রির্পোট ঃ- মানুষ দিবারাত সংগ্রাম করে চলেছে, সুন্দরের জন্যে। এই প্রচেষ্টা ও প্রেরণা শুধু শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজেই সীমাবদ্ধ নেই, সমাজের যে কোন স্তরে এই সাধনা চলেছে; কোথাও কম কোথাও বেশী। বাউরী সমাজের চৌকিদারের বউ কড়ি স্বামীপরায়ণা সতীত্বের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা। তার চরিত্রে একটা দোষ ছিল যে কেবল বাজারের সব থেকে বড় ফসলটি চুরি করত। এর জন্যে স্বামীর নিষেধ শোনে নি, স্বামীর অকথ্য নির্যাতন, প্রহার অক্লেশে সহ্য করেছে। এই শাস্তিকে সে যথার্থ প্রাপ্য বলে মেনে নেয়। স্বামীর মৃত্যুর পর সে কামুক পশু হরেরামের কবল থেকে সতীত্ব রক্ষা করতে আত্মহত্যা করেছে। একদিকে চৌর্যবৃত্তির অপরাধ, অন্যদিকে এই অপরাধের জন্যেই হয়তো স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এই ভেবে সে একাকীত্ব অনুভব করেছে। বাঁচতে হয়ত সে

পারত, কিন্তু বিকৃত সমাজের রিরংসা দেখে অনন্যোপায় হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। এই গল্পটিও নায়িকা প্রধান।

এ মেয়ে কেমন মেয়ে ঃ- সত্যই বিশালাক্ষী কেমন মেয়ে। ডোম পরিবারের বধূ হয়েও সে স্বতন্ত্র। অসীম দুঃখ কষ্ট নীরবে সহ্য করেছে। চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ধরা পড়ে তার স্বামী জেলে যায়। স্বামীর আসার পথ চেয়ে সে দিন গুনে চলে। ভ্রষ্ট সমাজে আবির্ভূতা হয়েও অনায়াসে ভোগের সাগরে নিমজ্জিত হতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। সুরতহাল রিপোর্টের নায়িকা কড়ির মতই সতীত্বের ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান দীপশিখা সে।

নারী ঃ- 'রাঙাদিদি' গল্পে দেহ ভোগকে জয় করে সরস্বতী উনমানবের স্তর অতিক্রম করে মানবীয় সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু "নারী" গল্পের নায়িকা নির্মলা দেহের পিপাসা সুতীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষার মধ্যে তৃপ্ত করতে চেয়েছে। বিধবা নির্মলা আশ্রয়দাতার পুত্র রমেনের সান্নিধ্যে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়। মেয়ে হয় কিন্তু অর্থাভাবে মারা যায়। রমেনেরও যক্ষা রোগে মৃত্যু হয়। ফলে আত্মহত্যার চেষ্টায়-পথে পা দেয়, পথে এক ধনী তাকে দেখে ঘরে তোলে এবং ভোগের সামগ্রী করে। সেখান থেকে কিছুদিন পর পালিয়ে গিয়ে হাসপাতালে নার্সের কাজ নেয়, কিন্তু সারাদেহে সম্ভোগ পিপাসার সুতীব্র আকুলতা বহন করে এসেছে। ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে— যে ডাক্তার তার ও রমেনের পূর্ব পরিচিত। এরপর নির্মলা ডাক্তারকে না জানিয়ে হাসপাতালের নার্সের কাজ নেয় ও কয়েকদিন পর বিষপান করে আত্মহত্যা করে। গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক। নির্মলা টাকা পেয়েছিল, গাড়ী, বাড়ী সবই পেয়েও সে বিষপান করল কেন? তাহলে কি নির্মলা ধনীটিকে সহ্য করতে পারেনি? না পারলে কোথাও চলে যেতে পারত কিন্তু মরল কেন? তাহলে কি সে ডাক্তারবাবুকে ভালবেসেছিল? হয়ত হতে পারে। নির্মলা মাতাল স্বামী সহ্য করতে পারত কিন্তু পশুর মত ব্যবহার সে সহ্য করতে পারত না। তাই সে ধনীর আশ্রয় ত্যাগ করেছে। ডাক্তারকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয় বলেই সে আত্মহত্যা করেছিল এবং তার সমুদয় সঞ্চিত অর্থের মালিক ডাক্তারকে করে কোন মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে দান করার কথা চিঠিতে লিখে গিয়েছিল। গল্পের পরিসমাপ্তি নির্মলাকে নায়িকার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

চ. বৈষ্ণবজীবনের নানারূপ

প্রাকচৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগের বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির রচনায় লীলামাধুর্য বর্ণনার মাধ্যমে রাধার পরকীয়াত্ব এদেশে ক্রমপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেন রাজাদের আমলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটলে বৌদ্ধ সহজিয়ামত এদেশে বৈষ্ণবদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। "এইভাবেই বৈষ্ণব সহজিয়া মত গড়িয়া ওঠে।" (১০২) এই বৈষ্ণব সহজিয়াদের একটি শাখা নেড়া-নেড়ী নামে পরিচিত হন— যারা মণ্ডিত মস্তক, বর্ণাশ্রম বিরোধী ও নারী পুরুষে অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী। আউল নামে আর এক সম্প্রদায় ধর্মে মুসলমান, তথাপি সাধন পদ্ধতিতে বাউলদের সঙ্গে তাদের অনেক মিল আছে। এরপর বাউল সম্প্রদায়। বাউলদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এইভাবে স্থান নির্দেশ করেছেন—

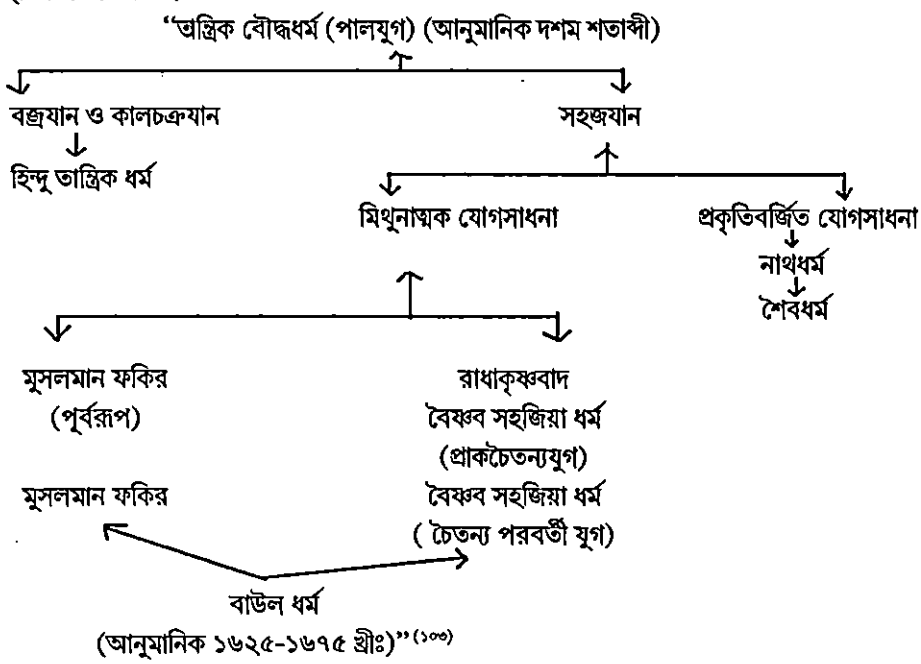

বাউল শব্দটি 'বাতুল' থেকে উদ্ভূত বলে অনেকের ধারণা। এদের পদবী কোন কোন অঞ্চলে ছিল 'ক্ষেপা'। অদ্বৈতাচার্যকে গুরু বলে মান্য করে তারা ঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুধর্মের লোকই আছে। হিন্দুরা বাউল ও মুসলমানগণ ফকির নামে পরিচিত।

আর একটি সম্প্রদায় আছে তাদের নাম কর্তাভজা। এদের গুরু আউল চাঁদ। "এই সম্প্রদায়ের সাধনার ক্ষেত্রে জাতি-বিচার নাই। বাউলদের মতো অধ্যাত্ম সংগীতই ইহাদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ।" (১০৪) গুরু সিরাজ সাঁই ও লালনের নির্দেশিত

সম্প্রদায় সাঁই নামে খ্যাত। আবার দরবেশ সম্প্রদায় সনাতন গোস্বামীকে আদিপুরুষ বলে মানে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকে উদ্ভূত অথচ নিজকর্মগুণে বিতাড়িত হয়ে পৃথক সম্প্রদায়ের নাম চূড়াধারী সম্প্রদায়। বৈষ্ণবসমাজ থেকে এরা সম্পূর্ণ পৃথক। "বৃন্দাবনে চূড়াধারীদের কুঞ্জ আছে।" (১০৫)

জাতগোঁসাই নামে আর এক গোত্রহীন হিন্দু ও বৈষ্ণবীয় আচার বিবর্জিত সম্প্রদায়আছে। এদের গুরুগণ অধিকারী নামে পরিচিত। এরা মৃতদেহ সমাধিস্থ করেন; মৃতের পারলৌকিক কৃত্যাদি অনুষ্ঠান করেন না।

"সখীসম্প্রদায় ঃ- এঁদের পুরুষরা নারীবেশ ধারণ করেন। সখীভাবে সাধনা করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক চরণ দাস।" (১০৬)

অতি বড়ী সম্প্রদায় ঃ - উৎকল থেকে এই সম্প্রদায় উদ্ভূত। সাধকগণ কৌপিন ও ডোর পরিধান করেন। নাসাগ্র থেকে কেশের কাছ পর্যন্ত ঊর্ধ্ব পুণ্ড্র করে থাকেন এবং নানা বর্ণ ও জাতির মধ্যে দীক্ষাদান করে থাকেন।

মহাপ্রভুর প্রায় সমসাময়িক কালে উৎকলে পঞ্চসখা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এছাড়া কিশোরীভজন, গুরুপ্রসাদী, হরিবোলা, নাথভায়া, যুগলভজন, অদ্বয়বাদী, আশ্রমরোধী সেবাপরাধী, বৈষ্ণবাপরাধী, ধামাপরাধী দাদা ও মা, হরিদাস, রামবল্লভী, খুশীবিশ্বাসী, রাতভিখারী প্রভৃতি সম্প্রদায় বিদ্যমান।

বর্তমানে দুশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়— একদল হল বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত বৈষ্ণব, অন্যদল হল জাত বৈষ্ণব।

নান্নুর ও কেন্দুবিল্ব বীরভূমের বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। রাঢ়ের আখড়া পরিকীর্ণ সিদ্ধ বৈষ্ণব জীবন পরিবেশের বহুমুখী পরিচয় দিয়েছেন তারাশঙ্কর। রাঢ়ের সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের জীবনে রূপানুরাগ ও নরনারীর বন্ধনহীন মিলন, বিচ্ছেদ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। বাউল বীরভূমের লোক সংস্কৃতির এক মহামূল্য সম্পদ। এরা আজও সরস আলাপ আলোচনা করে গৃহস্থের সঙ্গে, একতারা নিয়ে মাধুকরী করে পেট ভরায়। আজও এখানে বৈষ্ণবগণ কপালে তিলক, গলায় তুলসী কাঠের তৈরী মালা ও শিখা রাখে; মেয়েরা চুড়ো করে মাথার চুল বাঁধে। "যেদিন শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনের অনেককাল পূর্ব হইতে এ অঞ্চলটিতে মানুষেরা ধীর সমীরে যমুনার তীরে যে বাঁশি বাজে তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে।" .....সকলের মালা তিলক ধারণ করে, হাত জোড় করিয়া কথা বলে, প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে। ভিখারীরা "রাধেকৃষ্ণ" বলিয়া দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়, বৈষ্ণবরা খোল করতাল লইয়া আসে, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীরা একতারা খঞ্জনী লইয়া গান গায়— পুত্রশোকাতুরা যশোদার খেদের গান। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব আখড়ায় পদাবলী গান হয়। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সংকীর্তন হয়। ঘরের খাড়া বারান্দায় ঝুলানো এদেশী শালিকপাখি 'রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরাধা গোপীভজ' বলিয়া থাকে।" (১০৭) তারাশঙ্কর এই বৈষ্ণবদের চালচলন, জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার রীতিনীতি ছেলেবেলা থেকেই খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন এবং দেখার সামগ্রীকে গল্পে হুবহু রূপ দিয়েছেন। তারাশঙ্কর বাস্তবতার মধ্যে অবগাহন করেই রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন— "সাহিত্য আমার কাছে চায়ের পেয়ালার মত অবসর ও ক্লান্তি বিনোদনের পানীয় সামগ্রী নয়, সে আমার কাছে প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনী সুধা।" (১০৮) রাইকমল, রাধা, স্বর্গমর্ত প্রভৃতি উপন্যাসে এর অনেক নিদর্শন আছে। বীরভূমের মল্লারপুরের অধুনা লুপ্তপ্রায় ঝুমুর দল ও বৈষ্ণবীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত। তাঁর রসকলি গল্প সেই অতিচেনা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কাহিনী, "জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস, কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্ম খুঁজে পেয়েছে।" (১০৯) ছোট গল্পে তারাশঙ্করের বাস্তবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন— "তোমার (তারাশঙ্কর) স্থূলদৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে, কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমর বাঁধার ভান নেই। গল্প লিখতে বসে গল্প লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।" (১১০)

তাঁর বৈষ্ণব প্রধান গল্প লেখার পশ্চাতে রাঢ়ের পল্লীগ্রামের গৃহস্থ বৈষ্ণব সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রা তুলে ধরার প্রবণতাই ক্রিয়াশীল ছিল। তারাশঙ্করের 'রাইকমল'-এর কমলিনী, 'মালাচন্দন' এর তুলসী, 'রসকলি'র মঞ্জুরী চরিত্রধর্মে তিন সহোদরা কিন্তু শীলধর্মে তারা সকলেই স্বতন্ত্র। নিম্নবর্গের বাসিন্দা হয়েও সামাজিক অনুশাসনে তারা বন্দিনী, বাঁধনহারা যৌন উল্লাসে তারা মত্ত নয়। তাই তো 'রসকলির' মঞ্জুরী যৌবনেই বৃন্দাবনের পথে পা দিয়েছে। 'মালাচন্দন' এর কমলিনী কামনার আসক্তিকে জয় করে গ্রামেই থেকে গেছে। 'হারানো সুর'- এর গিরি শেষে স্বামীর কোলে মাথা গুঁজে থাকে। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান-অভিমান ভরা সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবদের জীবনচর্যাকে তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। লাভপুরের সন্নিকটে 'গোগা' গ্রামে চৈতন্যদেব পদধূলি দিয়েছিলেন এ তথ্য আমাকে বলেছেন ঐ গ্রামেরই প্রণব দাস মহাশয়। এই গ্রামে বর্তমানে আখড়াও রয়েছে।

রসকলি ঃ—এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রেমের গল্প। এটিই তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে বলেছেন যে, নিজমহলের এক নিবিড় পল্লীগ্রামে ছোট নদী (ডাহুকী) তর তীরে বটগাছ। সামনেই এক ছায়া সুনিবিড় আখড়া। "গ্রামের লোকে বলে কমলিনীর আখড়া, রসিকজন রসান দিয়ে বলে কমলিনীর কুঞ্জ।" (১১১) সেখানে মাথায় রাখালচূড়া বাঁধা এক শ্যামবর্ণা মেয়ে ঘোমটা দিয়ে রেকাবি করে পান, লবঙ্গ, দারুচিনি নিয়ে এসে প্রণাম করে বলে "প্রভুর জয় হোক"। তারাশঙ্কর একটু সরে যেতেই গোমস্তা বলে, "পানের চেয়ে বৈষ্ণবীয় হাসি মিষ্টি।" সবিনয়ে বৈষ্ণবী হেসে বলে, "বৈষ্ণবের ওই তো সম্বল প্রভু"। "এই তো, এই তো সেই জীবনের জয়।" এরপরই আসে পাগলা বৈরাগী পুলিন দাস। সে সর্বদা কমলিনীর আখড়ায় থাকে। কমলিনী তাকে বাড়ী যেতে অনুরোধ করে না গেলে বোষ্টুমী রাগ করবে বলে। ছড়া কেটে বলে "পাঁচ সিকের বষ্টুমী তোমার গোসা

করেছে হে, গোসা করেছে। পত্তন হলো রসকলির। তারাশঙ্কর লিখেছেন, "গল্প পেলাম। আমার নায়িকা মঞ্জুরী, জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটে উঠল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জুরীই ফুটল না-আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম।" (১১২) ময়ূরেশ্বর থানার লোকপাড়ার কাছে ডাহুকী নদীর ধারে বেলেড়া গ্রামের আখড়াটি এবং বাউন্ডুলে ক্ষ্যাপা পুলিন জীবন্ত হয়ে তারাশঙ্করের অমর কলমে "রসকলি"র আধারে বাঁধা পড়ল। "এই গ্রামেরই ফুল্লরাপদ ওঝা মেয়ে সেজে মঞ্চে অভিনয় করতেন এবং তিনি ছিলেন তারাশঙ্করের স্নেহধন্যদের অন্যতম। প্রয়াত ফুল্লরাপদ ওঝার মুখ থেকেই অনেকে শুনেছেন, "রসকলি" রচনার রাত্রে ওঝা মহাশয় লেখকের সঙ্গে ওই গ্রামে রাত্রিযাপন করেছিলেন। একথা তিনি বলতেন বেশ গর্বের সঙ্গেই।" ১১৩

রামদাসের পোষ্যপুত্র পুলিন মঞ্জুরীর সাথে 'রসকলি' পাতায়। তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়। কিন্তু রামদাস রাজী হয় না। কারণ মঞ্জুরীর মা ভেকধারী বৈষ্ণব, পূর্বে ধোপা ছিল। অথচ রামদাস জাত বৈষ্ণব। আকস্মিক ঘটনার বিপর্যয়ে আর এক বৈষ্ণব কন্যা গোপিনীর সাথে পুলিনের বিয়ে হয়। পুলিন মঞ্জুরীকে ভুলতে পারে না, সে রোজ মঞ্জুরীর আখড়ায় যেতে শুরু করে। পুলিনের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মঞ্জুরী পুলিনকে প্রশ্রয় দিয়ে গোপিনীর জীবনে কোন ক্ষতি করেনি। পুলিনের তীব্র আকর্ষণ লক্ষ্য করে গোপিনীর দুঃখ দূর করতে, গ্রাম্য কুৎসার নিবৃত্তি করতে, সেই সঙ্গে গোপিনীদের দাম্পত্য জীবন সুখের করতে পুলিনকে গোপিনীর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যৌবন বয়সেই বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ায়। নাকে রসকলি মুখে অমলিন হাসি, চলনে অজানা হিল্লোল, সর্বাঙ্গে উদ্বেল রসধারা নিয়ে মঞ্জুরী সকলকে নিয়ে গ্রামে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু গোপিনীর বিষ, পুলিনের উদগ্র কামনা, জমিদারের লালসা, গ্রাম্য কুৎসার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে বৃন্দাবনে চলে যায়। যাবার সময় গান গায়—"

"লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী সখি।
সেই গরবে আমি গরবিনী গো, আমি গরবিনী।"

মঞ্জুরীর প্রেম দেহাতীত সৌন্দর্যের প্রেম, রাধার প্রেমের সমতুল্য। রসকলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তারাশঙ্করকে লিখেছিলেন, "যে সব চরিত্র এঁকেছ তা সজীব হয়ে উঠেছে, তাদের নিয়ে যে খেলা খেলিয়েছ মনের মধ্যে সে ছাপ দিয়ে যায়, রেশ রাখে।" (১১৪) বিদেশী সমালোচক পিয়ের ফালোঁ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন, "তাঁর (তারাশঙ্করের) গল্পগুলির বিভিন্ন চরিত্র এত প্রাণবন্ত যে, পাঠকস্টাইলের কথা ভুলে গিয়ে কাহিনীর স্রোতে ডুব না দিয়ে পারেন না।" (১১৫)

হারানো সুর ঃ- এই গল্পটি গৃহস্থ বৈষ্ণবদের জীবনকাহিনী। সংসারী জীবনযাপন করলেও তাদের চালচলন, রীতি-নীতি - মাধুকরী, সমাধি প্রভৃতির মধ্যে নিজস্বতা বিদ্যমান। ননীগোপাল ও গিরি উভয়ে স্বামী ও স্ত্রী, গল্পের নায়ক- নায়িকা। ননীর চরিত্র সর্বদা মধুর অপেক্ষা মাধুর্যকে আকর্ষণ করে। তাই শৈশব থেকেই কৃষ্ণের মত বাঁশি বাজিয়ে সে দিন কাটায়। কিন্তু এই উদাসীর ঘরে আসে বাল্যে বিবাহিতা স্ত্রী গিরি। সংসারে অভাব, অনটন অথচ স্বামীর বাঁশিতে অনুরাগ দেখে গিরির অসহ্য হয়ে ওঠে। রান্নার সময় কাঠের অভাবে ও মনের জ্বালায় গিরি ঘরের চালে গোঁজা ননীর প্রিয় বাঁশির গুচ্ছ উনুনে পুড়িয়ে দেয়। সংসারে শুরু হল নতুন করে বিরহ। ননীর জীবনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। সে ভবঘুরে বৃত্তি ত্যাগ করে বাঁশি বাজানো বন্ধ করে এক নিপাট গ্রাম্য চাষী হয়ে ওঠে। সংসারে স্বচ্ছলতা আসে কিন্তু একঘেয়েমি জীবনযাত্রায় গিরি চঞ্চলা হয়ে ওঠে। গিরি গান ভালবাসত না ঠিকই তথাপি সে মানুষ— সেও আনন্দ চায়, চায় প্রেম উচ্ছ্বাস অথচ ননী সম্পদ সংগ্রহে পাগল। তাই গিরি মাঝে মধ্যে গাঁয়ে কীর্তন শুনতে যায়। ননী সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। স্বামীর নীরস জীবনযাত্রায় গিরি বীতশ্রদ্ধ হয়। ননী সকালে মাঠে যায় ফেরে সেই সন্ধ্যাবেলায়। একদিন যাত্রাপালার অভিনেতা কড়ি (ননীর বাল্যবন্ধু) ননীর বাড়ীতে বেড়াতে আসে। গিরিকে একা পেয়ে তার কামুক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। শয়তানের লোলুপ লালসার হাত থেকে বাঁচতে গিরি বঁটি নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে কড়ি পালিয়ে যায়। গিরির মৃত্যু কামনা জেগে ওঠে। হঠাৎ গিরির মা কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা কালে গিরির বাড়ীতে রাত কাটায়। গিরি মায়ের সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবার মনস্থ করে। সে ননীর নিষেধ শোনে না। গভীর রাতে একাকীত্বের যন্ত্রণায়, বেদনার আঘাতে বিমর্ষ ননী মনকে শান্ত করতে আবার বাঁশি বাজায়, ফিরে আসে হারানো সুর। বাঁশির সুর শুনে উদ্ধত গিরি বৃন্দাবনযাত্রার কামনা ত্যাগ করে স্বামীর কোলে মাথা রেখে তীর্থের সাজ খুলে ফেলে সব অভিমান ভুলে সে গান গায় "এই তো আমার তীর্থ, মধুর মধুর বংশী বাজে, এই তো বৃন্দাবন।" "এই গল্পে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের সুর- সংগীতই দাম্পত্য প্রেমের উদ্দীপনে ক্রিয়াশীল হয়েছে।" (১১৬)

ননী জগৎ-জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও গিরিকে সুখী করতে সে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বলি দিয়েছে, পুরোদস্তুর সংসারী হয়েছে। কিন্তু গিরি এতখানি ভাবে নি, সে চেয়েছিল স্বচ্ছল সংসার সেই সঙ্গে দাম্পত্য প্রেম। তাই ননীর মধ্যে আবার সেই অতীতের আনন্দঘন চিত্তের পুনরাবৃত্তি ঘটার সাথে সাথে গিরি বৃন্দাবনে যাবার বাসনা ত্যাগ করে স্বামীর কোলে মাথা রেখেছে।

রাইকমল ঃ- এই গল্পটির প্রথম নাম ছিল 'স্বৈরিণী'। 'কল্লোল'— এর অচিন্ত্যবাবু নামটির পরিবর্তন করে 'রাইকমল' করে প্রকাশ করেন। এই 'রাইকমল' গল্পটি প্রকাশিত হবার পর একখানি বই তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। গল্পটি পড়ে কবি তারাশঙ্করকে চিঠি লিখে জানান, "রাইকমল গল্পটির রচনায় রস আছে এবং জোর আছে, তাছাড়া এটি ষোল আনা গল্প, এতে ভেজাল কিছু নেই। পাত্রদের ভাষায় ও ভঙ্গীতে যে বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল সেটি ভোলা সহজ নয়।" ১১৭

ছোট্ট আখড়া, চারদিকে গাছপালায় ঘেরা সেখানে দুটি প্রাণী বাস করে মা কামিনী ও কন্যা কমলিনী। আখড়ার পাশেই থাকে প্রৌঢ় রসিকদাস বাউল। গ্রামের হরি মোড়লের ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে কমলিনীর পরিচয় গভীর থেকে গভীরতর হয়। তারা উভয়ে বর-বধূর স্বপ্ন দেখে। রঞ্জনের পিতামাতা রাজী হয় না। রঞ্জন শেষে জাত খোয়াতে উদ্যত হয়। এদিকে কামিনী কমলিনীকে নিয়ে

নবদ্বীপ চলে যায় সঙ্গে যায় রসিকদাস। নবদ্বীপে কামিনীর মৃত্যু হলে কমলিনী রসিকদাসকে মালাচন্দন করে। বাসরশয্যায় বৃদ্ধ রসিকের মধ্যে জেগে ওঠে আদিম বুভুক্ষা, কিন্তু কমলিনীর কাছে পরাজিত হয়। দুজনার হৃদয়ই চঞ্চল হয়ে ওঠে। গৃহবাস অসহ্য মনে হয় কমলিনীর কাছে। তাই দুজনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে পথে, চলতে চলতে আসে নিজেদের সেই গ্রামে।

এদিকে হরিমোড়ল রঞ্জনের অন্যত্র বিয়ে দেয়। গাঁয়ে আসতেই রঞ্জনের সঙ্গে কমলিনীর সাক্ষাৎ ঘটে। রসিকের কামনার আগুন থেকে বাঁচতে কমলিনী গ্রামে আসে কিন্তু এখানেও সে রঞ্জনের মধ্যে লক্ষ্য করে এক আদিম ভোগস্পৃহা, কমলিনী মনে মনে বলে, "এতো কোমল কিশোরটি নয়, নয়নের কোলে সে আনন্দ তো নেই। এযে সবল যুবা—পাথরের মতো বুক, দৃঢ়বাহু, নয়নে উগ্র ক্ষুধা। নারীর দৃষ্টি আরও দেখিল-ওই বুকের অন্তরালে সুধার সন্ধান তো মেলে না,— তীব্র বিষ-নীল সে হৃদয়।" অর্থাৎ কমলিনী সর্বত্রই দেখেছে উদ্দাম নগ্ন দেহজ ক্ষুধা, কোথাও নির্মল শুভ্র প্রেম নেই, সকলের নিঃশ্বাসে যে বিষ। তাই সে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়েছে আখড়ায় প্রায়ই কমলিনীর কাছে রঞ্জনকে দেখে অসহ্য হয়েছে রসিকের। তাই সে অভিমানে একদিন বিষ পান করে। আখড়ার কুঞ্জতলে মহন্তকে সমাধি দিয়ে সেখানেই থেকে যায় কমলিনী। রঞ্জন আর আসে না। বৈষ্ণবদের জীবনে ধর্মীয় সাধনার স্পর্শ আছে বলেই তারা অনেক ক্ষেত্রেই মার্জিত ও পরিশীলিত। যখনই তারা উদ্দাম হয়ে উঠতে চায় তখন বিবেক ও সংস্কার তাকে ক্ষতবিক্ষত করে। তাই রসিকের জীবনে কামনা বিষের জ্বালায় উত্তাল হয়ে উঠলেও বিবেকের দংশনে তার চিত্তে অপরাধবোধ জেগেছে। বৈষ্ণবদের সামাজিক জীবনের বন্ধন দৃঢ় নয়, তাই বৃদ্ধ রসিক ষোড়শী কমলিনীকে সহজেই মালাচন্দন করেছে, আবার রঞ্জনের সঙ্গে কমলিনীর মেলামেশা সহ্য করতে পারে নি রসিক, তাই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। মহন্তের সমাধিতে সন্ধ্যায় দীপ জ্বেলে কমলিনী প্রত্যহ কীর্তন গায়, হেসে উপেক্ষা করে গ্রামবাসীর নিন্দা। সবাই তাঁর ঠোঁটের হাসি দেখে জ্বলে, তা উপেক্ষা করে কমলিনী গান গায়, "বড় ভালবাসি আমি-কলঙ্কিনী নাম গো, কলঙ্কের তরে আমি হারাই কি শ্যাম গো"।।

"মুখে তার মধুর হাসি, চোখে তার আনন্দ, কোনো অসূয়া নাই, আক্ষেপ নাই, এলানো চুল।" বৈষ্ণবীয় জীবনের সহজ প্রেম চিত্র প্রণয় সুরভিত কাহিনী সরলভাবে বিধৃত হয়েছে। লেখকের মনোভাব এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গোপিকানাথ বাবু বলেছেন, "সহজিয়া বৈষ্ণবের জীবনে আধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে জৈব বাসনার যে নিগূঢ় সম্পর্ক এবং অন্তর্গূঢ় দ্বন্দ্ব থেকে উত্তীর্ণ হবার যে আন্তরিক অভীপ্সা—তারই এক জীবনধর্মী আলেখ্য রচনা করতে চেয়েছেন লেখক।" (১১৮) 'রাইকমল' ও 'মালাচন্দন' গল্পদুটিকে একত্রে গ্রথিত করে "রাইকমল" উপন্যাস হিসেবে পরে প্রকশিত হয়।

প্রসাদমালা ঃ- এই গল্পটিতে বৈষ্ণবতা আছে। স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝিই মূল উপজীব্য। "গ্রাম্য জীবনের সংস্কার রক্ষিত জীবন যাত্রার মধ্যে যে সম্পর্কের উন্মেষ, নতুন যুগের অর্থগৃঢ়তা, আত্মীয়তার মর্যাদানাশী, সর্বগ্রাসী লোভ ও নারীর হঠাৎ উদ্রিক্ত ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের জন্য তাহার উন্মূলন।" (১১৯) হরিমোড়ল অর্থলোভী, সম্পত্তির লোভে এমন কি দেহের লোভে বিধবা চিত্ত কালীর কন্যা পাঁচ বছরের ললিতার সঙ্গে নিজপুত্র গোপালের বিয়ে দেয়। চিত্তকালীর একমাত্র সন্তান হিসেবে ললিতা মায়ের মৃত্যুর পর সমুদয় সম্পত্তির মালিক হত কিন্তু হরিমোড়লের ধৈর্য রইল না। তাই কৌশলে চিত্তকালীকে সর্বস্বান্ত করে ভিটে ছাড়া করে। চিত্তকালী কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। গোপাল বাড়ী ছেড়ে কীর্তন দলে যোগ দেয়। কলেরায় স্ত্রীপুত্রকে হারিয়ে সন্তানব্যাকুল প্রেমদাস গোপালকে পুত্রসম পালন করে। হরিমোড়লের মৃত্যু হয়। গোপাল স্ত্রীর সন্ধানে কলকাতায় যায় এবং ললিতাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে কিন্তু শহরে ললিতার গ্রাম্য জীবন ভাল লাগে না তাই গৃহত্যাগিনী হয় কারণ সে বিলাসিনী। দেবতায় বিশ্বাসী সুন্দরের আকর্ষণে পাগল গোপাল দ্বিতীয়বার সংসারী না হয়ে কীর্তনের দলে যোগ দেয়। বিরহের পর্যায়ে গোপাল সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক হয়। নবদ্বীপে এক কীর্তনের আসরে ডাক আসে। গোপালকে মিলনের গান গাইতে বলা হয়। গোপাল গাইতে পারে না তাই তাকে হেনস্থা করা হয়। গোপাল দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গোবিন্দকে স্মরণ করে মিলনের পর্যায় শুরু করলেও ললিতার ছবি ভেসে ওঠে তাই মনের দুঃখে একাকী গঙ্গার তীর ধরে চলতে থাকে। পাশেই পতিতাদের আশ্রমে গিয়ে গোপাল ফিরে পায় ললিতাকে। ললিতা বিগ্রহের জন্যে গাঁথা মালা পরিয়ে দেয় গোপালের গলায়। মালা পড়ে গোপাল মিলনে পর্যায়ে গান গেয়ে জয়ী হয়। দাম্পত্য জীবনের মিল হল। গ্রামে বিবাহ ও বিচ্ছেদ অথচ বৈষ্ণব প্রেমাবসিত আসরে মিলন হয়েছে। এক্ষেত্রে গোপালের চরিত্রের মহানুভবতা ধরা পড়েছে। দেহের থেকে দেহাতীত সৌন্দর্যই গোপালের কাছে বড় হয়েছে। সার্থক বৈষ্ণব আশ্লিষ্ট চরিত্র। আবার বিলাসিনী ললিতার জীবনেও ভোগের প্রতি তীব্র অনাসক্তি দেখা দিয়েছে। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। তাইতো বিগ্রহ অপেক্ষা মানুষ বিগ্রহই তার কাছে বড় হয়েছে।

মালাচন্দন ঃ- রাইকমলের কমলিনী সুন্দরের আরাধিকা আর মালাচন্দনের তুলসী ভোগের বাসনায় পাগলিনী। তাই তুলসী কাদুকে বলেছে, "ঠাকুরকে ভক্তি করা যায় কিন্তু ভালবাসা যায় না ভাই, এ আমি বেশ বুঝেছি। কাদু। রূপ যে ভোগ করতে পারে না, রূপের পূজো তার পাওনা নয়।" জাত বোষ্টমের ঘরের তুলসীর ন বছর বয়সে বাবা মারা যায়। মা বহু কষ্টে তাকে মানুষ করে— দশ বছর বয়সে তার বিয়ে দেয়, কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। তথাপি ভেকধারী নয় বলে আর মালাচন্দন করেনি। সুন্দর কণ্ঠ ছিল তুলসীর। গান গেয়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। জয়দেব কেঁদুলীর মেলায় যাবার সময় মোহন দাসের সাথে পরিচয় হয়। দেশে ফিরে তারই সাথে তুলসীর মালা চন্দন হয়। স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখে এক জীর্ণ ক্ষীণা সতীন গৌর ভামিনীকে। কিছু দিনের মধ্যে ভামিনীর মৃত্যু হয়। তুলসী স্বামীর ঘর করতে থাকে সে । হঠাৎ মোহন দাস আরেক জন বৈষ্ণবী নিয়ে আসে। তুলসী তা সহ্য করতে না পেরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে করতাল আর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেয়। তুলসী অবয়বে বিশ্বাসী ছিল,

সে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার পেতে চেয়েছিল। তা পায়নি বলেই অভিমানে দগ্ধা তুলসী দেহ কামনার ঊর্ধ্বে গমন করেছে। জীববৃত্তির সোপান অতিক্রম করে প্রেমের জয় হয়েছে তার জীবনে।

সর্বনাশী এলোকেশী ঃ- গল্পের নায়ক বলরাম। সে উচ্ছৃঙ্খল বৈষ্ণব— মদ ও মাংস খায়। বিশাল শরীর, ঘোর সংসারী অথচ অকৃতদার— স্থানান্তরে বৈষ্ণবদের মৃতদেহ সৎকার করে বেড়ায়। গ্রামের শেষে সে একটি দোকান করে, তার পাশে একটি হেনা গাছকে দেহের ও মনের জারকরসে বড় করে হঠাৎ একদিন এক কঙ্কালসার বাছুর গাছটিকে প্রায় শেষ করে দিলে তন্দ্রাচ্ছন্ন বলরাম হিতাহিত জ্ঞান ভুলে বাছুরটাকে প্রহারে জর্জরিত করে। জমিদারের বাছুর বলে বলরামকে জরিমানা দিতে হয়। অর্ধমৃত বাছুরটাকে ঘরে এনে সে বড় করে। এরপর বলরাম অন্য মানুষ হয়ে যায়। বাছুর, গাছপালা ইত্যাদি পরম যত্নে পালন করতে থাকে। এদিকে দেশ জুড়ে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। অর্থশালী বলরাম জলসত্র খোলে, পুকুর কাটায় আর অবসর সময়ে বাছুর এলোকেশীকে সন্তান সম ভালবাসে। এলোকেশীও তার গা চাটে। গ্রামের স্বার্থপর হিংসুক ব্রাহ্মণ বেশী শয়তানের দল তাকে সহ্য করতে পারত না, সর্বদা অভিশাপ দিত। অথচ তার উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি লোভের অন্ত ছিল না। গল্পের শেষ পরিণতিতে বলরামের কুষ্ঠ ব্যাধি হয়, সকলে তাকে ঘৃণা করে। গ্রামের জলকষ্ট দূর করতে বলরাম পুকুর কাটায় কিন্তু পুকুর কাটিয়েও জল পাওয়া যায় না। সকলে বলে সবই বলরামের পাপের ফল। তাই ক্ষতবিক্ষত বিমর্ষ ব্যথিত বলরাম সবকিছু ত্যাগ করে গলায় ফাঁসি দিয়ে প্রাণ দেয়; এলোকেশী একা দাওয়ায় বসে তার দেহ চাটে। বলরাম নাস্তিকের মত জীবনযাপন করলেও তার হৃদয় ছিল, ছিল প্রেম, প্রীতি, মায়ার অপরূপ মাধুর্য। তাই এলোকেশীকে অর্ধমৃত করার পর তার চরিত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। সে বাছুরটার জন্য জমিদারকে জরিমানা দিয়েছে কিন্তু বাছুরটাকে ছাড়েনি। বাছুরটাকে শুশ্রূষার দ্বারা মৃত্যুর কাছ থেকে ফিরিয়ে আনে। হৃদয়হীন জল্লাদসম বলরামের চরিত্র চকিতে পরিবর্তন করে রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে উত্তরণ ঘটিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাই জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, **"সমাজের অনাবিষ্কৃত মহল থেকে অসংখ্য অদ্ভুত চরিত্রের বিরাট মিছিল সাজিয়েই তিনি বাংলার কথাসাহিত্যে নব নব বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। বলরাম বৈরাগী তাদেরই আদি পুরুষ।"** (১২০)

রাধারাণী ঃ- যাত্রাদলের সঙ্গে গ্রাম্য এক বৈষ্ণব পরিবারের সুখ ও দুঃখের কাহিনী। একদল পালাগান করতে আসে গ্রামে। বাঁড়ুজ্জে বাড়ীতে প্রতিবছর রাসযাত্রায় দলের বায়না বাঁধা হয়ে যায়। একবার গানের সময় যাত্রাদলের ম্যানেজারের পুত্র গৌরচন্দ্র দাসের সাথে গ্রামেরই এক আখড়ার বৈষ্ণবের কন্যা রাধারাণীর বিয়ের যোগাযোগ হয়, গৌরচন্দ্র তারপর প্রায়ই আখড়ায় গিয়ে রাধার সঙ্গে দেখা করে। শুরু হয় প্রেমের পূর্বরাগ। কিন্তু জানা যায় যে গৌর বৈষ্ণবসন্তান নয়, তার মা বারাঙ্গনা ছিল। তাই এই বিয়ে হয় না।

দিন চলে যায়। গৌর তখন যুবক, দলের মূল গায়েন। একদিন তার দল গান গাইতে আসে সেই রাধার গাঁয়ে। পথ চলতে চলতে রাধাকে মনে পড়ে তার, গৌরচন্দ্র সরু গলির মাঝে রাধাকে দেখতে পায়। রাধা তখন অন্যের ঘরণী, স্থূলাঙ্গী, সন্তানের জননী। রাধার জন্য গৌরের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু হৃদয়ের কামনায় জর্জরিত আকুলতাকে দুর্দমনীয় ভাবে দমন করে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে যে, রাধাকে না পেলেও সে রাধারাণীকে পেয়েছে। অর্থাৎ জৈবিক প্রবৃত্তিকে জয় করে সৌন্দর্যের সন্ধানে পাগল গৌর ধীরে ধীরে রাধার গ্রাম ত্যাগ করেছে। আবার রাধার শৈশবের সেই পূর্বরাগ বর্তমানে সে সংসারী হয়েও প্রশমন করতে পারে নি, তাই অপরের গৃহিনী হয়েও গৌরের কীর্তনের সুর তার কর্ণে প্রবেশ করে উতলা করেছে তার মনকে।

সাবিত্রী চুড়ি ঃ- আধপাগলা নিরক্ষর গোবিন্দ বৈরাগী, বৈষ্ণবের ছেলে। পরে সে হারানন্দপুরে পোষ্ট অফিসে চিঠি বিলি করার কাজ পায়। চাকুরী পাবার পর সে লক্ষ্মী বোষ্টমীকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু লক্ষ্মীর মা লক্ষ্মীকে এক রেলের কর্মীর সাথে বিয়ে দেয়। দশ-বারো বছর পরে লক্ষ্মী বিধবা হয়ে গ্রামে ফেরে। গোবিন্দ পুনরায় লক্ষ্মীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় কিন্তু লক্ষ্মী রাজী হয় না। গোবিন্দের চরিত্রে এক মারাত্মক দোষ ছিল। সেটি হলো সে রোজ নির্জন গাছতলায় বসে বিলি করার আগে সব চিঠিগুলি পড়ত। গ্রামের সাবিত্রীদেবীর নামে প্রেরিত প্রবাসী স্বামীর চিঠি গোবিন্দ পড়ে। সেই পত্রে ভালবাসা মিশ্রিত কথাগুলি গোবিন্দ নির্জনে উপভোগ করে। পরে এই চিঠিটি সাবিত্রী দেবীর হাতে দিয়ে আসে। গোবিন্দর চাকুরী পাকা হয়— বেতন হয় আড়াইশো। সে লক্ষ্মীকে আগামী ১লা বৈশাখ বিয়ে করবে ঠিক করে। এই সময় সাবিত্রীদেবীর নামে আরেকটি চিঠি আসে। গোবিন্দ সেই চিঠি পড়ে জানতে পারে যে সাবিত্রীর স্বামী সাবিত্রীকে সোনার চুড়ি বানিয়ে দেবে। তার নাম হবে সাবিত্রী চুড়ি। পরে আরেকখানি চিঠি আসে তাতে গোবিন্দ জানতে পারে যে হরনাথ চক্রবর্তী অর্থাৎ সাবিত্রীর স্বামী কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। গোবিন্দ কেঁদে ফেলে, সাবিত্রীর বৈধব্য-বেশ সে সহ্য করতে পারবে না। তাই সে নিজে হরনাথের জবানীতে সাবিত্রীকে পত্র দেয়। তাতে সে লেখে যে সংসার ত্যাগ করে হরনাথ কাশীবাসী হয়েছে। তিন বছর পর ১লা বৈশাখ দেশে ফিরবে। চিঠিটা সাবিত্রী দেবীর বাড়ীতে দিয়ে এসেই পোষ্ট অফিসে ঝাঁপতে থাকে। এর মধ্যে তার পিওনের চাকুরী চলে যায়। বাড়ীতে ফিরে আসে বিভিন্ন চিন্তায়-গোবিন্দ শেষে পাগল হয়ে যায়। গ্রামের সকলে বলে গোবিন্দর চাকুরী গেছে ও লক্ষ্মী বিয়ে করবে না বলছে, সেই চিন্তায় গোবিন্দ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু আসল অর্থ অন্য। সাবিত্রী দেবীকে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ না জানিয়ে সে বড় অন্যায় করেছে। সে ভেবেছিল যে লাল শাড়ী পরা মেয়েটি চিরদিন সোনার চুরি পরা হাতখানি বাড়িয়ে চিঠি নেবে। এইভাবে গোবিন্দ সারা পৃথিবী থেকে সব দুঃখ লাঘব করতে চেয়েছিল কিন্তু পারে নি, তাই ব্যর্থ হয়ে নিজেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সীমাহীন দুঃখার্ণবে নিমজ্জিত হল।

বাঞ্ছাপূরণ ঃ- এই গল্পের নায়ক 'বহুবল্লভ' যাত্রার সাজঘরে এসেও রাধাকে খুঁজে পেলনা। তাই সেই স্থান ত্যাগ করে রাধার সন্ধানে বের হয়। বহুবল্লভ সত্যই বহু পত্নীর প্রেমে পাগল। জীবনে একতারা বাজিয়ে কুসুম, কাদু, সুবাসীর জীবনে উপস্থিত হয়েছে আবার সকলকেই ছেড়েছে। রাধার খোঁজ করতে গিয়ে মানবী-রাধাদের একে একে ভোগ করেছে। কোথাও শান্তি না পেয়ে আবার নিরুদ্দেশের পথে তার যাত্রা ও পথে ঝুমুরের দলে যোগদান । রূপোপজীবিনী গোলাপের প্রেমে মুগ্ধ হয়। হঠাৎ একদিন রাত্রে গোলাপ নাচের আসর বসিয়ে বহু বল্লভকে বিহ্বলিত করে বাজনাদারের সাহায্যে ছুরি দিয়ে হত্যা করে। বহুবল্লভের নিথর দেহ শেষ বারের মতো নেচে ওঠে, বলে— রাধা এসেছে? এইখানে গল্পের রসমোক্ষ ঘটেছে। বহুবল্লভের রাধা-অন্বেষণের পথে কামনার্ত হৃদয় বড় হয়ে উঠেছিল ঠিকই, তথাপি রাধার জন্য সর্বদা ব্যাকুল ছিল। ভোগের মধ্যেই মুক্তির সন্ধান পেতে সে চেয়েছে।

সখিঠাকরুণ ঃ- 'সখি ঠাকরুণ' গল্পে সখিঠাকরুণ একটি সম্মানিত পদ। ঐ পদে বহাল থাকতে হলে যুবতী হতে হবে, তাই বর্তমান এলোকেশী সখী ঠাকরুণ তার যৌবনকে ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে শরীরে বয়স বাড়ে, ঢলে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। শুরু হয় এলোকেশীর জীবনে Tragedy যা করুণ রসে পূর্ণ। এই গল্পটির মূলবীজ ভারতীয় সনাতন আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ঃ- এই গল্পটিতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়নি, হয়েছে প্রেমের প্রতিষ্ঠা। প্রেমের জন্যই সর্বস্ব ত্যাগ করে নির্মম মৃত্যুকে বেছে নেয় গোবিন্দ দাস। অজয় নদীর তীরে একটি আখড়া, এর দখলদার কুৎসিত পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় গোবিন্দ দাস— পূর্ব নাম কালো গোস্বামী। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী সতী ও শান্তির সংসার ছিল। হঠাৎ স্ত্রী গৃহত্যাগিনী হয়ে কৃষ্ণদাসের দাসী হয়। প্রতিশোধের স্পৃহায় গোবিন্দ কৃষ্ণদাসের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, কৃষ্ণভামিনী চেয়েছিল কেবল প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ আর বিগ্রহের ঘরটুকু। গোবিন্দ সে টুকুও দেয়নি। তাই শেষে কৃষ্ণভামিনী গোবিন্দের কাছে রাত্রে একাকিনী আসে এবং বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা অথবা কলসী দড়ি চায় । গোবিন্দ স্ত্রীকে চিনতে পেরেছিল যে কুৎসিত বলে কলঙ্কিনী হয়েছিল। কিন্তু গল্পের উপসংহারটি খুবই চমকপ্রদ। এত রাগ প্রতিশোধ স্পৃহা থাকলেও শেষে সমস্ত সম্পত্তি ও বিগ্রহের অধিকার কৃষ্ণভামিনীকে লিখে দিয়ে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। ক্রোধের আগুনের শিখায় প্রেমের ফল্গু ধারা প্রবাহিত হয়েছে এখানে ।

ছ. শিক্ষক জীবনে প্রাচীন মূল্যবোধ

মানুষের জীবনের দুটো দিক আছে— একটি জৈবিক দিক, অপরটি সমাজসত্তার দিক। জীবনে স্থায়ীত্ব লাভে দুটো দিকেরই প্রয়োজন অত্যধিক। সমাজসত্তার প্রধান উপকরণ হল সংস্কৃতি। এই সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষা হল তাই মানুষের তথা জাতির মেরুদণ্ড। প্রাচীনধর্মীয় শাস্ত্রও মানুষের সংস্কার মুক্ত করার একমাত্র উপকরণ হিসেবে শিক্ষাকেই বলেছেন। আবার গীতায় উল্লেখ আছে "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" [২১] অর্থাৎ জ্ঞানের মত শুদ্ধিকারক আর কিছুই নেই। সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ হল মূল্যবোধ। যে জাতির মূল্যবোধ যত গভীর, সে জাতির সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবন তত উন্নত ও রুচিশীল। বিভিন্ন সময়ে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত আসলেও ভারতীয় সংস্কৃতি আজও অটুটি রয়েছে। যদিও আঙ্গি - কে কিছুপরিবর্তন ঘটেছে। সমাজ সংরক্ষণে ও সমাজ প্রগতির প্রধান উপকরণ তাই শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচর্যা করতে হয়। এই পরিচর্যা ছাড়া কোন সমাজই সম্মানের সঙ্গে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় না। সমাজের বয়স্কদের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, রীত-নীতি, সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতির ভাণ্ডারটি প্রজন্মদের জন্যে যথাযথ রাখা —এই প্রক্রিয়া কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব হয়। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছেন আচার্যগণ, যাঁদের জীবন ও বাণী আচরণ ও চিন্তা সমার্থক হয়ে মন্ত্ররূপে সমগ্র সমাজের উপর বিদ্যমান। তাই শিক্ষাজগতে শিক্ষকগণই হলেন প্রকৃত নিয়ন্তা— মানবিক ও মানসিক জীবনগড়ার কারিগর। শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য হল শিশুদের মানসিক ও বৌদ্ধিক-সত্তার যথাযথ বিকাশ সাধন করা।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষা সম্পর্কে নানামুনি নানা মত পোষণ করেছেন। কিন্তু সকলেরই প্রধান সুর হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশসাধন অর্থাৎ অন্তর থেকে যাবতীয় কলুষতা দূর করা। উপনিষদের ভাষায় "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"—মানুষকে সংস্কার মুক্ত করা। পরবর্তীকালে পরিবেশ, চরিত্রগঠন, দেশপ্রেম ইত্যাদির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত সংস্কৃত আলংকারিকগণ যেমন পাণিনি, কণাদ, যাজ্ঞ্যবল্ক, কৌটিল্য, শঙ্করাচার্য প্রমুখ শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যকআত্মোপলব্ধির কথাই বলেছেন। আধুনিককালে শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ যেমন বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণাণ, রবীন্দ্রনাথ সকলেই আত্মসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলেছেন।

পাশ্চাত্যদেশের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ প্লেটো, অ্যারিস্টটল রুশো, থমসন, নান্, জন ডিউই প্রমুখ শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলেছেন। অনেকে শিক্ষাহীন ব্যক্তিকে মৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুতরাং শিক্ষার দ্বারাই জীবনে পরিপূর্ণতা, ব্যক্তি কল্যাণ সমাজকল্যাণ ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মনরো প্লেটোর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "Plato attempted to formulate a new basis for the moral life which gives sufficient scope for the

individual while at the same time providing an ample basis for institutional life" [১২২] শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে প্লেটো জন্মান্তরের প্রক্রিয়া বলেছেন— যে প্রক্রিয়া ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে প্রকৃত আদর্শমুখী করে তোলে। প্লেটো নিজেই বলেছেন, **"The purpose of education is to turn the whole soul round in order that the eye of the soul or reason may be directed to the right quarter. Education does not generate or infuse a new principle : It only guides and directs a principle already in existence."** [১২৩]

শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের মূল্য অপরিসীম। পিতামাতা অপেক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষকের স্থান উচ্চে। এ ব্যাপারে চিন্তাবিদ এ্যারিস্টটল বলেছেন, **"Those who educate children well are more to be honoured than even their parents, for those only give them life, those the art of living well"** [১২৪]

ভারতে প্রথমে অন্তেবাসী শিক্ষা প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থী গুরু গৃহে যাবতীয় কাজ করত নির্দিষ্ট সময়ে আচার্য উপলব্ধি করলে শিক্ষার্থীকে নিজে গৃহে পাঠাতেন। পরবর্তীকালে পাঠশালা স্থাপিত হয়। স্থানীয় বিত্তবান, জমিদারদের সাহায্যে ও দানে শিক্ষক শিক্ষাদান করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই একজন করেই শিক্ষক থাকতেন। শিক্ষকগণ অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিক্ষার্থীদের উন্নতির উপরেই শিক্ষকদের অর্থ ও সম্মান নির্ভর করত। টোল, পরিষদ ও মাদ্রাসা (মধ্যযুগে) স্থাপিত হয়।

পূর্বে রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে এবং সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ শিক্ষালাভ করে রাজা ও জমিদারদের বশংবদ শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে সেইরকমভাবে শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা হত। শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় শাস্ত্রাদি পাঠদান- এর অন্যতম কারণ। সেই সঙ্গে পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন রাজারাজড়াদের মহানুভবতা, শক্তি, সাহস ইত্যাদি প্রবিষ্ট হত, যাতে শিক্ষার্থীদের শৈশব থেকেই রাজানুগ্রাহী সেবকে পরিণত হতে পারে। জাতপাতের বিভিন্নতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাব, রাজা বা জমিদার ঈশ্বরের প্রতিনিধি ইত্যাদির শিক্ষাও দেওয়া হত যাতে কখনও প্রজাকুল আত্মসচেতনতা লাভ করতে না পারে। নির্বিচারে তাদের উপর কেমন করে শোষণ ও শাসন করা যায় তার ব্যবস্থাই পাকাপাকিভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

ইংরেজ কোম্পানী এদেশের ক্ষমতা দখলের পর এদেশে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, ধর্মীয় কুসংস্কার, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পল্লীর প্রতি উন্নাসিকতা ও শহরে ঝোঁক ইত্যাদি বহুবিধ কারণে দেশীয় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। কেরাণী তৈরী করার জন্যে ইংরেজরা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে, আর গ্রাম বাংলায় সামন্তযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা কোনরকমে টিকে থাকে। মুষ্টিমেয় জমিদারদের বদান্যতায় সীমিত সংখ্যক পাঠশালা, টোল ও মাদ্রাসা চলতে থাকে। শিক্ষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় পড়েন তথাপি, স্বীয় আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতেন না। নিজ ছাত্রদের উন্নতিকল্পে তনু-মন-প্রাণ অর্পণ করতেন; নিজে না খেয়ে ছাত্রদের খাওয়াতেন— পিতা-পুত্রের সম্পর্কে গড়ে ওঠে যেন একই পরিবারের বাসিন্দা। এই অবস্থা অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, উৎসাহদাতা হিসাবে উদার সর্বোপরি শিক্ষার্থীর জীবনে জীবন্ত প্রভাব বহু শিক্ষক বিস্তার করেছিলেন।

তারাশঙ্করের বেশ কয়েকটি গল্পে এই ধরনের আদর্শবাদী শিক্ষকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন— "হেডমাস্টার", "মধুমাষ্টার" "পণ্ডিতমশাই", "হরিপণ্ডিতের কাহিনী", উপন্যাস হিসেবে "গুরুদক্ষিণা" এবং "সন্দিপন পাঠশালা" উল্লেখযোগ্য।

হেডমাষ্টারঃ- এই গল্পে শিক্ষকের আদর্শবাদকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন লেখক। এক ছাত্র বৎসল, পিতৃপ্রতিম, ভারতীয় সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষক চন্দ্রভূষণবাবু তিলতিল করে গড়ে তোলেন বিদ্যালয়। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হলে চন্দ্রবাবু যাবতীয় সত্তা দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সেবা করতে থাকেন। বিদ্যালয়ে তিনি ধর্মীয় স্তোত্রপাঠ ও আলোচনার ক্লাস প্রবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে ছাত্রদের নৈতিক morality গড়ে ওঠে। কিন্তু কালের অভিঘাতে, পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাবে তাঁর সব আদর্শ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্য বুদ্ধির প্রাবল্য দেখা যায়। সহকর্মী পুত্রপ্রতিম সীতেশবাবু এই বিরুদ্ধ-পরিবেশ সৃষ্টির পাণ্ডা। ছাত্রগণ বিদ্যালয় বয়কট করে। সামনে বিদ্যালয়ের গোল্ডেন জুবিলী, প্রধান শিক্ষক হিসেবে চন্দ্রবাবুর কত চিন্তা ও দায়িত্ব, কত স্বপ্ন ও আশা, অথচ ছাত্রদের দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আদর্শকে টিকিয়ে রাখতে তিনি চাকরী ছেড়ে কাশী চলে যান। 'গোল্ডেন জুবিলী'র দিন তিনি পত্র পাঠান তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন একটু বদল করে লিখে পাঠান ঃ-

"যখন আমার চরণচিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে
—— তখন নাই বা মনে রাখলে।"

অশুভের কাছে, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে চন্দ্রবাবু নীরবে দূরে চলে গেছেন। তথাপি যা অন্যায়, সর্বনাশী, সমাজের অকল্যাণকর, ভারতীয় ঐতিহ্য বিরোধী তাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি।

মধুমাষ্টার ঃ এই গল্পের শিক্ষক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আদর্শপরায়ণ, ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল। কোন এক শ্বেতাঙ্গ লেখক ভারতীয়দের অসভ্য, বর্বর বললে জ্ঞানতপস্বী, দর্পহারী মধুসূদন শ্বেতাঙ্গদের দর্পচূর্ণ করতে মৃত্যুবাণরূপী লেখনী ধারণ করেন। পল্লীর এই অখ্যাত ব্রাহ্মণ স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা। চির-দারিদ্র্য তাঁর ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারেনি। সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে বই লেখার জন্যে শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতায় যান। তিনি প্রমাণ করবেন যে ভারতীয় সভ্যতা আদি ও প্রাচীন। কলকাতায় গিয়ে কিছুদিন থেকে বই লেখায় মনোনিবেশ করবেন এই চিন্তা করে প্রাক্তন ছাত্র বর্তমানে বিরাট উকিল কালীঘাটবাসী সতীশের কাছে মধুবাবু থাকতে চাইলে সতীশ 'হার্টলেস" বলে এড়িয়ে যায়। ক্ষুব্ধ মধুসূদনবাবু খাবারের থালা ছেড়ে এক মেসে গিয়ে ওঠেন এবং পনেরো টাকায় একটি টিউশান করে কোনরকমে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে বইটি সমাপ্ত করেন। যদিও জীবিতাবস্থায় তিনি কোন সম্মান তিনি পান নি—মাথার শিরা ছিঁড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ক্ষমাহীন, উদার নির্ভীক জ্ঞানতপস্বীর হৃদয়ে দাম্পত্য প্রেমের এক অমলিন স্মৃতি সদা জাগরুক ছিল। তাই মৃত্যুর কিছুদিন আগেই তিনি স্ত্রীর কাছে ফিরে আসেন। স্ত্রীর প্রতি তাঁর অভিমান ছিল একটাই যে স্বামীর মানসিকতা স্ত্রী বোঝে না। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র অরুণের সহায়তায় বইটি লণ্ডনে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন মহলে তা প্রশংসিত হয়।

মধুমাষ্টার চিরজীবন সংগ্রাম করলেও জীবিত থাকতে কিছুই পান নি কিন্তু মৃত্যুর পর সব পেয়েছেন ঃ দেশবিদেশের প্রশংসা এবং স্ত্রীর অনুরাগ বিমিশ্রিত ভালোবাসা। জীবনের যাবতীয় সুখ-স্বপ্নকে অনায়াসে ত্যাগ করে নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও পরবর্তী প্রজন্মদের সেবা করে গেছেন।

এই গল্পটি "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হয়। তখন তারাশঙ্করের খ্যাতি ও যশ বা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আসে নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ইহজীবনে সার্থকতা নাও আসতে পারে। কিন্তু দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে মৃত্যুর পরেও সম্মান তিনি অবশ্যই পাবেন, তাঁর কীর্তি ব্যর্থ হবে না। এই বিশ্বাস নিয়েই হয়তো তিনি মধুমাষ্টারের চিত্রকল্প তৈরী করেন।

পণ্ডিতমশাই ঃ- যতীন চাটুজ্জে এক অখ্যাত পল্লীতে জমিদারীর কাছারিতে পাঠশালা খোলেন। অত্যন্ত কালো ও কুৎসিৎ চেহারা তথাপি শিক্ষাবিস্তারের জন্যে তিনি ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। গ্রামে পূজাপার্বণ এবং কাছারিতে বিভিন্ন পূজার্চ্চনা তিনিই করেন। আবার জমিদারবাবু কাছারি পরিদর্শনে এলে যতীন্দ্রবাবুকেই রান্না বান্না করতে হত। তিনি প্রায়শই সাধুভাষায় কথা বলতেন। ছাত্রপ্রীতি ছিল তাঁর অপরিসীম। প্রতি বছর বৃত্তি পাওয়ানোর জন্যে দরিদ্র গ্রামবাসীদের মেধাসম্পন্ন ছেলেদের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন অথচ বৃত্তি পরীক্ষা হবার পূর্বেই লোকপাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নানা প্রলোভন দেখিয়ে সেইসব মেধাবী ছেলেদের নিয়ে গিয়ে নিজেরা নাম কিনতেন। যতীনবাবুকে বৃত্তি পরীক্ষা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হত না। তাতে পণ্ডিতের বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। নিরলস পরিশ্রম করে তিনি চলেন। সে বছর মরিরাম নামে এক ছাত্রের অসাধারণ মেধা দেখে পণ্ডিতের যাবতীয় স্নেহ, মায়া, করুণা, ভালোবাসা তার উপরে পড়ে। কিন্তু ছাত্রটি অত্যন্ত দরিদ্র—অভাব, অনটনে জর্জরিত। ভালমন্দ খাবারের প্রয়োজন অথচ সে পায় না। জমিদারবাবু কাছারিতে এসেছেন। গোমস্তা জমিদারের ও লোকজনদের খাবারের জন্যে বাজার থেকে জিনিসপত্র কয়েকদিনের জন্যে আনেন। তার মধ্যে থেকে যতীনবাবু লুকিয়ে কিছু মশলা ও ঘি চুরি করেন এবং শেষে ধরা পড়েন। সকলে তাঁকে চোর, অপরাধী বললে পণ্ডিতমশাই জমিদারবাবুর কাছে চুরি করার সত্যি ঘটনা স্বীকার করেন। তবে নিজের জন্যে নয়, মরিরামের জন্যে। যতীনবাবু শীর্ণ মরিরামকে জমিদারের সামনে এনে বলেন, "বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি; কিন্তু সংসারে বড়ই অভাব।" 'ঘিতে মেধা বৃদ্ধি হয় বলে মরিরামকে খাওয়ানোর জন্যেই তিনি চুরি করেছেন, নিজের জন্যে নয়। চৌর্যবৃত্তির কথা স্বীকার করেই যতীনবাবু শিশুর মত অঝোর ঝরে কেঁদেছেন। সহৃদয় জমিদারবাবু গ্রামের এই অখ্যাত শিক্ষকের ছাত্রপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি করেন। কাক পণ্ডিতের এই ছাত্র-বৎসল হৃদয় বড়ই দুর্লভ। বর্তমানকালে এমন কাকপণ্ডিতের বড়ই অভাব। ছাত্রশিক্ষক যে একান্ত আপনার জন — পিতা-পুত্রসম—তা এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

হরিপণ্ডিতের কাহিনী ঃ- হরি পণ্ডিত (চাটুজ্জে) জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা করেছেন। গ্রামে বিশ্ববাসিনীর নিত্য পূজো এবং জমিদারের আগমন ঘটলে তাঁর পাচক বৃত্তি সবই করতে হত হরি পণ্ডিতকে। এখানে জমিদারের গোমস্তাটি অত্যন্ত অসৎ ও ভণ্ডমূর্খ তথাপি হরি পণ্ডিতকে থাকতে হয়, কারণ তাঁর অভাব ও ছাত্রপ্রীতি। পণ্ডিতমশাই ছাত্রবৃত্তি পাশ। তাঁর প্রিয় ছাত্র ফড়িং। ফড়িংকে নিয়ে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন। ফড়িংকে একদিন পণ্ডিতমশাই বলেন, "রাজপুরুষ হয়ে দেশসেবা করবে, দরিদ্রের রক্ষক হবে, গুণীর আদর করবে।" একদিন লোকপাড়া গ্রামের পাঠশালার হেডপণ্ডিত মারা গেলে তাঁর শবদেহ পুষ্প পাহাড়ে সুসজ্জিত করে অসংখ্য ছাত্র মৃতদেহ বহন করে চলে হরিপণ্ডিতের পাঠশালার পাশ দিয়ে। হরিপণ্ডিত সেই দৃশ্য দেখে ফড়িংকে বলেন, "আমি যদি মরি ফড়িং, তবে এমনি করে নিয়ে যাবে তো?" ফড়িং বৃত্তি পেয়েছে এই সংবাদে পণ্ডিতমশাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। তিনি ভাবেন তাঁরও যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাঁকেও পুষ্পবেষ্টিত করে ছাত্রগণ নিয়ে যাবে শ্মশানে। মাইনর পরীক্ষাতেও ফড়িং বৃত্তি পায়। তাতেও পণ্ডিতের আনন্দের সীমা থাকে না।

ছ'বছর পর একদিন পণ্ডিতের অনুপস্থিতিতে এক ছাত্র 'বন্দেমাতরম্' বলে চিৎকার করে গোলযোগ সৃষ্টি করলে পণ্ডিত তাকে দারুণ প্রহার করেন। এই কথাটি ফড়িং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলে; ফলে বৃদ্ধ পণ্ডিতের চাকরী যায়। ফড়িং তখন স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কংগ্রেস-সেবক হয়েছে। হরিপণ্ডিত তখন শিক্ষকতা হারিয়ে দেবসেবা ও জমিদারী কাছারীর পাচকবৃত্তি

নিয়ে থাকেন। হঠাৎ মাত্র দু-তিন দিনের জ্বরে পণ্ডিতের মৃত্যু হয়। গ্রামে ব্রাহ্মণের অভাব। তাই লোকপাড়া গ্রাম থেকে চারজন ব্রাহ্মণ এসে শবদেহ গরুর গাড়িতে করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়। গাড়ি ছাড়ার প্রাক্-মুহূর্তে ফড়িং এসে সামান্য একটি গাঁদাফুলের মালা মৃত পণ্ডিতের গলায় পরিয়ে দেয়।

যে ছাত্রটির শুভাশুভের নিত্য সহচর ছিলেন পণ্ডিতমশাই, যিনি ফড়িং-এর চারিত্রিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক, যাঁর তিল তিল করে পরিশ্রমের সার্থক ফসল ফড়িং—সেই ফড়িংই হরিপণ্ডিতের বৃদ্ধ বয়সে চাকরী থেকে বরখাস্তের কারণ হয়। হরিপণ্ডিতের পিতৃপ্রতিম বাৎসল্য, স্নেহ, নিঃস্বার্থ দেশসেবা হারিয়ে যাওয়া ফড়িংদের সামাজিক উজ্জ্বল আলোয় গিয়ে আসেন পণ্ডিতমশাই। ফলের আশা না করে এভাবে শিক্ষাবিস্তার করা, পাঠশালার শিক্ষকতাকে টিকিয়ে রাখতে ধনীদের জামাকাপড় সেলাই পর্যন্ত করতে হয়েছে হরিপণ্ডিতকে।

তারাশঙ্করের যুগে এবং পরবর্তী যুগে যেখানে শিক্ষা-বিস্তারে তীব্র অনীহা ছিল এবং ধনতান্ত্রিক প্রথা জীইয়ে রাখতে জমিদারগণ শিক্ষাকে কোনরকমে টিকিয়ে রেখেছিল, শিক্ষা বা শিক্ষার্থী বা শিক্ষক কোন পর্যায়েই স্থিরতা বা স্থায়ীত্ব ছিল না, ছিল না শিক্ষকদের ন্যূনতম সম্মান, তথাপি আদর্শবাদী শিক্ষকের অভাব ছিল না—যাঁরা সমাজ থেকে কেবল ঘৃণা, অপমান পেয়েছেন তথাপি মানুষ তৈরীর লক্ষ্য থেকে কদাচ বিচ্যুত হন নি।

জ. সামাজিক সচলতা ঃ-

সমাজ সর্বদা পরিবর্তনশীল। ফলে সামাজিক স্তর বিন্যাসেরও পরিবর্তন স্বাভাবিক। বিশেষ করে বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার যুগে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বৃত্তিগত বা পেশাগত পরিবর্তন হচ্ছে কখনও ঊর্ধ্বমুখী, আবার কখনও নিম্নমুখী।

যখন কোন ব্যক্তি বা জনসমষ্টি নিজকর্মের দ্বারা এক সামাজিক স্তরে থেকে অন্যস্তরে উন্নীত হয় বা অবনমিত হয়, সেই পরিবর্তনের ধারাকে সামাজিক সচলতা বলে। এই সচলতা দু-প্রকারের —

(অ) Horizontal mobility বা অনুভূমিক সচলতা।

(আ) Vertical mobility বা উল্লম্বী সচলতা।

অনুভূমিক সচলতা ঃ- যখন কোন ব্যক্তির বৃত্তি পরিবর্তন করা সত্ত্বেও তার সামাজিক মর্যাদার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না তখন এই জাতীয় পরিবর্তনকে অনুভূমিক সচলতা বলে। যেমন কোন পরিবারের ২/৩ পুরুষের বৃত্তি প্রায় একই রয়েছে। যেমন ডাক্তারের ছেলে উকীল, আবার উকীলের ছেলে ডাক্তার বা ব্যবসায়ী হয়েছে তাদের বৃত্তির পুরুষানুক্রমিক বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না বা সামাজিক মর্যাদার কোন তফাৎ হলো না।

উল্লম্বী সচলতা ঃ-

কোন ব্যক্তির বৃত্তি বা অন্য কোন দিক থেকে স্থান পরিবর্তন করায় তার সামাজিক মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটল। তখন এই পরিবর্তনকে উল্লম্বী সচলতা বলে। যেমন কারখানার শ্রমিকের ছেলে যদি ডাক্তার হয়, তাহলে বৃত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। এই পরিবর্তনকে ঊর্ধ্বমুখী উল্লম্বী সচলতা বলে।

আবার কোন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার বা উকীলের ছেলে যদি সাধারণ কোন বৃত্তি গ্রহণ করে তাহলে সামাজিক মর্যাদার হ্রাস হয়।

এই পরিবর্তনকে অধোমুখী উল্লম্বী সচলতা বলে।

বৃত্তি ছাড়াও শ্রেণীর জীবনযাপনের রীতি পরিবর্তনে সামাজিক মর্যাদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেমন আচার, আচরণ বা বিবাহ-পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

বিবাহ
- Hypergamy–অনুলোম—পাত্র উচ্চবংশ + পাত্রী নিম্নবর্ণ
- Hypogamy–প্রতিলোম নিম্নবংশজাত পাত্র + উচ্চশ্রেণীর পাত্রী।

এই ধরণের বিবাহ এবং তজ্জনিত সন্তান-সন্ততি হলে তাদের সামাজিক স্তর বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।

খড়গ ঃ- বৃত্তির পরিবর্তন হলেও সামাজিক মর্যাদার কোন পরিবর্তন হয়নি। রাজা সাহেব জমিদার বংশের সন্তান হলেও বর্তমানে উকীল। তাই এই পরিবর্তনকে অনুভূমিক সচলতা বলা যায়।

আবার বৃত্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। যেমন, নুটু মোক্তারের সওয়াল, চৌকিদার,

প্রত্যাবর্তন, মানুষের মন, প্রভৃতি গল্পে। অবশ্য এই গল্পগুলোতে বৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। "নুটুবিহারী" প্রথমে এক সাধারণ পরিবারের একজন শিক্ষক ছিলেন। দারিদ্র্য তার নিত্য সঙ্গী। অথচ পরে ওকালতি পাশ করার পর তাঁর সামাজিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে জমিদার অভিজাত্যে ও কৌলিন্যে নুটুকে ঘৃণা করত, সে ও নুটুর সাথে আত্মীয়তায় বাঁধা পড়েছে। "চৌকিদার" গল্পেও বনোয়ারী বাগদী চৌকিদারী বৃত্তি পেয়ে সামাজিক জীবনে গুরুত্ব পেয়েছে। "প্রত্যাবর্তন" গল্পেও পশুপতি জেলে গ্রামে থাকলে সেও হয়ত বাবা কাকাদের মত মদ্যপ, মজুর ব্যভিচারী জীবনযাপন করত, মর্যাদা পেত না। কিন্তু জাহাজে খালাসীর কাজ পেয়ে যখন অর্থ ও চালাক চতুর হয়ে গ্রামে ফিরে আসে তখন প্রতিবেশীদের কাছে সে অযাচিত সম্মান পায়। "মানুষের মন" গল্পে ভবেন্দ্র শিক্ষিত বেকার অথচ সৎ, কিন্তু স্ত্রীর কাছে উপার্জনহীন বলে চরম লাঞ্ছনা পাওয়ায় গৃহত্যাগ করে। কিন্তু ভাগ্যের অনুকূলে অচিরেই বহু লক্ষ টাকা উপার্জন করে দেশে ফিরে আসে তখন সে সমাজে পায় অতিরিক্ত সম্মান। যদিও তার স্ত্রী এই অধঃপতন হাসি মুখে মেনে নিতে পারেন নি। "কবি" গল্পে নিতাই ডোমের ছেলে হয়েও কবিয়াল হয়েছে; বৃদ্ধি পেয়েছে সামাজিক মর্যাদা তার।

কোন কোন ক্ষেত্রে বৃত্তির পরিবর্তন মানুষের সামাজিক মর্যাদাকে ধ্বংস করে হীনগতি করে দেয়। এমন গল্পও তারাশঙ্করের অনেকগুলি আছে— যেমন ব্যাধি, রাজপুত্র, ছলনাময়ী, শ্রীনাথ ডাক্তার হোলি, মা, চরহাটির স্টেশন মাষ্টার, বোবা কান্না, তৃষ্ণা, শিবানীর অদৃষ্ট, গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী প্রভৃতি"

'ব্যাধি' ঃ—গল্পে হারাণ আচার্য ওরফে নারায়ণ রায় ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও বিগ্রহের অলংকার চুরির ব্যবসা করে। ফলে তাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়।

'রাজপুত্র' ঃ- জমিদার বংশের সন্তান হয়েও বিশ্বনাথ আজ দারিদ্র্যের শিকার। সমাজ, বন্ধু-বান্ধব তাই আজ তাকে উপহাস করে, ব্যঙ্গ করে ডাকে। তবুও বিশ্বনাথের দুঃখ নেই। হয়তো দুঃখ ভেতরে থাকলেও বাইরে প্রকাশ করে নি। সমাজের চোখে সে একজন ক্যারিকেচারিষ্ট।

'ছলনাময়ী' ঃ- এই গল্পের নায়ক ম্যানেজারের সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি অনেক। তার ছোট সংসার, তবুও তান্ত্রিক সাধনায় তাকে পশ্বাধম, জামাই হন্তারক, পাষণ্ড করে তোলে। আর্থিক সচ্ছলতা পাবার জন্যই হয়তো সে আরও ধনী হবার স্বপ্ন দেখে পাগল হয়ে যায়। চারিত্রিক অধোগতিই শেষ পর্যন্ত তার জীবনে ক্রিয়াশীল।

'শ্রীনাথ ডাক্তার' ঃ- শ্রীনাথ ডাক্তার মেডিকেলের ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র হয়েও পিতার উপরে প্রতিশোধ নিতে পড়া ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি প্রাকটিস শুরু করেন। স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি মদ্যপ হয়ে ওঠেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। শেষে স্টেশনে ভিক্ষা করতে থাকেন। সামাজিক মর্যাদা থেকে একেবারে সরে এসেছেন শ্রীনাথ অর্থাৎ এটি অধোমুখী উল্লম্বী সচলতার উদাহরণ।

'হোলি' ঃ- কানাই মুখুজ্জে খনিজ সম্পদে লক্ষপতি হলেও তাগাদা করতে আসা একজনকে গুলি করে হত্যা করলে টাকার জোরে মুক্তি পেলেও সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। শেষে দালালগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। বৃত্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদার অধোগতি হয়েছে কানাইবাবুর জীবনে।

'মা' ঃ- মহাবিষ্ণু জমিদার হয়েও বর্তমানে জমিহীন, প্রতিপত্তিহীন একজন সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। শেষ জীবনে তাঁর হাতে কুষ্ঠ হয়। তিনি স্ত্রীর কাছে স্বীকার করেছেন যে প্রথমা স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা সন্দেহে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন। তখন নিশ্চয়ই মহাবিষ্ণু দ্বিতীয়া স্ত্রীর কাছে আর মর্যাদা পাবেন না। চারিত্রিক অধোগতিই সংসারের ক্ষয়ের কারণ।

'চরহাটির স্টেশনমাস্টার' ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও বৃত্তি গোত্রান্তর করে। বৃত্তির জন্য কোম্পানীর কাছে ভৃত্যেরও অধম হয়েছেন। আত্মমর্যাদা হারিয়ে বৃত্তি হারিয়েও স্টেশন ছাড়তে পারে নি। সমাজে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন।

'বোবাকান্না' গল্পের আস্তিক কবিরাজ, পূজারী ত্রিপুরা ভট্টাচার্য আনুঠাকুরের ছোট ছেলেটিকে বাঁচাতে না পেরে পূজার্চ্চনা ত্যাগ করেন। পূজারী ও কবিরাজ হিসাবে সমাজে যে সম্মান ও মর্যাদা পেতেন, এরপর তেমন হয়তো তিনি আর পাবেন না। সুতরাং এই চরিত্রটিকে ও অধোগতি উল্লম্বী সচলতার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে।

'তৃষ্ণা' গল্পে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী দোকানদার ছিলেন। পরে দোকান তুলে দিয়ে কীর্তনের দলে যোগ দেন। সংসার চালাতে ধীরে ধীরে বাকি পড়ে। তার মা মারা যায়, বাপের বাড়ী গিয়ে স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। ক্ষুদিরামকে সুরোধনী জেলেনী পেতে চায়; ক্ষুদিরাম

ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও জেলেপাড়ায় রাতদিন পড়ে থাকেন। এই চালচলন নিশ্চয়ই সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে।

'শিবানীর অদৃষ্ট'-এ স্বর্ণকারের মেয়ে হয়েও মারা যাবার পর পথের ভিক্ষুক হয়ে যায় এবং পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে এক শিক্ষিত পরিবারে ঝি-এর বৃত্তি গ্রহণ করে। এর ফলে সামাজিক মর্যাদা হারিয়েছে শিবানী।

'গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী' ঃ- জনার্দন চট্টোপাধ্যায় দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ও কন্যাদায়ের হাত থেকে বাঁচতে বাড়ী থেকে পালিয়ে এক পাত্রীর সুপারিশে রেলে চাকরী পান এবং চাকরী পেয়েও বাড়ীতে জানান না। চাকরী করা সত্ত্বেও ভিক্ষা করেন ও ভিক্ষে করা টাকায় মদ খান। ব্রাহ্মণ হয়েও কন্যার পিতা হয়েও এভাবে মদ্যপান বা আত্মগোপন করা কোনটাই সমাজ সুস্থ মনে মেনে নিতে পারে না। ফলে এই চরিত্রটিরও বৃত্তি লাভের পর অধঃপতন ঘটেছে বলা যেতে পারে।

দীপার প্রেম ঃ- দীপা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও দেবপ্রিয় হালদারকে বিয়ে করেছে। ফলে সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে কারণ প্রতিলোম বিবাহ সমাজ স্বীকৃত নয়।

পাদটীকা

১।	কালের পুত্তলিকা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ-২৪৩
২।	বাংলা গল্প বিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-৭১
৩।	গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৫
৪।	প্রাগুক্ত		পৃ-৫
৫।	শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৬
৬।	রবীন্দ্রোত্তর কাল	ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-৬৮
৭।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-৩
৮।	তারাশঙ্কর রচনাবলী ১০ম খণ্ড	মিত্র ও ঘোষ	পৃ-৩৫১
৯।	কয়েক প্রহরের স্মৃতি (কালি ও কলম)	গৌরাঙ্গ ভৌমিক	পৃ-৭৯৫/৯৬
১০।	কথা ও সাহিত্যে তারাশঙ্কর (তারাঃস্মৃতি সংখ্যা)	কালিদাস রায়	পৃ-২৪৬
১১।	গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১৫
১২।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১১
১৩।	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৩৩
১৪।	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা সাহিত্য	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	পৃ-৩৭০
১৫।	গল্প পঞ্চাশৎ ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১৬
১৬।	বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৩৪
১৭।	গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১৭
১৮।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-১৫৩
১৯।	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা সাহিত্য	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	পৃ-৩৭১
২০।	তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল সাহিত্য	ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-৯৯
২১।	গল্পপঞ্চাশৎ ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১৮
২২।	প্রাগুক্ত		পৃ-৪৬
২৩।	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৩৪
২৪।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	ডঃ নিতাই বসু	পৃ-১৮১
২৫।	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৩৫
২৬।	বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার	ভূদেব চৌধুরী	পৃ-৪৩৫/৩৬
২৭।	তারাশঙ্কর ঃ দেশকালসাহিত্য	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-১০০
২৮।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১২১
২৯।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য়) ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৬০

৩০।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১২৩
৩১।	গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৫১
৩২।	ছোটগল্পে ত্রয়ী	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পৃ-১২০
৩৩।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-১২৫/২৬
৩৪।	কালের পুত্তলিকা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ-২৪৮
৩৫।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম) ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৫৩
৩৬।	প্রাগুক্ত		পৃ-৫৪
৩৭।	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা সাহিত্য	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	পৃ-৩৬৮
৩৮।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৪৯
৩৯।	গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৫২
৪০।	তারাশঙ্কর	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ-১৬৪
৪১।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১১৭
৪২।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-১২৫
৪৩।	তারাশঙ্কর	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ-১৫
৪৪।	বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার	ভূদেব চৌধুরী	পৃ-৪৩৭
৪৫।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-১২৫
৪৬।	ছোটগল্পের কথা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১১৫
৪৭।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম, ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৫৪
৪৮।	প্রাগুক্ত	"	পৃ-৫২
৪৯।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-২০
৫০।	ছোট গল্পে ত্রয়ী	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পৃ-৭৪
৫১।	বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার	ভূদেব চৌধুরী	পৃ-৪১৫
৫২।	কল্লোলযুগ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	পৃ-১৮০
৫৩।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৭৭
৫৪।	প্রাগুক্ত		পৃ-২৭
৫৫।	প্রাগুক্ত		পৃ-৯৪
৫৬।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৬১
৫৭।	The Worlds' Thousand Best Short Stories–Sir J. A. Hammerton Vol-VIII		P-169
৫৮।	গল্পপঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-২৯
৫৯।	প্রাগুক্ত		পৃ-১৩
৬০।	শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-১৭
৬১।	ছোটগল্পে ত্রয়ী	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পৃ-১০৩
৬২।	তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা	সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৮৫
৬৩।	ছোটগল্প বিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-৮২
৬৪।	তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল সাহিত্য	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-১৩৭
৬৫।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৪৬
৬৬।	তারাশঙ্কর	হরপ্রসাদ মিত্র	পৃ-৯২
৬৭।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-২৩
৬৮।	শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-২০
৬৯।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-৮০
৭০।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	নিতাই বসু	পৃ-১৮২
৭১।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৫৩

৭২।	তারাশঙ্কর ঃ দেশ-কাল-সাহিত্য	উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-১০৫
৭৩।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৩৬
৭৪।	প্রাগুক্ত		পৃ-৩৮
৭৫।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৩২
৭৬।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১২৪
৭৭।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৩২
৭৮।	কালের পুত্তলিকা	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ-২৬৪
৭৯।	আমার সাহিত্য জীবন (২য়)	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-১২৯
৮০।	গল্পপঞ্চাশৎ ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ ১৫
৮১।	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা সাহিত্য	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	পৃ-৩৭০
৮২।	আমার সাহিত্য জীবন ২য় খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-১২৯
৮৩।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১১৪
৮৪।	তারাশঙ্কর ঃ দেশকালসাহিত্য	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ-১৩৪
৮৫।	বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার	ভূদেব চৌধুরী	পৃ-৪৩৬
৮৬।	আমার সাহিত্য জীবন ১ম খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-২২
৮৭।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-১২২
৮৮।	গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-৫
৮৯।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১১০
৯০।	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৮১
৯১।	আমার সাহিত্য জীবন ২য় খণ্ড	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-২৫
৯১।	(ক) ঝুমুর গান/ডঃ উৎপলা গোস্বামী লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা মাঘ+চৈত্র ১৩৯৭ সম্পাদনা ডঃ সনৎ মিত্র		পৃ-২৯৮
	"সাধারণতঃ ঝুমুর বলতে (১) লোক নৃত্য বিশেষ। (২) নৃত্য সম্বলিত শৃঙ্গার রসাত্মক লোকগীত বিশেষ। (৩) বাংলার এক শ্রেণীর পল্লীগান ইত্যাদি বোঝায়।"		
	এবং ঝুমুর একটি লোকসঙ্গীত সুরের আঙ্গিকঃ সৌমেন সরকার - সম্পাদনা - ডঃ সনৎ কুমার মিত্র		পৃ-৩২৬
	"ঝুমুরে নয়টি ঘরানা বা প্রকারভেদ আছে। যেমন জমিদারী, ভাদরিয়া, ঝিঙ্‌ফুলিয়া, দাঁড়শালি, নাচনিশাল, চৈতী, মুদিয়ালী, গুলওয়াড়ি এবং পেটিয়ামারা।"		
৯২।	সাহিত্য দর্পণ / বিশ্বনাথ কবিরাজ	অনুবাদক - বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়	পৃ-১২২/২৫
৯৩।	প্রাগুক্ত		পৃ-১৪১/৬৭
৯৪।	Macbeth :-	Edited by S.C. Sengupta	p-iv. v. 1986
৯৫।	এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব	সাধনকুমার ভট্টাচার্য	পৃ-২৪৭
৯৬।	তারাশঙ্কর ঃ সময় ও সমাজ	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-১০১
৯৭।	শ্রেষ্ঠগল্পের ভূমিকা	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৬/৭
৯৮।	বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর	সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৩০৮
৯৯।	বাংলা গল্পবিচিত্রা	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	পৃ-১২৬
১০০।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ-৩৬
১০১।	ছোটগল্পে ত্রয়ী	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	পৃ-১১০
১০২।	বাংলার বাউল ও বাউল গান (১ম খণ্ড)	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	পৃ-১২৭
১০৩।	প্রাগুক্ত		পৃ-২৯০
১০৪।	চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব	ননীগোপাল গোস্বামী	পৃ-১৭৮
১০৫।	শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন	হরিদাস দাস	পৃ-১৫২
১০৬।	Religious Sects of the Hindus :- H. H. wilson		p-178

১০৭। রাইকমল — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ-১-৪
১০৮। সাহিত্যের সত্য — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ-৩৮
১০৯। আমার সাহিত্য জীবন (১ম খণ্ড) — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ-২০
১১০। চিঠি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ১২/৩/১৯৩৭ (ফাল্গুন)
১১১। আমার সাহিত্য জীবন (১ম খণ্ড) — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ-২০
১১২। প্রাগুক্ত — পৃ-২১-২২
১১৩। তারাশঙ্কর ঃ সময় সমাজ — আদিত্য মুখোপাধ্যায় — পৃ-১১২
১১৪। সাহিত্য ও সংস্কৃতি — ৭২ সংখ্যায় উদ্ধৃত (এপ্রিল-জুন) পৃ-৫
১১৫। কালি ও কলম — (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা) — পৃ-৫৬৪
১১৬। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড — জগদীশ ভট্টাচার্য — পৃ-৪৩
১১৭। (চিঠি) তারাশঙ্কর গল্পগুচ্ছ (২য়) — ” — পৃ-১২ (২৮শে মাঘ ১৩৪৩)
১১৮। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য — গোপিকানাথ রায়চৌধুরী — পৃ-৩৬১
১১৯। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — পৃ-৫৩৯
১২০। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড) — জগদীশ ভট্টাচার্য — পৃ-৪৭
১২১। গীতা — ৪র্থ অধ্যায় ৩৮ নং শ্লোক
১২২। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন — সুশীল রায় — পৃ-৭/৯
১২৩। প্রাগুক্ত — ” — ”
১২৪। Aristotle, quoted by K. K. Mukherjee (New education and its aspects) — P-224

* * * * * * * * * * * * * * * *

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনীতি

চতুর্থ অধ্যায়

রাজনীতি

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের মূলবিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ জীবন ও জগৎ রূপায়িত। এ প্রসঙ্গে প্রথমে তাঁর ছোটগল্পে রাজনীতি প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে।

'রাজনীতি' কথাটি অত্যন্ত জটিল ও বহু প্রচারিত ব্যাপার। কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা সার্ব্বজনীন কল্যাণ ও বোধকে প্রকাশিত করাই হল রাষ্ট্রের দায়িত্ব—এই ছিল প্রাথমিক ধারণা। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তিকে অধিকার করতে গিয়ে দলাদলি, আইন প্রণয়ন; নিজ স্বার্থে আইনকে শোষণ ও শাসন যন্ত্রে পরিণত করা হল সংকীর্ণ রাজনীতির ফল। হেবের সংজ্ঞানুযায়ী রাষ্ট্র বা রাজনীতির সংজ্ঞা হল, 'রাষ্ট্র হচ্ছে একটি মানুষের সম্প্রদায় যা সার্থকভাবে নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে শারীরিক বলপ্রয়োগের আইনগত ব্যবহারের একচেটিয়া অধিকার দাবি করে।" (১)

তারাশঙ্কর সাহিত্যজগতে আসেন বেশ পরিণত বয়সে। প্রথমে সাহিত্যে ব্যর্থ হয়ে রাজনীতিতে গেছেন। তাঁর রাজনীতি ছিল দেশ-গঠনের চেতনা। তাই সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হয়েও তিনি ছিলেন সৎ আদর্শবাদী সমাজসেবক ও কংগ্রেস কর্মী। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুধা বিস্তৃত। দেশসেবায় গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, পথে, ঘাটে, যাত্রা করেছেন, দুঃস্থ, অসহায়দের সেবা করেছেন; সংগ্রহ করেছেন দেশ, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তারাশঙ্কর বহিরঙ্গ দেখেই ক্ষান্ত হন নি, বাস্তব সত্যকে গূঢ় তাৎপর্য সহ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সমাজ ও রাজনীতির ক্রমপরিবর্তন ও সমস্যাকে অপরূপ ভাবে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। দেশসেবার এই আদর্শ ও অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন বীর-বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সংস্পর্শে এসে। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবন গ্রন্থে বলেছেন, "এক সময় কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুর হাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বীর বিপ্লবী নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমার জীবনক্ষেত্রে, এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জাগিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শাসনমুক্ত করার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান।" (২) এই সময় গান্ধীজীর আহ্বান এল। কলমের পরিবর্তে তেরঙা পতাকা নিয়ে জেলে ঢুকলেন। জেলের ভিতর নির্জনে চিন্তা করে রাজনৈতিক দলবাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অবসাদ জাগে। কারণ তাঁর কাছে দেশসেবার অর্থ ছিল "রাজনীতিহীন সমাজসেবা"। রাজনীতির অন্য একটি অতিরিক্ত লক্ষ্য ছিল তা হল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভ। তাই বিভিন্ন দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সংঘাত। কংগ্রেসের রাজনীতিতে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব মারাত্মক ভাবে দেখা দেয়। জেলখানাতে বসে তারাশঙ্কর এইসব কদর্য চিত্রের চিন্তা করেন এবং ভীষণ মর্মাহত হন। রাজনীতি না করার সংকল্প নিয়ে, সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন— মানবজীবনের মহিমা প্রকাশের জন্যে কলম ধরেন। "কালি কলম" পত্রিকার অফিসে "রসকলি", "হারানো সুর" লেখা দুটি মনোনীত হয়। শুরু হল নতুন জীবন, সাহিত্যজীবন। তিনি নিজেই বলেছেন—"কল্লোল, কালিকলম গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে, রাজনীতির পথে। সে আকর্ষণ আমার তখন কম, দৃঢ় প্রবল নয়।" (৩) তথাপি তিনি রাজনীতির সংস্পর্শ ত্যাগ করতে পারেন নি। তিনি তাই বলেছেন, "আমি রাজনীতি ছাড়তে চাইলেও রাজনীতির কম্বলরূপী ভালুক আমায় ছাড়লে না।" (৪) রাজনীতির মূলপ্রবাহ অন্তরে থেকেই যায়। সে প্রবাহ ছিল গান্ধীবাদ। গান্ধীবাদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁর রচনায় অনেক ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। আবার তিনি সুভাষ বসুর সংস্পর্শেও এসেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রকে যে ভালবাসতেন তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, "রাজনীতির নেশা আমাকে তখন আরও বেশী আচ্ছন্ন করেছিল। তা ছাড়া আকস্মিক ভাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও মাধুর্যে অভিভূত হয়ে সে বই তাঁকেই উৎসর্গ করেছিলাম।" (৫) সত্য, অহিংসা ও আত্মত্যাগ—গান্ধীজীর এই চিন্তা তারাশঙ্করকে দারুন প্রভাবিত করে। তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যাগ্রহী মানুষের কাছে একদিন না একদিন অত্যাচারী শক্তি পরাভূত হবেই। এর জন্যে অত্যাচার বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই। অহিংসার মাধ্যমেই সাম্য চেয়েছেন তারাশঙ্কর। দেশপ্রেমের আবেগই তখন মুখ্য ছিল। তাই কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমরা যারা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে কাজ করি, তারা দেশের সেবা করতেই আসি, তারা তো সুভাষচন্দ্র বা জে. এম. সেনগুপ্তের সেবা করতে আসে না।" (৬)

আবার মার্কসবাদকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তবে রাষ্ট্র কেবল অত্যাচারের যন্ত্র, তার ক্ষমতা অধিকার করাই হল মূল লক্ষ্য—মার্কসের এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় রাজনীতির যাত্রা হোক গান্ধীজীর সত্য নিষ্ঠা ও মার্কস-এর সাম্যবাদের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন, "মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এই সাম্যবাদের আদর্শের সঙ্গে মিলিত হলে এক মহত্তর আদর্শে পরিণত হতে পারত, কিন্তু তা হয় নি। নিছক বৈষ্ণব ও শাক্ত মতের গোঁড়ামির মত মতবাদের গোঁড়ামি অন্তরায় হয়েছে।" (৭) তারাশঙ্করের "গণদেবতা", "ধাত্রীদেবতা", "পঞ্চগ্রাম" ইত্যাদি উপন্যাসে গান্ধীবাদ এবং "চৈতালী ঘূর্ণি, মন্বন্তর" ইত্যাদি উপন্যাসে কম্যুনিষ্ট প্রভাব স্পষ্ট—কিন্তু একায় নয়।

ক্যাপিটালিস্টিক সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের উপর শোষণের কথা থাকে। এই শোষণ থেকেই সৃষ্টি হয় বিচ্ছিন্নতা—নিজের থেকে নিজের, অন্যের ও পৃথিবীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপে সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে বাধ্য হয়, ফলে সৃষ্টি হয় হতাশা, ক্ষোভ ও ধ্বংস। তারাশঙ্করের গল্প ও উপন্যাসে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব চোখে পড়ে। একদিকে রাঢ়ের গণসমাজ, অন্যদিকে শহুরে শিক্ষা ও সাহিত্য- এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মাঝে তারাশঙ্কর দেখেছেন, "গ্রামীণ সমাজ কী ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, আধুনিক, ইনডাস্ট্রী কীভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, কীভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে বদ্ধ সমাজ ভেঙ্গে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কীভাবে জীবনের গভীরে প্রোথিত শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল আলগা হচ্ছে"। (৮) এ সব সুন্দর ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছেন ও লিখেছেন। আমাদের দেশে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে সামাজিক শ্রেণীগত সচলতা তা তিনিই প্রথম তুলে ধরেন।

তারাশঙ্কর সর্বত্র গান্ধীজীর আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর "সত্য যুগ" আর গান্ধীজীর "রামরাজ্য" -চিন্তা ভাবনায় এক। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে তারাশঙ্কর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সে সত্যের পূজারী হিসেবে তিনি মানুষের মহত্বকে ইঙ্গিত করেছেন। "চৈতালী ঘূর্ণি"র গোষ্ট জীবনের বিনিময়েও এই সত্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। ধর্মঘটে যোগ না দিয়ে কিছু শ্রমিক কাজে যোগ দিলে গোষ্ঠ তাদের বাধা দিতে যায় এবং সংঘর্ষে মারা যায়। সে কিছুতেই পিছু হটে নি। মরবার সময় সে বলেছে, "জান দেগা, লেকিন নেহি যায়েগা।" (৯) এখানে তারাশঙ্করের মার্কসীয় প্রভাব স্পষ্ট বলে মনে হয়, কিন্তু কখনই তিনি মার্কসবাদকে গ্রহণ করতে পারেন নি। মার্কসবাদের বস্তুবাদ সর্বস্বতাকে তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি "চৈতালী ঘূর্ণিতে" লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতায়, মার্কসের কোন বই পড়ে নয়। রামায়ন ও মহাভারত পড়েই তিনি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন "মানুষকে অ্যাটম বোমার ঘায়ে মেরে ফেলা যায়। তাকে ভীত করে সাময়িকভাবে হার মানানোও যায় কিন্তু সত্য কথা জয় করা যায় না। হিরোসিমা নাগাসিকির মানুষদের প্রকৃতি কি পরাজয় মেনে নিয়েছে? তারা কি কখনও ভুলতে পারবে একথা? . . . . বিড়ম্বিত জীবনের দুর্ভোগ ও পীড়ন থেকে মুক্তিই শুধু তার কাম্য নয় — সে জন্মান্তরেও এর প্রতিহিংসা চাইবে। যে আজ যত দান নিয়ে আসুক, যত সাহায্যই করুক তবু সে ভুলবে না। যাতে ভুলানো যায়, যাতে হিংসা-জর্জর প্রকৃতিকে প্রসন্ন করা যায় সে হল প্রেম, সে হল অহিংসার সাধনা।" (১০)

"ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথের বিশ্বাস- "অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি, গণ-আন্দোলন আমি প্রত্যাশা করি, বিশ্বাস করি আমি মানুষকে।" (১১) এতো তারাশঙ্করের হৃদয়ের অনুরণন। এই নীতিবাদ তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। তারাশঙ্কর মানব জীবনে পরম উন্নতির কথা বলেছেন। এই পরম উন্নতি তিনি গান্ধীজীর "আমার ধ্যানের ভারত' থেকে গ্রহণ করেছিলেন। 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ বলেছেন, "আমি আর একটু বেশী চাই। চরম উন্নতির সঙ্গে চাই পরম উন্নতি। আমার সভ্যতা, আমার জাতীয় ভাবধারা অনুমোদিত পন্থায় পরমপ্রাপ্তির সাধনার সুযোগ, অধিকার, আমার উপর বিদেশী রাজশক্তির চাপিয়ে দেওয়া বিদেশী জীবনদর্শনকে আমি অস্বীকার করতে চাই, আমার জীবনের সাধনায় অপরের নির্দেশ আমি মানতে চাই না। পূর্ণ, আজ বৈদেশিক শাসনের ফলে তাদের জীবনদর্শনের চাপে চরমবস্তু পরমকে ভুলিয়ে দিল, আমি স্বাধীনতা চাই সেইজন্য আর সেইজন্যেই বিদেশী নির্দিষ্ট এনার্কিজম বা টেররিজম আমি গ্রহণ করতে পারি না।" (১২) এই উক্তির প্রতিধ্বনি ফেরে গান্ধীজীর "আমার ধ্যানের ভারত' গ্রন্থে — "ঐশীশক্তির অস্ত্রে ভারত সংগ্রাম করে এসেছে এবং এখনও ভারত তা করতে পারে। অন্যান্য জাতিসমূহ পশুশক্তির উপাসক . . . . . ভারত আত্মার শক্তিতে সবকিছু জয় করতে পারে। সে অবস্থায় ভারত আর আমার হৃদয়ের গৌরবস্বরূপ থাকবে না . . . . আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাতৃবক্ষ সংলগ্ন শিশুর মত ভারতকে আঁকড়ে থাকি।" (১৩) আবার "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধিকে তাদের প্রাপ্য বলেই মেনে নেয় নায়ক দেবু ঘোষ। চরম সংকটকালেও দেবু পাপপুণ্যের বিচার করেছে। এতো গান্ধীবাদকেই প্রতিষ্ঠা করা। শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর যে মনোভাব, "আমি জমিদারদের ধ্বংস করতে চাই না, তবে জমিদাররা যে অপরিহার্য এ আমার মনে হয় না। জমিদার ও পুঁজিপতিদের আমি অহিংসা পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তিত করতে চাই এবং তাই আমার কাছে শ্রেণী সংঘর্ষ অপরিহার্য নয়। এখনকার প্রয়োজন হল জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিলুপ্তি নয়। তাদের সঙ্গে জনসাধারণের বর্তমান সম্বন্ধের পরিবর্তে এক সুস্থ ও পবিত্র সম্পর্কের স্থাপনা।" (১৪) "পঞ্চগ্রামে" শ্রেণীচেতনা থাকলেও তাকে প্রতিষ্ঠা করেন নি তারাশঙ্কর। এই আদর্শবাদ ও তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। অহিংসানীতি মানুষের আবিষ্কার, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।

'গণদেবতা' প্রকাশের পর তারাশঙ্কর ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। তথাপি শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয়—কম্যুনিজমের এই তত্ত্বকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তারাশঙ্করের বিপ্লবীচিন্তা মূলতঃ তাঁর নিজস্ব। "আমার বিপ্লবের স্বরূপ কল্পনা আমার নিজস্ব; তার মধ্যে ন্যায় প্রধান, নীতিপ্রধান, সত্য প্রধান এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা সুদৃঢ় অটল। যে ন্যায়, যে নীতি সে সত্যের জন্যে বিপ্লবের কামনা, আবাহন তার উৎস ঈশ্বরবিশ্বাস তারই মধ্যে মৃত্যু অমৃত রাজ্যের সেতু। . . . . . ঈশ্বর'কে অমৃতকে, ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে

যে তত্ত্ব সে তত্ত্বকে অন্নবস্ত্র সম্পদের প্রলোভনে বা মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে কোন কারণে গ্রহণ করতে পারি না।" (১৫) সেই কারণেই তিনি কম্যুনিষ্ট লেখক হয়েও কম্যুনিষ্ট নন। তাঁর নীতি একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত। সেইকারণেই তাঁরসঙ্গে হুবহু মিল কংগ্রেস বা গান্ধীজী বা কম্যুনিষ্ট কোনটার সঙ্গেই হয় নি। তিনি রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়াই কেবলমাত্র অহিংসার মাধ্যমেই দেশে মার্কসীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে মনে করতেন। অথচ কম্যুনিষ্টগণ রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী। এই খানেই তারাশঙ্করের সঙ্গে বামপন্থীদের মত পার্থক্য। এই নীতি থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। "সুতপার তপস্যা" "একটি কালো মেয়ের কথা"—এই দুই উপন্যাসেও তারাশঙ্কর তাঁর নিজস্ব ধারণাকে অটুট রাখতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি বলেই তিনি ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে নুব্জ হয়েছেন।

"সুতপার তপস্যা"য় "তারাশঙ্করের জাতীয়তাবাদী চিন্তা, গান্ধীজীর আদর্শ গ্রামীণ স্বরাজের আদর্শ, নগর মানুষের কাছে সত্যাগ্রহ — সব যেন ধূলিসাৎ। তারাশঙ্কর এখানে সুতপার মত পালিয়ে গেছেন, গান্ধীজীর অহিংসনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে, তার তপস্যা ও মানবতা হারিয়ে গেছে।" (১৬)

সাম্যবাদীদের নীতিগত প্রশ্নে বহুধা বিভক্ত, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের অধঃ পতন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন এবং দেশ ও জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ বলে মনে করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "আজ যদি সমাজে এবং জীবনে কামার্ততা এবং রাক্ষসীক্ষুধা এবং চতুর পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি ছাড়া কিছু নেই এমনটাই সত্য হয়ে উঠে থাকে তবে সে সমাজ এবং সে জীবনের ধ্বংস অনিবার্য। তাকে মরতেই হবে।" (১৭)

"মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ"—এই নীতিতে বিশ্বাসী তারাশঙ্কর। ১৯৪২ সালে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে নিজের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য—"আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি তা সুস্পষ্ট ভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক। তাঁরা দৃষ্টির যে কোণ থেকে এদেশের মানুষের অন্তরের অসন্তোষ দেখেছিলেন এবং কারণ নির্ণয় করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ..... সকলেরই সুর ছিল প্রায় এক। তার অধিকাংশ স্থলেই— যারে চাই তারে কেন পাই না, এই অতৃপ্তির সুর ছিল উগ্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে তার এই সম্পর্কিত সকল বিধির বিরুদ্ধে আক্রোশ, ক্ষেত্র বিশেষে ছিল বিদ্রোহ।..... আমি সাহিত্য ক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। 'চৈতালী ঘূর্ণিতে" আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম। ... "ধাত্রীদেবতা" "কালিন্দী"তে নতুন করে সেই কথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ..... রাজনৈতিক বন্ধনমক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা, জীবন-মুক্তি বলতে ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গন্ডি, অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর করে চাপানো সকল প্রকার প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষ সংগ্রাম করে চলেছে। সেই তার অভিযান। ..... সেই চিরন্তন মুক্তি সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলাম আমি " (১৮) দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি পরস্পরের পরিপূরক-এই চেতানা তারাশঙ্করের প্রথম থেকেই ছিল তবে মার্কস প্রবর্তিত সহিংস শ্রেণী সংগ্রামের দ্বারা আনতে চাননি, তিনি তা করতে চেয়েছেন সনাতন ভারতীয় আদর্শে, প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা। তিনি বলেছেন, "১৯৩০-৩১ সালে জেলের মধ্যে বন্দীদের আলোচনার আসরে কম্যুনিজম তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনেও যা শিখলাম, যা জানলাম তাও এক স্বপ্ন রঙীন মোড়কে মোড়া আদর্শবাদ— তার ভেতরের আসল তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু জানিনি। নিজেই নিজের আদর্শবোধ অনুযায়ী কম্যুনিজমের এক রূপকে তৈরী করে নিয়ে তাকেই তার স্বরূপ ধরে নিয়েছিলাম।" (১৯) ফলে তাঁর বিপ্লবী চিন্তার সঙ্গে সাম্যবাদী বিপ্লবের ব্যবধান ঘটেছে দুস্তর। তাই তিনি যে কম্যুনিষ্ট ছিলেন না তার প্রমানস্বরূপ প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা ও রজনীপাম দত্তের অনুগামী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "এটা জানি, একেবারে অবধারিত জানি, যে নাগিনীরা চারদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস যখন ফেলছিল, তখন মানসিকতার টানে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন অকুণ্ঠে কিন্তু কম্যুনিষ্ট কোনদিনই হন নি। আমরাও কোনদিন তা ভাবিনি। সৌহার্দ্যের প্রাবল্যে আমাদের একজনকে তিনি গ্রন্থ উপহার ব্যপদেশে কমরেড বলে সম্বোধন করা সত্ত্বেও ভাবিনি। নানা ব্যাপারে, নানা পরিস্থিতিতে তাঁর এবং কম্যুনিষ্টদের মনোভঙ্গী ও বিচারধারায় প্রবল পার্থক্য থাকতো। শুভবুদ্ধি না থাকলে দুঃশীল না হলে আলাদা ধরণের মানুষের পক্ষে এক হয়ে শুভ কর্মপথে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, সঙ্গত ও সমুচিত, একথা তারাশঙ্কর জানতেন এবং সেই জন্যেই কম্যুনিষ্টদেরও কোল দেওয়ার মত চিত্ত প্রসার ও হৃদয় ঔদার্যের তাঁর কখনও অভাব হয়নি।" (২০)

মানবিক প্রেমের সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে তিনি কখনই ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর "কালান্তর" উপন্যাসে বামপন্থী চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অহিংস প্রেমের দ্বন্দ্বে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য সুস্পষ্ট। আজীবন কংগ্রেসী হলেও সত্তর দশকের কংগ্রেসকে দেখে তিনি ঘৃণা বোধ করেছেন। গবেষিকা মুক্তি চৌধুরীকে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, " একালেও কংগ্রেসী দেখছি। আমি তাদের সকলের আচরণ কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। আমি নিজে

কংগ্রেসী সত্য, তাই বলে বর্তমানকালে কংগ্রেসের যে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ দেখছি, তার প্রতি আমার তীব্র ঘৃণা রয়েছে।" (২১) সাহিত্যেও রাজনীতির কদর্য প্রবেশকে তিনি পছন্দ করতেন না। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের আজ যে এই অবনতি তার কারণ সাহিত্যজগতে রাজনীতির প্রবেশ।" (২২) হেগেলের মত তারাশঙ্করও রাষ্ট্রীয় চিন্তায় পরম, মহত্ত্ব ও গৌরবকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় চোদ্দটি ছোটগল্পে রাজনীতির কথা আছে, তার মধ্যে নয়টি মুখ্যতঃ রাজনীতি সংশ্লিষ্ট—তিনি মূলতঃ স্বদেশী আন্দোলনকেই তুলে ধরেছেন। প্রথম পর্বে তিনি কংগ্রেসীদের বাবুয়ানা ও ইংরেজদের চাটুকাবৃত্তিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন। বিপ্লবীদের তিনি শ্রদ্ধা করেছেন কিন্তু মেকী বিপ্লবীদের তিনি তুলে ধরেছেন, যেমন—"ঘরে বাইরে" উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্র। সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী চিন্তা সম্বলিত গল্প "মেঘ ও রৌদ্র"। অসহযোগের প্রতি আস্থাহীনতার চিত্র মেলে "শেষকথা" গল্পে। সশস্ত্র জাগরণের ইশারা মেলে "বদনাম" গল্পে। রবীন্দ্রসমকালীন যুগে রাজনীতির এমন প্রচার ও প্রসার ছিল না বলেই হয়ত কবির ছোটগল্পে রাজনীতির প্রভাব কম হয়েছে। সামাজিক সমস্যাই ছিল প্রধান। ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডীর আদর্শে দেশসেবা করতে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের কাহিনী "একরাত্রি"। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতির ভ্রান্ত চেহারা "বিদূষক" তদানীন্তন কংগ্রেসীদের তীব্র কটাক্ষে ব্যঙ্গ করেছেন "রাজটিকা", স্বদেশী যুগের স্বদেশী শিক্ষকের কাহিনী "পণরক্ষা" প্রভৃতি গল্প রাজনীতি সংশ্লিষ্ট উদ্ভট বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত।

এবার তারাশঙ্করের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট গল্পগুলি দেখা যেতে পারে ঃ—

	গল্প	প্রকাশকাল	পত্র/পত্রিকা	গুরুত্ব	মন্তব্য
১	আলো আঁধারি	১৩৩৯, বৈশাখ	ভারতবর্ষ	রাজনীতির স্পষ্ট উল্লেখ নেই অসহযোগ অন্দোলনের ইঙ্গিত	প্রসঙ্গক্রমে এসেছে
২	ফনু (মা)	১৩৪৫, আষাঢ়	পরিচয়	স্বদেশী আন্দোলন	"
৩	হরিপন্ডিতের কাহিনী	১৩৪৮ বৈশাখ	প্রবাসী	অসহযোগ আন্দোলন	কংগ্রেসীর চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে
৪	শেষকথা	১৩৫১ আশ্বিন	শনিবারের চিঠি	গান্ধীবাদী প্রভাব	অহিংসে
৫	শবরী	১৩৫২ চৈত্র	দিগন্ত	স্বদেশী আন্দোলন	"
৬	কলকাতার দাঙ্গা ও আমি	১৩৫৩-পূজা-সংখ্যা	বসুমতী	'৪৬' এর দাঙ্গা	প্রসঙ্গতঃ এসেছে
৭	নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান	১৩৫৪ মাঘ	শনিবারের চিঠি	গান্ধীজীর জীবনী	অহিংসানীতি প্রধান
৮	ময়দান	১৩৫৭ কার্ত্তিক	মাটি	সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ছাপ স্পষ্ট	প্রসঙ্গতঃ এসেছে
৯	বরমলাগের মাঠ	১৩৬০	চতুরঙ্গ	তেভাগা আন্দোলন (বামপন্থী)	মূল বিষয়
১০	বিস্ফোরণ	১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ	বিস্ফোরণ	'৪৬ এর দাঙ্গার রক্তাক্ত পরিণাম	"
১১	একটি মুহূর্ত	১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ	বিস্ফোরণ	বামপন্থী লেখক, লেখার বেলাতে, কর্মে নয়	বামপন্থী লেখকদের কটাক্ষপাত
১২	রবিবারের আসর	১৩৬৪, অগ্রহায়ণ	বিষপাথর	কলেজের ইউনিয়ন এর খুঁটি মনে হয় বামপন্থী	প্রসঙ্গতঃ
১৩	মানুষের মন	১৩৬৫	তরুণের স্বপ্ন	অসহযোগ আন্দোলন	প্রসঙ্গতঃ
১৪	ভুলোর ছলনা	১৩৭২	নীহারিকা	লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসী।	প্রসঙ্গতঃ
১৫	এ মেয়ে কেমন মেয়ে	১৩৭২, পূজাসংখ্যা	যুগান্তর	প্রথমে কংগ্রেসী, পরে সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করেন	প্রসঙ্গতঃ এসেছে
১৬	বেদের মেয়ে	১৩৫৬, আশ্বিন	শনিবারের চিঠি	স্বদেশী/কংগ্রেসী	গল্পের সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা
১৭	প্রত্যাখ্যান	১৩৭৭	রূপসী বিহঙ্গিনী	স্বদেশী আন্দোলন/আইন অমান্য	মূল বিষয়
১৮	গোপাল বাঁধের ইতিকথা	১৩৭৭, পূজাসংখ্যা	অমৃতবাজার	'৪২ এর আন্দোলনে যুক্ত	প্রসঙ্গতঃ
১৯	সখিঠাকরুণ	১৩৭৭, পূজাসংখ্যা.	আনন্দবাজার	কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও কম্যুনিষ্ট	প্রসঙ্গতঃ এসেছে
২০	স্বাধীনতা	১৩৫৪	শনিবারের চিঠি	বিশ্বযুদ্ধ/অহিংসা	মূলবিষয়
২১	কয়েক ফোঁটা রক্ত	১৩৬৯, পূজাসংখ্যা	বিংশ শতাব্দী	আইন অমান্যের প্রাকপর্ব (১৯৩০)	প্রসঙ্গতঃ এসেছে
২২	চন্দ্র জামাই এর জীবনকথা	১৩৪৭, শারদীয়া	দেশ	অসহযোগ আন্দোলন	"

তারাশঙ্করের বাইশটি গল্পে রাজনীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় আটটি গল্পের রসমোক্ষনে রাজনীতির কথা বর্তমান। তিনি ভারতীয় ঐতিহ্য ব্যতিরেকে কোন রাজনীতিকেই বড় করে দেখেন নি।

"আলো আঁধারি" গল্পটি দাম্পত্য বিচ্ছেদের করুণ কাহিনী। এখানে রাজনীতি এসেছে বিচ্ছেদের উপকরণ হিসেবে। ধনীর কন্যার বাক্যবাণে বেকার, চরিত্রবান স্বামী সুখময়ের জীবনে আঘাত নেমে আসে। এম, এ পাঠরত সুখময়কে নিয়ে সকলের নানা উজ্জ্বল চিন্তাকে সুখময় নষ্ট করেছে। ১৯২১ সালে জেল খেটেছে। এইসময় ভারতে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। সুখময় তরুণ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু রাজনীতির সঙ্গেও তার বনিবনা হল না। তার কারণ তার গোঁয়ারতুমি। সেই সঙ্গে স্ত্রীর দুর্ব্যবহার তাকে অতিষ্ট করে তোলে। অবশ্য সুখময়ের জীবনে রাজনীতির আদর্শ কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। কারণ রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ায় স্ত্রীর ভর্ৎসনা গঞ্জনায় সে শেষ পর্যন্ত হয়েছে গৃহছাড়া এবং ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনকেই একান্ত করেছেন। সুতরাং রাজনীতি নয়, গার্হস্থ্য জীবনের অপ্রাপ্তিই তাকে শেষ পর্যন্ত অনির্দেশের পথে অগ্রসর হতে বাধ্য করেছে।

অনেকে এই গল্পে লেখকের আত্মজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনুমান করেন। এটিই তাঁর অন্তরঙ্গ-জীবন নিয়ে প্রথম রচনা। এই গল্পের সুখময় ও সারদার চরিত্র অনেকটা তারাশঙ্কর ও তাঁর স্ত্রীর আদলে রচিত। তাঁরাশঙ্করের স্ত্রী উমাশশী ছিলেন ধনীর কন্যা। প্রায়ই তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রথম জীবনে তাঁর মনোমালিন্য হত। তারাশঙ্করের গৃহত্যাগের পরিকল্পানাও ছিল।

ফল্গু ঃ- সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হওয়ার সময় গল্পটির নাম ছিল 'ফল্গু', পরে নাম হয় 'মা'। এখানে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার মহাবিষ্ণু সরকারের পূর্ব জীবনের অত্যাচার ব্যাভিচার, কদর্য জীবন যাত্রার ফলে তিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে তিনি আজ সর্বস্বান্ত এবং নির্বংশ। বড় ছেলের প্রজাহত্যার দায়ে দ্বীপান্তর হয়েছে। ছোটছেলে নীরেণ এম, এ, পাশ করেছে। সে স্বদেশী করে কংগ্রেসী দলের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা। একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তার ফাঁসি হয়। অনেকেই রাজনীতি করেছে, মৃত্যুবরণ করেছে ঠিকই কিন্তু এই গল্পে নীরেণের রাজনীতি ও মৃত্যু সরকার-পরিবারে সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং পরিণামে বংশ ধ্বংস হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে এমনভাবেই অনেক পরিবার কালের আঘাতে বিলীন হয়ে গেছে। তাই এই গল্পে রাজনীতির চকিত আবির্ভাব হলেও পরিসমাপ্তি অত্যন্ত ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়েছে সন্দেহ নেই।

হরিপন্ডিতের কাহিনী ঃ— এই গল্পে রাজনীতি প্রসঙ্গত এসেছে। কিন্তু গল্পটির প্লট পরিবর্তনে রাজনীতি মুখ্য সহায়ক হয়েছে। হরি পন্ডিত জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা খুলে বহু দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের পুত্রসম পালন করেন। তাদের মধ্যে একজন হল ফড়িং—যে পন্ডিতের নয়নমণি ছিল। সেই ফড়িং বৃত্তি পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে কংগ্রেসের সেবক হয়ে সেই পিতৃসম গুরুদেবকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অভিযোগ করে পন্ডিতকে চাকরী থেকে অপসৃত করে। পন্ডিতের দোষ হয়েছিল সামান্য। স্কুলের শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্র "বন্দেমাতরম্" বলে চিৎকার করায় পন্ডিত ছাত্রটিকে প্রহার করেছিলেন। এই লঘুপাপে ফড়িং গুরুদেবকে গুরুদন্ড বিধান করেছিল। ফড়িং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল বলেই তার গুরুত্ব সমাজে বাড়ে এবং তার সুপারিশেই চেয়ারম্যান পন্ডিতের চাকরী কেড়ে নেয়। পাশের গাঁয়ের পন্ডিতের মৃত্যু হলে তাঁর শবদেহে পুষ্প মালায় শোভিত হয়ে ছাত্ররা দল বেঁধে শ্মশানে নিয়ে যায়। সেই দৃশ্য দেখে হরি পন্ডিত তাঁর এরূপ মনোবাসনা জানান ছাত্র ফড়িং-এর কাছে। সেই ফড়িং রাজনীতির অহংকারে অন্ধ হয়ে নিজগুরুর চাকুরী কেড়ে নেয় এবং মৃত্যুর পর পন্ডিতের শবদেহ সৎকারের জন্যে লোকাভাব হয়। এসব দৃশ্য ফড়িং এর সামনেই ঘটেছে। কোন ব্যবস্থা ফড়িংকে নিতে দেখি না। গল্পের অন্তিম মুহূর্তে দেখা যায় পন্ডিতের শবদেহের পাশে একখানি গাঁদা ফুলের মালা হাতে ফড়িংকে। ফড়িং রাজনীতিতে উচ্চপদে আসীন, তবুও ফড়িং সামান্য কর্তববোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে।

শেষকথা ঃ- অহিংস অসহযোগ-এর মাধ্যমে শত্রুর হৃদয় পরিবর্তনের অবাস্তব তত্ত্বের প্রতি লেখকের পক্ষপাত "শেষকথা"য় প্রকট। লাটভরতপুরের জমির সীমানা নিয়ে সাউ এবং সাঁই বাবুদের মধ্যে যে যুযুধান অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে চাষীদের অবস্থা হয়েছে "ষাঁড়ের পায়ের তলায় উলুঘাসের মত"। এই অবস্থায় চাষীদের পান্ডা বৃদ্ধ লালমোহন পান্ডে বেছে নেয় সত্যাগ্রহের পথ—"হ্যাঁ আমি মরব। আমি যদি মরি, তবে তখন উহারা মনে দুঃখ পাবে। ভগবান জ্ঞান দিবে। তখন আমাদের কথা ঠিক উহাদের সমঝে আসবে"। এই গল্পটিতে গান্ধীজীর অহিংসা-নীতির প্রভাব সক্রিয়। প্রসঙ্গত: এই গল্পটি "পৌষলক্ষ্মী" গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত এবং গ্রন্থটি গান্ধীজীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সমগ্র গল্পটিতে লেখক গান্ধীজীর জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বৃদ্ধ লালমোহন অশান্তি চায়না, সদা নির্বিকার, খুনোখুনি, রক্তারক্তি সে পছন্দ করে না। সে ফৌজদারী পরামর্শ দেয় না কেবল ভগবানে বিশ্বাস করতে বলে। সাউবাবুদের নায়েব লালমোহনও তার স্ত্রীকে আটক করে রাখে—এখানেই বুড়ির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে বুড়ি হাসতে হাসতে বলে, "মরণভারি সুন্দর গো, বুড়া, মরণ ভারি সুন্দর।"

অধ্যাত্মচিন্তা, গান্ধীবাদ ও মৃত্যুচেতনা এই গল্পে ক্রিয়াশীল। "বাষট্টি বছরের বৃদ্ধা কস্তুরীবাঈ স্বামীর পাশেই এক প্রকার অন্তরীণ অবস্থাতেই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সময় গান্ধীজীরও মানসিক অবস্থা এমনই হয়েছিল" (২৩)। শ্রেণী-জাগরণ তারাশঙ্কর চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেই পথ রক্তে রাঙানো নয়, অহিংসার পথ ধরে। "তারাশঙ্করের রাজনীতি চিন্তার ধারাবাহিক সূত্রটি তাঁর (তারাশঙ্করের) সাহিত্যে বর্তমান রাজনীতিতে গান্ধীবাদেই যেহেতু তাঁর মূল আকর্ষণ ছিল তাই তাঁর..... গান্ধীবাদের প্রতি সশ্রদ্ধ বিশ্বাস সর্বদাই অক্ষুন্ন রয়েছে। সাহিত্যরসের শর্ত পূরণ করেও গান্ধীবাদকে তিনি কোন সময়েই বিস্মৃত হতে পারেন নি। কারণ মানবজীবনের মূল নীতিবোধ—ন্যায়, সত্য ইত্যাদিতে পরিচালিত হতে গিয়ে গান্ধীবাদকেই তিনি সর্বত্র মহিমামন্ডিত করে রেখেছেন।" (২৪)

শবরী ঃ- এই গল্পে কংগ্রেসের গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের কথা আছে। গান্ধীজীর হুকুমে ফণী জেলের ছেলে কলকাতায় পরিচারকের কাজ করতে গিয়ে জেলে যায়। জেল থেকে বেরিয়ে চরকা নিয়ে গ্রামে সুতো কাটে। সত্যাগ্রহী হয়ে যায় ফণী; অহিংস-যুদ্ধের কথা বলে। সে গান্ধীজীর রামরাজত্বের কথা বলেছে। ফণী বিদেশী মদের বিক্রি বন্ধ করতে গিয়ে দেশী মদের দোকান খুলে বসে, নিজেও মদ্যপান শুরু করে এবং জেলেও যায়। এরপর ফণী আর গ্রামে ফিরে আসে না। গ্রামে তখন ইউনিয়ন বোর্ড নিয়ে মেতে উঠেছে বাবুরা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন তখন ভাঁটা পড়েছে। ফণীর এই পরিবেশ ভাল লাগেনি তাই আর গ্রামে ফিরে আসেনি। আসলে ফণী গান্ধীজীর নীতিতে অন্ধবিশ্বাসী। ফণীর দূর সম্পর্কীয়া পিসি সরলা প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে গান্ধীজীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছে। সরলা ঊনপঞ্চাশের ঝড়ে ঘর হারিয়ে, পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে সে ভিক্ষা সার করেছে। এর মধ্যে তেরশো বাহান্ন সাল এসেছে। সরলা বর্তমানে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেছে। গান্ধীজী মিটিং করতে এলে সরলা তাঁকে দর্শনের জন্যে উৎসুক হয়ে ভিক্ষালব্ধ সামান্য অর্থ গান্ধীজীকে দেন। গান্ধীজী তার থেকে একটি পয়সা গ্রহণ করেন। এরপর সরলার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তার বুভুক্ষু হৃদয় গান্ধীজীর দর্শনে পূর্ণ হয়েছে তাই সে চিরমুক্তির সন্ধান পেয়েছে। এখানে তারাশঙ্করের স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনই মুখ্য হয়েছে। অর্থাৎ প্রগতিশীল লেখক সংঘের সভাপতি হয়েও শেষে পদত্যাগ এবং গান্ধীবাদে ফিরে আসা—১৩৫১ সালে কংগ্রেসে পুনঃ প্রত্যাবর্তন এবং ১৩৫২ সালে শবরী প্রকাশিত হয়।

কলকাতার দাঙ্গা ও আমি ঃ- লেখকের ঈশ্বর-বিশ্বাস, গান্ধীজী-প্রীতি, কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় পরিণামে বিবিক্ত হৃদয় যেমন বড় হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে সত্যের প্রতীক হিসেবে সুঁদীপুরের বটতলা তেমনি এই গল্পের মুখ্য বিষয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎস ও তার পাশ্চাতে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মিথ্যাবাদী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান চরিত্র সম্পর্কে লেখকের বোধসঞ্জাত অভিজ্ঞতাই "কলকাতার দাঙ্গা ও আমি"-র মূলকথা। এখানে কলকাতার দাঙ্গার প্রতি লেখকের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সমাজ ও জীবনের প্রাচীন মূল্যবোধের উপর তীব্র আঘাতই তাঁকে এ গল্পে বেদনার্ত করেছে। শহর ও গ্রামীন জীবনের দাঙ্গা সম্পর্কে বিপরীত বোধ—একদিকে তীব্র সংঘর্ষ, বিদ্বেষ, হানাহানি, ভ্রাতৃহত্যা অন্যদিকে গ্রামীণ লোকায়ত জীবনে তার অনুপস্থিতি লেখককে যেমন দাঙ্গার কারণ ও দাঙ্গাকারীদের প্রতি গভীর ভাবে বিদ্বিষ্ট করেছে তেমনি গ্রামীণ সমাজে হিন্দু-মুসলমানদের প্রীতি ও সদ্ভাবকেও তিনি অনির্বান ভাবে জাগ্রত রেখেছেন।

রাত্রে গো-গাড়ীতে গ্রামে ফিরছিলেন তিনজন - লেখক, নিতাই বাউল এবং গাড়োয়ান শেখ। হঠাৎ লাভপুরের পীচ রাস্তার ধারে চৌহাট্টার কাছে সুঁদীপুরের বটতলায় (যেখানে শতাব্দী ধরে ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ঘটেছে) এসে প্রলয় ঝড় ওঠে। নিতাই বাউল বলে যে এই বটতলায় যারা নিজের পাপকে সত্যভাবে অকপটে ব্যক্ত করবে তাদের এই ঝড়ের প্রলয়লীলা স্পর্শ করবে না, এমনকি পাপও স্পর্শ করতে পারবে না। নিতাই ও দরিদ্র শেখ রাজী হয়েছে। কিন্তু লেখক ইতস্তত: বোধ করেছেন। শুধু লেখকই নন, তথাকথিত ভদ্র উচ্চবিত্ত শিক্ষিতের দল কোনদিনই নিজের পাপকে অকপটে স্বীকার বা ব্যক্ত করতে সক্ষম নন অথচ পল্লীর এক দরিদ্র অশিক্ষিত সরল মানুষ নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছে যে সে তার পাপ ঠিক ঠিক বলবে। "এই গল্পে পল্লীর অশিক্ষিত সরল মানুষ আর মহানগরীর সভ্যতাভিমানী অভিজাত পুরুষের বিপরীত চরিত্র ধর্মই গল্পসত্যের রসমোক্ষ রচনা করেছে।" (২৫) এখানে শিল্পিমানসের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, রাজনীতির চরিত্র ও তার রূপরীতি সম্পর্কে সচেতনতা লেখকের শ্রেয়োবোধেরই ফসল।

নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান ঃ- মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর দিন চারদিক নিস্তব্ধ। ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জানুয়ারী গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণে লেখকের মানসিক অবস্থার কথা এই গল্পে চিত্রিত। যিনি সত্য ও অহিংসার মহাব্রতে শুধু আত্মজীবনকেই উৎসর্গ করেন নি, বিশ্বজীবনকেও পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, হিংসার গুলিতে তাঁর মৃত্যুবরণ যেন ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর জীবনের যবনিকাপাত এমনভাবেই হয়েছিল। স্বাধীনতার পরই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। "হিন্দুমহাসভা" সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মেতে ওঠে । এই সভারই সদস্য নাথুরাম গডসে গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যা করে। সেদিন থেকেই হিংসার রাজনীতি শুরু হয়।

ময়দান ঃ- এই গল্পে যে রাজনীতির ইঙ্গিত আছে তা বামপন্থী আন্দোলন। নিষিদ্ধ হওয়ার জন্যে রাজনৈতিক কর্মীগণ গোপনে চলাফেরা করে। শাসনক্ষমতা লাভ করায় সেই রাজনীতির চাপে এরা আত্মগোপন করে থাকে। আবার

যখন এই আত্মগোপনকারীর দল শাসন ক্ষমতা লাভ করবে তখন বর্তমান শাসকগোষ্ঠীও আত্মগোপন করে থাকবে। অর্থাৎ, নোংরা রাজনীতির ইঙ্গিত তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন—যা বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বাস্তব।

বরমলাগের মাঠ ঃ- গল্পটির উপসংহার "তেভাগা" আন্দোলন দিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে শিবনাথ মার্ক্সীয় জীবনবাদে বিশ্বাসী। "লাঙ্গল যার জমি তার" এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও বরমলাগের আঠার বিঘা উর্বর জমি লাভজনক ভেবে নিলামে ক্রয় করেন, অথচ এই জমি দরিদ্র বলরাম পুরুষ পরম্পরায় শ্রম দিয়ে তৈরী করে। দেশে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। মনিবের এক ভাগ এবং দুভাগ চাষীর। বলরাম তেভাগা আন্দোলনে যোগ দেয়। ধানের ভাগ নিতে সদলবলে বলরাম শিবনাথবাবুর কাছে এলে শিবনাথ তাকে গুলি করে হত্যা করেন।

এই গল্পে শিবনাথের চরিত্রে দ্বৈতরূপ দেখা যায়। জমির চাষ করার জন্যে চাষীকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করেছেন, বেশী ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অন্যদিকে বলরামকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। মুখে প্রগতির কথা বললেও জমিটুকুর লোভ দমন করতে পারেনও নি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক, পরিবর্তনকে মেনে নিলেও সামন্তপ্রথা বা জোতদারী প্রথাকেও সমর্থন জানিয়েছেন। আসলে পুরাতনকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে নতুনের আগমন ঘটানোর পক্ষে তারাশঙ্করের সায় ছিল না কোনদিনই। তারই জ্বলন্ত উদাহরণ গল্পটি। সেই সঙ্গে সুবিধাবাদী রাজনীতি-ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র তুলে ধরেছেন গল্পকার তারাশঙ্কর।

বিস্ফোরণ ঃ- এই গল্পে কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা চিত্রিত । আজ যেখানে রাম-রহিমের দৃঢ় বন্ধুত্ব, দুদিন পরে সেখানেই ঘটে যায় ভ্রাতৃহত্যার জঘন্যলীলা। এই দাঙ্গা মূলতঃ কেন্দ্রীভূত থাকে সেই সব দরিদ্র আশ্রয়হীনদের মধ্যে। অথচ দাঙ্গা সৃষ্টিকারী বা মদতদাতাগণ দূরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে ভোগ-সুখের লালিত্যে আনন্দে থাকে। মহানগরীর বুকে রামতারণ, নটবর ও ইসমাইল এই তিনজন মোটর গ্যারেজে অত্যন্ত সখ্যসূত্রে বাস করত। যখন টিনের বেড়ার ঘরের চারদিকে শুধু " আল্লা হো আকবর, বন্দেমাতরম্"—বলে চিৎকার করে ভ্রাতৃহত্যায় মেতে ওঠে তখনও এই তিন প্রাণী একসঙ্গে বসে আকণ্ঠ মদ খায়। কিন্তু প্রবৃত্তি তাড়িত আদিম বর্বরতার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ রামতারণ ইসমাইলকে হত্যা করেছে। আত্মরক্ষার জন্যে সংগৃহীত অস্ত্র ও বোমা দিয়েই শেষ পর্যন্ত রামতারণ বোমার আঘাতে নিজেকে ও নটবরকেও শেষ করে দেয়।

১৯৪৬-এর মুসলীম লীগ বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসার পর মহম্মদ আলী জিন্নাহ্-এর চক্রান্তে নেমে আসে ভয়াবহ দাঙ্গা। কী ভীষণ, ভয়াল ও নিষ্ঠুর আকার নিয়েছিল, এই গল্পে তার ইঙ্গিত মেলে। এই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান এক এবং অভিন্ন—যেন ভারত জননীর দুটি হাত । সেই হাত পরস্পরে ভাঙ্গাভাঙ্গি করলে দেশের মঙ্গল হয় না, উন্নতি হয় না, শান্তি আসে না। দাঙ্গা দেশ থেকে চিরতরে বিদূরিত হোক, মিলিত হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সবল পেশীর দ্বারাই ভারতের আর্থিক ও মানসিক উন্নতি সম্ভব—এই কথাই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁর বক্তব্য।

একটি মুহূর্ত ঃ- "ফ্যাসী বিরোধী লেখক সংঘ" ত্যাগ করার পর তারাশঙ্করের এই গল্পটি। এখানে রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট। বাম ও ডান উভয় পন্থীকেই লেখক কটাক্ষপাত করেছেন। বিশেষ করে বামপন্থী লেখক অমরেন্দ্র অদ্ভুত চরিত্র। সে লেখার বেলায় বামপন্থী অথচ কর্মে ও লক্ষ্যে তার মিল নেই। এখানেও সুবিধাবাদী রাজনীতির কথা বলা হয়েছে।

শিলাসন ঃ- "শিলাসন" গল্পেও বামপন্থী রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে বামপন্থীগণের যে গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে যোগদান, তারই ইঙ্গিত আছে।

রবিবারের আসর ঃ- "রবিবারের আসর" এক বৈঠকী গল্প। এখানে কলেজের ইউনিয়নের উল্লেখ আছে। মনে হয় বামপন্থী প্রসঙ্গতঃ এসেছে।

মানুষের মন ঃ- এই গল্পের নায়ক ভবেন্দ্র বি, এ পড়াকালীন গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশসেবার কাজে মেতে ওঠে এবং এই সময় সে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাগারে যায়। সে নিজের জেলায় দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী। দুর্ভিক্ষের সময় ভবেন্দ্র গ্রামবাসীদের সেবা করেছেন, চরকা কেটেছে, খদ্দর পরেছে। স্ত্রী সুভাষিণী ধনীর কন্যা। তার বাক্যবাণে ভবেন্দ্র গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে চায়। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে রাজনীতি মুখ্যতঃ দায়ী। চার বছর পর দেখা যায় ভবেন্দ্রর স্ত্রী সুভাষিণীও বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে এসেছে এবং স্বামীর আদর্শকে গ্রহণ করে সেও চরকা কাটে, খদ্দর ব্যবহার করে, সেবা সমিতিতে কাজ করে, গ্রামে নৈশ বিদ্যালয়ে কাজ করে। স্ত্রীর আঘাতে ভবেন্দ্রর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে কন্ট্রাকটারী করে বহু অর্থের মালিক হয়। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে। স্বামীর এই অধঃপতনের সংবাদে স্ত্রী সুভাষিণী আত্মহত্যা করেছে। ভবেন্দ্রর কাছে রাজনীতি অপেক্ষা স্ত্রীর অপমান বড় হয়েছে।

ভুলোর ছলনা ঃ- এ গল্পেও রাজনীতি প্রসঙ্গত এসেছে। ১৯২৯ সাল, তখন এখনকার পঞ্চায়েতের মত ইউনিয়ন বোর্ড ছিল। লাভপুরে তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন স্বয়ং লেখক। তখন কংগ্রেসী বোর্ড ছিল। দেশ সেবা করার জন্যেই লেখক প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। গল্পের মূল অংশের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগসূত্র নেই।

এই পর্যায়ে " এ মেয়ে কেমন মেয়ে" গল্পটিও উল্লেখ্য। এই গল্পের শিবানন্দ স্বামী পূর্বজন্মে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগও করেছিলেন। সামান্য জমিদারী তাঁর ছিল। ১৯৩০-৩২ সালে জেলে ছিলেন এবং জেল থেকে বেরিয়ে বৈরাগ্য নিয়েছিলেন। কারণ দেশে ও গ্রামে তখন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের কাছে তিনি অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সম্পত্তি গ্রাস করতে ধনীরা ইংরেজদের মনতুষ্টি করে তাঁকে দেশছাড়া করতে চেয়েছিল। তাই শিবনাথ শিবানন্দ হয়ে দেশান্তরী হন এবং সম্পত্তি গৃহদেবতার নামে সমর্পণ করে যান। স্বাধীনতার পর তিনি আইনসভার সভ্য হন। শেষে স্বগ্রামে ফিরে এসে নিরন্নদের অন্নদান ও দুঃস্থদের পথ্যের ব্যবস্থা করেন—তৈরী করেন সেবাশ্রম। ডোম পরিবারের এক বধূর চারিত্রিক সততা প্রতিষ্ঠাই এই গল্পের মূল বক্তব্য—রাজনীতির সঙ্গে এর কোন যোগ নেই।

চন্দ্রজামাই এর জীবন কথা ঃ- ভরদ্বাজ গোত্রীয় কুলীন সন্তান চন্দ্রকান্ত লাভপুরেই বিয়ে করে ঘরজামাই থাকেন, নাট্যামোদী। নাটক করতে করতে কখন সে তাঁর অন্তরে দেশাত্মবোধ জন্ম নিয়েছিল তা বিস্ময়কর । বৃদ্ধবয়সে কংগ্রেসে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান এবং জেল থেকে মুক্তি লাভের পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এখানে রাজনীতির প্রবেশ অকস্মাৎ ও আবার সমাপ্তি, হঠাৎ।

কয়েকফোটা রক্ত ঃ- এই গল্পে রাজনীতি এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। "ভারত রক্ষা আইন"-এর প্রসঙ্গ আছে। চন্দ্রশেখরবাবু আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান। এই গল্পে লেখকের পরিবার-জীবনের ছাপ স্পষ্ট।

গোপাল বাঁধের ইতিকথা ঃ- গল্পটিতে "ভারতছাড়" আন্দোলন প্রসঙ্গত এসেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা আছে। ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী জহরলালের স্বাধীনতার আহ্বান এই গল্পে আছে, আবার অসহযোগ আন্দোলনের ছোঁয়াও আছে। তারাচরণ একজন যথার্থই দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত প্রাণ। সে সরকারী ১৪৪ ধারা ভেঙে জেলে গেছে। গান্ধীবাদ এখানে স্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত। স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক চেহারা এখানে রয়েছে।

সখীঠাকরুণ ঃ- এই গল্পে চকিতে বিভিন্ন রাজনীতির কথা এসেছে। এখানে কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা ও বামপন্থীদের কথা থাকলেও এদের ভূমিকা নেই।

বেদের মেয়ে ঃ- এই গল্পে রাজনীতি এসেছে। বলতে গেলে সমস্ত গল্পের কাহিনীজুড়েই রাজনীতির ছায়া অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। গল্পের নায়ক প্রভাত কংগ্রেসী করে। গান্ধীজীর ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেয়। বেদের মেয়ে শিবি প্রভাতকে প্রথম দেখেছে ও ভালবাসায় প্রত্যাখ্যাতা হয়েছে। কিন্তু পূর্বরাগ প্রবলতর হয়েছে। তাই প্রভাতকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করে সে প্রভাতের বাড়ী গেছে, প্রভাতকে নিজের ঘরে লুকিয়ে রেখেছে। প্রভাত এবারেও শিবির আকর্ষণকে উপেক্ষা করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। স্বাধীনতা হবার পর শিবি প্রভাতকে দেখবার জন্যে ছটপট করে। শিবির স্বামী ভোলা ডাকাত। সে গ্রামের নতুন হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর বাড়ী চুরি করতে গিয়ে গুলি খেয়ে ঘরে ফেরে। শিবি তাকেও প্রভাতের মত বিছানায় লুকিয়ে রাখে। যে গুলি করেছিল সে ডাক্তারের বন্ধু প্রভাত। দারোগাকে নিয়ে প্রভাত শিবির বাড়ী আসে, দারোগা ভোলাকে খুঁজে পায় না। শিবির চালাকি প্রভাতের জানা ছিল। ভোলাকে বিছানা চাপা থেকে বার করতে গিয়ে শিবির ছুরির আঘাতে প্রভাত মারা যায়। গল্পটি প্রেম ঘটিত হলেও রাজনীতির একটা সুপ্ত অবস্থান থেকে গেছে এখানে।

প্রত্যাখ্যান ঃ- এখানে সুকুমার চৌধুরীকে স্বদেশী "ডিটেনশন" আইনে এক গ্রামে থানার পাশে আনা হয়। সুকুমারের আত্মীয়রা দেশের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। সুকুমার গাঁয়ের এক মেয়েকে এক দুষ্টলোক ও এক কনষ্টেবলের হাত থেকে বাঁচায়। ১৯৩০ সালে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে জেলে যায় ও গ্রামে স্বদেশী ভান্ডার খোলে; গায়ে খদ্দরের জামা পরে এবং পুরোপুরি গান্ধীবাদী হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর সুকুমার দেশনেতা হয়। আবার পরে স্ত্রী মারা যাবার পর সুকুমার রাজনীতি ছেড়ে বৈরাগ্য নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে। সুকুমারের সংস্পর্শে এসে খোঁড়া চক্রবর্তীর কন্যা গীতাও স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এখানে গীতার জীবনে ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বিধৃত, আবার সুকুমার অন্য মেয়েকে বিয়ে করলেও সে সুখী হয় নি—বিপত্নীক হয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে।

স্বাধীনতা ঃ- তারাশঙ্কর রাজনীতির ক্ষেত্রে কখনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর শুচিশীলিত জীবনচর্যায় অহিংসার মন্ত্রকে আজীবন প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী ছিলেন। জগৎ নিয়ন্ত্রক যিনি অর্থাৎ Supernatural Power কে তিনি

কখনই অস্বীকার করেন নি। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করেছেন। লেনিনের শ্রেণীহীন সমাজ, সাম্যবাদের মহত্ত্বকে কখনই অস্বীকার করেন নি, আবার ঈশ্বরকেও অবিশ্বাস করেন নি। "স্বাধীনতা" গল্পে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মবাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই "আকাল হাড়ি" সাদা ইংরাজকে সামনে পেয়েও প্রতিশোধ নিতে পারেন নি। এখানে গান্ধীবাদ প্রকট।

সুতরাং এই গোত্রের গল্পগুলিতে কোথাও রাজনীতি প্রকট, কোথাও বা সুপ্তভাবে কাহিনীদেহে ক্রিয়াশীল।

পাদটীকা

১।	তারাশঙ্কর : দেশ, কাল, সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ৪৭
২।	আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩৩
৩।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ৩২
৪।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ৫০
৫।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ৪৭
৬।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ৫২
৭।	আমার কথা (শনিবারের চিঠি মাঘ, ১৩৭১)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ২৬৫
৮।	কালের পুত্তলিকা	:	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃ. ২৪২
৯।	চৈতালী ঘূর্ণি	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১২১
১০।	আমার সাহিত্য জীবন	:	ঐ	পৃ. ৯১
১১।	ধাত্রীদেবতা	:	ঐ	পৃ. ২৬৯
১২।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ১৭৪
১৩।	আমার ধ্যানের ভারত	:	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	পৃ. ১-২
১৪।	ঐ	:	ঐ	পৃ. ২৬
১৫।	শিল্পীর স্বাধীনতা (দেশ)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৬০৫-৬০৬
১৬।	তারাশঙ্করঃ দেশ কাল সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	পৃ. ৭৬
১৭।	আমার কথা/শনিবারের চিঠি (জ্যৈষ্ঠ১৩৭৪)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১১৯
১৮।	বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন (ভাষণ)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীঃ ১৯৪২	
১৯।	শিল্পীর স্বাধীনতা (দেশ)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৬০৫-৬০৬
২০।	কীর্তির্যস্য সজীবতি (কালি ও কলম অগ্রহায়ণ-১৩৭৮)		হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	পৃ. ৫৫৫-৫৫৬
২১।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর : মুক্তি চৌধুরী/ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (১৯৭০,মে)			পৃ. ১৫৮
২২।	আনন্দবাজার ১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৮, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে			
২৩।	মহাত্মা (৬ষ্ঠ খন্ড)	:	টেন্ডুলকর	পৃ. ২৩৮
২৪।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর	:	ডঃ মুক্তি চৌধুরী	পৃ. ১১২
২৫।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (৩য় খন্ড)	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৩৯

* * * * * * * * * *

পঞ্চম অধ্যায়

নারী চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ

নারীচরিত্রের রূপ ও স্বরূপ

ছোটগল্পের বিচিত্ররূপ—বহুবিধ তার রীতি। দুনিয়ার সবকিছুই ছোটগল্পে ঠাঁই পেয়েছে। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজসমস্যা, রোমান্টিক জীবনবোধ, শিহরণ, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, কৌতুক, নরনারীর প্রেম, ব্যক্তিত্বের সমস্যা প্রভৃতি উপকরণ ছোটগল্পে বিধৃত হয়েছে। তাই ছোটগল্পের সীমাহীন বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ঘটনা, চরিত্র, বিষয় ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তাকে একটি নিজস্ব জীবনবোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত ভাবলোকে পৌঁছে দেওয়াই ছোটগল্পকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রথমদিকে ছোটগল্প রোমান্টিক ভাবাবেগে ছিল পূর্ণ। 'কল্লোল' যুগে আসে এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত এক মুক্তিলাভের দুর্বার রোমান্টিক পিপাসা। এই বিশ শতক হল সংশয়ের, হতাশার, প্রত্যয়ভঙ্গের যুগ। শিল্পীর চিন্তার মানসপটে ভেসে উঠল। "Plain living and high thinking." ইংরেজী শিক্ষা যতই এদেশে বেড়েছে ততই এদেশীয়দের আত্মোপলব্ধির চেতনা বেড়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। শিক্ষিত বেকারত্বের সংখ্যা ঊর্দ্ধমুখী হয়, চারদিকে হতাশা। ফ্রয়েড-এর তত্ত্বকে বাস্তব পটভূমিতে প্রয়োগ করে যৌনচিন্তাকে ইংল্যান্ডের চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যাভলক প্রতিষ্ঠা দিলেন। পৃথিবীব্যাপী অবসন্নতার যুগে ফ্রয়েড-এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের তরুণ সমাজ গ্রহণ করল। নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের গুপ্ত রহস্যদ্বার উন্মোচিত হল। যৌবনের নিষিদ্ধ কৌতূহল জানার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে বিজ্ঞান সমর্থিত হয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন নব্যশিল্পীগণ। প্রণয় প্রবৃত্তির জটিলতা, অতৃপ্তি, দেহমনের নগ্নতা, নিরাভরণ ক্ষুধা তৃষ্ণা জড়ানো মানব-মানবীর চরিত্র চিত্রণ বিচিত্র আধারে প্রতিবিম্বিত হয়ে ছোটগল্পে স্থান পেল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বস্তুনিষ্ঠ জীবনের অচলায়তনে সেই অতলান্ত পাতাল-পুরীতে প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাওয়া গেল।

মানুষের মনের গোপন রহস্যের সন্ধানে সকলেই আগ্রহী। মানুষের মনের সন্ধান করতে হলে মনের অজানা দুই প্রকোষ্টের অর্থাৎ অবচেতন ও অচেতন মনের স্বরূপ জানতে হবে। "ফ্রয়েডের" বিখ্যাত তত্ত্ব "স্বপ্ন" ব্যাখ্যা হল এই অবচেতন মনের পথ প্রদর্শক। স্বপ্নের দ্বারাই আমরা আমাদের ইচ্ছাকে কাল্পনিক ভাবে চরিতার্থ করি। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে মানুষের চিন্তার জগতে ফ্রয়েডের রচনা চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অচেতনমন, যৌনতাবাদ, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অবাধ ভাবানুষাঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি—ফ্রয়েডের এ সব আবিষ্কার মানুষকে অবাক করে দিল। সাহিত্যে, মনোবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, সমাজবিজ্ঞানে, চিকিৎসাশাস্ত্রে ফ্রয়েডের প্রভাব হাওয়ায় ভাসা তুলোর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।"[১] চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়িত ফল হল মন। এই মনের উদ্দেশ্য গুলোর উৎসে রয়েছে তিনটি স্তর। যেমন অদস (id) অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super-ego)। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অদসের মধ্যেই অবস্থিত। এই অদসের কাছে মূল্যবোধ বা ভালমন্দ বলে কোনো জিনিস নেই। অদসের একমাত্র লক্ষ্য হল সুখভোগ। অহং এর উৎপত্তি অদস থেকেই। অদসের শক্তিকে ফ্রয়েড কামপ্রেরণা বা Libido বলেছেন। বর্হিজগতের সঙ্গে সংঘাতের ফলে অহং Super ego এর জন্ম দেয়। ঈডিপাস এষণা অর্থাৎ মায়ের ছেলের যৌন আকর্ষণ থেকেই শুরু হয় অধিশাস্তা। অন্তরের অতৃপ্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থেকে যায়। তার ফলেই সমাজ জীবনে অন্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌন উন্মাদনায় নারীপুরুষ অন্যায় করে বসে তার অবচেতন মনের প্রেরণায়। চেতনমনের পর্দায় যখন কৃতকর্মের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় তখন মানুষ দুঃখ অনুভব করে থাকে। সুইডিশ গল্পকার "পার লাগোরভিস্ট" এর "The lift that went down into hell" গল্পে স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে যৌনক্ষুধার তাড়ায় শহরের ধনী ব্যবসায়ী স্মিথের অঙ্কশায়িনী হতে যায়। সন্ধ্যায় তারা দুজনে সুরাসক্ত হয়ে ছাদে আকাশ ভরা চন্দ্র তারা দেখে লিফটে চড়ে নীচের ঘরে নামতে থাকে। এই সংকীর্ণ পরিসরে নামবার সময় পরস্পরে চুম্বন করছে। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে যায়। লিফট্ তবু থামছে না, লিফট্ থামল এসে একেবারে নরকের দ্বারে। শয়তান এসে সামনে দাঁড়াল। শয়তান বলে যে তাকে দেখে ভয় পাবার কারণ নেই। নরকে আজকাল যন্ত্রনা দেওয়া হয় না। তাদের আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল শয়তান। নায়কও নায়িকার যখন বহুদিনের প্রত্যাশা নির্জনে পরিতৃপ্তি হতে চলেছে তখনই ঘরে ছায়া মূর্তিকে মদের গ্লাস নিয়ে ঢুকতে দেখল নায়িকা—এ তো তার স্বামী। কপালে তার গভীর ক্ষত। মেয়েটি বুঝতে পারল যে তার দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে স্বামী রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। এই দৃশ্য অসহ্য বলে মেয়েটি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। ভোগ করে মানসিক যন্ত্রনা। তীব্র অনুশোচনার ফলে সে আবার উপরে ওঠার অধিকার পেল। অবচেতন মনের দ্বারা কৃত-অন্যায় চেতনমনের শুদ্ধতায় পরিশুদ্ধ হয়ে নায়িকা নবজীবন লাভ করল।

"Ibsen"-এর "Dolls House" এর নায়িকা "Nora", "Bernard Shaw" এর "Arms and the man" এর "Raina" D. H. Lawrence" এর উপন্যাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। "গল্পগুচ্ছ" ও "তিনসঙ্গী"তে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র স্বভাবের নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাদের জটিল দ্বন্দ্ব মুখর জীবন ও ব্যক্তিত্বের রহস্যময়তা এবং সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্প ছাড়াও

উপন্যাসেও তিনি নারীর বিচিত্র চরিত্র চিত্রণ করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর প্রেম প্রথমে ছলনা, ক্রমান্বয়ে প্রলোভন, চাতুরী, আত্মসমর্পণ ও নিবেদন, পূজা ও আরতির মধ্যে দিয়ে শুদ্ধতা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও নারীজাতির হৃদয়ের অতৃপ্তিজনিত খেদ বড় হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে অশান্তি দ্বিতীয়া স্ত্রী কুন্দনন্দিনীর জন্যে স্বামীনগেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে। কুন্দর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছেন সূর্যমুখী। আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল চরিত্র বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে ভ্রমর চরিত্র। ভ্রমরের নিঃস্বার্থ ভালবাসার মূল্য গোবিন্দলাল দেয়নি। তাই অভিমানহত ভ্রমর স্বামীর কাছে থাকতে চায়নি, সে মৃত্যুর পর জন্মান্তরে সুখী হতে চেয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম "পতিগত প্রাণা" এই ধারণাকে সে অবিশ্বাস করেছে। এই উপন্যাসের রোহিণীর তৃষ্ণা শুধু প্রেমে আবদ্ধ নয় তা জীবনতৃষ্ণায় আশ্লিষ্ট। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বিমলার চরিত্রও গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও অতৃপ্তির যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত। শরৎচন্দ্র বাংলাদেশে নারীজাতির প্রতি অবহেলা ও সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হন। যদিও সামাজিক সংস্কারের উর্দ্ধে তিনি সর্বত্র উঠতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এর একদিকে মহিমের শান্ত, ভাবাবেগহীন সরল আহ্বান অন্যদিকে অর্থের গর্বে, উন্মত্ত আবেগে সুরেশের ব্যাকুল আহ্বান এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে অচলার চরিত্র ক্ষতবিক্ষত। "শেষপ্রশ্ন"-এ কমলাও অতৃপ্ত হৃদয়ের চরিত্র। একই পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন জোড়াতালি দিয়ে থাকতে চায়নি।

এবারে কয়েকজনের গল্প নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের "পোষ্টমাষ্টার' গল্পে রতন পোষ্টমাষ্টারের সেবা করতে গিয়ে পরিচারিকা, ভগিণী ও জননীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার রোগশয্যায় পোষ্টমাষ্টারের পাশে থাকতে থাকতে রতন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। 'শাস্তি' গল্পে চন্দ্ররার প্রবল অভিমান তাকে জীবন বিমুখ করে তুলেছে। বিরামহীন মানসিক যন্ত্রনার 'টেল' 'নষ্টনীড়' গল্পটি। চারুলতার অবচেতনস্তরে অমলকে পাওয়ার জন্যে প্রেমের আসন পাতা হয়েছে ফলে স্বামী ভূপতির সঙ্গে ব্যবধান বেড়েছে। সর্বতোভাবে পরাভূত ও বিপর্যস্ত হয়ে চারুলতা নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রনার তুষারগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে। "স্ত্রীর পত্র" গল্পে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার ও অন্ধআচার সর্বস্বজীবন থেকে মুক্তি পাবার সংগ্রাম ও মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অটল মৃণাল। রবীন্দ্রনাথের "দেনাপাওনা" মূলতঃ পণপ্রথা কেন্দ্রিক। বাঙালী সমাজে কুপ্রথার ফলে এক অনূঢ়ার বিবাহোত্তর জীবনের শোচনীয় পরিণতি। নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে পনের টাকা বাকী থাকার জন্যে নির্মম লাঞ্ছনা পেয়েছে। নিরুর অবচেতন স্তরে যে না পাওয়ার হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলেই তিলে তিলে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নারীজীবনের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, নৈরাশ্য-অভীপ্সা, কদর্যতা-ইতরতা, মাহাত্ম্য ও নীচতা সবই ধরা পড়েছে রবীন্দ্র গল্পের সৃষ্টনায়িকাদের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র প্রেমের বিচিত্র রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছেন। নির্লিপ্ত, উদাসীন, নিরাসক্ত স্বামীর মন জানতে জঘন্য পথের আশ্রয় নিয়েছে ধনবতী, অভিমানিনী কমলা "কাশীনাথ" গল্পে। শেষে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজ কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরেছে। স্বামীর পদতলে আশ্রয় নিয়েছে। নারীর মাতৃত্বকে উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা হিসাবে শরৎচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "মেজদিদি"; "অভাগীর স্বর্গ" তে বাগদী ঘরের বৌ অভাগী স্বামী প্রত্যাখ্যাতা হয়েও পুনঃ বিবাহের বা চরিত্র হননের সুযোগ পেয়েও পথভ্রষ্টা হয়নি। আবার ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিণীর শবদাহের সমারোহে মুগ্ধ হয়ে নিজের জন্যেও ঐরূপ চিতা সজ্জা কামনা করেছে। যদিও বৈষম্য সমাজ ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য হেতু তা সম্ভব হয়নি।

এরপর আসে "কল্লোল" যুগ। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে এই পর্বের লেখকগণ ব্রাত্য, পতিত নীচুতলার অখ্যাত নরনারীর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা লেখেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর হতাশা ক্লিষ্ট, দারিদ্রে জর্জরিত মানুষ সাম্রাজ্য বাদীর বিরুদ্ধে জাতীয় উত্তাল তরঙ্গে নিষ্ফল আন্দোলনে এগিয়ে যায় যুবশক্তি, অন্যদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন লোকের আবিষ্কার সেইসঙ্গে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষন্নতাবোধ, নৈঃসঙ্গ বিষাদ, অতৃপ্তি সংশ্লিষ্ট জীবনের ছবি উপন্যাস ও গল্পে বিধৃত হয়। যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, আদর্শ পূজা, অবক্ষয়, যৌনপ্রবৃত্তির আতিশর্য্য, কলঙ্কের বেসাতি, বিদ্রোহীচেতনা ইত্যাদি কল্লোলের লক্ষণ প্রবোধ কুমার সান্যালের লেখায় স্পষ্ট। আবার রাণীগঞ্জ ঝড়িয়া প্রভৃতি কয়লা খনিতে কর্মরত অসংখ্য আদিবাসী নরনারীর বিকৃত যৌনতা, দ্বন্দ্ব জটিলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার লৌহশৃঙ্খল শাসনের চাকায় নিরীহ নারীদের অমানবিক ও নির্মম নির্যাতনের কথা চিত্রিত। তাঁর "কয়লা কুঠী" "নারীর মন" "নারীমেধ" প্রভৃতি গল্পে এর প্রমান মেলে। 'বিহ্বল ভাববিলাস, বাস্তবের দিকে ঝোঁক, দরিদ্র নিম্নবিত্তের প্রতি পক্ষপাত, স্বপ্ন ও সংগ্রাম বিমুখতা-এইসবের যোগফল কল্লোলের মানসিকতা, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য কুমারের গল্পে তার রূপায়ণ হয়েছে।" (২) প্রেমেন্দ্র, মিত্রের "বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে" গল্পটিতে এক পতিতার বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার কাহিনী স্পষ্ট। ক্ষুধাতুর বারাঙ্গনার অতৃপ্তি চোখে পড়ে। পরকীয়া প্রেম প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতে সার্থক হয়েছে। যেমন স্টোভ, 'ভস্মশেষ', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' প্রভৃতি গল্পে। "সংসার সীমান্তে" এক বারাঙ্গনা রজনীতে চোর অঘোর এর পারস্পারিক

প্রেম, ভালবাসা এই নোংরা জীবন ত্যাগ করে দুজনে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্নে বিভোর। হঠাৎ ধার শোধের কুড়ি টাকা জোগার করতে চুরি করতে যায় এবং ধরা পড়ে পাঁচবছরের জেল হয় অঘোরের। কলকাতায় নোংরা কুৎসিত পথের ধারে বিগত যৌবনা রজনীর নতুন পথিকের আগমনের আশায় অন্ধকারে ক্ষীন ডিব্বার আলোয় হতাশ নয়নে প্রতীক্ষা, এই অসাধারণ সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতেই সম্ভব। অচিন্ত্যবাবু সম্পর্কে বলা যায় 'উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবনযাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌনচেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেমচেতনা, আত্মসন্ধানী ব্যক্তির অস্তিরতা, ব্যর্থতা, স্বপ্নপ্রবনতা, সবটা মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার।" (৩)

এরপর তারাশঙ্করের পর্ব। কিন্তু তার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্মের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগের আতিশয্য, উচ্ছল যৌবনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বপ্নবিলাস-ই ছিল কল্লোলীয়দের বিদ্রোহী চেতনা। তারই পাশাপাশি ছিল হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি। যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতৃষ্ণ করে তোলে। বস্তুতঃ জীবন রহস্যময় ও গতিশীলতাকে চালনা করে অনিবার্য শক্তি হৃদয়ে অবদমিত 'ইদ' ও 'লিবিডো' এই দুই শক্তি ও যৌন বৃত্তি। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিকার বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়ে মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে লেখার জগতে প্রবেশ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীর মত মধ্যবিত্ত সমাজের ছলনা, প্রতারণা, কদর্যতা, ভন্ডামিকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষিত করেছেন কঠিন বাস্তবতার কাঠগোরায় দাঁড় করিয়ে। জীবন শিল্পী মানিক কোনদিন মুখোশ পরে কাব্য সংসারে আবির্ভূত হন নি, এটাই তাঁর অহংকার। তিনি নিজেই বলেছেন," সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়। বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।" (৪) মানিকের যৌনব্যাপার সম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের সার্থক রূপায়ণ "চতুষ্কোণ" উপন্যাস। এই পর্যায়ের গল্প হিসাবে "সর্পিল" দিবারাত্রির কাব্য" উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'অতসীমাসী' "বৃহত্তর ও মহত্তর" গল্পে নারীর মনোবিকার ও যৌন অস্থিরতার চিত্র স্পষ্ট। "স্নেহ প্রেম মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মুর্চ্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধ যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন শুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের কাজটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল, তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য, তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখদেখে আমার মনে হল, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ শৈশবে স্নেহ করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।" [৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে শ্রীকুমারবাবু বলেছেন, "ছোটগল্প ও উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নানা মুখী বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহার উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌন বিষয়ের প্রতি অতিপক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছে।" (৬)

'কল্লোল' যুগে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংশয়, অস্থিরতা, নাস্তিক্যবুদ্ধির প্রাবল্য, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্রোহ, রোমান্টিক পাশ্চাত্ত দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যে প্রতিফলিত রবীন্দ্রভাবের বিরোধী মনোভাব নিয়ে। "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরূদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন" (৭) লেখকদের রচনায় শুরু হয়েছে। ঠিক তখনই পল্লীবাংলার বিশেষ করে রাঢ় বাংলার বৈষ্ণব সমাজের রসমধুর প্রেম কাহিনী, নৈতিক বন্ধনমুক্ত পরকীয়া প্রেম সম্বলিত গল্প নিয়ে উপস্থিত হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু কল্লোলীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পীর বেশীদিন সম্পর্ক স্থায়ী হল না। মাত্র তিনটি গল্প "কল্লোলে" প্রকাশ হয়েছিল হারানো সুর, রসকলি ও স্থলপদ্ম। এর কারণ তারাশঙ্কর শহুরে লেখক নন, তিনি পল্লীর লেখক—রাঢ়ের মাটি আর মানুষের রূপকার। অচলায়তন সমাজ জীবনের পরিবর্তিত রূপের কারিগর। তাই তিনি কল্লোলীয় না হয়েও আধুনিক শিল্পী। তারাশঙ্করের গল্পে আস্তিক্য বোধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

তারাশঙ্কর তার ছোটগল্পে ও উপন্যাসে নারীর বিচিত্রলীলা ও গতির বর্ণনা দিয়েছেন। "নীলকণ্ঠ" (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর) তে গিরি, রাইকমল" (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর) তে রাইকমল, 'আগুন' (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) এ মীরা, 'কবি' (মার্চ ১৯৪২) বসন ও ঠাকুরঝি, কালিন্দী (১৯৪০) তে সাঁওতাল রমনী সারী, নাগিনীকন্যার কাহিনী (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) তে নাগীনকন্যা, সপ্তপদী (ডিসেম্বর ১৯৫৭) তে 'রিনা, মহাশ্বেতা (জুলাই ১৯৬০) এর নীরা, সুতপার তপস্যা (১৯৭১) তে সুতপা ইত্যাদি নারী চরিত্র বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিল রহস্যে পরিপূর্ণ। 'গনদেবতা' উপন্যাসে অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম মনস্তাত্ত্বিকতায় সার্থক। "মঞ্জরী অপেরা "(বৈশাখ-১৩৭১) তে বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার ছবি স্পষ্ট। যাত্রাদলের সুরাসক্ত যৌনচর্যা, অতৃপ্তি অস্থির জীবনতৃষ্ণা প্রতিফলিত। সমাজের অপাংক্তেয়, বে-পরোয়া মনোভাব, সামাজিক বন্ধনের ধার ধারে না অথচ মঞ্জরী দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে অনন্যা।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে নারীর বিচিত্ররহস্য অত্যন্ত প্রকট। রাঢ়বাংলার অশিক্ষিত আচারহীন যৌনসর্বস্ব গোষ্ঠীজীবনের প্রতিনিয়ত অসংগতি তাঁর নিখুঁত তুলির টানে বিধৃত। নারীচরিত্রের এই জটিল রহস্যের মাঝে পাঠকদের

দাঁড় করিয়েছেন তিনি। কেবলমাত্র বাঙালীর নানান সমাজের নারীর প্রতি সামাজিক বিধান ও সামাজিক অবস্থানই আলোচনা নয়-তারই সঙ্গে রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বকেও উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি প্রায়ই সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে মানবধর্মের হারজিতের দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। বেশীর ভাগ অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী চরিত্র ঘরের বন্ধন অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোকেই বেশী পছন্দ করে। অরুগ্ন বলিষ্ট হিংস্র নগ্ন বর্বরতা কেই আশ্রয় করেছে। তারাশঙ্কর দেশসেবা ও রাজনৈতিক কাজে পরিব্রাজকের মত প্রত্যন্ত পল্লীতে ঘুরেছেন। তিনি দেখেছেন রাঢ় মাটির স্বভাব রুক্ষতায় চরিত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত। গ্রামজীবনের নিম্ন জাতীয়া চরিত্রগুলি প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে বিচিত্র রহস্যের উন্মীলন ঘটিয়েছে। তাদের রিক্ত অমার্জিত জান্তব প্রবৃত্তি সামাজিক বিধি নিষেধ অনায়াসে অতিক্রম করে। নারী হৃদয়ে লুক্কায়িত নানা কলা-কৌশল, রহস্যময়, চালচলন, বিচিত্রগতি, অত্যাশ্চর্য কর্মধারা, কখনও সুতীব্র ভোগলিপ্সা, আবার কখনও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা। প্রেমের আকর্ষণে কখনও নারী স্বৈরিণী, আবার ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কখনও দানবিনী—এই হল রাঢ়ের লোকায়ত জীবনের নারীচরিত্র। বাহ্যিক সারল্যে ভরপুর বলে মনে হলেও আন্তঃ চরিত্র বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

একটি ছকের সাহায্যে তারাশঙ্করের সৃষ্ট নারী চরিত্রের গতিপ্রকৃতি দেখা যেতে পারে ঃ—

১। নীতি নিষ্ঠতা।

২। মাতৃত্ব

৩। পবিত্রতা।

একস্বামী বহুস্বামী অন্যপুরুষে

৪। সংকীর্ণতা।

৫। ছলনাময়ী।

৬। দ্বন্দ্ব, (সংস্কার লব্ধমন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব)

৭। ব্যাভিচারিণী (সামাজিক জীবনে বাস করেও অন্য পুরুষে আসক্তা)

৮। বারাঙ্গনা (মানবতাবাদ ও আশা আকাঙ্ক্ষা)

বলপূর্বক ইচ্ছাকৃত

৯। ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল

১০। অভিভাবকের অমতে প্রতিলোম বিবাহ।

১১। বিলাসিনী।

১২। প্রেম।

১৩। মিথ্যাভাষিণী।

১৪। অভিনেত্রী।

এখন ছক অনুযায়ী লেখকের গল্পগুলির আলোচনা করা যেতে পারে—

১। নীতিনিষ্ঠতা ঃ—নারী জীবন বহু ধারায় বিভক্ত। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসনে বন্দিনী হয়েছে চিরকাল। উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে অন্ত্যজ স্তরের নারীদের পুরুষেরা "কিনেছে অল্প দামে" । লোকায়ত জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা, ঘাত প্রতিঘাত, যৌন সমস্যা জনিত ঘটনার উত্থানও পতন নারী চরিত্রঅবলম্বনে রচিত হয়েছে। জীবনের চলার পথে এক একটি লক্ষ্যকে অবলম্বন করে রমণী বাঁচতে চায়। সেই লক্ষ্য বা নীতিথেকে কিছুতেই সে সরে আসতে পারে না। তার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত থাকে। এর উদাহরণ অনেক গল্পে পাওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র" যেখানে পনেরো বছর ধরে পত্নীজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে, "মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয় নারীত্বে, পত্নীত্ব নারীত্বের অংশমাত্র।" (৮)

বড় বৌ ঃ—স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের পারিবারিক কাহিনী। দুভাই ও দুই বৌ এর সুখের সংসার। সেতাব সরকার বড়ভাই, মিথ্যাবাদী অথচ তার স্ত্রী সুন্দরী ও বন্ধ্যা কাদু তার দেওর আত্মভোলা মহাতাপ কে সন্তান সম ভালবাসে। মহাতাপের স্ত্রী মানদা সন্দেহ করে, তথাপি কাদু বাৎসল্য-প্রেমের পথ থেকে নিজেতে গুটিয়ে নেয় না। সেতাবের কৌশলে সংসার ভাঙে; ভাইকে ঠকায়। কাদু এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও নগদ টাকা স্বামীর কাছ থেকে চুরি করে ভোর রাত্রে মহাতাপকে দিয়ে আসে। সেতাব কাদুকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নিলেও কাদু এতটুকু দুঃখ করে নি। মিথ্যা সন্দেহের জাল ছিন্ন করতেও চেষ্টা করে নি। মহাতাপকে সন্তানসম দেখত কাদু। এই কথা যেমন সে কাউকে বলেনি, আবার মহাতাপকে তার দাদা ঠকিয়ে নিক, এটাও সে সহ্য করতে পারে নি। একজন যথার্থ শান্তিময়ী জননীর নীতি থেকে কিছুতেই কাদু ভ্রষ্ট হয় নি।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ—অকৃতদার, তান্ত্রিক চণ্ডীরায়ের জীবনের একমাত্র মমতার স্বর্ণসূত্র বিধবা ভাগিনী চিন্ময়ী। চিন্ময়ী জীবনে সব হারিয়ে মামাকে সন্তানসম স্নেহ ও মমতায় আচ্ছন্ন করে রাখে। চণ্ডী তার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ্নীর নামে লিখে দেয়—যা চিন্ময়ীর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ। চিন্ময়ী কেবল মদ্যাসক্ত, আত্মভোলা মামার সুখের জন্যে চিন্তা করে। চণ্ডীকে ঠকিয়ে যখন মদের দোকানের মালিক সুদখোর গিরীশ জমি গ্রাস করতে এগিয়ে আসে, তখনই চিন্ময়ী মামার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে জমির উপর নিজের দখল দাবী করে। মামা তাই আদালতে মিথ্যা কথা বলে, চিন্ময়ীকে মিথ্যাবাদিনী সাজিয়ে সব সম্পত্তি মামলা করে কেড়ে নেয়। দুঃখে, ঘৃণায় ও অপমানিতা চিন্ময়ী নীতিভ্রষ্টা হয়নি। তাই সে ঘর থেকে চিরদিনের জন্যে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়। চণ্ডী মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে এলে চিন্ময়ী সেবিকার মত তাকে সেবা করেছে, মামার সমস্ত আবদার নীরবে পালন করেছে। কিন্তু যখনই তাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিয়েছে তখনই চিন্ময়ী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। যাবার সময় সে নিজের জিনিস কটাই নিয়ে গেছে। মামার কোনকিছু স্পর্শ করে নি। স্নেহ ও ভালবাসায় যদি একবার আঘাত আসে তাহলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। চিন্ময়ী মামাকে সুখী করতে ও মামার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তাকে বড় করে দেখেছিল কিন্তু যখনই সে দেখল যে এখানে থাকলে তার নীতির কোন মূল্য থাকবে না, তখনই সে পালিয়ে গেছে।

কালোমেয়ে ঃ—সারাজীবন আদর্শকে, আঁকড়ে ধরে শিক্ষকতা করে শেষ জীবনে পঙ্গু হয়ে যান উপীনবাবু। দুই পুত্র আদর্শ ভ্রষ্ট হয়েছে। একমাত্র কন্যা অত্যন্ত কালো নাম সুমতি। স্ত্রী মারা গেছেন, ছোট ছেলে পড়াশুনা করে। জীবন সায়াহ্নে উপীনবাবু কন্যাটির বিয়ে দেবার জন্যে শেষ সম্বল বাস্তু ভিটা বিক্রির উদ্যোগ নেন। কিন্তু সুমতি বাবাকে বলে যে সে বিয়ে করবে না। বৃদ্ধবাবার সুখের জন্যে সে দোকানে কাজ নেয়, সুমতি অত্যন্ত কুৎসিত বলে সে ভেবেই নিয়েছে যে এই নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থায় সে মূল্য হীন, তাই দাম্পত্য সুখ ভাগ্যে নেই। তাই বিয়ে না করে বাবা ও ভাইটির সেবা করে যাবে— এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়েছিল সুমতি। বাবা বাড়ী বিক্রি করবে সুমতিরই বিয়ের জন্যে। সুমতি নীতিভ্রষ্টা হতে চায় নি। তাই সে বাবাকে বলে "আমার বিয়ে দেবেন না বাবা। আমি কালো।" রাত্রির মত সুমতি সূর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করে যাবে। বাবা ভাইকে পথে ভাসিয়ে নয়।

মানুষের মন ঃ— সুভাষিণী পল্লীগ্রামের ধনীর কন্যা। এগার বছর বয়সে বিয়ে হয় শিক্ষিত চিন্তাশীল স্বদেশী 'ভবেন্দ্র'র সাথে। দারিদ্রের যন্ত্রনায়, সন্তান হীনা মাতৃত্বের জ্বালায় সুভাষিণী উপার্জনহীন স্বামীকে তিরস্কার করে। সুভাষিণী বিরাট ধনী হতে চায় নি। সে চেয়েছিল উপার্জনশীল স্বামী" ধনী বাবার উপর করুনা ভিক্ষাকে সে ঘৃণা করত। এই নীতি বোধে বিশ্বাসী ছিল বলেই সে অক্ষম স্বামীকে ভর্ৎসনা করে। স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বাপের বাড়ি গেলেও আবার স্বামীর ভগ্ন কুটিরে ফিরে আসে। চরকায় সুতো কেটে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে। এরপর স্বামী প্রচুর অর্থের মালিক ও মদ্যপ হয়ে দেশে ফিরলে, সুভাষিণী স্বামী দর্শনের পূর্বেই আত্মহত্যা করে। সুভাষিণীর নীতি ছিল উপার্জন করে সৎভাবে সাধারণ জীবন যাপন করা। যে স্বামীর চিন্তা ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার অভিপ্রায় অথচ সেই স্বামীই অসৎভাবে, ইংরেজদের অনুগ্রহে ধনীও মদ্যপ হয়ে আদর্শকে বির্সজন দিয়েছে। এই স্বামী তো সে চায় নি। এর জন্যেই তো সে দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে নি। নীতি ভ্রষ্ট হবার আগেই তাই গ্লানির চাপে মৃত্যুবরণ করেছে।

প্রত্যাখ্যান ঃ— পল্লীর গৃহস্থের কিশোরী গীতা দেশকর্মী সুকুমারের সংস্পর্শে এসে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে ও সুকুমারকে ভালবাসে। দেশ স্বাধীন হবার পর সুকুমার গীতাকে বিয়ে না করে M. A. পাশ এক রূপসীকে বিয়ে করে। ভালবাসা প্রত্যাখ্যাতা গীতা নতুন জীবন শুরু করতে জেদের বশে গ্রামের বিপত্নীক প্রৌঢ় পন্ডিতকে বিয়ে করে। পন্ডিতমশাই গীতাকে ভালবেসেছিল ও পেতে চেয়েছিল। গীতা পন্ডিতকে স্বামীত্বে বরণ করে একেবারে আদর্শ হিন্দু রমণীতে পরিণত হয়েছিল। যদিও সে বিধবা হয়েছিল। গীতা সুকুমারকে পাবার জন্যে জীবনে দুঃসাধ্য কাজ করেছে। সুকুমারের মন জয় করতে নিজেই নিজের ও সুকুমারের নামে দেওয়ালে কুৎসিত মন্তব্য লিখেছে অথচ সুকুমার তাকে গ্রহণ করে নি। তাই সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছে। সুকুমারের অস্তিত্বকে গীতা ঘৃণা করেছে। সুকুমার বিপত্নীক হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। যাবার পূর্বে তার সমুদয় সম্পত্তি গীতাকে উইল করে পাঠায়। গীতা তা প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি ভালবাসার মর্যাদা দেয় নি তার সম্পত্তিকে গীতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হিসাবেই দেখেছে। নীতির পরিবর্তন করে নি।

ধাত্রী পান্না এই নীতিবোধের জন্যেই নিজ পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে অপরের পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন।

২। মাতৃত্ব ঃ—নারীর জীবনের সার্থকতা তাঁদের মাতৃত্বে। সন্তান কামনায় বিবাহিতা রমণী জীবনের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ অনায়াসে বিসর্জন দেয় আবার সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রনা অকাতরে সহ্য করে। বৃক্ষের সার্থকতা যেমন ফলে, নারীর সার্থকতা তেমনি সন্তান প্রাপ্তিতে। সন্তানহীনা রমণীদের চিত্তে যে কী করুণ দুঃখ সঞ্চিত থাকে তা লেখকের কয়েকটি গল্পে পাওয়া যায়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিম্ন সর্বস্তরেই এই কামনা প্রকট।

স্থলপদ্ম ঃ—বিধবা বেলে সন্তান কামনায় দিশাহারা। সে সন্তানের জন্যে হারা বাউরীকে সাঙা করে। অন্যের ছেলে-মেয়েদের সে আদর করে এবং তারও এমন সন্তান হবে বলে সে স্বপ্ন দেখে। মেলায় গিয়ে হারা যখন বেলের জন্যে নানা সামগ্রী কিনে আনে বেলে তখন ঝুমঝুমি, ঝিনুক বাটি, অনাগত ছেলের জন্যে কিনে আনে। এই অনর্থক খরচে হারা প্রতিবাদ করলে বেলে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বেলে তখন অন্তঃসত্ত্বা। ক্ষুধায়, অনাহারে পরিশ্রমে বেলের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায় এবং বেলে পাগলের মত হয়ে যায়—শ্মশানে গিয়ে পুত্রের জন্যে কাঁদে, কারও কথা তার কানে যায় না—সে শুধু সন্তান কামনায় পাগল।

রাজারাণী ও প্রজা ঃ—তারাশঙ্করের স্ত্রী ও একজন মাতা। অন্য মাতার মতই তিনিও নিজ সন্তানের জন্যে যেমন ধাত্রী তেমনি অন্যের সন্তানের জন্যেও তাঁর হৃদয় কাঁদে। নারীহৃদয় এমনই কোমল ও স্নেহপ্রবন। লেখক জমিদার। অবাধ্য প্রজা রাইবল্লভ খাজনা না দিলে তিনি তাঁর উপর রুষ্ট হন এবং প্রজাদের গাঁয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দেবার মনস্থ করেন। রাইবল্লভের স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে পুত্রদের সঙ্গে করে গোপনে লাভপুরে রাণীমার কাছে আসেন। রাণীমার মাতৃহৃদয় বিগলিত করুণায় সিক্ত হয় এবং রাইবল্লভের সন্তানকে নিজের কাছে রেখে নিজ পুত্রসম পালন করেন।

পুত্রেষ্টী ঃ—পুত্রকামনায় এমনই উদগ্রীব হয়েছিলেন জমিদার মেজকর্তার স্ত্রী যে স্বামীকে দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণে উৎসাহিত করেন। জমিদার গণেশ বাঁড়ুজ্জে একসময় পোষ্যপুত্রের জন্যে স্বীয় ভ্রাতার পুত্রকে চেয়েছিলেন কিন্তু না পাওয়ায় পাগল ও কৃপণ হয়ে যান। স্ত্রীর বারংবার অনুরোধেও মেজকর্তা পোষ্যপুত্র নেন নি। হঠাৎ একদিন রাজী হন, তার কারণ হল এক তান্ত্রিক তাঁকে নিজ পুত্রের জন্যে অপরের পুত্র বলি দেবার কথা বলেন। মেজগিন্নী এসব জানেন না। তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মাতৃত্বের আহ্বানে চাটুজ্জেদের অনাথ ভাগ্নেকে তিনি আনেন। কি অপার আনন্দে আত্মহারা থাকেন গিন্নীমা। রাত্রে আপন পুত্রসম তাকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন। এই মাতৃত্বে কোন খাদ ছিল না। তাই হয়ত গণেশ বাঁড়ুজ্জে ঘুমন্ত ছেলেটাকে শ্মশানে বলি দিতে গিয়েও পারে নি। মেজকর্তা নিজের ভুল বুঝতে পারেন, মেজগিন্নীও পুত্রকে ফিরে পান।

মতিলাল ঃ—নিঃসন্তান মতিলাল ও স্ত্রী ভুবন হাড়ি মাতুলালয়ে বাস করে। উভয়েই সন্তান কামনায় বিভিন্ন দৈবী কৃপালাভের চেষ্টা করে। ভুবন হাতে মাদুলী পরে। কিন্তু যখন কুৎসিত বলে মতিলাল অন্যায়ভাবে গ্রামবাসীর হাতে প্রহৃত হয়, তখন আর সন্তান কামনা করে না, কারণ সে ভাবে সন্তান তাদেরই মত হয়ত কুৎসিত হবে এবং সমাজে ঘৃণার পাত্র হবে। কিন্তু ভুবন তা মানতে চায় নি কারণ ভুবন তো নারী। তথাপি স্বামীর অপমানে সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাই মতিলাল ভুবনের হাতের মাদুলী খুলে ফেলে দিতে গেলে ভুবন কোন কথা বলেনি। কেননা তার সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। ভুবনও তাই মতিলালের কথার সত্যাসত্য উপলব্ধি করে কোন প্রতিবাদ করে নি।

জন্মান্তর ঃ—হৈমবতী জমিদার বলরাম চাটুজ্জের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান স্ত্রী। বিচক্ষণা রমণী জমিদারী নিপুনতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালে জমিদারী বিলোপ আইনে এ জমিদারী চলে যায়, সেই সঙ্গে সতীনের ছেলে নীলুর দুর্ব্যবহার দুই-ই মিলে হৈমবতীর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হয়। সন্তানহীনা হৈমবতী নীলুর মধ্যে আপন সন্তানের স্বপ্ন-সার্থক করতে পারেন নি তাই তিনি বৃন্দাবন যাবার সংকল্প নেন। আসক্তি মুক্ত হবার প্রাক্কালে নীলুর চার বছরের শিশুটিকে দেখে তিনি শিশুটির মধ্যে নিজের সন্তানের চিত্র অনুভব করেন। এই শিশুর ছোট্ট মুখখানি আজীবন সন্তানবুভুক্ষু বিধবার জন্মান্তর ঘটায়। তিনি তাঁর সারা জীবনের অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ নীলুর ছেলেকে পেয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির নেশায় বৈরাগ্য ত্যাগ করে সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

শঙ্করীতলার জঙ্গলে ঃ—বাপমায়ের আদরের কন্যা গীতা। স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হলেও স্বামীর মৃত্যু হয়—রেখে যায় দেড় বছরের এক কন্যা। গীতার স্বামীর সংসারে অন্যভাইরা সব সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার জন্য গীতার মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইলে গীতা সন্তানের জন্যে শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে আসে। সবকিছুর অধিকার ত্যাগ করে। ঘনশ্যাম দাস গীতাকে সাঙা করতে চায়। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে দুটি বিয়ে করেছে ও ছেড়েছে। গীতা ঘনশ্যামকে সাঙা করতে চাইলেও কিন্তু মেয়ের জন্যে প্রথমে রাজি হয়নি। শেষে মেয়েটাকে ঘনশ্যাম নিজের মেয়ের মর্যাদা দেবে বলে দেবতার দিব্যি দিলে, গীতা তবেই রাজী হয়। বিয়ের পর ঘনশ্যাম গীতার মাঝখানে অপরের কন্যা টুলুকে সহ্য করতে পারেনি—তাকে মারতে চেয়েছে। গীতা জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ঘনশ্যাম তাকে হত্যা করে। গীতা আদালতে সাক্ষ্য দিলে ঘনশ্যামের ফাঁসি হয়। এখানে দাম্পত্য প্রেম মাতৃত্বের কাছে পরাজিত হয়েছে। গীতা সন্তান হত্যাকারীকে রাক্ষস হিসেবে দেখেছে, স্বামী হিসেবে দেখতে পারে নি।

চোরের মা ঃ—মাতৃহৃদয় স্থান, পাত্র, আপন-পর বিচার করে স্নেহবর্ষণ করে না—তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পটি। ডোম জাতির রক্তে মিশে থাকা চৌর্যবৃত্তির কলঙ্ক স্পর্শ করেছিল পিতৃহীন মায়ের একমাত্র সন্তান ফিঙেকে। সে ধরা পড়ে প্রহারে মারা যায়। চোরের মা বলে ফিঙের মা কাঁদতে পারে না। যে চৌধুরী ফিঙেকে পিটিয়ে মেরেছিল,

তার পুত্রের মৃত্যু হলে ফিঙের মা আক্রোশের পরিবর্তে গ্রামের বাইরে নির্জন প্রান্তরে বসে কেঁদেছে। চোরের মাও যে সত্যকারের আদর্শ জননী হতে পারে, যে কোন অন্যের পুত্রের শোকে কাঁদতে পারে তা দেখা যায় এখানে।

বোবাকান্না ঃ—এই গল্পে এক বোবা-কালা নারীর জীবনেও যে মাতৃত্বের কোমল তৃষ্ণা লুকিয়ে আছে তা দেখা যায়। জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনাসক্ত আনুঠাকুরের সে বিধবা স্ত্রী। নির্বাক মায়ের কথা কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু যেদিন তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হল, সেদিন বোবা মায়ের এক অদ্ভুত চিৎকার প্রকাশিত হয়—যা উপলব্ধি করতে হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাত্রা করতে হয়।

কান্না ঃ—ছেলে বিক্রি করত চুড়িওয়ালী নামে এক মহিলা। সে জনি নামে এক ছোট হিন্দু জাতের ছেলেকে বিক্রি করতে নিয়ে আসে, কিন্তু তাকে বিক্রি করতে পারে নি। নারীর মাতৃত্বের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়েছিল জনি। ছেলে বিক্রি করা ব্যবসা হলেও তার অন্তরে বাৎসল্য-প্রেম ছিল। নিষ্ঠুর রাক্ষসী হৃদয়হীন নারী কখনও যে আদর্শ মা হতে পারে, তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পতিব্রতা ঃ—সাবিত্রী-সত্যবানের দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রাচীনকাল থেকেই নারী-মনে সংসার ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত—স্বামীই হল রমণীর সর্বস্ব, অলংকার, অর্থ, সম্মান, গর্ব, সবকিছু। স্বামীর দুঃখে স্ত্রী দুঃখী, স্বামীর সুখে স্ত্রী সুখী। স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতার ন্যায় পূজার্ঘ্য নিবেদন করে রমণী সমাজ। রমণীর কাছে তাই ধর্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ হল স্বামী। কোন রমণী বিধবা হলে কঠিন নিয়ম মেলে চলে। আবার অন্ত্যজস্তরেও পাতিব্রত্যের সুন্দর নিদর্শন মেলে। কোন রমণী আবার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে এবং তাকেও একনিষ্ঠভাবে সেবা করেছে, আবার কেউ কেউ বিবাহ না করেও প্রেমিককেই জীবনের ধ্রুবতারা বলে মেনে নিয়েছে। তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে স্বামীগতপ্রাণা রমণীর চিত্র পাওয়া যায়—যারা আপন সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। যদিও তারাশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন যে "আমার সাহিত্যে নবদম্পতির বা তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে।" [৯] রাঢ় বাংলার চিরন্তনী রমনীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, মাতৃত্ব, মহত্ত্ব ইত্যাদি গুণগুলি কতকগুলি গল্পে বিধৃত, যা পল্লীজীবনের রোমান্টিকতার আবেশের নিখুঁত তুলির টানে তিনি একেঁছেন—

হারানো সুর ঃ—বৈষ্ণব গাহর্স্থ্য-জীবনের চিত্র। ননী দিবারাত্র বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়, সংসারের অভাব-অভিযোগে কান দেয় না। পরে ননী গভীরভাবে সংসারে ডুবে যায়। বাঁশি বাজায় না, গম্ভীরভাবে কেবল চাষবাস করে চলে। এভাবে আড়ষ্ট জীবন যাপন অসহ্য হয়ে ওঠে গিরির কাছে। সে চেয়েছিল স্বামী সংসারে কাজকর্ম করুক, সেই সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে মধুর আলাপনের যেন ঘাটতি না হয়। ননীর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে গিরি বৃন্দাবন যাবার মনস্থ করে। ননীর নিষেধ সে শোনে না। ভোর রাতে ননী একা বাঁশি বাজাতে শুরু করে। গিরি বৃন্দাবন যাবার সংকল্প ত্যাগ করে স্বামীর কাছেই থেকে গেছে। গিরির কাছে স্বামীর ঘরই বৃন্দাবন মনে হয়েছে। কারণ এতদিন পর সে তার মনের মত স্বামীকে পেয়েছে।

শ্মশানের পথে ঃ—দামিনী চরিত্র সতীত্বের এক উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা। দামিনীকে ভালবেসে প্রতিবেশী সুবল সবসময়ে দামিনীর অভাবের সংসারে নানা ভাবে সাহায্য করে। দামিনী সুবলকে স্নেহ করে, কিন্তু ভালবাসে স্বামী গোষ্টকে। সুবল দামিনীকে উপকার করার জন্যে প্রতিদান চায়, কিন্তু দামিনী ফিরিয়ে দেয়। একদিন সুবল রাতের অন্ধকারে দামিনীকে ভোগ করে করলেও দামিনী চিৎকার করে না। দামিনীকে অসতী বলা যাবে না। দামিনী সুবলের আকাঙক্ষায় নীরবে নিজেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলিয়ে দিয়েছে। তারপর ঘৃনায়, লজ্জায় দামিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকোবার চেষ্টা করে, মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। একদিকে প্রতিদান, অন্যদিকে সতীত্ব — এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত দামিনী সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

নারী ও নাগিনী ঃ—নিম্নজ শ্রেণীর মধ্যেও নারীদের জীবন এক স্বামীত্বে আসীন। খোঁড়া সেখ উদয়নাগ সাপ ধরে তাকে সাঙা করলে স্ত্রী জোবেদা সহ্য করতে পারেনি। তার সতীনের জ্বালা অসহ্য মনে হয়েছে। স্বামীর ভালবাসা হয়তো তার উপর কমে যাবে এই ভেবে সে সাপটাকে সহ্য করতে পারেনি। স্বামীর ভালবাসার প্রতি জোবেদার সংশয় জাগে তাই স্বামীকে দিয়ে সাপটাকে জঙ্গলে ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে। জোবেদা স্বামীকে সম্পূর্ণ ষোল আনাই ভোগ করতে চেয়েছিল।

কুলীনের মেয়ে ঃ—কুলীনের মেয়ে তরুবালা—ছোট জমিদারের একমাত্র আদরের কন্যা। কুলীন বর বিপদ তারণের তার সঙ্গে বিয়ে হয়। বিপদতারণ বহুপত্নীক, মদ্যপ—সে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা তরুকে দেয় নি। উপরন্তু তরুর জীবনে দিয়েছে অসীম লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। তরুর জীবনে মাঝেমাঝে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে সে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। যতবারই বিপদ তারণ এসেছে ততবারই তরু তাকে স্বামীর আসনে বসিয়েছে। দুঃখ, কষ্ট, ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেও সতীত্বকে সে বিসর্জন দেয়নি। স্বামীর প্রতি তার গোপন শ্রদ্ধা অটুট।

তারিণী মাঝি ঃ—দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র। সুখী ও তারিণী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। সুখীর পতি-ভক্তি ছিল অটল। তারিণী উন্মত্ত ময়ূরাক্ষীতে সাঁতার কেটে ঘোষেদের নববধূকে উদ্ধার করে পুরস্কার হিসাবে সুখীর জন্যে কানের নথ চেয়েছে। আকণ্ঠ মদ পান করে বাড়ীতে সুখীকে নথের কথা বলাতে সুখী আনন্দিত না হয়ে স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। সে বলে "কোনদিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দেব কিন্তু।" তারিণীকে সেবা, যত্নে, ভালবাসায় সর্বদা মগ্ন রেখেছে সুখী। রাত্রির ভূষণ চন্দ্র, পত্নীর অলংকার তার স্বামী—এই কথার প্রমাণ সুখীর স্বামী ভক্তি।

পদ্ম বৌ ঃ—পাঠশালার শিক্ষক চন্দ্র মশাইয়ের কুষ্ঠরোগ দেখা দিলে ছাত্রবৃত্তি পাশ তাঁর স্ত্রী পদ্ম প্রথমে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। পদ্মের বাবা মেয়েকে স্বামী সেবার কথা বলেন এবং মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে সতীর বেশ্যাগৃহে যাবার কথা বলেন। পদ্ম বাবার কাছ থেকে পাতিব্রত্যের আদর্শে দীক্ষিতা হয়ে স্বামীগৃহে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামী সেবা করতে থাকেন। এদিকে কুষ্ঠরোগের জন্যে পাঠশালায় ছাত্র আসে না এবং সংসারে দারিদ্র্য নেমে আসে। পদ্ম বৌ ধানভেঙ্গে চালকুটে সংসার চালাতে ও স্বামীসেবা করতে থাকেন। দেবতার উপর বিশ্বাস রেখে স্বামীসেবা করলেও একদিন এই দুরারোগ্য ব্যাধি তাকেও আক্রমন করল এবং তাতেই তিনি মারা গেলেন—রেখে গেলেন স্বামী সেবার সার্থক দৃষ্টান্ত।

সমুদ্রমন্থন ঃ—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার বুকে অনাহার ক্লিষ্ট শত শত ভিখারী ও ভিখারিনীর দল পথে পথে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। সকলেই জৈববৃত্তির নাগপাশে বন্দী। এরই মাঝে এক দম্পতির নৈসর্গিক প্রেম পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থি-মজ্জা সার করা এক খনা ভিখারী রমণী ভিক্ষালব্ধ যা কিছু পায় তা নিজে না খেয়ে অসুস্থ স্বামীকে খাওয়ায়। পাতিব্রত্যের এখানেই শেষ নয়। ডাক্তার স্বামীকে মাংস খাওয়াতে বলায়, খনা মেয়েটি রাতে জমিদার উমানাথ বাবুর গোয়াল থেকে ছাগল চুরি করতে আসে এবং ধরা পড়ে। মূর্চ্ছিতা অবস্থা থেকে একটু জ্ঞান ফিরলেই গৃহের বাইরে রুগ্ন স্বামীর কাশি শুনতে পেয়ে সে বলেছে—"মরে যাঁবে, বুঁকে হাঁত বুঁলিয়ে না দিঁলে মরেঁ যাঁবে।" মৃতপ্রায় স্বামীকে খনা মেয়েটার বাঁচাবার কী আপ্রাণ চেষ্টা। বাবুদের পায়খানা সাফ করে অর্জিত অর্থে ওষুধ আনে, না খেলে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে। স্বামী "গরীবদের মরণ ভালো" এই কথা বললে, চুরির অপরাধও অপমান ভুলে মেয়েটি বলে "এঁই দেঁখ মরণ মরণ কঁরিস না বলঁছি, ভাঁলো হঁবে না।" পতিভক্তির এই অকৃত্রিম নিদর্শনে জমিদার গৃহিণী রমার অন্তঃসারশূন্য পতিভক্তির চকিতে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

একপশলা বৃষ্টি ঃ—জয়া বাউরী অল্প বয়সেই স্বামীপরিত্যক্তা। বিশ্বযুদ্ধের পর হঠাৎ কনট্রাক্টরীর কাঁচা পয়সায় ধনী চন্দ্রচৌধুরী। চন্দ্রের রক্ষিতা হিসাবে জয়া থেকে যায়। চন্দ্র জয়াকে বিয়ে করতে চাইলেও সে রাজী হয় নি; আবার চন্দ্রকে ছেড়েও যায় নি। চন্দ্রকে অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা জয়াই করে দেয়। চন্দ্র দুই সন্তান ও স্ত্রী রেখে মারা যায়। ব্যবসায়ে লোকসান ও আনির বদলে পয়সা চালু হওয়ায় চৌধুরী বাবু ভিখারী হয়ে যায়। জয়া দিনরাত পরিশ্রম করে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেয়। নিজে না খেয়ে চন্দ্রের স্মৃতিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। এসময় ধনীব্যবসায়ী দে'পরিবারের সেজবাবু জয়াকে চাইলেও জয়া যায়নি। এইভাবে পরপুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও সেবার নিদর্শনের তুলনা মেলা ভার। জয়া পতিসেবার মত সেবা করে গেছে তাকে।

প্রত্যাবর্তন ঃ—তিনবার বিয়ে হওয়ার পর তিনটি স্বামীই মারা গেছে নবীন জেলের মেয়ে রমার। তাই প্রতিবেশী রমাকে বেউলো বা বেহুলা বলে ডাকতো। হঠাৎ তার জীবনে হাজির হল ঘরপালানো পশুপতি। বহুদিন দেশে-বিদেশে জাহাজের খালাসীর কাজ করে ধোপদুরস্ত সাহেব সেজে গ্রামে আসে। নাচের আসরে রমাকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে যায়—রমাও তাকে অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছে। বিয়ের জন্যে জিনিস কিনতে কলকাতায় যায় পশুপতি। এসেই বিয়ে হবে। বাবা মার অমত বলে পশুপতি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে নতুন ঘর তুলেছিল, সেখানেই রমা থাকে। কলকাতা যাবার আগে পশুপতির নিরাপত্তার জন্য রমা মঙ্গলচন্ডীর মাদুলী হাতে বেঁধে দেয় কিন্তু পশুপতি আর ফেরে না। রমা ভাবী-স্বামীর নতুন ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তিনটি স্বামী হারিয়েও সে ধৈর্য রেখেছিল। পশুপতিকে সত্যই স্বামীত্বে বরণ করেছিল, তার হাতে মাদুলী দিয়েছিল কিন্তু তার পরেও যখন পশুপতি ফিরে আসল না তখন জয়া হয়ত ভেবেছে যে তার দাম্পত্য জীবন দেবতারাও চান না। তখনই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে ও সে আত্মহত্যা করেছে। বহুপুরুষের বাহুলগ্না হলেও রমা পশুপতিকে পেয়ে তাকে পতির আসনে বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

অহেতুক ঃ—ঘোষ জায়া বিকৃতমস্তিষ্ক, কাউকে সে সহ্য করতে পারে না। ঈর্ষাকাতরা, অসুস্থ শরীর তথাপি স্বামী-সেবার ত্রুটি নেই। সকলের সঙ্গে অহেতুক কোন্দল করাই তার স্বভাব, সন্তানহীনা তথাপি পতিকে দেবতার আসনে বসিয়ে সেবা করে।

সুরতহাল রিপোর্ট ঃ—নিম্নজ বাউরী সমাজের রমণীদের মধ্যে কেবল দেহজ প্রবৃত্তিই সবসময় বড় হয় না,

কখনও কখনও অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অসুন্দর থেকে সুন্দরের দিকে উদগমন করে। কড়ি বাউরীর স্বামী চৌকিদার ছিল। কড়ি স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বর গ্রহণ করে নি এমনকি সুস্থভাবে বাঁচতে গিয়ে যখন কামুক পশুস্তরের জীব হরেরাম পোদ্দারের চোখে পড়ে তখন সতীত্ব রক্ষার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। কড়ি ছিল চৌর্যবৃত্তিতে আসক্ত। এই চুরি করার জন্যে প্রায়ই স্বামীর কাছে প্রহৃত হত কিন্তু কড়ি প্রতিবাদ করত না—এটা তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিত। সেই পতির মৃত্যুর পর সেও পতির অনুগামিনী হয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে। বাউরী সমাজে ব্যাভিচারী জীবন যখন স্বীকৃত বা পত্যান্তর সামাজিক বিধিসম্মত তখন কড়ি সতীত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে।

চোরের মা ঃ—ডোম পরিবারে বহুস্বামী গ্রহণ সমাজে প্রচলিত অনুকূল বিধান, তা সত্ত্বেও ফিঙের বাবা মারা যাবার পর ফিঙের মা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে নি। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝি গিরি করে ফিঙেকে মানুষ করেছে। ছেলে ডাকাতি করতে চাইলেও মা বারংবার নিষেধ করেছে। আদর্শজননী, পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে ফিঙের মার চরিত্র অনবদ্য।

আবার "এ মেয়ে কেমন মেয়ে" গল্পে বিশালাক্ষী ডোমপরিবারের স্ত্রী হয়েও সতীত্ব রক্ষা করেছে।

৪। সংকীর্ণতা ঃ—নারী-চরিত্র যেমন ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, স্বামী-সন্তান সেবায় নিবেদিতা প্রাণ, পর-আপন সকলকে আপনার মত করে দান করে স্নেহ, মায়া ও প্রেম, নিজ স্বার্থ মুহূর্তে অপরের জন্যে সর্বস্ব অকাতরে দান করতে পারে, নিজের সুখ-শান্তি বিলিয়ে দিয়ে মাথায় নিতে পারে সীমাহীন দুঃখ ও যন্ত্রনা, ঠিক তেমনি আবার সংকীর্ণ মনোভাবেও তারা অদ্বিতীয়া। সংসারে তাই নারী কখনও মায়াবিনী, বরাভয় দায়িনী আবার কখনও ধ্বংস কামনায় রাক্ষসী। সামান্য স্বার্থের জন্যে সোনার সংসার, শিবতুল্য স্বামীকেও ছাড়খার করে দিতে দ্বিধা করেনা। 'মন্থরা' কৈকেয়ীর হৃদয়ে বিষ প্রয়োগ করে রামচন্দ্রের জীবনে করুণ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছিল। সেই মন্থরা সদৃশ হীনমনা নারী জাতির আজও অভাব নেই। তারাশঙ্করের অনেকগল্প আছে যেখানে নারীজাতির সংকীর্ণতা হেতু গল্পের জীবনকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন—

বড় বৌ ঃ—সেতাব ও মহাতাপের বিরাট স্বচ্ছল পরিবারের বড় বৌ মাতৃত্ব ও স্নেহের জন্যে মহিয়সী। মহাতাপকে বড় বৌ অত্যন্ত স্নেহ করে। নিঃসন্তান বড় বৌ মহাতাপকে আটবছর বয়স থেকেই পুত্রসম ভালবাসে—এই ঘটনা সংকীর্ণ মানসিক সম্পন্ন পরিবারের কন্যা ছোট বৌ মানদা উপলব্ধি করতে পারে নি। ফলে মিথ্যা সন্দেহের বশে সংসারে অশান্তি নেমে আসে।

আলোআঁধারি ঃ—দারিদ্র্য পীড়িত সংসারে বহুকষ্টে বি, এ, পাশ করে সুখময়। এম, এ পড়াকালীন সুখময় ১৯২১ সালে কোন কারণে জেলে যায়। কিন্তু তার আগেই ধনী ব্যবসায়ী হরিশবাবু নিজ কন্যা সারদার সাথে তার বিয়ে দিয়েছিল। আত্মসম্মান-সচেতন সুখময় দরিদ্র হলেও মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেয় নি। তাই শ্বশুর বাড়ি থেকে তত্ত্বের নামে সাহায্যের ঝুড়ি আসলে সে স্ত্রীর জিনিস কটা রেখে সব ফিরিয়ে দেয়। সারদা অপমান করলে সুখময় চিরদিনের মত দেশত্যাগী হয়। কিন্তু সতীত্বের মর্যাদা দিয়ে স্বামীর জীর্ণ কুটিরে বসে সারদা স্বামীর আগমনের কাল গোনে। অথচ সামান্য কারণে এতটা নির্দয় ও নির্মম না হলে সুখময় চলে যেত না—যা হোক একটা কিছু করে দুঃখের ভাত সুখে খেতে পারত। সংকীর্ণ মানসিকতা এই দুঃখময় পরিণতির জন্য দায়ী।

না ঃ—অনন্ত অল্পশিক্ষিত জমিদার তনয়। শিকার করা সখ কিন্তু তার মনুষ্যত্ব-বিবেক সবই ছিল। সে বিবাহিত স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দিতে কসুর করে না, সে কালীনাথের চালাকি বুঝেও প্রথমে কিছু বলে না। অনন্ত স্ত্রীকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে বহুবার, স্ত্রী কিন্তু অনন্তের হৃদয় বুঝতে সক্ষম হয়নি। সে এতই সংকীর্ণমনা যে অনন্তকে অপমান করেছে জ্বালাময়ী ভাষায়—অনন্তকে সে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করেছে। অর্থের অহংকারে অনন্তের স্ত্রী হিন্দু সমাজের বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। অনন্ত নিজে নির্দোষ, তাই স্ত্রীর এই তির্যক বাণে দিশাহারা স্ত্রীকে প্রহার করেছে, আবার এই অন্যায়ের জন্যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ক্ষমা চাইতে গেছে—বিনিময়ে শ্বশুরের চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কালীনাথকে হত্যা করে সে জেলে গেছে। অনন্তের স্ত্রী যদি উদার মানসিকতা নিয়ে স্বামীর অন্তর্লোককে উপলব্ধি করার চেষ্টা করত, তাহলে অনন্তের জীবনমরুভূমি হত না বা জেলে পচতে হত না।

তাসের ঘর ঃ—শৈল নাবালিকা বধূ—মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা। মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ হয়ে সে এসেছে। স্বভাব চঞ্চলা, অস্থির-মস্তিষ্ক, সহজাত সারল্যে ভরপুর। কিন্তু শৈল মিথ্যাভাষিনী। সে যেখানে থাকে তার বিপরীত বাড়ীর মিথ্যা প্রশংসা করত। যেমন—শ্বশুর বাড়ীতে থাকলে বাপের বাড়ীর এবং বাপের বাড়ীতে থাকলে শ্বশুর বাড়ীর প্রশংসা করত। এই মিথ্যার জন্যেই অমর তাকে বাপের বাড়ীতে রেখে আসে। অবশ্য এসবের মূলে ছিল শাশুড়ীমাতা। অমরের মা যদি মাতৃত্বের অঞ্চল-ছায়ায় শৈলকে রেখে তাঁর স্নেহপ্রবন ভালবাসায় শৈলকে বাঁধতে পারতেন, তবে শৈলর জীবনে এমন দুঃখ আসত না। শৈলর স্বামী নাকি "শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা নেয় অভাবের জন্য"—এই কথা শৈল এক প্রবাসিনীকে বলাতে লজ্জায় ঘৃণায়-শ্বাশুড়ী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। কথাটা সত্যই গর্হিত। তবু যদি তিনি কথাটাকে হাল্কা করে দেখতেন তবে সংসারে অশান্তি আসত না। অমর এই কথা শুনে যখন শৈলকে বাপের বাড়ীতে রেখে

আসার জন্যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে তখনও অমরের মা এতটুকু নরম হন নি। অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়ে তিনি অমরকে প্ররোচিত করেছেন। শাশুড়ীমাতৃসম। নিজের কন্যা যদি এমনটি করতো তাহলে কি তিনি এমন নির্মম হতে পারতেন?

৫। ছলনাময়ী ঃ—নারীহৃদয় শুধু সেবায় আলোকিত নয়, সে কখনও উন্মাদিনী, কখনও স্বৈরিণী, কখনও বা মায়াবিনী, ছলনাময়ী। ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে অন্যায় কাজে প্রবৃত্তও হয়। এই ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সুখী করতে গিয়ে কেউ কেউ দুঃখের শিকার হয়েছে, আবার কেউ ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজে মুক্ত হয়ে অন্যান্যদের মুক্তিও দিয়েছে, কোন কোন নারী হৃদয়ের অতৃপ্তির জন্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, কেউ বা স্বামীর অক্ষমতা দূর করবার জন্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। নানা উদাহরণের নিদর্শন তারাশঙ্করের গল্পে পাওয়া যায়। লেখক নারীজাতির চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাহারা (নারী) অমাবস্যাকে পূর্ণিমা করিতে পারে, পূর্ণিমাকে অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকিয়া দিতে পারে, দিনকে রাত্রিতে পরিণত করিতেও তাহারা সক্ষম। তাহাদের চক্রান্তে না হয় কি?" (মাছের কাঁটা)। এখানে সামান্য একটা মাছের মাথা নিয়ে দুই ভাইয়ের সংসারে অশান্তির অগুন জ্বেলেছিল দুই বৌ ছলনার আশ্রয় নিয়ে।

আবার "গবিন সিংহের ঘোড়া" গল্পে নবীনের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জ্বালাময়ী বাক্যবাণের ফলেই বাপ-বেটায় শুরু হয়েছে অশান্তি। নবীন শ্বশুরবাড়িতে বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে চেপে যায়; তাই দেখে শালারা ব্যঙ্গ-কৌতুক করলেও নবীন ততটা দুঃখ পায় নি, কিন্তু রাত্রে শোবার সময় যখন তার স্ত্রী বলেছে, "তুমি ওই ছাগলটায় চেপে আর এসো না।" তখনই নবীনের পৌরুষত্বে বিরাট আঘাত লেগেছে ও পরিণামে সংসারের স্রোত অন্যখাতে প্রবাহিত হয়েছে। নবীন নতুন ঘোড়া এনেছে—বৃদ্ধ 'প্রবীন' ঘোড়াকে সহ্য করতে পারেনি। সংসারে অশান্তির জন্যেই বৃদ্ধ পিতার হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু হয়। নবীন গল্পের শেষে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বৃদ্ধ ঘোড়াটাকে হত্যাও করেছে—এ সবের মূলে ছিল স্ত্রীর ছলনাময়ী বাক্যবাণ।

"শিবানীর অদৃষ্ট" গল্পে বিধবা সুন্দরী যুবতী শিবানী পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর নিগূঢ় দাম্পত্য-প্রেম দেখে হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে মালকিন (লতা) কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে কই মাছে বিষ মিশিয়ে খেতে দেয়। কিন্তু সেই বড় কই মাছটি কে খাবে এই নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির পর ঠিক হয় শিবানী খাবে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে লতাদির কোন ক্ষতি হয় না—শিবানীই বিষমাখা মাছ খায়।

"রাঙাদিদি" গল্পে উদ্ভিন্ন যৌবনা, সুন্দরী অতৃপ্ত যৌবনা রাঙা দিদি পটুয়া বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রী। তাকে পেতে চায় গ্রামের সব তরুণ বিবাহিত যুবকেরা। তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করে রাঙাদিদি তার হৃদয়ের গোপন ক্ষুধা মেটায়। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেরা রাঙাদিদিকে ঘরের স্ত্রী করতে ভিড় করে। রাঙাদিদি তাদের প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে। সকলে যখন এই পর্বের উদ্যোগে ব্যস্ত, তখন রাঙাদিদি গোপনে পালিয়েছে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে যুবকদের চোখে প্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালিয়েছে, আবার নিজেই সেখানে থেকে বহুদূরে চলে গেছে। আসলে রাঙাদিদি ঈশ্বর-দর্শনে পাগলিনী, তার মনের এই সদিচ্ছা কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি, সকলে তাকে ভোগের সামগ্রী ভেবেছে, পূজার নৈবেদ্য ভাবতে পারে নি।

৬। দ্বন্দ্ব ঃ—সংস্কার লঙ্ঘন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব এ গল্পের মূলসুর। "মানুষ গড়ে দেবতা ভাঙে"। নিয়তি তাড়িত প্রবৃত্তির বশে বন্দী মানুষ, মানুষের উত্তরণ তাই উর্ধ্বগামী। কেউ জেতে, কেউ হারে; কেউ বা এই দুইয়ের মাঝে পড়ে দ্বন্দ্ব-জটিলতায় প্রবিষ্ট হয়। মন বা হৃদয় সামাজিক নীতি, বন্ধন ভাঙতে চেয়েছে, কিন্তু সংস্কার তার যাত্রাপথে বিরাট বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে উদ্ভূত অতৃপ্তি তাড়িত ক্ষুধা, তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেহ, যৌবন, চিরশাশ্বত নয় তা জেনেও বিগত যৌবন স্বীকার করতে চায়নি (সখি ঠাকুরুণ), তাই দর্পনে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে বার্ধক্যে রেখা তার হৃদয়কে দুঃখে, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করেছে।

রসকলি ঃ—গল্পের নায়িকা মঞ্জরী-বিচিত্র রহস্যময়ী। মঞ্জরী গ্রামের সমবয়সী পুলিনের বাল্যসখি। উভয়ের সংসর্গ গভীর প্রেমে রূপান্তর ঘটায় কিন্তু মঞ্জরীর মা সৈরভী ভেকধারী বৈষ্ণব বলে পুলিনের কাকা ও অভিভাবক রামদাস বিয়েতে আপত্তি করে। পুলিনের বিয়ে দেয় গোপিনীর সাথে। পুলিন গোপিনীর গোপন বাধা ছিন্ন করে মঞ্জরীর কাছে আসে। গ্রাম্য কুৎসা, গোপিনীর ঘৃণা, কটাক্ষ উপেক্ষা করে মঞ্জরী সদাহাস্য ও লাস্যময়ী থাকে। পুলিনকে কাছে পেয়েও নিষ্কলঙ্কিণী থাকে। পুলিনের প্রতি নীরব ভালবাসা, দেহ সৌষ্ঠবে উচ্ছলতা, পরিহাস রসিকতা, সর্বদা সহজ ও স্বাভাবিক চালচলন—সত্যই বিস্ময়কর। "চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপছিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতেও তাহার আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।" (রসকলি)। মঞ্জরী চরিত্র বিচিত্র রহস্যে পূর্ণ। কখনও প্রেয়সী, কখনও উন্মাদিনী আবার কখনও শান্তসমাহিতা। অচরিতার্থ প্রেম তার হৃদয়ের গভীরে মধুরিমা রচনা করেছে। মঞ্জরী পুলিনের দাম্পত্য জীবনে ঝড় তুলেছে, আবার সে সেই ঝড়কে প্রশমিত করে দাম্পত্য

জীবনের সংকট মোচনও করেছে। সংস্কারবদ্ধ জীবনই তাকে বৃন্দাবনের পথে নিয়ে যায়। চকিতে আকর্ষণ, আবার চকিতে বিকর্ষণ, কখনও সর্বত্যাগী, কখনও সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় চঞ্চলা, আবার মানবিকতার ঔজ্জ্বল্যে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মঞ্জরী চরিত্র অনন্যা। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাই বলেছেন,—"যেমন আদিম রিপুর তীক্ষ্ণতায়, তেমনি সর্বস্ব বিসর্জনের অকৃত্রিম আনন্দরূপে তারাশঙ্করের গল্পের প্রেমিক-প্রেমিকরা এইভাবেই চিরায়ত মহিমার মুকুটমণি হয়ে ওঠে।" (১০)

চোখের ভুল ঃ—অনাথা বিধবা, সন্তানহীনা উমা। সুন্দরী রূপসী—তাই উমাকে ভোগের বাসনায় ব্যাকুল গ্রামের মহাজন গোকুল। দেবী-আরাধিকা উমা সব কামনাকে জয় করে প্রত্যহ চন্ডীমায়ের মন্দিরে পূজো দিতে যায়। সেখানেই এক সন্ন্যাসীকে দেখে তার অপলক চাহনীতে সে লজ্জা বোধ করে। অন্যদিকে সকলের মাঝখানে সন্ন্যাসী কেবল উমাকেই দেখে। গ্রামে কুৎসা রটে, একদিন রাত্রে গোকুল উমার ঘরে গেলে উমার মৃদু চিৎকারে সেই সন্ন্যাসী গিয়ে বাঁচায়, কিন্তু শয়তান গোকুল সন্ন্যাসীকে ধরে প্রহার করে উমার সাথে মিথ্যা কুৎসা রটায়। অবচেতন মনে অতৃপ্তি থাকলেও সংস্কার-বদ্ধ উমা গ্রাম ছেড়েছে। পথে সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হলে উমা সন্ন্যাসীর মনোভাব জানতে চেয়েছে। সন্ন্যাসী উমাকে তার হারানো মায়ের সঙ্গে তুলনা করলে উমা সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মায়ের মতই দাঁড়িয়ে থাকে।

রাইকমল ঃ—কমলিনীর জীবন গভীর মনস্তাত্ত্বিক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পরিপূর্ণ। একদিকে বৈষ্ণবীয় জীবন ও ধর্মের সংস্কার অন্যদিকে অবচেতন মনের সুপ্ত কামনা—এই দুই এর দ্বন্দ্বে কমলিনী ক্ষতবিক্ষত। সে রঞ্জনকে পেতে চাইলেও সামাজিক বিধিনিষেধে তা বাস্তবায়িত হয় না। তাই সে "জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন" যাপনের স্বপ্ন দেখেছে। চন্ডীদাসের রাধার মতই সেও দেহাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করতে চেয়েছে। মায়ের সঙ্গে সে নবদ্বীপ ধামে যায়, সেখানে মালাচন্দন করতেও বাধ্য হয় প্রৌঢ় রসিকদাসের সাথে—কিন্তু সেখানেও কামনার বিষাক্ত ক্ষুধা, তাই গ্রামে ফিরে আসে। পথে রঞ্জনকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়, কারণ রঞ্জনের মধ্যে তখনও কামনার জ্বালা মেটেনি। গ্রামে লোকনিন্দা, তথাপি কমলিনী গ্রামের আখড়াতেই থেকে যায়। জমিদারের রসিকতার উত্তরে সে বলে, "ভিখারীর ওই তো সম্বল প্রভু।" কমলিনী বৃন্দাবন যায় নি হয়তো রঞ্জনের আকর্ষণেই। "মালাচন্দনের" তুলসী দেবতার পরিবর্তে মানুষকে ভালবেসেছে আর কমলিনী মানুষের মাঝেই কৃষ্ণের সাধনা করেছে।

মালাচন্দন ঃ— মেয়েজাতি স্বামীর ভালবাসার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হতে চায়। যেমন—"নারী ও নাগিনী" গল্পে জোবেদার জীবনে দেখা যায়, তেমনি "মালাচন্দন" গল্পে তুলসীর জীবনেও ঘটে। চোদ্দ বছর বয়সের বিধবা তুলসী সুন্দর গান করে। জয়দেবের মেলায় গিয়ে মোহনদাসের সঙ্গে তার পরিচয় ও মালাচন্দন হয়। স্বামীর ঘরে দেখে প্রথমা স্ত্রী শীর্ণা গৌরভামিনীকে। সে তুলসীকে সহ্য করতে পারত না—তুলসী তবু থেকে যায়। এই ভেবে যে প্রথমা স্ত্রী ভামিনী দুচার দিনেই মারা যাবে এবং সত্যই সে মারা যায়। তুলসী স্বামীর ঘর করতে থাকে, কিন্তু অন্তরের অতৃপ্তি থেকে যায়। তুলসী স্বামীর নিবিড় আত্মসমর্পণ চেয়ে পায় নি, কারণ মোহনদাস ছিল রূপের ভিখারী, হৃদয়ের নয়। তাই মোহনদাস আবার তৃতীয় স্ত্রী যখন ঘরে এনেছে তখনই তুলসীর নারীত্বে, সম্ভ্রমে লেগেছে তীব্র আঘাত। সে ঘর ছেড়ে চলে যায় বহু দূরে। স্বামীর ভালবাসার অভিনয়কে তুলসী সহ্য করতে পারে নি।

ডাইনীর বাঁশি ঃ—স্বর্ণ মানবী। লোকাচার ও কুসংস্কারের জালে বন্দিনী—সে আজ ডাইনী। তার হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা সব আছে, অথচ তা প্রকাশ করতে পারে না, অন্যকে বিলিয়ে দিতেও পারে না কারণ সে ডাইনী। তার মা নাকি তাকে এই বিদ্যা দিয়ে গেছে। স্বর্ণ ভাল হতে চায়। তাই সে ঘরেতে বালিশে মুখ রেখে কাঁদে আর রাক্ষসী মাকে অভিসম্পাত দেয়। 'ডাইনী' গল্পেও সুরোধনী ভাল হতে চেয়েছে, সমাজে মিশতে চেয়েছে অথচ সে ডাইনী, তাই সে দেবীর কাছে মানুষ হওয়ার প্রার্থনা জানায়, বিনিময়ে বুক চিরে রক্ত দিতেও চায়।

কুলীনের মেয়ে ঃ—ধনী জমিদার ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তুলসীর বিয়ে হয় লম্পট স্বামী বহু পত্নীক বিপদতারণের সাথে। তুলসীর জীবনে ফুলশয্যার রাত থেকে শুধু কান্না আর যন্ত্রনা। স্বামী চোর, মাতাল, বহুপত্নীক তবুও তরু স্বামীকে বারংবার প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দু সমাজের সংস্কারে আবদ্ধ তরু ব্যাভিচারী জীবনে যেতে পারে না, অথচ তার জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নি। তাই স্বামী বিপদতারণকে বহুবার ক্ষমা করেছে। শেষে তরুর সর্বস্ব চুরি করে বিপদতারণ পালিয়ে যায়। তরুর জীবনে নেমে আসে একাকীত্ব।

প্রতিমা ঃ—প্রতিমা তৈরীর মিস্ত্রী কুমারিশ ছোটবৌ-এর মুখের আদলে দেবী দুর্গার মুখ তৈরী করলে তা দেখে চির-বিরহিনী, মদ্যপ স্বামী-অত্যাচারিতা যমুনা গ্রামের কুৎসা ও স্বামীর ভয়ে ভীতা হয়ে একদিকে সংস্কারলব্ধ মন ও অন্যদিকে অবচেতন মনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে খিড়কির ডোবায় আত্মহত্যা করে।

নারী ঃ—এই গল্পে নায়িকা নির্মলার চরিত্র বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। ত্রিধারা বিস্তৃত তার জীবন। প্রথমপর্বে বিধবা হয়েও অন্তঃস্বত্ত্বা; দ্বিতীয় স্তরে বেশ্যা, মদ্যাসক্তা, তৃতীয় পর্বে নার্স। সে স্বভাব চঞ্চলা—বহুবল্লভ হয়েও সে প্রেম-সন্ধানী। সে প্রেমিককে খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। নার্স হয়ে সুস্থ জীবনে অভ্যস্ত হয়েও আত্মহত্যা করেছে। শুভ্র প্রেমের

সন্ধান সে পেয়েছিল ডাক্তারবাবুর মধ্যে, তাই মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে ডাক্তারকেই সে মনের কথা বলেছিল। নির্মলার চরিত্রে সর্বদা একটি দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। রথীন্দ্রনাথ রায় তাই বলেছেন, "দেহ মনের এই দ্বন্দ্ব, এই দুঃসমাধেয় প্রশ্ন, পূর্ণতর পটভূমিকায় ও বলিষ্টতর প্রতিশ্রুতিতে আর একবার রূপ পেয়েছে। "সপ্তপদীর রীনা ব্রাউন চরিত্রে, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সংকেতে ও প্রেমরহস্যের জটিল জিজ্ঞাসায়" নারী গল্পটি তারাশঙ্করের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।" (১১)

৭। সামাজিক জীবনে বাস করেও বহু পুরুষ লোভী ঃ—আদিম প্রবৃত্তির বশে বশীভূত হয়ে নারী কখনও কখনও কামনাকে চরিতার্থ করতে বহুপুরুষের বাহুলগ্না হয়েছে, ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, অর্থের জন্যে অন্যপুরুষে আসক্তা হয়েছে। এরা সমাজে বাস করেও সামাজিক বন্ধন বা নিয়মকানুনের ধার ধারে না। কামনার বহ্নি জালে পুরুষকে বশীভূত করে। বিশেষ করে সমাজে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে বেশী প্রকট। বিলাস জীবন যাপন ও দেহজ ভোগের অতৃপ্তি বোধ করলেই এরা অন্য পুরুষের দেহলগ্না হয়। আদিম অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্রতা ও উন্মত্ত জৈবশক্তির উন্মাদনায় এরা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। দেহকে পণ্য করে এরা বহুপুরুষের ঘাটে নৌকা ভিড়ায়। 'যাদুকরী' সম্প্রদায়ের মেয়েরা সংসারে বাস করেও দেহরূপোপজীবিনী। সতীত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন।

বেদেনী ঃ—এই গল্পের নায়িকা রাধিকা। দুর্দম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রেম প্রকাশে সে কুণ্ঠিতা হয়নি। ধর্মহীন, নীতিহীন হয়ে জৈবশক্তির প্রাবল্যে দুরন্ত গতিতে সে ভোগ করে চলেছে শিবপদ, শম্ভু, কিষ্টোদের। শিবপদ প্রথম পুরুষ যে শান্ত ও সংযত, কিন্তু এই রূপ রাধিকাকে তুষ্ট করতে পারেনি। তাই দাম্পত্যের স্মৃতিকে অনায়াসে মুছে ফেলে শিবপদকে ভিখারী করে, তার সমস্ত অর্থ নিয়ে পালিয়ে আসে শম্ভুর কাছে। সেই শম্ভু বৃদ্ধ হয়েছে অথচ রাধিকার প্রবৃত্তিতাড়িত জৈবিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নি। তাই সবল বলিষ্ঠ, দৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারী কিষ্টোবেদের জীবনে সহজেই ধরা দিয়েছে রাধিকা। স্বৈরিনী রাধিকা এত দিনের জীবনসঙ্গী শম্ভুকে ত্যাগ করার সময় তাকে পুড়িয়ে মারার জন্যে ঘুমন্ত শিবুর তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। "এই চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর আদিম নারী মনের চিরন্তন অভীপ্সার ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন। রাধিকা চরিত্রটির আপাত অসঙ্গতির মধ্যে যে সমন্বয় সূত্রটি আছে তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব সম্মত।" (১২) রাধিকা যখন যে পুরুষের সাথে থেকেছে তাকেই সম্পূর্ণরূপে ভালবেসেছে, আবার নতুনের দর্শনে সর্পিনীর ন্যায় ফোঁস করে অন্যের সাথে ঘর বেঁধেছে। সামান্যতম অনুশোচনা হয় নি তার। কেবল কামজ ভোগই তার জীবনে মুখ্য হয়ে উঠেছে।।

নারী ঃ—এই গল্পের নায়িকা নির্মলা বিধবা হয়েও পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে মালিকের ছেলে রমেনের সাথে থাকে। তার সন্তান হয় ও মারাও যায়। তারপর নির্মলা এক ধনীর নজরে পড়ে। মদ্যপান সুরু করে। শেষে ডাক্তারবাবুকেও ভালবাসতে শুরু করে, কিন্তু অনুশোচনায় বিষপান করে মারা যায়। উচ্চবংশীয়া হয়েও সে রমেনকে সহজে ত্যাগ করেছে। ধনীর কাছে থাকবার সময় প্রচুর অর্থ পেয়েছে, তথাপি রমেনের কাছে ফিরে যায় নি।

বেদের মেয়ে ঃ—বেদের মেয়ে শিবি এই গল্পের নায়িকা। এই সমাজের মেয়েরা অর্থের জন্যে ভদ্রসমাজের ধনীর ছেলেদের সাথে প্রেম করে বেড়ায়। শিবি ভোলাকে বিয়ে করার পরেও বারাঙ্গনার মত জীবিকা নির্বাহ করেছে। দারোগা, ইনস্‌পেক্টর এমন কি কনস্টেবল পর্যন্ত শিবিকে ভোগ করে অর্থের বিনিময়ে। সর্বদা স্বৈরিণী জীবন সে যাপন করেছে। ভদ্রঘরের ছেলে প্রভাতকে সে ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি। ফলে শিবি বিবাহিত স্বামীকে বাঁচাতে প্রভাতকে হত্যা করেছে। এই শ্রেণীর মেয়েরা যাকে চায় তাকে যদি না পায় তবে তার উপর নির্মম হতে দ্বিধা করে না।

সাপুড়ের গল্প ঃ—বিচিত্র চরিত্র কালী বেদেনীর। সে বহুভর্তৃক, স্বৈরিনীও বুদ্ধিমতী। সে কোন পুরুষকে নিয়ে শান্তি পায় না সে তাই সর্বদা এক পুরুষসর্প কালীনাগ সাপকে ঝাঁপিতে করে কাছে রাখে। এক সন্ন্যাসীর সাথে তার পরিচয় হয়। তারা দুজনে থাকার মনস্থ করে। একসাথে মদও খায়। কিন্তু যখনই সন্ন্যাসী কালীকে বন্ধ্যাত্বকরণের ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলে তখন থেকেই কালীর সব ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে রাক্ষসী সাজে। পরিণতিতে সন্ন্যাসীকে নির্মম ভাবে হত্যা করে চলে যায়। মাতৃত্বের সুপ্ত বাসনা সদাই তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। কালী যা চেয়েছিল তা কোন পুরুষই হয়তো দিতে পারেনি।

রূপসী-বিহঙ্গিনী ঃ—প্রতিভাময়ী সঙ্গীতজ্ঞা রক্ষিতার কন্যা বিভাসেন। জীবনে বহুপুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছে। স্বামী পার্থ, বন্ধু সুরেন, ভবেশ প্রমুখ তার জীবনে এসেছে। হয়তো বাধ্য হয়েই তাকে এই পাপকাজে ব্রতী হতে হয়েছিল। তাই সে পুরুষজাতির এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে এক সুদর্শন সন্ন্যাসীর কাছে যায়, কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ব্যবহার ও তার আভিজাত্য দেখে অসহ্য হয়ে বিভা সন্ন্যাসীকে হত্যা করে জেলে যায় এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়।

দেহের প্রদীপে রূপের শিখা ঃ—এই গল্পের নায়িকা সতী বিনোদের সাথে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ঘর ছাড়ে।

প্রতীক্ষা ঃ—এ গল্পের নায়িকা পরী বাউরী। বাল্যবয়স থেকেই মিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রূপ দান করে। আখনাকে বিয়ে করেছে। আখনা পরীকে অত্যন্ত ভালবাসে অথচ দারিদ্র্য হেতু পরী আখনাকে ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে এক মুসলমান মরদের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। শেষে দুরন্ত যৌবন নিঃশেষ হয়ে যায় ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কাটোয়ায় গৌরাঙ্গঘাটে ভিক্ষা করে।

ময়দান ঃ—এই গল্পের নায়িকা সুষমার মা এইভাবেই বহু পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েছে।

৮। বারাঙ্গনা ঃ—আগে রাজা, মহারাজা, জমিদার, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তারা অবসর বিনোদন করতে বাঈজী ও রক্ষিতা রাখতেন। প্রাচীনকালের শূদ্রকের রচিত "মৃচ্ছকটিকম্" গ্রন্থে নটী বসন্তসেনার উল্লেখ আছে। রক্ষিতা বা বারাঙ্গনাদের সমাজে ঠাঁই হত না। তাদের প্রজন্মের সামনে কেবল খোলা থাকত পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত জীবিকা। বৃটিশরা এদেশে আসার পর তাদের অধিকাংশই অবসর সময়ে মদ্যপান করতো, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে এদেশের বাবুরা উপঢৌকন দিত এই দেহপসারিণীদের। এরা উচ্চ সমাজে ঠাঁই না পেয়ে কখনও নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের সাথে সংসার বাঁধে। আবার বেশীরভাগই বংশানুক্রমে এই পঙ্কিল ব্যবসায়ে নিমজ্জিত হয়। নিম্নজ শ্রেণীর বন্ধনহীন জীবনে বিলাসিনী মেয়েরা গ্রাম্য মেলায় গিয়ে অর্থের জন্যে পুরুষদের সঙ্গিনী হত।

এই বারাঙ্গনাদের জীবন বড়ই করুণ। যতদিন যৌবন থাকত ততদিনই তাদের রোজগার ও কদর থাকত। তারপর এদের জীবন ভিখারিণীর ন্যায় অতিবাহিত হত। মূলতঃ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণেই তারা বারাঙ্গনা হতে বাধ্য হয়েছে। স্বেচ্ছায় আবার অনেকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই কদর্য জীবনের মাঝে অনেকের জীবন মহত্বে মহীয়ান। এদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা বহুধা বিভক্ত হলেও এদের মধ্যে মাঝে মাঝে ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম ভালবাসা দিশাহীনকে দিশা দেখায়, লক্ষ্যহীন মানুষকে লক্ষ্যস্থির করতে সাহায্য করে—আবার অনেকে হারিয়ে যায়। সুবোধ ঘোষের "স্নানযাত্রা"য় সমাজসেবক ইন্দুনাথ মেলা থেকে বেশ্যাপল্লী তুলে দিতে গিয়ে বেশ্যা সোনালীর কাছে হারিছে গেছে। ডাক সাইটে বেশ্যার কাহিনী পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ'তে। তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পে বারাঙ্গনাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পেও এক অসহায় বাল্য বিধবা পতিবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

মেলা ঃ—"মেলা বাংলাদেশের এক ঐতিহ্য। বিভিন্ন কারণে মেলা বসে। কোথাও একদিন, আবার কোথাও দুই থেকে একমাস পর্যন্ত চলে। মেলা ও তার উৎস সম্পর্কে 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা' গ্রন্থ থেকে একটি সারণী উল্লেখ করা যেতে পারে।" (১৩)

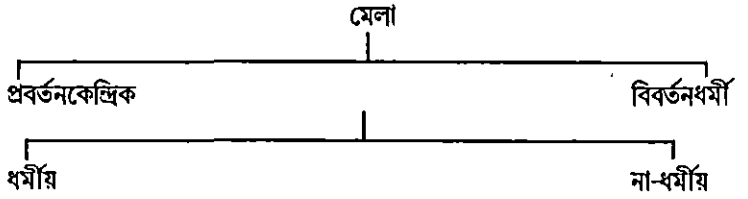

'মেলা' গল্পটি লেখার পশ্চাতে লেখক তাঁর সাহিত্য জীবনগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"মাঘমাস শ্রী পঞ্চমীর পরদিন শীতলাষষ্ঠীতে আমাদের ওখান থেকে পনেরো মাইল দূরে দৈথী বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথিতে মেলা। সেই মেলায় চলে গেলাম। দুরন্ত শীত তখন। আশ্রয় নিলাম এক গাছতলায়। সেইখানেই ইট দিয়ে উনান তৈরী করে একবেলা খিচুড়ি রান্না করে দুবেলা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম তিনদিন।" (১৪) এই গাছতলায় বসেই 'মেলা' গল্পটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। দিনের আলোয় বিচিত্র মানুষের আগমন, হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হলেও রাত্রে এর চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেত। লেখক নিজেই বলেছেন, "রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের জুয়ার-উন্মত্ত মানুষদের লক্ষ্য করেছি, পাপপঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যা বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছি। ক্লান্ত হলে ফিরে এসে গাছতলায় খড়ের বিছানার উপর বসে লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল দিয়ে লিখতে বসেছি।" (১৫)

এই মেলাতে এসে অমর ছোটবোনকে হারিয়ে ফেলে। মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে আশ্রয় দেয় এক বারাঙ্গনা—নাম তার কমলি। রাত্রে এই মেয়েটির সংবাদ পেয়ে সেখানকার কর্ত্রী (মাসি) তাকে বিক্রি করার কথা বলে এবং ভোর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে যাবে বলে। এক অনির্বচনীয় বাৎসল্য প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে গণিকা হয়েও কমলি মেয়েটাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের কুৎসিত জীবন ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে জঘন্য জীবন যাপন করলেও কমলির এই মহানুভবতা সত্যই মানবিক ঔজ্জ্বল্যে প্রোজ্জ্বল। কমলি এই পথকে ঘৃণা করেছে। সে বুঝতে পারে যে এই

অবোধ শিশুটির ভবিষ্যতেও এই কদর্য জীবন নেমে আসবে—তাই কমলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ায়। গণিকা শুধু বিলাসিনী বা ছলনাময়ী নয়, তাদেরও হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম, মমতা যে থাকতে পারে, তারাও মা হতে পারে—তারই দৃষ্টান্ত কমলি চরিত্রটি।

প্রসাদমালা ঃ—বৈষ্ণব পরিবারের বিধবা চিত্তকালীর কন্যা ললিতা। বাল্যবয়সে বিয়ে হয় হরিমোড়লের ছেলে গোপালের সঙ্গে। হরিমোড়লের লালসায় চিত্ত সব সম্পত্তি খোয়ায়। হরিমোড়ল এরপর চিত্তর শরীরের দিকে তাকালে চিত্ত মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যায় এবং গোপাল কীর্ত্তনের দলে চলে যায়। চার-পাঁচ বছর পর সংসারে ফিরে এসে গোপাল দেখে তার বাবা মারা গেছে। ললিতাকে ঘরে আনবার জন্য কলকাতা গিয়ে বহুসন্ধানের পর ললিতাকে পায় এবং গ্রামে আনে। গ্রাম্য জীবনকে ঘৃণা করতে থাকে ললিতা। বিলাসিনী ললিতা ঘর ছাড়ে। গোপাল দ্বিতীয় বিয়ে না করে কীর্ত্তনের দলে যোগ দেয়। আসলে জৈব ক্ষুধার সঙ্গে বিলাসী জীবনের মোহ ললিতাকে ওই পথে যেতে সাহায্য করে। শেষে অবশ্য মিল হয়েছে। এ ছাড়া তারাশঙ্করের 'রাধারানী', 'ময়দান', 'মুহূর্ত' প্রভৃতি গল্পে বারাঙ্গনাদের উল্লেখ আছে।

৯। ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ঃ—সেবা ও ত্যাগধর্মে নারীজাতির ঐতিহ্য বহুজনবিশ্রুত। নিজের অনলে পুড়ে অপরের মঙ্গল তারা করে। বিরাট প্রত্যাশা একলহমায় ত্যাগ করে—সর্বত্যাগিনী মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। ধাত্রীপান্নার ত্যাগ সর্বজনবিদিত। সমস্ত সুখ, আকর্ষণ বির্সজন দিয়ে এরাই স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। শীর্ণশরীর শচীশের জন্যে দামিনীর উৎকণ্ঠা (চতুরঙ্গ/রবীন্দ্রনাথ), গোবিন্দলালের জন্যে ভ্রমরের আত্মত্যাগ (কৃষ্ণকান্তের উইল/বঙ্কিমচন্দ্র) কিংবা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে 'শাস্তি'র চন্দরার ত্যাগ ও আশাপূর্ণাদেবীর ছোটগল্প "অনাচার"-এর সুভাষ-কাকীমার বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ—এ কেবল নারীজাতির পক্ষেই সম্ভব। তারাশঙ্করের বেশ কয়েকটি গল্পে নারীর অভাবনীয় ত্যাগের কাহিনী আছে। যেমন—

না ঃ—স্বামী-হন্তা অনন্তকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের সংকল্পে কালীনাথের সতীসাধ্বী স্ত্রী ব্রজরাণী, "আজ আট বৎসর ব্রজরাণী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতিক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিমর্ষ, বিবর্ণ, নুব্জ্যদেহ, ক্ষতবিক্ষত হৃদয় অনন্তকে দেখে তাকে ক্ষমা করেছেন। স্বচক্ষে স্বামীহন্তাকে দেখেও সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে ব্রজরাণী শুধু "না" বলেছেন। এ ক্ষমা সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী মায়ের করুণা। ব্রজরাণীর "না" শব্দটিকে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি স্তরে। "প্রথম স্তর"—দৃঢ়তার ও সংকল্প কঠোর মনের, দ্বিতীয় স্তর—ক্ষমার। তৃতীয় স্তর—গভীর প্রশান্তির।" (১৭)

একপশলা বৃষ্টি ঃ—বহু পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েও শেষে চন্দ্রচৌধুরীর ভালবাসার শৃঙ্খলে বাধা পড়েছে জয়া। বাউরী সমাজে জন্মগ্রহণ করেও সমাজে অনেক ধনীর আহ্বান পেয়েও জয়া স্বর্গত চন্দ্রের বর্তমান সংসারের স্ত্রী ও দুই সন্তানের দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছে। দারিদ্র্যে অনাহারে জর্জরিতা হয়েও ধনীব্যবসায়ী দে পরিবারের সেজবাবুর প্রলোভনকে জয় করেছে—মিস্ত্রীদের দেহজ প্রবৃত্তির আহ্বানকেও উপেক্ষা করেছে।

এছাড়া 'প্রসাদমালা' গল্পে অর্থ, সম্পত্তি ও দেহ লোভাতুর হরিমোড়লের লোলুপ দৃষ্টির কাছে নিজেকে বাঁচাতে বিধবা চিত্তকালী বেয়াই হরিমোড়লকে নিজের সবসম্পত্তি অকাতরে দান করে বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।

"শ্মশান বৈরাগ্য" গল্পে সুদখোর, কুসীদজীবী, অর্থলোলুপ, অর্থগৃধ্নু মহিম বাঁড়ুজ্জে বিধবা-বাড়ীতে আকণ্ঠ ভোজন করেছে, দিদির শ্রাদ্ধের জন্যে খরচের সামান্য পাঁচশো টাকা খরচ করেও হা হুতাশ করেছে। অকৃতদার মহিম নির্লজ্জের মত সহায় সম্বলহীনা ভাগিনীর শেষ সম্বল সোনার পুটুলিটা নিয়েছে। মায়ের আত্মার যাতে শান্তি হয়, মামা বাবুর লালসা যাতে পরিতৃপ্ত হয় তার জন্যে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে বিভা অথচ নিজের জন্যে সামান্যতম ভাবে নি।

১০। প্রেমজ বিবাহ ঃ—প্রতিলোম

বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন। যুবক ও যুবতীর পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করে। বিবাহ সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমজ বিবাহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতার অমত থাকে কারণ, বেশীর ভাগ বিবাহই—.....প্রতিলোম বা অনুলোম হয়ে তাকে। কিন্তু এই বিবাহে দম্পতির প্রেম প্রায়শঃই নিগূঢ় হয়ে থাকে যদিও বিরহ বা বিচ্ছেদের অভাব নেই। তারাশঙ্করের গল্প "দীপার প্রেম" "রূপসী বিহঙ্গিনী" ইত্যাদিতে এর উদাহরণ মেলে। 'সুতপার তপস্যা" উপন্যাসেও সুব্রত মুখার্জী এবং সুতপা দাশগুপ্তের প্রেমজ বিবাহ হয়েছে।

দীপার প্রেম ঃ—অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে দীপা বিয়ে করল সকলের অমতে এমন যুবককে যে তার ঠাকুরমা সত্যদাসী এককালে তাদেরই (দীপা) বাড়ীতে দাসীর কাজ করত। জাতিতে কাওড়া বা যুগী। তারই নাতি দেবপ্রিয় হালদার অধ্যাপক। দীপা তার পিতামহীকে বলেছিল, জাতির বিচার না করে ভালবাসার প্রতিদানেই

তাকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয় নি। দীপা বিধবা হয়েছে। বন্ধু রঞ্জিত দীপাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু দীপা রাজী হয় নি। দীপার হৃদয় জুড়ে দেবপ্রিয়র ভালবাসা চিরকাল ছিল তাই দীপা অন্য কাউকে হৃদয়ের আসনে স্থান দিতে পারেনি। দীপার এ প্রেম সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেম—যা মহিমময় চিরশুভ্র ও মধুময়।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ—এই গল্পের নায়িকা বিভা সেন পার্থ মুখার্জীর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা বিনিময় করে বিয়ে করে। কিন্তু এ ভালবাসা ছিল মেকী। তাই পার্থ সুরেনকে চার হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে। ভবেশ বাবু আবার চার হাজার টাকা দিয়ে সুরেনের কাছ থেকে বিভাকে কিনে নেয়। এখানে প্রেমজ বিয়ে হয়েও বিভা জীবনে শান্তি পায় নি—বহু পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছে।

১১। বিলাসিনী ঃ—নারী যেমন ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা তেমনি কেউ কেউ উগ্র আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিলাসিনী সাজতে চায়। বিলাস-ব্যসনকে চরিতার্থ করতে মরিয়া হয়ে কেউ স্বামী সংসার, বন্ধন সব তুচ্ছ করেছে ঃ সাময়িক তাড়নায় ঘর ছেড়ে কেউ বারাঙ্গনা হয়েছে, কেউ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি—যেখানে প্রেম, ভালবাসা, মমতা সব মিথ্যে হয়ে যায়। তারাশঙ্কর মুখ্যতঃ পল্লীজীবনের বন্ধনহীন মানুষের রূপকার। "প্রত্যাখ্যান" গল্পে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাত্য মেয়ে নিয়ে ঘর ছাড়ে। ব্রাহ্মণ কন্যা কুমারী অবস্থায় মা হয়েছে এবং লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যাও করেছে—অনেকের মতে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কুশপুত্তলী ঃ—লাজুক, ভদ্র, শান্ত স্বভাব ব্রাহ্মণ পুত্র নিরঞ্জন, পিতৃমাতৃহীন। বাল্যবিবাহিতা স্ত্রী কিশোরীকে সে ঘরে আনে সুখের জন্যে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে উগ্র বিলাসি তাই কিশোরীকে ঘর ছাড়াতে বাধ্য করে। এক রাতে কিশোরী হারিয়ে যায় এবং নিরঞ্জন কলকাতার গলিতে গলিতে খুঁজে ফেরে।

প্রতীক্ষা ঃ—নিকষ কালো অথচ রূপবতী বাউরী ঘরের মেয়ে পরী প্রথম জীবনে রাজমিস্ত্রীদের সুনজরে পড়ে, দেহের বিনিময়ে টাকা পয়সা পেয়ে দামী শাড়ি, রূপচর্যার বহু বিলাসী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সাজগোজ করে ঘুরে বেড়ায়—শেষে আখনাকে বিয়ে করে। কিন্তু আখনার দারিদ্র্যের সংসারে পরী খাপ খাওয়াতে পারল না। বিলাসিনী পরী তাই মুসলমান হয়ে ঘর ছাড়ে এবং সুখের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। রূপ ও দেহের ক্ষুধার আকর্ষণে ঘর ছাড়লেও শেষ জীবনে দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অন্ধপরী ভিক্ষা করে। প্রেমিক আখনা পরীকে পেয়েও গ্রহণ করে নি।

সনাতন—এই গল্পে সনাতন জমিদার বাড়ির চাকর—অত্যন্ত সৎ ও সরল। তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ প্রভাতী বিলাসিনী। "চলনে বলনে, আহারে রুচিতে পোষাকে প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত।" প্রভাতী নিজের বিলাসিতার জন্যে সনাতনকে চুরি করতে প্রলুব্ধ করে। সনাতন এই কথায় অত্যন্ত রেগে যায় এবং প্রভাতীকে প্রহার করে। প্রভাতীও মাসখানেক পরে সনাতনের যথাসর্বস্ব নিয়ে বাবুদের চাপরাশীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। যাবার আগে "বেদেনী" গল্পের রাধার মত প্রভাতীও স্বামী মৃত্যুর কামনায় বটির কোপ বসায়।

প্রসাদমালা—এই গল্পের নায়িকা ললিতা মায়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে শহুরে ছোঁয়ায় অবগাহন করে। তাই স্বামী গোপাল যখন দীর্ঘদিন পর স্ত্রী ললিতাকে গ্রামে নিয়ে আসে তখন অজপাড়াগাঁয়ের গ্রাম্য পরিবেশ ললিতা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই একদিন গোপালের যথাসর্বস্ব নিয়ে সে পালিয়ে যায়—গোপালের শুভ্র প্রেমের কোন মর্যাদা দেয়নি আধুনিকা ললিতা।

১২। প্রেম—তারাশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন—"আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।" [১৭] যখন পরকীয়া প্রেমচর্চা কল্লোলীয়গণ বিচিত্র আস্বাদনে গ্রহণ করেছেন, তখন তারাশঙ্কর এই ধরণের চিত্তাকর্ষী রোমান্স সৃষ্টির জন্যে প্রেমের গল্প লিখলেন না। কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাই বলেছেন, **"Another aspect, I find Tarasankar lacking in is what our Sanskrit aesthcticians called the adirasa or the primary feeling."** [১৮] তিনি সমাজের অন্তেবাসী জীবনে প্রেমের লীলাকে সাবলীলভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পে প্রেম স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। তরল চটুল প্রেমে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। প্রেম চেতনাকে বিচ্ছিন্নভাবে না ভেবে তিনি গোটা জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই তিনি প্রেমের গল্পে আড়ষ্ট ছিলেন না। "তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পের তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ঃ ক) তারাশঙ্করের তথাকথিত "বিশুদ্ধ" প্রেমের গল্পের অভাব, তবে প্রেমানুভূতি একাধিক ভাবানুষঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। খ)

তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে তারুণ্যের রসোচ্ছলতার চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের ভাবস্থির অনুভবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। গ) তাঁর প্রেমের গল্পের পরিণতি সাধারণতঃ মিলনাত্মক হয় না এবং সুলভ রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই নেই।" (১৯) "রসকলি"র নায়িকা মঞ্জরী সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে যৌবনেই বৃন্দাবন যাত্রা করেছে। "রাইকমল" এর কমলিনী লোকনিন্দা, কুৎসা, সকল কিছুকে উপেক্ষা করে দেহাতীত সৌন্দর্য প্রেমের আরাধনায় রত হয়েছে। "হারানো-সুর"-এ গিরি স্বামীকে ছেড়ে বৃন্দাবন যেতে গিয়েও স্বামী ননীর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়েছে। বৃন্দাবন যাবার বাসনা ত্যাগ করে সব অভিমান ভুলে স্বামীর চরণকেই বৃন্দাবন ভেবেছে।

স্বকীয়া প্রেমের কাহিনী তারাশঙ্করের কলমে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। "মতিলাল" গল্পে মতিলাল ও ভুবন উভয়েই কুৎসিত। সন্তান নেই বলে দুঃখ, তথাপি তাদের দাম্পত্য প্রেমে স্বর্গীয় সুধা ঝরে। মতিলাল [redacted] বিয়ের দিন সন্ধ্যায় খড়ির গুঁড়ো এনে জলেগুলে ভুবনকে মাখায়, ভাবে কালো সুন্দর হয়। আয়নায় নিজের মুখ দেখে উল্লসিত হয়ে সেও মতিলালকে মাখাতে চায়। আবার "তারিণী মাঝি" গল্পে তারিণী ডুবন্ত ঘোষের বউকে উদ্ধার করে পুরস্কার স্বরূপ বউ সুখীর জন্যে নাকের নথ ও দুখানা শাড়ি চেয়েছে। নথটা নিয়ে বাড়ি ফিরে রাতের বেলাতেই সুখীকে পরিয়ে ছেড়েছে। আয়নার সামনে বসে সুখী নথ পরতে বসে, তারিণী ভাত খাওয়া বন্ধ করে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, আলো নিয়ে সুখীকে দেখতে যায় এবং সুখীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে—এগুলি নির্ভেজাল দাম্পত্য প্রেমের চিত্র।

প্রেমের পরম তৃষা "তমসা" গল্পের কুৎসিত বিকলাঙ্গ পঙক্ষীকে জীবসীমার উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। বিনোদের প্রত্যাখ্যান ও পদাঘাতে জর্জরিত "ঘাসের ফুল" এর কয়লাখনির মেয়ে শ্রমিক চুড়কীর প্রেমের স্নিগ্ধতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিটোল প্রেমের কাছে বিনোদ পরাজিত হয়েছে কিন্তু চুড়কী হয়েছে জয়ী।

"দীপার প্রেম" গল্পে দীপার দেবপ্রিয়র প্রতি যে প্রেম তা তুলনাহীন। প্রথম যৌবনেই স্বামীকে হারিয়েও অন্য কাউকে সুযোগ পেয়েও চিন্তা করেনি—স্বামীর প্রতি ভালবাসা আমৃত্যু ক্রিয়াশীল থেকেছে। "ময়দান" গল্পে নিশীথ রাত্রে রহস্যময়ী নায়িকা ভিক্ষার ছলে খুঁজে বেড়ায় প্রত্যাখ্যাত প্রেমিককে। আবার 'কবি' গল্পে নিতাই তার প্রেমিকাকে না পেয়ে বহুদূরে যাত্রা করেছে। ঠাকুরঝি নিতাইকে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু জয়া বাউরী ত্যাগ করতে পারেনি প্রেমিক চন্দ্র চৌধুরীকে বা তার স্ত্রীসন্তানদের (একপশলা বৃষ্টি)। জয়া আমৃত্যু তিলে তিলে আত্মহনন করেও কামনা বা লালসার আগুনে পুড়ে মরেনি। তার প্রেমের গভীরতা অসীম ও অনন্ত।

"প্রেমের মানচিত্র বোধহয় নীল, নীল-আদিগন্ত নীল। ঘটনার শাদা শাদা সরু সরু সমস্ত রেখাই সেই আকাশনীল, সমুদ্রনীল বিস্তারে মুদ্রিত। তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প পড়তে পড়তে সেই কথাই পুনর্বার মনে আসে।" (২০)

১৩। মিথ্যাভাষিণী—মিথ্যাকথা বলা মানুষের মজ্জাগত। শুধু আত্মীয় স্বজনেরই নয়, নিজেকেও বড় দেখানোর একটা "অহং" বোধ কাজ করে। "তাসের ঘর"-এ যেখানে শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে অকারণে মিথ্যাভাষণ দেয় গৃহবধূ যুবতী শৈল। শৈল বিনীত, নম্র, মিষ্টভাষী, সুন্দরী। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে বাপের বাড়ির সম্বন্ধে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে যার অধিকাংশই মিথ্যা। আবার বাপের বাড়িতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ির সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত মিথ্যা কথা বলেছে। এটা শৈলের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে শৈল আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সামনে মিথ্যা করে তার বর অমর প্রায়ই বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ একশো টাকা নিয়ে আসে—এই কথা বললে অমর তা শুনে বৌকে এলাহাবাদে (শৈলের বাপের বাড়ি) রেখে আসে। অমর সবার অলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়িতে জলস্পর্শ পর্যন্ত করে না। বাপের বাড়িতেও সে একইভাবে মিথ্যা কথা বলে তাসের ঘর ভাঙতে থাকে আবার গড়তে থাকে। পরে শাশুড়ী ব্যাপারটাকে বুঝতে পারেন এবং বধূকে ক্ষমা করে গৃহে নিয়ে আসেন।

১৪। অভিনেত্রী—অভিনয় ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও প্রথম পর্বে নারীদের অভিনয়ের সুযোগ ছিল না। ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নাটকে, যাত্রায়, পালাগানে নারীদের প্রবেশাধিকার ঘটে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নারীদের অভিনয়ে সুযোগ ঘটে। যাত্রাগান সারাবছর ধরে গ্রামগঞ্জে হত। সমাজের অসহায় মেয়েরাই প্রধানত এতে অংশ নিত। অনেকেই ছিল নিম্নবংশীয়া। ফলে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে নটীগণ মদ্যপান ও দেহদান করত। অনেক সময় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীগণ বিধবা হয়ে সমাজের নিষ্ঠুর চাপে তারা কখনও বারাঙ্গনা, কখনও যাত্রা দলে যোগ দিত। মূলতঃ প্রথম পর্বে বারাঙ্গনা সমাজের নারীরাই অভিনয়ে

আসত। অনেক পুরুষ এই নটীদের সংস্পর্শে এসে সমাজ, সংসার অনায়াসে ত্যাগ করেছে। রবীন্দ্রনাথের "মানভঞ্জন" গল্পে স্বামী ঘরে রূপসী বৌ থাকতেও অভিনেত্রীদের সঙ্গে সহবাস এবং তাদের একজনকে নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। সংসার ও স্বামী গিরিবালাকে অভিনেত্রী ও পতিতা সাজিয়েছিল। "সেকালে পেশাদারী মঞ্চে অভিনেত্রী জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে দেহজীবিকা মিশে থাকত। ক্ষীরোদাদের (বিচারক) পতিতাবৃত্তির তুলনায় তাতে কিছু পালিস থাকত। হয়ত এই পালিসের চোখ ধাঁধানো লোভে ঐ পথে মুক্তি খুঁজেছিল গিরিবালা। সঙ্গে একথাও বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি লেখক (রবীন্দ্রনাথ) যে সংসার এবং স্বামী তাকে ঐ দিকে ঠেলে দিয়েছিল।" (২১)

তারাশঙ্করের "রূপসী বিহঙ্গিনী", "অভিনয়", "শেষ অভিনয়" প্রভৃতি গল্পে অভিনেত্রীদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গল্পগুলিতে অভিনেত্রীদের জীবনে শান্তি বা মিলন হয় নি—প্রত্যেকে বিচ্ছেদের বিরহে বিরহিনী।

অভিনয় ঃ প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে জন্ম হয় নট ও নাট্যকার অংশুমানের সঙ্গে সীতা সেনের পরিচয়। প্রথমে অভিনয় সুন্দর করতে না পারার জন্যে অংশুর কাছ থেকে ভর্ৎসনা পরে সুন্দর অভিনয়ের জন্যে অংশুর হৃদয় টলে যায়। সে সীতাকে ভালবাসার কথা জানায়, কিন্তু সীতা সেন "না" বলে চলে যায়। "অভিনয় কোনদিন সত্য হয় না"—এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে চিরকাল একা থেকেছে নায়িকা সীতা। শেষ জীবনে অভিনয় ছেড়ে সাহিত্যিক শিবনাথবাবুর সুপারিশে এক আধা-সরকারী নারী-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তার জীবনেও অভিনয় শেষ হয়ে যায়।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ প্রেমজ বিয়ে। সংগীতজ্ঞ পশ্চাত্ত্য সংগীতে খ্যাতি অর্জন করা পার্থ মুখার্জী বিভাকে বিয়ে করে। ভালবেসে নাম পরিবর্তন করে সুচন্দ্রা রাখে কিন্তু কিছুদিন পর পার্থ অভিনয়ের জগতে স্ত্রীকে আনে এবং বন্ধু সুরেণের কাছে মাত্র চার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়। সুচন্দ্রা অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভবেশের সাথে তার পরিচয় হয়। সুরেণ সুচন্দ্রাকে ভবেশের কাছে চার হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। এরপর সুচন্দ্রা এক সুদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখতে যায়। সেখানে কয়েকদিন পর সুচন্দ্রা সন্ন্যাসীকে হত্যা করে এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়। তার জেলের গারদে বসে একটাই প্রশ্ন—"হে ঈশ্বর, তুমি বলো, কেন আমি এ কাজ করলাম।" এখানে পাঠকদের মনেও জিজ্ঞাসা সন্ন্যাসীকে সে এমনভাবে খুন করল কেন? মনে হয় সন্ন্যাসী হয়ত পার্থ মুখার্জী—যে বিভাকে সুচন্দ্রা, রূপসী বিহঙ্গিনী তৈরী করেছে। অথবা সন্ন্যাসীর দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুচন্দ্রা সমগ্র পুরুষজাতির উপরেই ঘৃণা করতে থাকে, যার কারণেই সন্ন্যাসীকে হত্যা করে।

শেষ অভিনয় ঃ— তারাশঙ্কর "মঞ্জরী অপেরা" রচনা করার পর একাধিক গল্প লেখেন যেখানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কাহিনী আছে। অভিনেতা বাপ্পা বোস দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' নাটকে গোলাপী নামে এক রঙ্গিনী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই অভিনয়ের পর বন্ধু রমাপতির বাড়ি রাতে খাওয়া ও থাকার নিমন্ত্রণ ছিল। তাই বাপ্পা রাতে খেয়ে একটা ঘরে একা শুতে যায়। মাঝ রাতে ঘরে দেখে যে সে 'বিরহ' নাটকে যে গোলাপী নামের মেয়েটার রোল করেছিল অবিকল গোলাপীর মত এক রমণী—গোলাপীর মত তারও কাঁখে কলসী। সে হল রমাপতির বিধবা দিদি সুমতি। চোদ্দ বছরে বিয়ে, আর পনেরো বছরে সে বিধবা হয়েছিল। কিছুক্ষণ রাত্রে অন্ধকার ঘরে দুজনে থাকাকালীন বাইরের লোকজন তাদের ধরে লাঞ্ছিত করে। এই দুঃসংবাদে বাপ্পার বাবা বাপ্পাকে ত্যজ্যপুত্র করে দেয়। বাপ্পা তার পর অভিনয়ের জগতেই থেকে যায়। অবশেষে পঞ্চাশ বছর বয়সে "মদন ভস্মের পরে" নাটকে অভিনয় করে। এটাই তার শেষ অভিনয়। নায়িকা বিনোদিনী। বিনোদিনীকে দেখে বাপ্পা সুমতির কথা ভাবে। কারণ বিনোদিনী সুমতির মতই হুবহু দেখতে। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করলে বিনোদিনী নিজেকে বিনোদিনী বলেই পরিচয় দেয়। পরে সে আর অভিনয় করেনি—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সুমতিই হয়ত বিনোদিনী। প্রথম যৌবনের প্রেমকেই শেষবারের মত আস্বাদ করে নিজের পরিচয় গোপন করে জীবনাহুতি দিয়েছে।

যাত্রাগান বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি। যাত্রাদলের নরনারীর জীবন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে বাঁধা। এরা মূলতঃ বোহেমিয়ান—সুরাসক্তি, যৌন আকর্ষণ, একপ্রকার অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা সদা বর্তমান। এদের মধ্যেও পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান-অভিমান, ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটে থাকে। তারাশঙ্কর যাত্রাগানের নট-নটীর জীবনবেদ অত্যন্ত বাস্তব তুলিতে অঙ্কন করেছেন। তাঁর "মঞ্জরী অপেরা" (বৈশাখ ১৩৭১) এসবেরই জীবন্ত দলিল। একটি যাত্রাদলের নট-নটীদের সেখানে জীবন কাহিনী বিধৃত—"সমাজে যাহারা অপাংক্তেয় এইরূপ এক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিয়া, উহাদের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ ও বে-পরোয়া, অথচ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োজিত জীবনচর্যার বর্ননা দিয়া এবং উহাদের ক্বচিৎ প্রকাশিত গভীরতর হৃদয়াবেগের পরিচয় দিয়া কথা শিল্প জগতে একটি অনন্য স্থান অধিকার করিয়াছে ও তারাশঙ্কর প্রতিভার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।" (২২)

এ অধ্যায়ের আলোচনায় তারাশঙ্করের ছোটগল্পে নারী চরিত্রের রূপ ও স্বরূপের যে বৈচিত্র্য প্রকাশিত তাতে তাঁকে সার্থক-ধনা নারী জীবনের নিপুণ চিত্রকর বলা যায় স্বচ্ছন্দে।

পাদটীকা

১। ফ্রয়েড—সুনীল কুমার সরকার পৃ - ১২৮

২। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ - ১৮৮

৩। প্রাগুক্ত পৃ - ২০৮

৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী পৃ - ৪৬৫

৫। বাঙলা উপন্যাসে কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৩৪৬

৬। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৫৩২

৭। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ - ১৭

৮। কৈশোর স্মৃতি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৯৪

৯। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ - ৭৫

১০। তারাশঙ্কর—দেশ, কাল, সাহিত্য—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ - ১৬২

১১। গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা—রথীন্দ্রনাথ রায় পৃ - ২৫

১২। প্রাগুক্ত পৃ - ১৩

১৩। মেলা রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সনৎকুমার মিত্র—লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (মাঘ/চৈত্র-১৩৯৮) পৃ - ১৮১

১৪। আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৯৩

১৫। প্রাগুক্ত পৃ - ৯৪

১৬। গল্প পঞ্চাশৎ এর ভূমিকা—রথীন্দ্রনাথ রায় পৃ. (৫১)

১৭। স্বনির্বাচিত গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা

১৮। Buddhadev Bose- An Acre of Green Grass (Papyrus Edn.) P-94

১৯। তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল সাহিত্যে ঃ ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পৃ - ১০৯

২০। প্রাগুক্ত পৃ - ১৬৪

২১। রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব—ক্ষেত্রগুপ্ত পৃ - ৯৬

২২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৫৯৯

* * * * * * * * * *

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশানুক্রম ও পরিবেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশানুক্রম ও পরিবেশ

সমাজ ও ব্যক্তি পারস্পরিক-সংশ্লিষ্ট। আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগত ও পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। উভয়ের প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এদের ভূমিকা প্রসঙ্গে Mac Iver & Page বলেছেন " **Heredity.....contains all the potentialities of life, but all its actualities are evoked within and under the conditions of environment.**" (১) জীবনে বংশগতির ও পরিবেশের মধ্যে কার প্রভাব বেশী এ সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিদগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ ব্যক্তির উপরে বংশগতির প্রভাবকে গুরুত্ব দেন, আবার কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক পরিবেশের প্রভাবকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ ঠিক যেন জল ও বায়ুর মত। যে কোন একটির অভাবে জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু উড্ওয়ার্থ ও মার্কুইস ব্যক্তিত্বকে বংশগত উপাদান ও পরিবেশগত উপাদানের যোগফল না বলে বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন। " **The relation of heredity and environment is not like addition, but more like multiplication. The individual does not equal heredity + environment, but does equal heredity x environment. He is a product of two factors, not a sum of certain parts due to heredity and other parts due to environment.**" (২)

ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব প্রসঙ্গে Mac Iver & Page বলেছেন, "**Heredity is potentiality made actual within an environment. All the qualities of life are in the heredity all the evocation of qualities depends on the environment.**" (৩)

বংশগতি ঃ- শিশু জন্মের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় তাকেই এক কথায় বংশগতি বলে। জীবনের গতি প্রকৃতিতে বংশগতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল পীয়ারসন বলেছেন— " **The influence of environment is far less than that of heredity in the determination of important human differences. For the people of same race within a given community, heredity is more than seven times more important than environment.**" (৪) জীবমাত্রেরই দেহের গঠন ও মানসিকতা তৈরী হয় তার বংশগতির মাধ্যমে। বংশগতি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দুভাবে প্রভাবিত করে। পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত যেসব বৈশিষ্ট্য তাকে প্রত্যক্ষ বংশগতি বলে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পায় তাকে পরোক্ষ বংশগতি বলে। অবশ্য বংশগতি দৈহিক, মানসিক ও জৈবিক এই তিনভাবেই প্রজন্মের উপর প্রভাবিত হয়—যার প্রভাবে ব্যক্তি সামাজিক জীবনে খ্যাতি বা অখ্যাতি পেয়ে থাকে। K. Pearson তাই বলেছেন, "**We are forced, I think literally forced, to the conclusion that the physical and psychological characters in man are inherited within broadlines in the same manner and with the same intensity.**" (৫)

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পর পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বাণু থেকে সৃষ্টি হয় ডিম্বকোষ— যেটি মাতৃজঠরে প্রলম্বিত হয় প্রায় ২৮০ দিন ধরে। প্রতি জনন-কোষের কেন্দ্রাংশে থাকে বংশজ প্রলক্ষণের কতকগুলো বাহক। এদের বলে ক্রোমসোম। এরা সংখ্যায় ২৪টি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে বলে মোট সংখ্যা ২৪+২৪=৪৮টি। প্রতিটি কোষেই ৪৮টি ক্রোমসোম থাকে। সাম্প্রতিক কালে একদল বৈজ্ঞানিক ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮ নয়, ৪৬ টি বা ২৩ জোড়া বলেছেন।(৬) এই ক্রোমোসোম বা বংশগতি বাহকগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দন্ডের ন্যায় এবং এদের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য গুটিকা বা দানা—এদের বলা হয় উৎপাদন অণু বা জিন। এই উৎপাদন অণুগুলোই হল বংশগতির প্রকৃত বাহক। "**The most important hereditary determiner is the Gene; Genes are the carrier of information from cell to cell and from one generation to another. They are the unit of inherited material, recognised by their constant effect on the development of any individual bearing them.**" (৭) বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক Thrope একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "**.....Since, however, each cromosome "thread" is composed of numerous infinitesimal units called Genes, it is more proper as Gilliland suggests, to regard the latter as the real basis of inheritance.**"(৮) "পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরেই শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে।" (৯) প্রত্যেক শিশুর বংশগতি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব সম্পদ। " **The child's heredity is his won unique combination of Genes** "(১০) আবার মাতা-পিতা ও সন্তানের সাদৃশ্যের মত বৈসাদৃশ্যও জিনের উপরেই নির্ভর করে। একই পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে। তাদের দৈহিক আকৃতি

ও মানসিক বৃত্তি ভিন্ন হয়। এর কারণ একই পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তান ভিন্ন ভিন্ন জননকোষের মিলনে জন্মলাভ করে থাকে এবং এই জনন-কোষগুলোর বংশগতি বাহক বা ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন। যেমন কোন দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তির কোষগুলোর মধ্যে খর্বতার সম্ভাব্যতা সুপ্তভাবে থাকায় জনন-কোষ গঠনকালে কোন এক সময় খর্বতা বহনকারী ক্রোমোসোম সক্রিয়ভাবে থাকতে পারে এবং সন্তান খর্বাকৃতি হতে পারে। তাই একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতাবিশিষ্ট সন্তান দেখা যায়।

যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে বংশগতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যমজ সন্তান দু প্রকার সম-ডিম্বজ এবং দ্বি-ডিম্বজ। সমডিম্বজ যমজের ক্ষেত্রে পুত্র কন্যা দুজনে একই হবে। এই দুই পুত্র বা কন্যার ব্যক্তিত্ব অভিন্ন হয় কারণ দুজনে একই প্রকারের ক্রোমোসোমের অধিকারী। কিন্তু দ্বি-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ধরণের। পিতৃ-দেহ থেকে আগত দুটি বিভিন্ন জনন-কোষ যদি মাতৃদেহের দুটি ভিন্ন ডিম্বানুতে অল্পবিস্তর একই সময়ে প্রবেশ করে, তাহলে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। তাদের কোষের ক্রোমোসোমগুলি ভিন্ন। তাই-তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

ব্যক্তি দক্ষতা, পটুতা, কর্মকুশলতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, রোগ, ঝোঁক ইত্যাদি বংশগতির মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। বংশগতির উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা বা স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা বংশগতির প্রভাবেই হয়েছিল। এখনও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করার সময় বংশ, কুল, আভিজাত্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে এর গুরুত্ব অনেকাংশে অবলুপ্তির পথে— এর কারণ, শিল্পায়ণ, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির অভ্যুদয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও বংশগতির বিষয়টি কোন কোন সময় গুরুতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের নিয়ে সমস্যা, ভারতবর্ষে উপজাতি সম্পর্কিত ইত্যাদি সমস্যা।

মানুষের সামাজিক বিপ্লবের মূলে আছে বংশগতবিদ্যা বা জিনতত্ত্ব। বংশগতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বংশগত বিদ্যা অনেকাংশে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে জেনেটিক্স চিকিৎসাশাস্ত্র এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে বংশগতি প্রযুক্তিবিদ্যা (genetic engineering) মানুষের একাধিক সমস্যার সমাধানে হাতিয়ারের কাজও করবে।

পরিবেশ ঃ- পরিবেশ বলতে ব্যক্তিকে যা পরিপূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত করে আছে তাকেই বুঝি। জীবনে পরিবেশের গুরুত্ব সমধিক। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যে সব উদ্দীপক উত্তেজিত করে তার সমবায়ই হল পরিবেশ। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্তির ও বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়ায় স্বীয় দৈহিক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রেষণা, বুদ্ধ্যঙ্ক প্রভৃতি সবই গৃহের এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশের গুরুত্ব প্রসঙ্গে, ডঃ শেফার বলেছেন, " **There is..... the strong suggestion that since the change in intellectual structures is most rapid during the child's early life, the early environment encounters are the most important."** (১১) বিখ্যাত আইনস্টাইন যদি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে কখনই তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারতেন না। আবার বিখ্যাত চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞের সন্তান যদি জীবনে অনুকূল পরিবেশ না পায় তাহলে তাদের প্রকৃত স্ফুরণ সম্ভব হবে না। বংশগতি অপরিবর্তনীয় কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনশীল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"Human beings are usually capable of passing from one environment to another as well as of changing the conditions of a given environment to suit their won purposes. But they are not on that account more independent of the kind of environment in which they live."**(১২)

পরিবেশগত পার্থক্যের ফলেই মানবসমাজ ও এই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ঘটে। সমাজে বসবাসকারী জনগণের ভাষা, অভ্যাস, রীতি-আচার, নৈতিক চেতনা, জীবন যাত্রার পদ্ধতি ইত্যাদি মানবিক পরিবেশ। ইহা ব্যতীত প্রাকৃতিক ও অন্যান্য পরিবেশ হল বাহ্যিক পরিবেশ। তাই পরিবেশ একক নয় বহু। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"Environment is not one but infinitely various"**। (১৩) বস্তুত: আমাদের বাসস্থানই হল পরিবেশ। এক্ষেত্রে ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেছেন, **"Our environment is our habitation in the complete sense."** (১৪) পরিবেশ প্রভাবিত করে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গকে আবার পরিবেশও প্রভাবিত হয় ব্যক্তিবর্গের কর্মোদ্যোগের দ্বারা। উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম করার জন্যে যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর জীবন বিকাশের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। যথাযোগ্য পরিবেশের অভাবে শিশুর জীবনের সব সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কুৎসিত ও কলুষতাযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে শিশু প্রতিপালিত হয়, তার মধ্যে দুষ্কর্ম করার প্রবণতা থাকে, তেমনি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর মনোভাব সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়।

পরিবেশকে ম্যাকাইভার ও পেজ প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন, " **In his incessant efforts to modify the conditions of his life, man creates a new type of environment. This man-made environment has a two fold character, an outer and an inner aspect**". (১৫) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমনিষ্ঠার প্রয়োগ ঘটিয়ে যে অভিনব আঙ্গিকে প্রকৃতি নিত্য নতুনত্ব লাভ করেছে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হয়েছে, জীবন যাত্রার রীতি ও পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে : বস্তুতঃ এইসব কিছুর মিলনেই বাহ্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-নিষেধ, সমস্ত রকম প্রবণতা ইত্যাদির সমন্বিত উপস্থিতির মাধ্যমে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাই হল সামাজিক পরিবেশ। মানুষের সামগ্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে বাহ্যিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশকে কেন্দ্র করেই।

অধ্যাপক জিসবার্টের মতানুসারে পরিবেশ চার প্রকার ঃ—

পরিবেশ

১। প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক।	২। কৃত্রিম	৩। সামাজিক	৪। মনস্তাত্ত্বিক
(জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদ নদী, পাহাড়, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি)	(মানুষের তৈরী যে পরিবেশ। যেমন জলসেচ, শিল্প-স্থাপন ইত্যাদি)	(মানুষে মানুষে সম্পর্কের ফলে)	(মানুষের অভিজ্ঞতা অভ্যাস, তার প্রবণতা বা বিশেষ ঝোঁক প্রভৃতি)

এই চার প্রকার পরিবেশের পারস্পরিক যোগ ওতপ্রোত। এদের পৃথকীকরণ প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি নিজেই বলেছেন, " **All these types of environment are so intermixed in their action that at times it is not easy to distinguish one from the other. As to their effects on individuals or society, it is so difficult to find out how far the influence of each of them extends, that the attempt to do it is a perpetual challenge to Sociology and Philosophy.....**"(১৬)

ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বংশগতি অথবা পরিবেশ এই দুইয়ের মধ্যে কার প্রভাব বেশী? উত্তরে বলা যায় যে, উভয়- এর গুরুত্ব সমান। প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বংশগতির মাধ্যমে একটি ভিত্তিভূমি রচিত হয়–উহার মধ্যে বিবিধ প্রলক্ষণের সম্ভাবনা সুপ্তভাবে থাকে। প্রাকৃতিক এবং বিশেষত: সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ সব প্রলক্ষণ বিকশিত, পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হইয়া থাকে এবং নূতন কিছু কিছু প্রলক্ষণও উহাদের সহিত সাধারণতঃ সংযুক্ত হয়। সমাজের মধ্যে বর্ধিত না হইলে মানব-শিশুর মধ্যে অহংজ্ঞান, নৈতিকতা দক্ষতা, বুদ্ধি, বিবিধ আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি কোন কিছুই বিকশিত হয় না। মোটকথা, বংশগতি ব্যক্তিত্বের উপাদান সমূহ জোগাইয়া থাকে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ উহাদের বিকশিত করিয়া তোলে।" (১৭) অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন, "**Every phenomenoa of life is the product of both. Each is as necessary to the result as the other. Neither can ever be eliminated and neither can ever be isolated.**" (১৮) জীবন ও পরিবেশ গভীর সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন স্থানে গমন করলেও সেখানকার পরিবেশের কাছে বাঁধা পড়ে। এক্ষেত্রেও ম্যাকাইভার ও পেজ এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "**In truth, the relation of life and environment is extremely intimate. The organism itself, the life structure, is the product of past life and past environment. Environment is present from the very begining of life, even in the germ-cells.**"(১৯)

ব্যক্তিত্ব গঠনে শারীরিক গঠন, নার্ভতন্ত্র, এবং গ্রন্থিতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ কতটুকু সংবেদনশীল তা নির্ভর করে মুখ্যত নার্ভতন্ত্রের উপর। গ্রন্থিতন্ত্র জারিত রস যা হরমোন নামে পরিচিত। হরমোন দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়া স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র যা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। যেটির গতি বৃদ্ধি পেলে মানুষ মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে বা উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু এদের জীবনে উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে এর বিপরীত অর্থাৎ সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির জীবন বেশী মাত্রায় সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তবে তার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের গুরত্ব অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারে না রেখে শৈশব থেকে কোন অশিক্ষিত উপজাতি বন্যদের কাছে রাখা যেত তাহলে বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যেত

না। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"A new social situation or a happy chance may give a genius the opportunity to reveal his power, but no amount of favourable conjuncture will turn a person of mediocre mentality into a genius. On the other hand, me must not assume, with some protagonists of heredity, that genius will make its way no matter what the environmental impediments may be."** (২০)

তারাশঙ্করের গল্পে বংশানুক্রমিক প্রভাব ঃ-

পূর্বপুরুষদের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আমাদের চলমান জীবনে এর নিদর্শনের অভাব নেই। তাই জনজীবনে আজও একটি প্রবাদ চলে আসছে "বাপকে বেটা, সিপাই কা ঘোড়া। কুছ্না মেলে তো থোড়া থোড়া।" অর্থাৎ পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ না হলেও কিছু কিছু তাদের সন্তানদের উপর বর্ষিত হয়েই থাকে। তারাশঙ্কর বর্তমান শতাব্দীর মানুষ। এই শতকের প্রথমদিকে বিদেশীদের শাসনে জর্জরিত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। বিশেষ করে গ্রামবাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একদিকে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ও পাশ্চাত্যের নির্ভীক আগমন অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের নগ্ন আগ্রাসী রাজস্ব আদায়ে ধ্বংসপ্রায় দেশের জমিদারগণ। বংশ পরম্পরায় আর্থিক স্বচ্ছলতার দরুণ জমিদারগণ বিলাসে, বৈভবে ব্যাভিচারী জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করতে ও বিপুল অর্থ ও সংগ্রহের জন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর থেকে লেঠেল নিয়োগ করতেন। কখনও কখনও নিজেরাও দস্যুবৃত্তিতে নিয়োজিত হতেন। ফলে মদ্যপান, ব্যাভিচারী জীবন পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে বর্ষিত হয়। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে সামন্তদের অবস্থা ক্রমশঃ ক্ষীন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান, কৃষিব্যবস্থার প্রতি ইংরেজদের উদাসিকতার ফলে গ্রামে নেমে আসে দুর্দিন। ফলে জমিদারগণ আভিজাত্য, প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের কাজে নিযুক্ত সেইসব নিম্নজ শ্রেণীর লেঠেলরা বৃত্তি হারিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যে পৌঁছায় এবং রক্তে জমিদারীর প্রশ্রয়ে সৃষ্ট চৌর্যবৃত্তির নেশা তাদের দস্যু ও ডাকাতে পরিণত করে। শিক্ষার অভাবে, সুস্থ জীবনের অভাবে, এবং উদ্দাম বন্ধনহীন নিম্নশ্রেণীর জীবন যাত্রা ছিল একেবারে নগ্ন। তাদের কাছে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাধাহীন যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। চরিত্রহীন, কদর্য চরিত্রের জমিদার, তাই তাঁর রাজত্বে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা প্রজাদের মধ্যে প্রায় অসম্ভব। জমিদারগণই ডাকাত সৃষ্টি করেছেন আবার নিজেদের যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে নিরীহ প্রজাদের মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। এইসব কাজের জন্যে জমিদারগণ গ্রামের শাসন ভেঙ্গে দেন, কিন্তু যখন জমিদারদের অন্তিম পর্যায় নেমে আসে তখন তাঁদের সৃষ্ট অপকীর্তি বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে সমাজের বুকে। পথে পথিকদের চলা দায় হয়। রাতে ভয়ঙ্কর ডাকাতি শুরু হয়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির আগমন ঘটে ফলে চাষবাসের অভাবে গ্রামের সমাজজীবন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। জীবিকার সন্ধানে নানা বৃত্তি গ্রহণ করে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়। কেউ ঝুমুর গান, কেউ বাজীকর, কেউ মেলায় মেলায় ঘুরে দেহ পসারিণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ছন্নছাড়া, স্বৈরাচারী জীবনের প্রভাব পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে বংশগতির প্রভাবে এসে পড়ে। তাছাড়া এই রাঢ় বাংলায় সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আগন্তুক সম্প্রদায় আসত। যারা বল্গাহীন জীবন যাপনে ছিল অভ্যস্ত। গ্রামে বাউল বা ভিখারীর দল গ্রামের দুর্দশা দেখে শহুরেবাবুদের কাছে বেশী ভিক্ষা পাবার আশায় ভিড় জমায় স্টেশনে। বিংশ শতাব্দীর নগরজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ কিন্তু গ্রামে পড়েনি তাই পল্লীজীবনে প্রোথিত ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় বেজাল। ধর্মের আবরণে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। গায়ে নামাবলী অথচ মনে যৌনক্ষুধা এই প্রবৃত্তি পরবর্তী বংশেও এসেছিল অনিবার্য হিসেবে। কোন জমিদার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে এবং পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এই নরঘাতী নেশা পেয়ে বসে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ঘটে বেশী। শিক্ষিত হয়ে তারা বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সমগোত্রীয় বন্ধন শিথিল করে। উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েরা নিম্নবর্ণের ছেলেমেয়েদের প্রেম ও ভালবাসায় বিয়ে করতে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনে যাযাবর বেদে সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে কিন্তু তাদের রক্ত থেকে যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়নি, বিশেষ করে মেয়েরা পরম্পরায় স্বৈরিণী থেকে গেছে।

তারাশঙ্কর মূলতঃ রাঢ় বাংলার কথাকোবিদ। বাস্তবতার অঞ্জনে তাঁর সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তাঁর অসংখ্য গল্পের মধ্যে বংশগতির প্রভাব স্পষ্ট। গ্রামবাংলায় শিক্ষার প্রসার বা শহরের ঝলসানি দ্রুত প্রসার হয় নি, ফলে জীবন যাত্রা ছিল একই মানের নদীর স্রোতের মত। তাই এখানে বংশগতির প্রভাব সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে এর উদাহরণ মেলে।

খড়্গ ঃ- বাংলাদেশের ঢাকার এক বিখ্যাত রাজবংশের রামজীবন রায়। ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে রায়বংশের পতন হয়েছিল। সেই বংশেরই এক শাখা বর্তমানে গল্পের বিষয়বস্তু। রাজ্য নেই, সৈন্য, সম্পদ, প্রতিপত্তি কিছুই নেই তথাপি গ্রামবাসীর কাছে রায়বংশের বর্তমান বংশধর "রাজাবাবু" বলে সম্বোধন পান। রাজাবাবু শিক্ষিত—ওকালতি করেন। জমিদারী না থাকলেও জমিদারী রক্ত বর্তমান। রায়বংশের পতনের জন্যে তিনি হাহুতাশ করেছেন। বংশের ঐতিহ্য সিংহবাহিনীর মন্দিরে বলির জন্যে কালদন্ড নামে খড়্গখানি রামজীবন রায়ের আমলেই

ভেঙে যায়। সেটিকে মেরামতির জন্য তিনি উদগ্রীব হয়েছেন। রাজাবাবুর রাজ্য না থাকলেও প্রাক্তন রাজত্বের দাপট ও দম্ভ ক্রিয়াশীল থেকেছে। এই গল্পে এক কামারের ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেও চাকরী পায় নি— পিতৃপুরুষের লোহার কাজই সে করেছে। তার জীবনে বহু আশা ছিল, সে স্বপ্ন দেখেছিল অনেক, কিন্তু কোন স্বপ্নই তার সার্থক হয় নি।

রাজাব্রাণী প্রজা ঃ- রাঢ় বাংলার পল্লীগ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের চিত্র। এই গল্পটি লেখকের নিজের জীবন-কাহিনী। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাম্ভিক, অত্যাচারী, প্রবল প্রতাপান্বিত। দাপটের সঙ্গে জমিদারী শাসন করেছিলেন। বর্তমান জমিদার সামান্য জমিদারীর মালিক। নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ; তথাপি সরকারী খাজনা দাখিলের চাপে পড়ে খাজনা অনাদায়ী প্রজাদের উপর নির্যাতন করতে উদ্যত হয়েছেন— হাতে বন্দুক তুলেছেন। এতো বংশগতিরই প্রভাব। তারাশঙ্কর মানবতাবাদী, দেশ সেবক হয়েও প্রজাপীড়নে উদ্যত হয়েছেন। আবার সনাতন ভারতের নারী হৃদয় সর্বদাই যে কোমলা ও শান্তিপ্রিয়া রাণীমার মধ্যে সেই ধারা ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিদ্রোহী প্রজা রাইবল্লভের স্ত্রী-পুত্র আশ্রয় চাইলে রাণীমা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যদিকে জমিদারের কাজে নিযুক্ত গোমস্তাগণ বংশ পরম্পরায় শঠ, প্রবঞ্চক ছিলেন। তার বহু নজির বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। গোমস্তাদের কুচক্রী মনোভাবের দরুন বহু জমিদার যেমন অযথা অত্যাচারী হয়েছেন আবার জমিদারীরও অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েছে। গোমস্তাদের চরিত্র যেন বাজীকরের মত। গোমস্তার জন্যই এই গল্পে জমিদার যেমন উত্তেজিত হয়েছেন, তেমনি "রায়বাড়ি" গল্পেও রাবণেশ্বর রায় গোমস্তা-হত্যার দায়ে ছত্রিশ মৌজা ধ্বংস করেছেন। গোমস্তাকে নিরীহ প্রজারা নিশ্চয়ই বিনা দোষে হত্যা করেন নি। এভাবে পুরুষানুক্রমে গোমস্তা, নায়েব প্রভৃতি সুবিধাভোগী, কুচক্রী কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল।

বিষধর ঃ- ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের শোষণ, অত্যাচার ভোগতৃষ্ণার অজস্র নিদর্শন তারাশঙ্করের অসংখ্য গল্পে বিদ্যমান। জমিদারী-দাপট ও দম্ভ এবং প্রজাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক জমিদার বহু পুরুষ ও নারীর সর্বনাশ করেছেন। বিনয়কৃষ্ণ রায় জমিদারীর সাত আনির এক আনির অর্ধেক মালিকের তৃতীয় পুত্র। সরকারী চাকুরে। শহরের প্রগতিশীল জীবনের সংস্পর্শে এসেছে কিন্তু পূর্বপুরুষজাত জমিদারী রক্তকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। গ্রামে বিভিন্ন মজলিসে বসে কেবল বড় বড় প্রগতির বুলি আওড়ান, গ্রামের ছেলেমেয়েদের সমালোচনা করেন। বৃদ্ধ আশী বছরের সাধুর চরিত্র নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন, নির্বিষ সাপের মত গর্জন করে নিজেকে সমাজপতি বলে জাহির করেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাতে গ্রামে নলিনীশের মেয়ে যুবতী বিরাজ এই সাধুকে বাড়ীতে না রাখতে পারে। অথচ এই বিনয়কৃষ্ণ রায় পাড়ার গোষ্ঠবিহারী রায়ের স্ত্রীকে সন্তানসহ প্রলুব্ধ করে ঘর থেকে নিয়ে কলকাতায় পালান। সেখানে তিনি তাকে ভোগ করে ত্যাগ করেন। নিরীহ স্ত্রীলোকটির প্রতি বা সন্তানটির জন্যে সামান্য কর্তব্যও করেন নি; পূর্বপুরুষদের ব্যাভিচারিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থেকেছে।

জলসাঘর ঃ- বিশাল জমিদারী, প্রচুর সম্পদের অহংকারে অমিতব্যয়ী ও অমিতাচারী জীবনযাপনের জন্যে চার পুরুষের অর্জিত সম্পদ ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। শুধু থাকে প্রাচীন ঐতিহ্য, মৃতপুরীর ন্যায় জীর্ণ প্রসাদ। তারই এক কোণে নির্জনে দিন যাপন করেন বিশ্বম্ভর রায়। শুধু অতীত স্মৃতির রোমন্থন করেন। তবু এই ম্রিয়মান, শোকে মুহ্যমান বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্ব সদ্য উদীয়মান ঐতিহ্যহীন ধনী মহিম গাঙ্গলীর উপর টেক্কা দিতে গর্জে উঠেছে। শেষ সম্বলটুকু জলসাঘরে খরচ করতে দ্বিধা করেন নি। বস্তুতঃ ভালো হয়ে থাকতে চাইলেও পিতৃ পুরুষের উষ্ণ রক্ত তাঁর শরীরে শিহরণ জাগিয়েছে। তাই উদীয়মান ধনতন্ত্রের কাছে নিশ্চিত পরাজিত জেনেও অসম প্রতিযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। আবার সারারাত আকণ্ঠ মদ্যপান করে ভোর বেলায় বেসামাল অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ছুটে যান। সম্বিত ফিরলে শূন্য জলসাঘরে ফিরে আসেন এবং জলসাঘরের দরজার সামনে পড়ে যান ও জ্ঞান হারান। এই প্রৌঢ় বয়সে এমন অবস্থা— এতো পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই তো তিনি পেয়েছেন।

তিনশূন্য ঃ- সন্তান একপ্রকার সম্পদ। এ হল মানব সম্পদ। এর সুন্দর ও স্বাভাবিকতার জন্য উৎপাদন কালে যত্ন নিতে হয়, যেমন পল্লীর কৃষকবৃন্দ বহু পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করে থাকেন। অযত্নে, শস্য লাগালে তার ফসল সুন্দর ও পুষ্ট হয় না, অনেকাংশই নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দুর্ভিক্ষের অন্তরালে একদল কামুক পশুস্তরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় জীব খুঁজে বেড়ায় তাদের রিরংসার সামগ্রী দরিদ্র যুবতীদের। অসহায়া মেয়েদের নির্জনে পেয়ে সামান্য অর্থ ও খাবারের ঠোঙা দিয়ে মিটিয়ে নেয় তাদের দেহের ক্ষুধা। তাদের বিকৃত রুচির রক্তের ফসল বয়ে বেড়ায় সেই মেয়েরা। পরে জন্ম দেয় পঙ্গু পশু মানবের। শারীরিক গঠনে অক্ষম হলেও পশু-পিতার রক্ত থেকে পাওয়া দেহজ ক্ষুধা থাকে প্রবল। তাই দেখা যায় চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে খাবারের সন্ধান করতে করতে নর্দমা, আস্তাকুড় ঠেলে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে ল্যালা। ঘরে দেখে নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন এক কিশোরী— তার সর্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে গেছে। সেই দৃশ্য দেখে বিকৃত বিধাতার অবাঞ্ছিত সৃষ্টি ল্যালা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কিশোরীর সর্বনাশ করে তার জন্মদাতাদের মতই তার আদিম ক্ষুধা মেটায়। জন্মদাতাদের মত সেও নিষ্পাপ কিশোরীর সর্বনাশ করে।

পরিবেশ-অনুকূলের জন্যে বংশানুক্রমিক দোষ এখানে সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন তাই বলেছেন, "পরিবেশ অনুকূল হইলে বংশানুক্রমিক দোষ-গুণগুলি সত্বর এবং সহজেই বিকাশ লাভ করে।" (২১)

সন্তান ঃ- এই গল্পের নায়ক গোবিন্দ প্রকৃতির বিকৃত মনোবিলাসের সৃষ্টি। উদরে থাকাকালীন তার মা বিষপান করেছিল, ফলে বিষের ক্রূর সর্পিল গতিচিহ্ন গোবিন্দ স্থায়ীভাবে লাভ করে, সে হয় বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। শান্ত ও সরল গোবিন্দ বিয়ে করলেও কিছুদিনের মধ্যেই পালিয়ে যায়। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্যে চেষ্টা করে কিন্তু অর্থাভাবে হয়নি। তাই অর্থের জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে চাকর বৃত্তি গ্রহণ করে। জমিদারবাবুর শিশু পুত্রকে সে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলে এবং শিশুটির কাছে নিজে বাবা সাজতে চায়। এই সংবাদে জমিদার তাকে চাকুরী থেকে তাড়িয়ে দেন। গোবিন্দর মনে তখন জমিদার তনয় 'মানিক' জুড়ে বসে। তাই সে বিয়ের জন্যে জাত খুইয়ে নিকুঞ্জ বৈষ্ণবের বাল-বিধবা কন্যা মঞ্জুরীকে বিয়ে করে। এরপর বাপের বাড়িতে মঞ্জুরী এক বিকৃত বীভৎস অবিকল গোবিন্দর মতো সন্তানের জন্ম দেয়। গোবিন্দ নিজের সন্তানকে নিজেই হত্যা করে এবং শেষে পাগল হয়ে যায়।

এমনই আর একটি গল্প "মতিলাল"। নিজে কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বলে সমাজের কাছে ঘৃনিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই তার হৃদয় থেকে সন্তান-কামনা মুছে গেছে। ধিক্কারে সে নিজের স্ত্রীর হাত থেকে মাদুলী খুলে দিয়ে বলে, "আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন! কাজ নাই।" বর্তমান দুই গল্পে বংশগতি একজনকে করেছে পুত্রঘাতী; অন্যজনকে নিঃসন্তান হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। আবার "শাপমোচন" গল্পে দেবীচরণ শিক্ষিত হয়েও কুৎসিত রূপের জন্যে চাকরী পায় না, সুন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা পায় না— ফলে সে আত্মহত্যা করেছে।

ফল্গু ঃ- জমিদারগণ-বংশ পরম্পরায় অত্যাচারী, নরঘাতী ছিলেন। এই প্রবৃত্তি পরবর্তী বংশধর বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ফলে বহু জমিদার বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এই গল্পে মহাবিষ্ণু সরকার প্রথমা স্ত্রীকে সন্দেহের বশে গলাটিপে হত্যা করেন। এই জান্তব রক্তের সৃষ্টি আরও ভয়ংকর। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেশ প্রজাকে গুলিবিদ্ধ করে আন্দামানে দ্বীপান্তরে গেছে। যৌবন বয়সের অত্যাচার ও অনিয়মের ফলে মহাবিষ্ণুর বৃদ্ধ বয়সে কুষ্ঠ হয়। পিতার রক্তের উগ্রতা ধীরেশকে প্রজাহত্যায় প্রেরণা দিয়েছে।

বেদের মেয়ে ঃ- বেদের মেয়ে শিবি। তিন পুরুষধরে সে স্থায়ীভাবে সমাজে বসবাস করছে, ফলে প্রেমের মাধুর্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আবার পূর্ব পুরুষদের কাছে থেকে পেয়ে চৌর্যবৃত্তি এবং অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্নবর্বরতা। এই দ্বিবিধ সত্তা শিবি চরিত্রে ক্রিয়াশীল। শিবি ভদ্রসমাজের প্রভাতকে অন্তরদিয়ে ভালবাসতে চেয়েও না পাওয়ার বেদনায় সে হিংস্র হয়ে উঠেছে আবার ভোলা-চোরকে বিয়ে করে তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছে। প্রভাতের জন্যে যখন ভোলার ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন শিবি প্রভাতকেই হত্যা করেছে।

দীপার প্রেম ঃ- দীপা উচ্চবর্ণে জন্মে ও এম. এ পাশ করে তাদেরই পূর্বতন পরিচারিকার নাতি দেবপ্রিয় হালদারকে বিয়ে করে। দেবপ্রিয়রা কাওড়া যুগী। দীপার জীবনে এই পরিণতির জন্যে কাদের প্রভাব পড়েছে তার প্রত্যক্ষ কোন কারণের উল্লেখ নেই। তবে তার দাদু অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পুত্র (দীপার বাবা) অল্প বয়সে মারা গেছেন কিন্তু মারা যাবার কোন কারণের উল্লেখ নেই। আবার দীপার মা শোভা অনেক বয়সে দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছেই থেকে যায়, এ নিয়ে অনেকেই কটাক্ষ করে। এর থেকে আমাদের মনে হওয়া সঙ্গত যে দীপার মায়ের পূর্বপুরুষদের হয়তো এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যার প্রভাব দীপার মায়ের জীবনে প্রৌঢ়-বয়সে এসেছে আবার দীপার জীবনে মায়ের প্রভাব কুমারী জীবনেই পড়েছে।

আখড়াইয়ের দীঘি ঃ- বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটত। অর্থের লোভে বা প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য এবং নিজ জমিদারীর নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্যে এ দেশে জমিদাররা নিজেরাও চুরি-ডাকাতিতে অংশ নিতেন, আবার সমাজের নিম্ন শ্রেণী যেমন ডোম, বাগদী প্রভৃতিদের মধ্যে থেকে শক্তিশালী পুরুষদের সংগ্রহ করতেন। এরা প্রয়োজনে লাঠিয়াল সাজত, আবার রাতের অন্ধকারে জমিদারের ডাকাতিতে সহযোগী হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং যশোহর জেলায় ডাকাতির যে ঘটনা ঘটেছিল তার একটি বিবরণ দেখা যেতে পারে— (২২)

	খ্রীঃ ১৮৪৬	১৮৫৭	১৮৫৮	১৮৬০
হুগলী	৪১	৩০	২৭	২৫
মুর্শিদাবাদ	৬৫	৫০	২৯	২৫
বীরভূম	৩১	১৯	৫১	৩৩
যশোহর	৬২	-	-	-

এখানে ১৮৪৬ সালের তুলনায় ১৮৬০ সালে ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ কম ছিল, কারণ ১৮৫৮ সালে ইংরেজ সরকার ডাকাতি দমনের জন্যে পুলিশের ডাকাতিদমন বিভাগ খোলেন। দারোগা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে চালান দিত। ফলে ডাকাতির দৌরাত্ম্য একটু কমে ছিল। জমিদারদের নিজ এলাকায় কিছু লাঠিয়াল ও ডাকাত ছিল। জমিদার অবাধ্য প্রজাদের বা অন্য জমিদারদের শায়েস্তার জন্যে অর্থ বা জায়গা দিয়ে এদের পুষত। এইভাবে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তারা চাষ বাস ভুলে যায়, কেবল লাঠি আর শক্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। কালক্রমে জমিদারীর পতন শুরু হলে তারা বাধ্য হয়ে ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতে পরিণত হয়েছে। এরা মদ ও ভাঙ খেত। নেশার ঘোরে এরা অমানুষ বনে যেত। ডাকাতি করতে গিয়ে কত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর কাজও তারা করত। তারাশঙ্কর "আমার কালের কথা" য় বলেছেন, "মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম করে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখানা বা দু-ফাঁক করে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিত।"[২৩] বর্তমান শতাব্দীর সূচনাপূর্বে বীরভূম-মুর্শিদাবাদে প্রায়ই যে ডাকাতি হত তা ছিল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি নৃশংস। লেখক নিজেই বলেছেন, "কত রাত্রি বাল্যকালে বিনিদ্র কাটিয়েছি তার হিসাব নাই। মধ্যে মধ্যে এক একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিনচার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত" [২৪] লাভপুরের দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পথে পাকা সড়কে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকত মৃত্যুদূতের মত "মানুষুড়ে" বা ঠ্যাঙাড়ে। বামনিগ্রাম (মুসলমান অধ্যুষিত), ধনডাঙ্গা (হিন্দু অধ্যুষিত) গ্রামগুলি ছিল ঠ্যাঙাড়ে প্রধান গ্রাম। মুসলমান প্রধান গ্রাম বজরহাটেও ছিল। লেখক একবার সাঁইথিয়া যাবার সময় এদের হাতে পড়েন কিন্তু ভাগ্যচক্রে বেঁচে যান। ঠ্যাঙাড়েরা বড় নিষ্ঠুর— সামান্য দু চার পয়সা ও পরনের কাপড়টার জন্যে তারা অনায়াসে মানুষ খুন করত এবং আখড়াইয়ের দীঘির মাটিতে পুঁতে দিত। পথে চলন্ত পথিককে লক্ষ্য করে পায়ে পাবড়া ছুঁড়ে মারত। পথিক রাস্তায় পড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরা এসে পথিকের ঘাড়ে বড় লাঠি দিয়ে লাঠির দু প্রান্ত দুজনে চেপে ধরত, অন্যজন মানুষটাকে উল্টে দিত আর মট করে ঘাড়ের মেরুদন্ডটা ভেঙে যেত। দাশকল গ্রামে একরাত্রে পথিক ভেবে নিজ পুত্রকে হত্যা করেছিল এক ঠ্যাঙাড়ে। এই ঘটনার উপরেই লেখা "আখড়াইয়ের দীঘি"।

কয়েক পুরুষ নবাবের পল্টনে কাজ করেছে, পরে কাজ চলে যায় কিন্তু লাঠি ছাড়তে পারে না। মদ খেয়ে লাঠি নিয়ে পুরুষ পরম্পরায় ঠ্যাঙাড়ে সাজে। গল্পের নায়ক কালী বাগদী নিজেই বলেছে, "কোম্পানীর আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকেই এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ, মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।" কালী নিজে আরও স্বীকার করেছে যে, তারা চারপুরুষ ধরে এই মানুষ মারার কাজ করছে। কালী রাত্রে পথিক ভেবে নিজ ঠ্যাঙাড়ে-পুত্র তারাচরণকে হত্যা করেছে। বিষাক্ত রক্তের কী ভয়াবহ পরিণতি। মরার সময় তারাচরণ বলেছে, " বাবা বাবা আমি,"। ঘাড় মটকিয়ে কালী বলেছে, " এ সময়ে বাবা সবাই বলে।" নিজপুত্রকে হত্যা করে মাত্র ছ'আনা পয়সা ও পরণের কাপড়টা পেয়েছিল সে।

বংশপরম্পরায় ডাকাতির চিত্র পাওয়া যায় "প্রহ্লাদের কালী, চোরের মা, চোর" প্রভৃতি গল্পে।

প্রহ্লাদের কালী ঃ- প্রহ্লাদ ভল্লা। এটি বাগদীদেরই একটি শাখা। তার বাবা অক্ষয় ভল্লা দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও দাঙ্গাবাজ। তার পুত্র প্রহ্লাদও বাবার রক্ত নিয়ে জন্মে আরও জঘণ্য কাজ করেছে। এমন কোন পাপ নেই যে সে করেনি। প্রহ্লাদ তিনটি বিয়েও করেছিল এবং অন্য তিনজনকে নিয়ে রঙের খেলা খেলেছে। ছেলেমেয়েদের প্রতি সামান্য কর্তব্যও সে করেনি। প্রহ্লাদ ছিল নৃশংস, মনুষ্যত্বহীন, নরকের কীট। এর জন্যে দায়ী তার বাবা এবং বংশের ধারা।

চোরের মা ঃ- এই গল্পের শুরুতেই লেখক নিজেই বলেছেন— "চুরির নেশা এই ডোম বংশটির রক্তের কণায় কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিত ভাবে করিয়া আসিতেছে।" [২৫] তাই পিতৃহারা সন্তান ফিঙে আঠার-উনিশ বছরের মধ্যেই মায়ের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে চুরি করতে গেছে এবং ধরা পড়েছে। শেষে জনতার প্রহারে মারা গেছে।

চোর ঃ- এই গল্পের ধান-চোর শশীর বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিনপুরুষধরে তাদের রক্তে চৌর্যব্যাধির বীজাণু রয়েছে। শশী বাতে পঙ্গু, তথাপি বংশানুক্রমিক বহুপত্নীক ছিল। তার ছেলে হাবলেরও এক স্ত্রী ও এক উপপত্নী ছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনে তারাশঙ্কর যোগ দিয়ে জেলে যান। জেলের মধ্যে আলাপ হয় বিখ্যাত ডাকাত কালী বাগদীর সাথে। জেলখানার অন্ধকার পাষাণপুরীতে অসংখ্য অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন। পরে তারাশঙ্কর "পাষাণপুরী" উপন্যাসখানি এদেরই জীবনের উপরে রচনা করেন। (২৬)

মধুমাস্টার ঃ- এই গল্পে বংশগতির ছাপ স্পষ্ট। দরিদ্র শিক্ষক মধুমাস্টার দেশের ও শিশুদের মঙ্গলের জন্যে সুন্দর একটি ইংরেজী বই লিখতে শুরু করেন। প্রথম পর্বে জমিদার জ্ঞানদাবাবু সাহায্য করলেও শেষে সাহায্য না পেয়ে অসীম কষ্ট করে বইখানি অসমাপ্ত রেখেই মারা যান। তাঁর উপযুক্ত পুত্র অরুণ কৃতি-ছাত্র হয়ে বাবার অসমাপ্ত বইটি সম্পূর্ণ করেন। পিতার লেখার ঝোঁক পরবর্তী পুত্রের মধ্যে বর্তেছে।

পরিবেশ প্রভাবিত গল্পনিচয়

পরিবেশ মানবজীবন গঠনে এক অবিসংবাদী অভিভাবকরূপে বিদ্যমান। পরিবেশে মানুষ গড়ে ওঠে। জন্ম সূত্রে যে গুণ নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, অনুকূল পরিবেশ তাকে যথাযথ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করে, আবার বিরুদ্ধ পরিবেশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে পরিবেশের অবদান অনস্বীকার্য। এলপোর্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, **"Personality is the dynamic organisation within the individual of those psychological systems which determine his unique adjustments to his environment."** (২৭) মার্কস মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুস্থ পরিবেশ মানুষের জীবন-ধারার পরিবর্তন ঘটায়। কোন অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেকে যদি শিক্ষিত পরিবেশে নিয়ে এসে তাকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই শিশুর বংশগতির অনেক প্রভাব পরিবর্তন হতে পারে। তারাশঙ্করের গল্পের জগৎ রাঢ়ের অশিক্ষিত ধূলিমলিন পল্লীর মানুষদের নিয়ে, যেখানে সমাজের গতি ও পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে হয়ে থাকে। শুষ্ক, রুক্ষ, কাঁকুরে মাটিতে ফসল আশানুরূপ হত না। উন্নত কৃষির জন্যে সরকার ও জমিদারগণের প্রচেষ্টার অভাব ছিল। ফলে অর্থনৈতিক দৈন্য ছিল প্রকট, সুষ্ঠু সমাজ জীবনও ভেঙ্গে গিয়েছিল। লেখকের বহু গল্পে এর ছাপ স্পষ্ট— যেগুলি পরিবেশ প্রভাবিত হয়ে চকিতে ঘটনার অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির আলোচনা করা যেতে পারে—

শ্মশানবৈরাগ্য ঃ- অর্থের প্রতি চাহিদা বাড়তে বাড়তে একজন সাধারণ মানুষ অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অমানুষ, অর্ধগৃধ্নু, পিশাচে পরিণত হয়। সামান্য অর্থের জন্যে দয়া, মায়া, কর্তব্য এমনকি চক্ষুলজ্জাকেও বিসর্জন দেন— এমনই এক চরিত্র মহিম বাঁড়ুজ্জের। বিধবা অসহায়া দিদির সংসারে দিনের পর দিন অন্নধ্বংস করেছে সে, অথচ তার বিপুল অর্থের সামান্য কাণাকড়িও দিদির সংসারে দান করে না। দরিদ্র দিদি এক মেয়েকে রেখে মারা গেলে সাময়িক ভাবে মহিমের চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে অর্থাৎ সে দিদির শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা খরচ করেছে। কিন্তু এই উদাসীনতা কয়েকদিনের মধ্যেই দূর হয়েছে। শ্রাদ্ধের খরচের টাকা কটার জন্য হা-হুতাশ করেছে সে, আবার অসহায়া ভাগ্নীর শেষ সম্বল সোনাকটা হাতে পেয়ে গ্রাস করেছে।

কুলীনের মেয়ে ঃ- এই গল্পে জমিদার ধনদা মুখুজ্জে রেজিষ্টারী অফিসে কেরাণীর কাজ করতেন। তার সংসারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। অফিসে বেতন ছাড়াও দৈনিক দু-তিন টাকা উপরি পাওনা ছিল। পনেরো টাকার মূল বেতনের সময় দু-তিন টাকা অতিরিক্ত পাওনা তা কম কথা নয়। উপরিপাওনা বা ঘুষ এক প্রকার চুরিরই নামান্তর। এই অসৎ প্রবৃত্তির জন্যে তাঁরই কন্যা বিধবা তরু প্রৌঢ় বয়সে পেটের জ্বালায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং গ্রামের গাঙ্গুলীবাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সুযোগ পেয়ে সোনার তাগা ও এক ছড়া চেন চুরি করে। কিন্তু পরিবেশ তরুকে সৎ হতে শিক্ষা দেয়, তাই চুরির অপরাধ সে সহ্য করতে পারে নি বলেই হয়তো আত্মগ্লানিতে তরু বিষ খেয়ে মারা যায়।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ- চণ্ডীচরণ রায় মাতাল, সাতপুরুষধরে তাদের তান্ত্রিক বংশ। চণ্ডীচরণ সহজ, সরল, নিষ্ঠাবান, অকৃতদার। তার একমাত্র নয়নের মণি বিধবা ভাগ্নী। চণ্ডীচরণ মিশত যে পরিবেশে তা ভাল নয়। বিশেষ করে মদের দোকানদার, লোভী গিরীশ সাহা। সে সর্বদা চণ্ডীচরণকে মদ খাইয়ে রাখত কারণ তার লক্ষ্য ছিল চণ্ডী রায়ের জমিগুলোকে আত্মসাৎ করা। এই নোংরা জঘন্য পরিবেশে মিশেই চণ্ডীচরণ তার আদরের ভাগ্নীকে দান করা সমস্ত সম্পত্তি আদালতে মামলা করে কেড়ে নেয়। ভাগ্নী দুঃখে, ক্ষোভে ঘর ছাড়ে। বিরুদ্ধ পরিবেশ-ই তাদের সুখের সংসারে আগুন সৃষ্টি করে।

মরুর মায়া ঃ- বেদেরা যাযাবর, তারা পরের ছেলে চুরি করে নিজেদের সমাজে নিয়ে এসে মানুষ করে। ধীরে ধীরে জন্মসূত্রে উচ্চ বংশে জন্মানো কোন শিশু বেদেদের পরিবেশে থাকতে থাকতে সে বেদিয়া হয়ে যায়। ডাকু বর্তমানে

বেদেদের সর্দার কিন্তু একসময় সেও ছিল নদীয়া জেলার নওগাঁও জমিদার অবিনাশ চৌধুরীর ছেলে। আবার সেও একদিন বর্ধমান জেলার কালীপুর গ্রামের জগদীশ রায়ের পুত্রকে চুরি করে আনে এবং তার নাম দেয় ননকু। ননকু বড় হয়ে যখন নিজের পরিচয় জানতে পারে তখন সে পালিয়ে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে বেদেদের সমাজে। জন্মসূত্রে উচ্চবংশে জাত হয়েও ননকু বেদেদের পরিবেশে থেকে বড় হয়েছে এবং সব ভুলেছে, তাই বাড়ী যেতে চেয়েও পারে নি। এই পরিবর্তনের জন্যে তার পরিবেশই দায়ী।

মতিলাল ঃ- অত্যন্ত সহজ ও সারল্যে পূর্ণ হয়েও বিকৃত বীভৎস আকৃতির জন্যে মতিলাল হাড়ি সভ্য সমাজের কাছে পেয়েছে আঘাত ও লাঞ্ছনা। অন্যের ছেলেমেয়েদের নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার অধিকারও সে পায়নি। তাই সে সংসারী হয়ে সন্তানের জন্যে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সন্তানকামনা ত্যাগ করেছে। পরিবেশ যদি অনুকূল হত, যদি ভদ্ররূপী মানুষেরা মতিলালকে ভালো চোখে দেখতেন, তাহলে মতিলালের জীবনে এমন দুঃখ আসত না বা মতিলালের সন্তান হলে সে হয়তো সুখী হত। মতিলালের সন্তান সুন্দর হতেও পারত। এখানে বিরুদ্ধ পরিবেশ তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

মেলা ঃ- রূপোপজীবিনী কমলি যে কোন কারণেই হোক বাধ্য হয়েই এই হীনবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। মনের দিক থেকে কোন দিনই এই বৃত্তিকে গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু সুযোগ পায় নি বলেই সে পালাতে পারে নি। কিন্তু মেলায় হারিয়ে যাওয়া মণিকে সেখানকার লোক (মাসি) বিক্রি করতে চাইলে, মণিকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে কমলি বস্তি ছেড়েছে। সে ভবিষ্যতের চিন্তা করেনি, সমাজে কোথায় দাঁড়াবে তার চিন্তাও করে নি, শুধু এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মেয়েটিকে বাঁচানোর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্তে সব বিস্মৃত হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে তার মাতৃত্বের এক গভীর উন্মাদনাও ক্রিয়াশীল ছিল।

অগ্রদানী ঃ- পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবন এমন হীন, জঘন্য হয়ে উঠত না যদি দরিদ্র না হতো ও লোভনীয় পরিবেশ না পেত। একদিকে সন্তান ও পরিবারের জন্যে আহারের চিন্তা, অন্যদিকে নিজের অসংযত লোভ তাকে যেমন দিশাহারা করেছে, অন্যদিকে জমিদার শ্যামাদাস বাবুর দেওয়া একের পর এক লোভনীয় প্রস্তাবদান— এই দ্বিবিধ সত্তায় পূর্ণচন্দ্রের এই পূর্ণত্ব ঘটেছে। দশবিঘা জমির সঙ্গে সিংহবাহিনীর নিত্য এক থালা প্রসাদের লোভেই পূর্ণ চক্রবর্তী নিজের ছেলেকে পর্যন্ত সূতিকাগার থেকে দিয়ে আসতে পেরেছে। পঁচিশ বিঘা জমির লোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহজেই শ্যামাদাসবাবুর স্ত্রীর পিন্ড গ্রহণ করেছে। দশবিঘা জমি পুনরায় পাওয়ার পরিবর্তে পূর্ণ চক্রবর্তী নিজপুত্রের (শ্যামাদাস বাবুকে দেওয়া) শ্রদ্ধার পিন্ড গ্রহণ করেছে। চক্রবর্তী লোভী ঠিকই, তথাপি তার এই নির্মম চরিত্র সৃষ্টির জন্য শ্যামাদাসবাবুর লোভনীয় সম্পত্তি, ভোগ, দান-সামগ্রী প্রদানই সর্বাংশে দায়ী।

নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ- সত্যবাদী ও মহাপন্ডিতের বংশধর নুটু বিহারী— পেশায় শিক্ষক, দরিদ্র তথাপি আদর্শ মানুষ হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। ধনী জমিদার-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী অপমানিতা হন। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মোক্তারি ও ওকালতি পাশ করেন। আদালতে কেসে জমিদার অন্যায়ভাবে নুটুর জমির ভাগচাষী মহাভারতের উপর অত্যাচারের জন্যে হেরে যান। নুটুর খ্যাতি ও প্রসার বাড়তে থাকে— বিশাল অট্টালিকা ও প্রচুর অর্থের মালিকও হন। জমিদার যদি নুটুর স্ত্রীকে অপমান না করতেন কিংবা নির্দোষ মহাভারতের উপর এই অত্যাচার না করতেন তাহলে সমাজ একজন সৎ আদর্শবাদী, সার্থক শিক্ষক হিসেবে নুটুকে পেত। তিক্ত পরিবেশ ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতি নুটুর মানসিক পরিবর্তনের জন্যে দায়ী।

না ঃ- প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে যেমন নুটুর দেখি, তেমনি আবার আদালতের কাঠগড়ায় স্বামী হত্যাকারী বলশালী, দাম্ভিক, যুবকের পরিবর্তে এক শুভ্রকেশ, শীর্ণতনু, ন্যুব্জদেহ, বিহ্বলদৃষ্টি, করজোড়ে দন্ডায়মান যুবককে দেখে দীর্ঘ আট বছর কৃচ্ছ্র সাধন করেও তাকে মুক্তি দিয়েছেন ব্রজরাণী। হত্যাকারী অনন্ত আর বিচার প্রার্থী অনন্তের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য দেখেই ব্রজরাণীর প্রতিশোধের আগুণ নিভে গিয়ে নেত্র থেকে ক্ষমাসুন্দর শান্তপ্রবাহ ধারা বর্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে যে পরিবেশে প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন, সে পরিবেশ দীর্ঘ আট বছরের জীবনে পরিবর্তন হয়ে গেছে, পরিবর্তে তাঁর চিত্তে নিরাসক্ত ও বৈরাগ্যের জন্ম হয়েছে। সেই জন্যেই বোধ হয় ব্রজরাণীর চরিত্রে এই অভাবনীয় পরিবর্তন।

জলসাঘর ঃ- এই গল্পে উদীয়মান ধনী মহিম গাঙ্গুলী পরিবেশের গুণেই এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে। গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করেছে। রায় কর্তাদের হুজুর বলেছে। কিন্তু ইংরেজদের দয়ায় অর্থের পরিমাণ ক্রমপুঞ্জহারে বেড়েছে, ফলে সে সাহেব, বাবুদের কাছে সম্মান পেয়েছে, পায়নি কেবল গ্রামের সাধারণ প্রজাদের কাছে। কারণ ঐ রায়বাড়ি। প্রজাদের কাছে দামী মোটর অপেক্ষা রায়বাড়ী বৃদ্ধ হস্তিনীর খাতির অনেক বেশী। অর্থের প্রাচুর্য

মহিমকে বংশ পরম্পরার হুজুর সম্বোধন ভোলাতে চেয়েছে; সে নিজেকেই হুজুর বলে সকলের কাছে জাহির করতে চেয়েছে এবং পদে পদে অর্থের প্রতিযোগিতায় মহিম বিশ্বম্ভর রায়কে হেনস্ত করেছে। এখানে বংশগতি নয়, অর্থনৈতিক পরিবেশই দায়ী।

কবি ঃ- বীরভূমের আদি অপরাধপ্রবণ জাতিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল হাড়ি— যেখানে বংশপরম্পরায় চুরি, মদ্যপান, নরহত্যা, ব্যাভিচারী জীবনযাপন, সংস্কারহীন সমাজই প্রতিফলিত। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিতাই হাড়ি পিতৃপিতামহের রক্তের সামান্যতম অংশও গ্রহণ করেনি। সে চুরি তো দূরের কথা, মিথ্যা কথা বলা বা কোন নেশা পর্যন্তও করে না। বেশীদূর লেখা পড়াও করেনি অথচ সৎ, সত্যবাদী। মাকে চোর বলার অপরাধে মামার কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ঘর ছাড়ে এবং গ্রামের স্টেশনে কুলি-ব্যারাকের মধ্যে বাসা করে থাকে। মাঝে মাঝে কুলিগিরি করে শেষে কবিয়াল হয়ে যায়। দেশে দশের কাছে সম্মান, ভালবাসা, অর্থ, পুরস্কারও পায়। নিতাইয়ের বংশ এত জঘন্য হীন হওয়া সত্ত্বেও নিতাই কেমন করে এত ভাল হল? মনে হয় ছোটবেলা থেকে ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল এবং বাড়ী ছেড়ে স্টেশনে চলে আসে। বিভিন্ন খারাপ ভাল মানুষের সঙ্গে মিশেছে; হঠাৎ কবিগান গেয়ে সুনাম পেয়ে যায়। জীবনের অনুকূল পরিবেশই তাকে ও তার স্বভাবকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এই পরিবেশকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলতে পারি।

চরহাটির স্টেশন মাষ্টার ঃ- এই গল্পটিকেও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ফসল হিসেবে বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ সন্তান স্টেশনে টিকিট কালেক্টর। বৃত্তিতে তিনি ভৃত্যেরও অধম। কোম্পানীর বশংবদ ভৃত্য বলে তিনি এই বৃত্তিকেই গর্ব করেন। ঘর, বাড়ি, সব ভুলেছেন এখানেই তিনি সংসার পেতেছেন। কোম্পানী স্টেশন উঠিয়ে দিতে গেলে মাষ্টার মশাই অনুনয় বিনয় করে স্টেশনের পাশেই একটি জায়গায় বিনা খাজনায় কয়লার ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু মাষ্টারের মর্যাদা থাকবে না, তাই নির্লজ্জের মত সাহেবকে বলেছেন যে বিনা বেতনে যদি তাঁকে টিকিট কালেক্টরের কাজটা দেওয়া হয় তো ভাল হয়। কোম্পানী তাঁর প্রস্তাব মঞ্জুর করে। স্টেশনে কাজ করতে করতে ইনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের মনুষ্যত্ব, বিবেক ইত্যাদি সব কিছু।

জটায়ু ঃ- শিবু কর্মকারের আধপাগলা জোয়ান ছেলে জটে। বাবার সাথে কামারশালায় লোহার কাজ করতো; কিন্তু বিশ বাইশ বছর বয়সে গ্রামে "সীতাহরণ" পালা দেখে তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। সীতাহরণকে সত্য বলেই সে ধরে নেয়। অভিনয়ে জটায়ু যে সেজেছিল সেই উমেশকে জটে প্রণাম করেছিল, কারণ জটায়ুর আত্মদান তাকে মুগ্ধ করেছিল। পরদিন উমেশকে জীবিত দেখে জটে তাকে "কাপুরুষ" বলে চিৎকার করে। এরপর নাটকের মূলকর্তা শিবনাথের কাছে যায় "সীতাহরণ" পালায় জটায়ু সাজবার জন্যে। এইভাবে যাতায়াত করলেও শিবনাথ জটেকে অভিনয়ের সুযোগ দেন নি। একদিন রাত্রে গ্রামে সাধুবেশী নেপাল গুন্ডা যখন শিবনাথের স্ত্রী কল্যাণীকে চুরি করে নিয়ে যায়, তখন অন্ধকার পথে নেপাল গুন্ডাকে জটে আক্রমণ করে কল্যাণীকে উদ্ধার করলেও সে ও নেপাল গুন্ডা উভয়েই মারা যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের মানসিকতা ও নিজস্ব পরিবেশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। নাটকটি দেখার পর থেকেই জটের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে যায়। রামকৃষ্ণের সেই অমোঘ বাণী— "থিয়েটার নোকশিক্ষের হয়" কথাটি জটের জীবনে হুবহু মিলে গেছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ জটের জীবনকে মহা মহিম করে তুলেছে।

পাদটীকা

1.	Mac Iver & page	:	Society	P - 95
2.	Woodworth & Marquis	:	Psychology	P-154
3.	Mac Iver & Page	:	Society	P - 97
4.	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২৩৯
5.	K. Pearson	:	Biometrika, Vol-3	P-156
6.	Krech & Crutchfield	:	Elements of Psychology	P-563
7.	D. Mitra, J. Guha,S.K.Chowdhury	:	Studies in Botany -Vol -2	P-899
8.	Thrope	:	Psychological Foundations of Personality	P-16

9.	প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত	:	মনোবিদ্যা	পৃ. ৩৫১
10.	Woodworth & Marquis	:	Psychology	P-164
11.	G. Wilson Shaffer	:	The Biological Basis of Pediatric practice	P.-53
12.	Mac Iver & page	:	Society : An Introductory Analysis p-73	
13.	ibid	:		P-74
14.	ibid	:		P-78
16.	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২২০
17.	ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	:	মনোবিদ্যা (অষ্টম অধ্যায়)	পৃ.৩৫
18.	Mac Iver & page	:	Society	P-95
19.	Ibid	:		P-74
20.	Ibid	:		P-96
21.	খগেন্দ্র নাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা	পৃ. ২৪৬
22.	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	:	বাংলার ডাকাত (অখন্ড সং), ভূমিকা	পৃ. ১
23.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	রচনাবলী ১০ম খন্ড	পৃ. ৪০৩
24.	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪০৩
25.	জগদীশ ভট্টাচার্য	:	তারাশঙ্করের গল্প গুচ্ছ (২য় খন্ড)	পৃ. ২১৪
26.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	পৃ. ৮৮
27.	G. W. Allport	:	Personality : A Psychological Interpretation	P-48

* * * * * * * * * * *

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও কুসংস্কার

সপ্তম অধ্যায়

সংস্কার ও কুসংস্কার

বাংলা ভাষার 'সংস্কার' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত। মানবসভ্যতার আদিকাল থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ সংগ্রাম শুরু করেছে, সেদিন থেকে সংস্কারেরও জন্ম হয়েছে। জীব জন্তুর সঙ্গে, প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্বিপাকের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে মানুষ কখনও জয়ী কখনও বা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করেছে, অথচ জয়ের বাসনায় মানুষের জয়যাত্রা। তাই যাত্রাকালে বিভিন্ন ধরনের সংকেত লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে থাকে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম হয় সংস্কার। এ বিষয়ে ডঃ বরুণ চক্রবর্তী যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল এই যে— "প্রাচীনকালে আদিম মানুষেরা শিকার করতে গিয়ে নানা সংকেত লক্ষ্য করতে থাকে। বারংবার একই অভিজ্ঞতা থেকেই এই সংকেতগুলি সংস্কারে পরিণত হয়েছে। যেমন আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি, নক্ষত্রের স্খলন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। পরবর্তীকালে মানুষ যতই সভ্য এবং উন্নত হতে থাকে, ততই পরিণামের সঙ্গে কল্পিত সংকেতগুলোর যোগাযোগকে স্পষ্টতর করে নিতে থাকে।"[১] শিক্ষার অভাবে বিশেষ করে উপজাতি ও আদিম গোষ্ঠী সম্বলিত এলাকা, পল্লীবাংলায় সংস্কারের প্রাধান্য আজও প্রবল— শিক্ষিত সমাজেও সংস্কার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও সমানভাবে ক্রিয়াশীল।

সংস্কার সম্বন্ধে Carveth Read বলেছেন, **"Superstition means in common use false beliefs concerning supernatural powers, especially such as are regarded as socially injurious and particulars as leadinng to obscuranitism or cruelty. "Superstition" then, is here used merely as a collective term for the subject..... Magic (or the belief in occult forces) and Animism (or the belief in the activity of spirits)."**[২] এ প্রসঙ্গে Melville J. Herskovits বলেছেন, **"Superstitions are, however, but beliefs of which there is no longer a whole-hearted acceptance. They are practices that are followed without conviction, but with an uneasy feeling that it will do no harm to carry them out, if by chance we thus get on the good side of powers whose existence we may at times doubt"**[৩]

প্রাচীনকালে পশুপাখি, গাছপালা, পাথর, মাটি, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই আত্মা বিদ্যমান এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পড়ার মতবাদের নাম সর্বপ্রাণবাদ। এর অনেক বিভাগের মধ্যে Animatism হল একটি। যার সম্পর্কে লুইস স্পেন্স বলেছেন, **"One of these is the belief in what is known as Animatism, that is, the notion that every object in the natural world is a living and sentiment being in the same sense that man himself is."** [৪]

'আত্মা' এই কথাটি আবিষ্কার করে আদিমমানব বিশ্বাসী হয়ে যায় যে, ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দেহমধ্যস্থ আত্মার জন্য। এই মৃতের আত্মা অনিষ্টকারীর কাছে প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এইভাবে যেমন সর্ববস্তুতে জীবন আছে এই বিশ্বাসে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি, অন্যদিকে সৎ ও অসৎ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী অপদেবতার উপর বিশ্বাস জন্মায়। এইসব সংস্কার থেকেই জন্ম হয় 'মানা'র। মানা কাকে বলে? উত্তরে বলা যায়— **"A kind of transcendental force, mana is thought to be the spirit that pervades all objects and things and is responsible for the good and the evil in the universe."** [৫] এই "মানা" নামক ক্রিয়ানুষ্ঠান দুভাবে অনুষ্ঠিত হত— সর্বজনীন ও ব্যক্তিবিশেষে। "ব্যক্তি বিশেষ 'মানা' ধারণ করে, এই শক্তির বলে ভালো ও মন্দ উভয়বিধ কাজই করতে পারতো। প্রকৃতপক্ষে এরাই আদিম সমাজে ঐন্দ্রজালিক বলে অভিহিত হতো।" [৬]

প্রাচীন ও আধুনিক জনসমাজের মধ্যে প্রচলিত বহুবিধ প্রথা ও লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে টোটেমবাদ। টোটেম প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন, **"What is totem? It is as a rule an animal (whether edible and harmless or dangerous and feared) and more rarely a plant or a natural phenomenon (such as rain or water) which stands in a peculair relation to the whole clan."** [৭] এই টোটেমবাদের শ্রেণীবিভাগ বলতে গিয়ে J. G. Frazer বলেছেন, **"Totems are at least three kinds : (1) the clan totem, common to a whole clan, and passing by inheritance from generation to generation; (2) the sex totem, common either to all the males or to all the females of the tribe, to the exclusion in**

either case of the other sex: (3) the individual totem, belonging to a single individual and not passing to his descendants....." (৮)

এইভাবে টোটেমবাদ একদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। যেমন গোত্র টোটেমকে গোত্রের সকল সদস্যই যথাযোগ্য সম্মান করে। তারা বিশ্বাস করে আদিকাল থেকে এই টোটেম তাদের রক্ষাকর্তা, এর ফলে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন, সংহতি সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে যে সাঁওতাল অধিবাসী রয়েছে তাদের প্রতিটি গোত্র উদ্ভিদ, জন্তুজানোয়ার ও বস্তুবিশেষের নামে নামাঙ্কিত। এদের কাছে টোটেম প্রাণী ভক্ষনযোগ্য কিন্তু ক্ষতিকারক জীবজন্তুকে এরা টোটেম হিসেবে পূজো করে। হিন্দুদের মধ্যে তুলসী, বেল, বটগাছের পাতা যেমন পবিত্র, আবার কাক, বিড়াল পরিবারের অমঙ্গলকর জীব বলে তাদের পবিত্র রূপে দেখে। যদিও এর মধ্যে টোটেমবাদের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং টোটেমবাদ হল— "আদিম মানুষ আত্মরক্ষার তাগিদে জন্তু জানোয়ার, গাছপালা ইত্যাদির উপর নির্ভর করেছে। তাই টোটেম বাদ হল মানুষের সঙ্গে পরিবেশের একটা সহানুভূতিসূচক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। একই টোটেম সম্ভূত প্রত্যেক লোকই জ্ঞাতি অর্থাৎ একই পরিবারভুক্ত এবং এই পরিবারের সবচেয়ে দূর সম্পর্কের জ্ঞাতির সঙ্গেও যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে একটি বিরাট বাধা বর্তমান।" (৯) আত্মরক্ষার তাগিদে সৃষ্টি হয় টাবু। টাবু দেবতাদের থেকেও প্রাচীন। টাবু-প্রচলিত নিষেধ অমান্য করলে তার চরম শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। যেমন কোন নিরপরাধ ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন পশু হত্যাকরে মাংস ভক্ষণ করল। যখন জানতে পারে তখনই সে ভাবে যে তার নিস্তার নেই এবং সে মুষড়ে পড়ে সত্যি সত্যিই মারা গেল। তাই যা কিছু পবিত্র, অসাধারণ এবং সেই একই সঙ্গে সাংঘাতিক অশুচি ও অদ্ভুত— তাই টাবু। যে ব্যক্তি টাবু নিয়ম ভাঙে সেও টাবু হয়ে যায়। সেই ব্যক্তিকে অন্যান্যরা এড়িয়ে চলে, ছোঁয় না— সৃষ্টি হয় ছোঁয়া-ছুঁয়ি।

সংস্কারের উৎসে ধর্মীয় নির্দেশ বা আচারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন ঋকবেদেও এর উদাহরণ মেলে। পেঁচার ডাক অমঙ্গলসূচক, তা দুরীকরণের জন্যে ১০ম মন্ডলে ১৬৫ সূক্তে বলা হয়েছে—"যদুলুকো বদতি মাঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্রৌকৃনৌতি। যস্য দূত প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে।" (১০)

তিনহাজার বছর আগেও পেঁচার ডাককে যমের দূতের মত মনে করা হত। আজ আমরা এটিকে কুসংস্কার বলি, তা সত্ত্বেও রাতে পেঁচার ডাক শুনলেই মনটা কেমন অশুভ সংকেতে শিউরে ওঠে। সংস্কার বা বিশ্বাস কখনও ব্যক্তিগত হয় আবার লোক সমাজের জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে প্রকাশও পায়। ব্যক্তিগত সংস্কার বিশ্বাস সমাজে প্রযুক্ত হলে তা হয় লোক সংস্কার। ব্যক্তিগত সংস্কার সেই ব্যক্তির নিজস্ব আবিষ্কার। যেমন আমরা প্রত্যেকে জীবনে সাফল্য চাই, অভীষ্ট লাভের জন্যে আমরা নানা সংস্কারের বশবর্তী হই। যে কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তি নিজে বিশ্বাস করতে পারে। যেমন এখনও কেউ কেউ মনে করে যে যদি ডুমুরের ফুল দেখতে পায় তাহলে সে রাজা হবেই। এই বিশ্বাস কিন্তু সমাজে কেউ স্বীকৃতি দেয় না— তাই এটি সংস্কার নয়।

সামাজিক প্রথা সৃষ্টি হয় সংস্কার থেকেই। বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়া থাকতে পারে। একাধিক ক্রিয়া থাকলে তা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বাঙালীর বিভিন্ন উৎসব, পাল-পার্বণে এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সব সংস্কার অর্থহীন নয়। যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কার অনেক আছে, যেগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃত কারণ গোপন রেখে অন্যবিধ কারণের উল্লেখ। যেমন স্বর্ণালংকার হারালে অমঙ্গল হয়। এর কারণ সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। যাতে ব্যবহারকারী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করে তার জন্যেই এই সংস্কারটির উদ্ভব। আবার, আমাদের দেশে গর্ভবতী মায়েদের উপর নানাবিধ নিষেধ আরোপিত হয়ে থাকে। সদ্যোজাত সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনে গর্ভবতী মায়েদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশেও এই সংস্কার চালু আছে। প্রসূতি ভূমিকা প্রসঙ্গে Encyclopaedia গ্রন্থে বলা হয়েছে— **"Birth marks on a baby's face or body are often said to be caused by something seen or touched by the mother during her pregnancy."** (১১)

দিন, বার, মাস, বস্তু, ধাতুর নাম ইত্যাদি সংস্কার দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। তুক-তাক, ব্রত প্রভৃতি বহু সংস্কার বর্তমানে ব্রতে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ভাল, কিছু মন্দ। যেমন তারাশঙ্করের "কালাপাহাড়" গল্পের নায়ক রংলাল পাঁচুন্দির হাট থেকে ১৯৮ টাকায় দুটি মোষ কালাপাহাড় এবং কুম্ভকর্ণ কিনে আনে। স্ত্রী যশোদার মা ওদের পায়ে জল, শিং-এ তেল-হলুদ মাখিয়ে বরণ করে নিয়েছে ঘরে। রাঢ়-বাংলার একটি নিজস্ব প্রথা এই "বরণ"। এছাড়া ধর্মরাজ ঠাকুরের কাছে মানত করে লোকে মাটির ঘোড়া দেয়। অম্বুবাচীর দিন ধরিত্রী নাকি ঋতুমতী থাকেন তাই হল কর্ষণ বন্ধ থাকে। কৃষকদের বিশ্বাস ঐদিনে ধরিত্রী রজঃস্বলা হন। বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে লক্ষ্মীব্রত মহাসমারোহে পালিত হয়। মেয়েরাই এই ব্রত নির্বাহ করে থাকেন। এই ব্রত গুলির সঙ্গে ব্রতচারিণীর মনে ভাল শস্যোৎপাদনের আকাঙ্খা যে সম্পৃক্ত

— তা সুস্পষ্ট। বিদেশেও এই ব্রত আছে। মেক্সিকোয় কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সময় মেয়েরা মাথার চুল আলুলায়িত করে রাখে, উদ্দেশ্য হল কেশ গুচ্ছের মত শস্য যেন গুচ্ছ গুচ্ছ উৎপাদিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে বলেছেন, **"The woman of the village wore their hair unbound, and shook and tossed it, So that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long."** (১২) সব কিছুর মতই সংস্কারও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। একযুগে যা ছিল জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত, পরবর্তীযুগে সেগুলি শুধু পরিত্যক্তই হয় না, সেগুলিকে আমরা কুসংস্কার বলি। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী তাই বলেছেন— "বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল।"(১৩)

কুসংস্কার ঃ- যুক্তিহীন আচার পালনই কুসংস্কার— যার জন্ম বস্তুতঃ যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস থেকে। মানুষ যখন যুক্তির চেয়ে আবেগকে প্রাধান্য দেয় তখনই বিভিন্ন উদ্ভট সমস্যার জন্ম হয়। এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্ত করেছে, বিপথগামী করেছে শাসক শ্রেণী। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, কুসংস্কার আজও বাসা বেঁধে আছে। কুসংস্কার শাসক শ্রেণী নিজস্বার্থে জীইয়ে রেখেছে। "শোষক শ্রেণী কখনই চাইতে পারে না সাধারণ মানুষের চেতনাকে যুক্তিনিষ্ঠ করতে, বেশি দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে"। (১৪) কারণ সাধারণ যদি যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে যায় তাহলে শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের অন্যায় ধরা পড়ে যাবে। সমাজের বুকে নিজেরা জীবন্ত ঈশ্বর সেজে থাকতে পারবে না। এছাড়া ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠী স্বার্থেও কুসংস্কার টিকে রয়েছে। সেই সঙ্গে পরিবেশ বাধ্য করাচ্ছে কুসংস্কারকে মেনে নিতে। যেদিন থেকে সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়েছে। এই কুসংস্কার কি বা কাকে বলে? এ ব্যাপারে আব্দুল হাফিজ বলেছেন, "কোন একটি বিশেষ লোকসংস্কার যখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দরুন অপ্রচলিত হয়ে যায় কিংবা লোকজীবনে যখন তার আর কোন কার্যকরী জীবন্ত ভূমিকা থাকে না, তখন তা কুসংস্কার নামে অভিহিত হয়"। (১৫) এ বিষয়ে এ, এইচ ক্রাপের বক্তব্য হল, **"Superstition, in common parlance, designates the sum of beliefs and practices shared by other people in so far as they differ from our own. What we believe and practice ourselves is, of course, Religion".**(১৬) অর্থাৎ নিজের ধর্ম ও বিশ্বাস ছাড়া অন্যের ধর্ম ও বিশ্বাসকে অন্ধ কুসংস্কার বলেই মনে করে। আবার স্থানবিশেষে বা যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে কোথাও যে বিশ্বাস প্রচলিত, সেটাই আবার কোথাও কুসংস্কার। যেমন একই হিন্দুধর্মের লোকদের মধ্যে অঞ্চলভেদে সংস্কারের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দেখা যায়। ক্ষিতিমোহন সেন তাই বলেছেন, " হিন্দুর মধ্যে দিবা-বিবাহও আছে, রাত্রিতে বিবাহও আছে। এই দেশে প্রদেশ-ভেদে মাতুল কন্যা বিবাহ আছে, আবার তাহাতেই জাতি যায় এমন স্থানও আছে। এক সময় গো-বধও এখানে চলিত, এখন সেই নামে লোকে শিহরিয়া উঠে।" (১৭)

গোষ্ঠীপতি বা শক্তিশালী ব্যক্তি অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করতেই এইসব অন্যায় কুসংস্কারের জন্ম দিয়েছে। কুসংস্কার যতদিন সমাজে থাকবে ততদিন শ্রেণী চেতনা বা শ্রেণী সংগ্রাম ঘটবে না, ধর্মের দোহাই দিয়ে সহজ সরল অশিক্ষিত দরিদ্রদের বোকা বানানো যাবে না। তাই প্রবীর ঘোষ বলেছেন— "কুসংস্কার ও জাতপাতের বিশ্বাস যতদিন শোষিত মানুষগুলোর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে ততদিন শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগোতে পারবে না, শোষিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর একটি গোষ্ঠীর অবিশ্বাস ও ঘৃণাকে যতদিন বজায় রাখা যাবে, ততদিন তাদের মধ্যে শ্রেণী চেতনা, শ্রেণী সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ পাবে না। শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেলে কুসংস্কার, জাতপাতের মত বিষয়গুলো দূরে সরে যায়।" (১৮) কুসংস্কার কখনই সমাজে অভিপ্রেত নয়। চিরায়ত বিশ্বাস দূর করতে হবে। এর জন্যে চাই সর্বজনীন শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়বে কুসংস্কারের বিষময় পরিণাম ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে যাবে। যে কোন বিশ্বাস একজন নিরক্ষর মানুষের কাছে আমৃত্যু অন্ধত্বের পর্যায়ে থাকে, অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রথমে বিশ্বাস করলেও ধীরে ধীরে তাকে যুক্তির আলোকে যাচাই করতে শেখে। যেমন শূদ্ররা পিতা মাতার মৃত্যুর পর এক মাস অশৌচ পালন করত, কন্যা সন্তান হলে একমাস ও পুত্র সন্তান হলে একুশ দিন আঁতুড় হিসেবে অশৌচ পালন করত। সেই পরিবারের বর্তমান শিক্ষিত প্রজন্ম মৃত্যুর পনেরো দিনেই শ্রাদ্ধ শান্তি করে শুদ্ধ হয়। অনেকে পিতা-মাতার মৃত্যু হলে এক বছর নগ্ন পায়ে থাকত; বর্তমানে তা প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

জাতিভেদ প্রথা

এরপর জাতিভেদ প্রথা। জাতিভেদ প্রথা সমাজে কুসংস্কার সৃষ্টির পক্ষে সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে— বিশেষ করে এই ভারতবর্ষে। প্রাচীন ঋকবেদে জাতিভেদের উল্লেখ আছে (পুরুষসূক্তে)। গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি ও এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ ৪/১৩। অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে

চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলা বাহুল্য। যেদিন থেকে চতুবর্ণের সৃষ্টি হল সেদিন থেকেই সৃষ্টি হল জাতিভেদ, অশুচি, অস্পৃশ্যতার বাতাবরণ। এছাড়া বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর যৌন মিলনের ফলে অনেক বিচিত্র সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হয়। সুতরাং চতুর্বর্ণই একমাত্র জাতি নয় বা জাতিভেদ সৃষ্টিকারী নয়। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কারণ ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর উপস্তর।" (১৯) তাই জাতিভেদ প্রথার প্রকৃত স্বরূপ চতুর্বর্ণের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না। সেইজন্যে শ্রীনিবাস মন্তব্য করেছেন, **"....the influential concept of varna successfully obscured the dynamic features of caste during the traditional or Pre-British period."** (২০ক)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। যদিও সনাতন হিন্দুদের কাছ থেকে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিপুল সাড়া পাওয়া যায় নি। রামমোহন প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"তে এই প্রথার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আলোচনা হতে দেখা যায়। রামমোহন একদা এক জনৈক ব্যক্তিকে এক পত্রে লেখেন, **"....I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interests. The distinction of Castes introducing in numerable divisions and sub-divisions among them, has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise."**(২০খ) ব্রাহ্ম সমাজের যে "ট্রাস্ট ডীড" রামমোহন করেছিলেন তাতেও জাতিভেদ প্রথার বিরোধী মনোভাবের পরিচয় মেলে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হঠাৎ করে শত শতাব্দী লাঞ্ছিত জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্ত সম্ভব নয়। তবে তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন, যে ধীরে ধীরে এর বিলোপ ঘটবে। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে বলেছিলেন, " এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে।" (২০গ)

জাতিভেদের সংস্কার দূর করার জন্যে কেশবচন্দ্র সেন অসবর্ণ বিবাহ ও উপবীত-বর্জন কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে ১৮৭২ সালে "তিন আইন" বিধিবদ্ধ হয়— যেখানে অসবর্ণ বিবাহ স্বীকৃত হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও বৃহত্তর সমাজ থেকে জাতিভেদের কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন হয় নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও জাতিভেদের অভিশাপ আমাদের সমাজে জগদ্দল পাথরের মত রয়ে গেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে সমাজ -সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেছিলেন— " জাতিভেদের ফলেই আমাদের দেশের মানুষ মনুষ্যত্বহীন ও কাপুরুষ। আমাদের বিবাহ রীতিও ঐ প্রথার জন্যে অদ্ভুত ও ক্ষতিকারক। বাল্যবিবাহেরও অন্যতম কারণ জাতিভেদ। "(২০ঘ) 'শিবনাথের মতে জাতিভেদ প্রথা অধর্মের ওপরই প্রতিষ্ঠিত'।

বাংলাদেশে বল্লাল সেনের আমল থেকেই কৌলিন্য প্রথাকে কেন্দ্র করে জাতিভেদ প্রথা আরও জোরদার হয় ব্রাহ্মণগণ নিজেদের খেয়াল খুশীমত সমাজে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতার বাতাবরণ তৈরী করে নিজেদের আধিপত্য ও স্বার্থ বজায় রেখেছিল। তারপর সামন্ততন্ত্রের যুগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নেমে আসেন সামন্ত ও জমিদারগণ। জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে তাঁরা কুসংস্কার জীইয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং নানা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়ে তাদের বোকা বানিয়ে রাখতে শাসকশ্রেণী ছিলেন বদ্ধপরিকর। ধীরে ধীরে ধনতন্ত্র ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার আবির্ভাবে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়, নেমে আসে অর্থনৈতিক দুরবস্থা; ক্ষুধার জ্বালায় নিরক্ষর মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয় নানা আচার অনুষ্ঠানের এবং গ্রাম্য শান্তি শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। তাছাড়া রাঢ় বাংলায় নানা উপজাতি আসত। যেমন— ইরাণী, যাযাবর, বেদে, যাদুকরী সম্প্রদায়। যাযাবর জীবন যাত্রার ফলে তাদের মধ্যে নগ্ন আদিম ক্ষুধাই কেবল সম্বল হয় এবং তার প্রভাব রাঢ়ের নীচুতলার মানুষদের মধ্যেও পড়ে। এইসব যাযাবর শ্রেণী নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নানা ধর্মীয় বা যাদুবিদ্যার ভেল্কী দেখিয়ে রোজগার করার চেষ্টা করত।

বাংলাদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণব পাশাপাশি রয়েছে, ফলে এই সমাজে নানা সংস্কার, কিংবদন্তী, বিশ্বাস, অধ্যাত্মচেতনা ও সাধনা সবই বিরাজ করেছে। সেইসঙ্গে রয়েছে তন্ত্রসাধনা— যার সাহায্যে মৃত্যুকে জয় করার এষণা, ধনী হবার বাসনা ছিল প্রকট। তারাশঙ্কর নিজেও একজন শাক্ত ছিলেন। "ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে শিবনাথ বলেছে, "আমাদের দেশটাই হল তান্ত্রিকের দেশ, এককালে তন্ত্রসাধনার মহা সমারোহ ছিল আমাদের দেশে।" (২১) এ গৌরবে তারাশঙ্করও গৌরবান্বিত

ছিলেন। তারাশঙ্কর ছিলেন একজন সামন্ত ও লেখক। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারগণ কীভাবে দেবতা ও নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিশ্বাসী হয়ে পড়েন তা লেখক নিজের চোখে দেখেছেন।

"সে কালে দুর্বল জমিদাররা মনস্কামনা সিদ্ধির আশায় দেবতার দুয়ারে মানত করতেন, নানা ব্যর্থতায় অপমানে লাঞ্ছিত হয়ে দেবতার নিকট সান্ত্বনা ভিক্ষা করতেন—বাল্যে তারাশঙ্কর তা দেখেছেন।" [২২] তারাশঙ্করের নিজের চুল মানত করা ছিল বৈদ্যনাথ ধামে। লেখক নিজেও প্রথম জীবনে ছিলেন যাযাবর প্রকৃতির। সেইসূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং নিজের চোখে বহু কুসংস্কার ও সংস্কার দেখেছেন। ঋজুদর্শী লেখক বহুগল্প কুসংস্কারের আধারে রচনা করেছেন। যেমন—ভূতে পাওয়া, ডাইনীতে পাওয়া, ভরপাওয়া, বাণমারা, জলপড়া, মন্ত্র-তন্ত্র নির্ভর ইত্যাদি।

কুসংস্কার সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে বহু ক্ষতি করে তা বর্তমান সমাজে আজও বিদিত। তা সত্ত্বেও এ সব কুপ্রথা নিবারণ করতে প্রশাসন সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেনি। সমাজেরই নিম্নস্তরের বাসিন্দা সেই সাঁওতাল, বাউরী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও এইসব কুসংস্কার ক্রিয়াশীল। কুসংস্কার স্বার্থান্বেষী মানুষেরই সৃষ্টি এবং সমস্ত ব্যাপারটাই যে আসলে বুজরুকী তা বিজ্ঞানী ও নব্য ডাক্তারগণ স্বীকার করেছেন— "চিকিৎসা বিজ্ঞান ভূত পাওয়া বলে পরিচিত মনের রোগকে তিনভাগে ভাগ করেছে। একঃ হিস্টিরিয়া, দুই ঃ স্কিটসোফ্রেনিয়া, তিনঃ ম্যানিয়াকডিপ্রেসিভ।" [২৩]

কুসংস্কার বা লোকবিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ীভাবে টিকে থাকার ফলে সমাজের বিভিন্নস্তরে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। কুসংস্কারের ফলে শত শত জীবন ও পরিবার শ্মশানে পরিণত হচ্ছে; আজও ওঝা বা হাতুড়ের হাতে অনেকে প্রাণ হারায়, ডাইনী সন্দেহে ছেলের হাতে বাবা, মা খুন হচ্ছে; অথচ ডাইনী বলে যাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়, সেই নারীর বুভুক্ষু অন্তরের হিসেব কেউ নেয় না। এই অলৌকিক ক্ষমতা যে মিথ্যা তা প্রচারে ও প্রকাশে আমরা নিশ্চুপ। ডাইনী সন্দেহে অত্যাচারিত বা নিহত নারী আসলে একজন আমাদেরই মত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ। সে বাঁচতে চায়, হাসতে চায়, সমাজের সাথে মিশতে চায়— এসবের খবর আমরা তারাশঙ্করের লেখার মধ্যেই পাই।

আবার আত্মা, পরলোকতত্ত্ব, ভূত-প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য, ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান যুক্তিবাদীগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। আত্মাকে স্বীকার করে নিয়েছেন ভাববাদী দার্শনিকগণ, কিন্তু চার্বাক সম্প্রদায় আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, "কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। অনুমান নির্ভর, একান্ত বিশ্বাস নির্ভর অমর-আত্মা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি ধারণাগুলো লোক ঠকানোর জন্য একদল ধূর্ত লোকের সৃষ্টি।" [২৪] এই সব ধূর্ত সম্প্রদায়ের বিচিত্র লীলা রহস্য তারাশঙ্কর বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। লাভপুর গ্রামটি ছিল সংস্কার ও কুসংস্কারে পূর্ণ। যেমন লাভপুরের দক্ষিণ পাড়ার শেষ প্রান্তে বিশাল অর্জুন গাছটিকে দেবতা বলে মনে করা হত। বর্তমানে অশুভস্থান বলে পরিত্যক্ত। এখানে আগে স্থানীয় মানুষেরা এই গাছটার নীচে নবজাতকদের দীর্ঘায়ু কামনার উদ্দেশ্যে সদ্যোজাত শিশুর নাভিকুন্ডলী পুঁতে রাখতেন। এখন আর গাছটি নেই— কেটে ফেলা হয়েছে। লাভপুরের পাশের গ্রাম বকুলগাঁয়ের পাশে মহানাগের মাঠ। প্রবাদ আছে যে এই মাঠে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরবাণ কৃষ্ণের আদেশে গতি সম্বরণ করে শ্যামকুন্ড নামক মাঠে এসে সাপের রূপ নিয়ে ধরাশায়ী হয়। এখানকার অশ্বত্থগাছটাকে বোধিদ্রুমের সগোত্র ও পবিত্র বলে ধরা হয়। এসব প্রবাদ তারাশঙ্কর ধরে রেখেছেন "কালান্তর" উপন্যাসে। লাভপুরের পাঁচ মাইল দূরে সাউগ্রামে শিবালয়ে পুত্রহীনা মায়েরা সন্তান কামনায় মাদুলী নিয়ে থাকে যার পরিচয় 'গণদেবতা'য় আছে। "ভুবনপুরের হাট"-এ বহু ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম সংলগ্ন বর্ধমানের কাটোয়া দাঁইহাট-সালার প্রভৃতি অঞ্চলের লোক-জীবনে আজও যা প্রচলিত তা তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন। সালারের হাট সম্পর্কে আদিত্য মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "সালারের হাটে ক্রয় বিক্রয়ের সঙ্গে বিশেষ রোগ দেওয়া-নেওয়া হতো, এমন প্রবাদ আছে। ভুবনপুরে "ভুবনেশ্বর শিব" বিরাজ করেন। এখানকার হাটে মা গন্ধেশ্বরীর (দুর্গা) আটন। তাঁদের বরে এই হাটে অবিক্রিত কিছু থাকবে না। এমন কী সুখ-দুঃখও বেচাকেনা হয়। ভুবনেশ্বর শিবমন্দিরের পাশে প্রাচীন বটগাছের ডালে বা ঝুড়িতে লোকে শিবের উদ্দেশ্যে মনস্কামনা জানিয়ে ঢেলা বাঁধে। "রাধা" উপন্যাসে শ্যামরূপার গড় (ইচ্ছাই ঘোষের ঢেকুরগড়) এও মায়ের থানে ঢেলা বাঁধার রীতি আছে। [২৫] গুণীন বা যাদুকর গাছ চালিয়ে গাছের উপর চেপে রাতের অন্ধকারে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাত্রা করত। সূর্য উঠলেই সাধারণের মাঝে গোপন রাখার জন্যে গাছ সেখানেই থামিয়ে রাখত। এই সমস্ত গুণীন বা ওস্তাদরা কামাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরে গিয়ে এইসব অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ও ভেল্কীবাজী শিখে আসত—এই প্রবাদ সমগ্র রাঢ়ের পল্লীজীবনে আজও ছড়িয়ে রয়েছে। বহু দেবদেবীর পীঠস্থান এই বীরভূম। এর ফলে এখানে বহু সংস্কার-বিশ্বাস-কুসংস্কার সমানভাবে আজও বর্তমান।

এবার তারাশঙ্করের লেখা গল্পগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে—

"একটি যাদুকরের মৃত্যু" ঃ- বাণমারা, যাদুবিদ্যা প্রয়োগ, তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা যাদের স্বভাব, যারা

চিরকাল আদিম সংস্কার বুকে নিয়ে বেঁচে থাকে— তাদের নিয়ে রচিত এই গল্পটি। প্রৌঢ় যাদুকর খোঁড়া নাদের শেখ কাঁউরের বিদ্যায় বিশ্বাসী, বাণ মেরে মানুষের সর্বনাশ করে, আবার মন্ত্রের দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে সাপের বিষ নামায়। তার বান্ধবী এক বেদেনী, সেও যাদুকরী। এই যাদুবিদ্যা অতি প্রাচীন। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে রোলো আহমেদ বলেছেন, "Magic was man's first effort to establish contact with the unknown, the hidden spiritual forces, which hedimly felt to exist and by means of which he hoped to attain his desires and accomplish matters that proved difficult or too much for him by ordinary means."(২৬)

একদিন এক ডাক্তারবাবুর সামনে সেই বেদেনীর সঙ্গে নাদের মন্ত্রের ভেল্কী দেখাচ্ছিল। হঠাৎ স্থানীয় জমিদার মহাদেববাবু এসে নিজের ছেলেকে বাণমারার অভিযোগে বেদেনীকে পাদুকা প্রহারে জর্জরিত ও অপমানিত করে চলে যান। বান্ধবীর উপর জমিদারের এই অন্যায় ও নির্মম ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে নাদের মরিয়া হয়ে ওঠে কারণ বান্ধবীকে সে-ই খেলা দেখাতে ডেকে এনেছিল। তাই নাদের জমিদারের পুত্রের মৃত্যুর জন্যে গুরুর কাছে শেখা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা 'বাণ" নামক মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। রাত্রের অন্ধকারে অস্ত্র তৈরী করতে শুরু করে। অস্ত্র প্রস্তুত হবার প্রাক্কালে নাদেরের মন দ্বিধাগ্রস্ত হল কারণ তার মনে পড়ে যায় গুরুর শেষ নিষেধবাণী— "এ বিদ্যা তুমি কখনও মানুষের উপর হানবে না।" নাদের সভয়ে পিছিয়ে আসে। অস্ত্র প্রয়োগ না করে তাড়াতাড়ি মাটিতে পুঁতে ফেলে। তার শরীর দুর্বল হয়। দিন তিনেক বাদে নাদের সেই ডাক্তারের কাছে এসে বলে, "এমন কি ওষুধ আছে বাবু, যাতে যা শিখেছি সব ভুলে যাই।" নাদেরকে দেখে যেন মনে হল তার দেহমনের উপর দিয়ে যেন এক প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবু তাকে মিক্সচার খাইয়ে ঐ সব উদ্ভট চিন্তা করতে নিষেধ করেন। সেই দিনই সন্ধ্যেয় ডাক্তারবাবুর সাথে নাদেরের দেখা হলে নাদের হতাশার সুরে বলে, "আমার আর কি রইল বাবু। সব যে হারিয়ে গেল।" অর্থাৎ তুকতাক, বাণমারা, ডাইনী ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে শেষ হতে চলেছে, আগমন ঘটতে চলেছে নব বিজ্ঞানের—তারই ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "নাদেরের এই আর্তনাদ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মতোই সভ্য মানুষদের সমাজদেহে আছড়ে পড়েছে।"(২৭) দীর্ঘদিনের অভ্যাস নাদেরের রক্তে মিশে গেছে। তাই শত চেষ্টা করেও সে ভুলতে পারছে না, এবং ভোলবার চেষ্টাও করেছে না। কারণ সে ভাবে এসব ভুলে গেলে যে তার মান, ইজ্জৎ সব লীন হয়ে যাবে। এখানে যাদুবিদ্যা বা মন্ত্রতন্ত্র যে সব মিথ্যে তা প্রতিপন্ন করেছেন ডাক্তার। কারণ যেদিন বেদেনী একমুঠো ধূলো মন্ত্রের সঙ্গে নাদেরকে মারে সেদিন বেশ কয়েকটা মৌমাছি নাদেরকে কামড়ে দেয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। তাঁর বাড়ীর কোনে মৌচাক ছিল সেখান থেকেই বেদেনী মৌমাছি ধরে এনেছিল। নাদেরও স্বীকার করে যে এমন একটা গাছ আছে যে তার রস হাতে মাখলে মৌমাছি বা বোলতা কামড়ায় না। ডাক্তার তখন বলেন যে মন্ত্রতন্ত্র সব মিথ্যে, কেবল গাছের রসই সত্য। সাপ ধরায় কেবল হাতের কসরত আর সাহসই প্রয়োজন, মন্ত্রের নয়। বর্তমান যুগে ওসব কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কিছু যে নয় তা ডাক্তারবাবু প্রতিপন্ন করেছেন। এই মনোভাব ছিল প্রগতিবাদী লেখকেরও। কয়েকটি গল্প দেখা যাক—

শ্যামাদাসের মৃত্যু ঃ- এখানে একদিকে বিজ্ঞানবুদ্ধি, অন্যদিকে ধর্মীয় সংস্কারের দ্বন্দ্ব। অধ্যাপক শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর বিশ্বাসমূল সংস্কারের কাছে পরাজিত হয়েছে। কৃষ্ণভামিনী ছিলেন ধর্ম, অধর্ম, পাপ-পুণ্য, মায়া-মোহের এমনকি জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাই মৃত্যুর সময় পরপারে যাবার সময় তিনি বলেছিলেন যে তাঁকে তাঁর পিতামাতার বিদেহী আত্মা নিতে এসেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, "ভুল বকিনি আমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে। দেখো তুমি, ঠিক আসব।" শ্যামাদাস তা বিশ্বাস করেন নি, কারণ তাঁর যাত্রা ছিল ভিন্ন পথে। জন্ম-মৃত্যু বিজ্ঞানের শাশ্বত নিয়মেই ঘটে। তিনি মৃত্যুর সময় স্ত্রীর বিদেহী আত্মা দেখতে পাননি বটে, কিন্তু অন্য এক গভীরতম রহস্যের সন্ধান পান। দেহের কোষ চক্রের দ্রুত পরিবর্তন, জীবদেহে ক্রমশঃ মৃত্যুর অধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি উপলব্ধি করেছিলেন। মৃত্যুর সময় দুহাতের তালুতে তাঁর দুফোঁটা অশ্রুপাত হয়তো কৃষ্ণভামিনীর বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করার ইঙ্গিত বহন করে। মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে অতিবড় নাস্তিকেরও যে স্মৃতিভ্রম ঘটে যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই গল্পটি।

রাজসাপ ঃ- মানবমনের আদিম সংস্কারকে অবলম্বন করে বস্তু-মুখ্য এই গল্পটি। কুসংস্কারকে অবলম্বন করে কি মর্মান্তিক Tragedy সৃষ্টি হয়েছে তারই বর্ণনা আছে। "সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর "টেটেম অ্যান্ড ট্যাবু" গ্রন্থে বলেছেন, "আদিম মানব এখনো আমাদের সহযাত্রী। অর্থাৎ আমরা যতই সভ্যতাভিমানী হই না কেন, আদিম কুসংস্কারগুলি এখনো আমাদের মনের অন্ধকার প্রদেশে লুকিয়ে আছে।" (২৮) ভবেশ দরিদ্র, অনেকগুলো সন্তান ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছে, অথচ তার মুনিব নিশাকর হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠে। ভবেশ জানতে পেরেছে যে নিশাকরের গৃহে রাজসাপ আছে এবং এ সাপ থাকলে বাড়ীর কর্তা ধনী হবেই। বন্যায় ঘর ভেঙ্গে গেলে ভবেশ নিশাকরের একটি ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানেই ভবেশ নিশাকরের সৌভাগ্যসূচক রাজসাপটিকে দেখতে পেয়ে হাঁড়িতে বন্দী করে নিজের ঘরে গোপনে এনে রাখে আর স্বপ্ন দেখে বিশাল সম্পদের। মৃত্যুশয্যা-শায়িনী মায়ের বরাদ্দ দুধটুকু বঞ্চিত করে ভবেশ সাপটিকে খেতে

দেয়। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় বৃদ্ধা সাপটির ঘরে ঢুকে অজান্তে বিষাক্ত দুধ পান করে মারা যায়। এদিকে অর্থের কোন আশা না পেয়ে ভবেশ হতাশ হয়ে পাঁচ টাকায় সাপটাকে বিক্রি করে মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করে। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলেই ভবেশ মাকে হারিয়েছে। বাড়ীতে সাপ থাকলে ধনী হওয়া যায় না— এই সত্যটি ভবেশ বোঝে নি, বোঝে নি বলেই মায়ের জন্যে সামান্য দুধ মাকে না দিয়ে সাপকে দিয়েছে, এমন কি সাপের মোহে মোহান্ধ হয়ে মায়ের মৃত্যু কামনা করেছে। এইভাবে পল্লীবাংলার ঘরে ঘরে আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের জন্যে অশান্তির আগুন জ্বলছে।

ডাইনী ঃ- অলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার ও কিংবদন্তী মানুষের জীবনে কত ভয়াবহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে তারই চরমতম নিদর্শন এই গল্পটি। বস্তুতঃ যাদুবিদ্যা চর্চা করতে গিয়ে এই ডাইনী-তন্ত্রের সৃষ্টি হয়। যাদুবিদ্যাকে যতটা কুপথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ডাইনীতন্ত্রে তার প্রমাণ আছে। "ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ডাইনীর যে চেহারা মানুষের মনে অঙ্কিত হয়েছিল তা হল একটি কুরূপা বৃদ্ধা নির্জন কুটিরে বসে নানা রকম ওষুধ-পত্র তৈরী করছে, তার পাশেই ঘুর ঘুর করছে একটি বেড়াল।" (২৯) ডাইনীতন্ত্র বস্তুজগৎকে বশে রাখতে এমন অপকর্ম নেই যা সে করেনি। শেক্সপীয়ারের "ম্যাকবেথ" নাটকে ডাইনী চরিত্রের সন্ধান মেলে।

আমাদের দেশে ডাইনী-তন্ত্র কবে সুসংহত রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার সঠিক দিনক্ষন জানা যায় না। তবে "ডাকিনী-যোগিনীর" নাম বিভিন্ন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মেয়েরা পারস্পরিক ঝগড়ার সময় "ডাইনী" বলে গালাগালি দেয়। তবে ডাইনী সম্বন্ধে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ডাইনীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহা 'গুরুর' নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়, গুরুর শিক্ষা ব্যতীত কিছুই হয় না। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক লক্ষণযুক্ত নারী সহজেই ডাইনী বিদ্যা শিখিতে পারে, "গুরু" যাহাকে এই বিদ্যায় দীক্ষাদানের সংকল্প করেন, কেবলমাত্র সেই এই বিদ্যার অধিকারী হইতে পারে।" (৩০) অতঃপর ডঃ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্র রায় মশাইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, "ওঁরাওদের মধ্যে ডাইনীতন্ত্রের প্রচলন আছে। সাঁওতালদের মধ্যেও এ-তন্ত্রের ব্যাপক চর্চা হয় বলেছেন।" (৩১) ধ্বংসাত্মক যাদুবিদ্যার একটি দিক হল ডাইনীবিদ্যা। উপজাতীয় অঞ্চলে ব্যর্থতা, দুর্ভাগ্য এবং মৃত্যু ইত্যাদির ব্যাখ্যা স্বরূপ ডাইনীবিদ্যাকে দায়ী করা হয়। ডাইনী বিদ্যা গ্রহণে মেয়েদের বেশী উৎসাহী হতে দেখা যায়। রেভারেন্ড পি.ও.বক্তি ট্যাবু কাস্টমস্ অ্যামাং দি সানতালস্" গ্রন্থে বলেছেন, " মেয়েরা সে ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্যেই হোক, অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর কাছে পৌঁছুতে চায়। সেটা প্রকাশ্যে পারেনা। কারণ পুরুষেরা মত দেয় না। তাই গোপনে ডাইনী বিদ্যার অনুশীলন করে।" (৩২)

বর্তমান ভারতবর্ষে আজও এই ডাইনী বিষয়ক কুসংস্কার আদিবাসী সমাজে সক্রিয় ক্রিয়াশীল। রাঢ় বাংলার সমাজে এই কুসংস্কার প্রচলিত। এককালে গ্রামীণ মনে ডাইনীতে দৃঢ় বিশ্বাস। যাকে ডাইনী বলে অপবাদ দেওয়া হয় তার জীবনে নেমে আসে নিদারুন যন্ত্রনা। পারিপার্শ্বিক চাপে সে নিজেকে ডাইনী বলে বিশ্বাস করতে থাকে। বীরভূমের ছাতিফাটা মাঠ নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই সব প্রবাদকে উপাদান করে তারাশঙ্কর গল্প লেখেন। "ডাইনী" ও "ডাইনীর বাঁশি" অন্যতম। অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে সহজ সরল দুই নারীর জীবনে কী ভয়াবহ ট্যাজেডি নেমে এসেছে তার সার্থক রূপায়ণ গল্প দুটিতে। "ডাইনী" গল্পটি সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "কুসংস্কারের ভিত্তিতে একটি গ্রামের মেয়ের দুর্ভাগ্যের ইতিবৃত্ত এতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু অদ্ভুত বলিষ্ঠতায় অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে।" (৩৩) ছাতিফাটা মাঠের পূর্বপ্রান্তে এক আমবাগানে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বৃদ্ধা সুরোধনী-ডাইনী বাস করে। বৃদ্ধার বাড়ি এখানে নয়, কোথায় কেউ তা ঠিক জানে না। "তবে একথা নাকি নিঃসন্দেহ যে, তিন চারখানা গ্রাম একরূপ ধ্বংস করিয়া অবশেষে একদা আকাশপথে একটা গাছকে চালাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে এই ছাতিফাটা মাঠের নির্জন রূপে মুগ্ধ হইয়া নামিয়া আসিয়া এইখানে ঘর বাঁধিয়াছে।" (৩৪) সুরোর বয়স যখন দশ-এগার বছর তখন হারু বামুনের ছেলের পেট ব্যথা শুরু হলে হারু বামুনই এই মেয়েটির বিরুদ্ধে ডাইনীর অভিযোগ আনে। সেই থেকেই সে হয় ডাইনী। ফলে ডাইনীর মানুষীসত্তার মৃত্যু ঘটে; আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়। সেও নিজেকে ডাইনী ভাবতে শুরু করে। মানুষ দেখলেই তার অনিষ্টস্পৃহা জেগে ওঠে। নরুণ দিয়ে চেরা ছুরির মত চোখ, বিড়ালের মত দৃষ্টি দিয়ে যাকে তার ভাল লাগে তাকে সে আর ছাড়ে না। সে যেন মানুষের দেহরস, লোলুপা রাক্ষসী। মানুষের নিত্য সন্দেহ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, লাঞ্ছনায় দগ্ধ হয়েছে তার মানবী-সত্তা। সে মানুষ হতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়, মিশতে চায় সমাজের সাথে, অথচ সে পারে না। তাই সে পাষাণ দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়— "মা আমাকে ডাইনী হইতে মানুষ করিয়া দাও, আমি তোমাকে বুক চিরিয়া রক্ত দিব"। হঠাৎ রটে যায় যে বাউরীদের ছেলেকে সে বাণ মেরেছে। গুণীন এসেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে না। ছেলেটার ধনুষ্টংকার হয়েছিল অথচ এ-রোগের খবর অন্ত্যজ বাউরী সমাজ জানতো না। সকলের রাগ গিয়ে পড়ে ডাইনী সুরোধনীর উপর। সেই রাতেই সুরোধনী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পালাতে চায়, কারণ সকালে বাউরীর দল এসে তাকে খুন করতে পারে— এইভেবে সে তার শেষ সম্বল ছোট্ট একটা পুঁটলী নিয়ে ছাতিফাটার মাঠে নামে। শুরু হয় কালবৈশাখী। পরিদিন সকালে গ্রামবাসী দেখে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য— "একটা কাঁটা ডালের সূচালো ডগায়..... তীক্ষ্মাগ্র প্রান্তে বিদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে বৃদ্ধা ডাকিনী"।

গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে এক সরল গ্রাম্য বালিকার জীবনে কী ভয়াবহ দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে তারই বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। "তারাশঙ্করের গল্পে জীবন ও প্রকৃতি" প্রবন্ধে দীপক চন্দ্র বলেছেন, "গ্রামীণ মানুষের অলৌকিক বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের সঙ্গে একটি সরল গ্রাম্য বালার দৃষ্টির তীক্ষ্মতা সংযুক্ত করে যে অবর্ণনীয় দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হল তা ছাতিফাটা মাঠের 'তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মানুষের মৃত্যু হওয়ার মত।" নিসর্গকে মানবায়িত করার এই শৈল্পিক সার্থকতা গল্পের পরিসমাপ্তিতে শোচনীয় ট্র্যাজেডির বীজ রোপণ করে।" (৩৫)

ডাইনীর বাঁশি ঃ- তারাশঙ্করের এটি নিজের চোখে দেখা এবং নিজগ্রামের স্বর্ণ বেনের জীবনের একটি সত্যকার ঘটনা। তিনি তাঁর "সাহিত্য জীবন" গ্রন্থে বলেছেন, "আমাদের গ্রামে ছিল গন্ধবণিকদের মেয়ে নিঃসন্তান বিধবা স্বর্ণ; লোকে বলত সে ডাইনী। সনা ডাইনী। আমাদেরই বৈঠকখানা বাড়ির সংলগ্ন পুকুরের উত্তর-পূর্বকোণে একটি অশ্বত্থতলায় ছিল তার বাড়ি।" (৩৬) স্বর্ণ ডাইনীর নিখুঁত বর্ননা তিনি তাঁর "স্মৃতিকথায়" লিখেছেন, "ডাইনী ছিল.....। স্বর্ণ ডাইনীকে মনে পড়ছে। শুকনো কাঠির মত চেহারা, একটু কুঁজো, মাথায় কাঁচা পাকা চুল। হাটে তরি তরকারী কিনে গ্রামে, ঘরে বেঁচে বেড়াত। চোখ দুটো ছিল নরুণে-চেরা চোখের মত ছোট।..... তার শেষ কালটায় আমি বুঝেছিলাম তার বেদনা। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেরও তার বিশ্বাস ছিল, সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে সে মনে মনে শিউরে উঠতো। কাউকে দেখে চোখে ভাল লাগলে সে সভয়ে চোখ বন্ধ করতো।..... সমগ্র পৃথিবীতে তার আত্মীয় ছিল না। রোগের যন্ত্রনায় দুঃখে সমগ্র জীবনটাই সে একা কাটিয়ে গেছে"। (৩৭) এই ডাইনী গল্প দুটি প্রকাশের পর অনেকেই তারাশঙ্করকে ইউরোপের উইচক্র্যাফ্ট সম্বন্ধীয় গল্পের অনুকরণ বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। লেখকের নিজের চোখে দেখা এগুলি। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " আমাদের দেশের ডাইনী এঁরা (অভিযোগকারী) দেখেন নি, জানেন না, বিশ্বাস করেন না। আমি তাই তাঁদের বললুম; উঁহু উঁহু। এ তারাশঙ্করের চোখে দেখা। আমি যে নিজে দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালের দুপুরে তালগাছের মাথায় বসে চিলটা লম্বা ডাক ডাকছে, গলাটা তার ধুক ধুক করছে। আর নিজের ঘরের দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী বসে আছে আচ্ছন্নের মতো। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি"। (৩৮)

ডাইনী গল্পের নায়িকা স্বর্ণ। তার মা 'ডাইনী' বলে পরিচিতা ছিল। তাই অনেকের ধারণা স্বর্ণের প্রতি তার মায়ের দৃষ্টি পড়েছে। তাই স্বর্ণও ডাইনী, অথচ সে নিঃসহায়, তরিতরকারি বেচে দিন কাটায়। সে পাড়ার ছোটছেলে টুকুকে ভালবাসে, টুকুও স্বর্ণকে কনে বলে ডাকে। একদিন মুখুজ্জে বাড়ির গর্ভবতী বৌ অসুস্থ হলে, বাড়ির গিন্নী স্বর্ণর নামে অপবাদ দেয়। এদিকে টুকু স্বর্ণের কাছে বাঁশি চেয়ে বাড়িতে এসে প্রবল জ্বরে পড়ে; জ্বরের ঘোরে সে বিকারে স্বর্ণর নাম ধরে বলতে থাকে "আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে কনে।" স্বর্ণ সেই কথা আড়াল থেকে শোনে এবং নিজেকে ডাইনী ভাবতে শুরু করে। এদিকে মুখুজ্জে বৌ মৃত-সন্তান প্রসব করে মারা যায়। স্বর্ণ বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে, সর্বাঙ্গে তার ব্যথা; সে তার মৃতা মাকে অভিসম্পাত দেয়। গুণীনের ঝাড় ফোঁকে টুকু সুস্থ হয়। স্বর্ণ টুকুর জন্যে বাঁশি নিয়ে টুকুর বাড়িতে গিয়েও তার হাতে দিতে সাহস পায় না; পাছে কেউ দেখে অশান্তি করে অথচ বাঁশি টুকুকে দিতেই হবে, তাই স্বর্ণ বাঁশিটি টুকুর খেলাঘরের পাশেই রেখে চলে যায়। স্বর্ণ বাড়ি এসে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে; কিছুক্ষণ পর সে টুকুর বাঁশির আওয়াজ শুনতে পায়। এখানে স্বর্ণের নিখাদ বাৎসল্য ও ডাইনী-বিশ্বাস বড় হয়েছে। লোক বিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ এ ভাবে কত শান্ত, সরল মেয়েদের ডাইনী সাজিয়েছে। এতটুকু মায়া, মমতা, বা করুণা করেন নি তারা। তারাশঙ্কর ডাইনীদের বাস্তব জীবনালেখ্য তুলে ধরলেও তাদের জীবনে মানবীয় সত্তার দিকটাও অঙ্কন করেছেন।

আজ শিক্ষিত সমাজ ডাইনীতন্ত্রের ও ডাইনী হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তারাশঙ্কর এর অনেক আগেই ডাইনী বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে তুলে ধরেছেন ও ডাইনী অপবাদে জর্জরিতা নিরীহ নারীজাতির অন্তরের বুভুক্ষা ও বিবিক্ত জীবনের দিকটাও সুন্দরভাবে সমাজের কাছে তুলে ধরেছিলেন— এইখানেই তারাশঙ্করের নতুনত্ব।

আবার গ্রামে স্কুল, হাট, ডাক্তারখানা করতে নেই, লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতীর একসাথে সাধনা করা যাবে না, কারণ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়ে সতীন; দুজনের মিল নেই— এই বিশ্বাসের বশীভূত হয়ে গ্রামে স্কুল তৈরী করতে চায় নি কেউ। গ্রামে ইট তৈরী করা চলবে না, সরকার থেকে ইঁদারা তৈরী হলেও পেটে নোনা ধরার ভয়ে সেই জল স্পর্শ করেনা, কয়লা পোড়াতে নেই, কেবলমাত্র পানসাজার জন্যে ছাড়া কখনও চুন ব্যবহার করা চলবে না, শেয়াল ছাগল ধরে নিয়ে গেলেও তাকে তাড়ানো যাবে না কারণ শেয়াল নাকি সাক্ষাৎ ভগবতী। এরকম নানা কুসংস্কারে বিশ্বাসী রাঢ়ের বহু গ্রাম ছিল। এদের নিয়েও তারাশঙ্কর গল্প লিখেছেন। যেমন, নুটু মোক্তারের সওয়াল, ব্যাঘ্রচর্ম, প্রভৃতি। এগুলি সবই সামন্ত - সংস্কার। এই পর্যায়ে আর একটি গল্প ঃ-

বন্দিনী কমলা ঃ- অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত এই গল্প। রায়বাড়ির কমলা (লক্ষ্মী) কে বন্দিনী করে রাখার অতিপ্রাকৃত কাহিনী শতাব্দীব্যাপী সংস্কারে পরিণত হয়েছে। এই বংশের দেওয়ান গোপীবল্লভের সতীসাধ্বী বিধবা স্ত্রী

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর রাত্রে লক্ষ্মীকে ঘরে বন্দিনী করে জলে ডুবে প্রাণ দেন। রাঢ়ের মাটিতে প্রবাদ ছড়িয়ে আছে যে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মা লক্ষ্মী স্বয়ং মর্তে নেমে আসেন এবং এই রাতে প্রতিটি গৃহে তিনি আসেন; কেউ জেগে থাকলে লক্ষ্মী তাঁকে আশীর্বাদ করে যান। এই লোকসংস্কার আজও অনেকের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। বহু রমণী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে জেগে বসে থাকেন। এমনি এক কোজাগরী পূর্ণিমার রাতের তৃতীয় প্রহরে বাড়িতে বসতে চেয়ে এক পরমাসুন্দরী আসে। তখন গোপীবল্লভের স্ত্রী মেয়েটিকে ঘরে বসতে দিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে তালা দিয়ে বড় ছেলেকে চাবি দিয়ে বলেন, " ও তালা তোমার বংশে কেউ যেন কখনও না খোলে। মা লক্ষ্মীকে আমি বন্দিনী করে চললাম।" (৩৯) এই বলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেন। কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারা পূর্বপুরুষদের নিষেধ অমান্য করে অর্থের লোভে সেই ঘরটির তালা খোলে এবং পায় কেবল নরকঙ্কাল, একরাশি বিবর্ণ চুল আর নামাবলি। হয়ন্তে বিপদাপন্ন হয়ে কোনো সরলা সুন্দরী রাতের শেষে একটু আশ্রয় খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু সংস্কারের যূপকাষ্ঠে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সংস্কার এবং কিংবদন্তীই এখানে ক্রিয়াশীল।

আবার 'বোবা কান্না'য় ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের আস্তিক্য বুদ্ধির সঙ্গে বিজ্ঞানী ডাক্তারের দ্বন্দ্ব, 'পুত্রেষ্ঠী' গল্পে পুত্র কামনায় পাগল জমিদার অপরের পুত্রকে বলি দিতে বদ্ধপরিকর, প্রাচীন সংস্কারের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত 'শিলাসন' গল্পে, দেশীয় সংস্কারের উপর আস্থাশীল হয়ে পিতা নিজ পুত্রের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন, 'পিতাপুত্র' গল্পে।

ছলনাময়ী ঃ- অর্থ, প্রতিপত্তি ও যশ কামনায় অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বশীভূত করতে তান্ত্রিক-মার্গ অনুসরণ করেছেন কলিয়ারীর ম্যানেজারবাবু— তন্ত্রে বশীভূত হয়ে তিনি অমানুষে পর্যবসিত। স্ত্রীকে প্রহার, সংসারের প্রতি অবহেলা, একমাত্র কন্যার নিরীহ সদ্য-বিবাহিত জামাইকে তিনি হত্যা করিয়েছেন; শেষে উন্মাদ হয়ে গেছেন। এখানেও অন্ধ কুসংস্কার বলবত্তর হয়েছে।

সংসার ঃ- সংসার বড় কঠিন পরীক্ষাগার। কবে কোন অতীতে মানুষ বিধান রচনা করেছিল যে, কোন ব্যক্তির দীর্ঘ বারো বছর যদি কোন সন্ধান বা খোঁজ পাওয়া না যায়, তাহলে তার বিধিসম্মত শ্রাদ্ধ শান্তি করতে হবে। আবার শ্রাদ্ধ-শান্তির পর যদি ঐ ব্যক্তি বাড়ী ফিরে আসে তাহলে বাড়ীতে তার আর স্থান হবে না; কারণ সে তখন প্রেতাত্মা— এতে সংসারের অমঙ্গল হবে। এই কুসংস্কারে বশীভূত হয়ে সরকারকর্তাকে ঘরে স্থান দেয় না তাদের পুত্রগণ। সরকারকর্তা ও গিন্নী মহাকুম্ভে স্নান করতে গিয়ে কলেরায় আক্রান্ত হ'ন। পুত্রগণ পিতামাতার দীর্ঘদিন কোন সংবাদ না পেয়ে সমাজপতিদের বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধ-শান্তি করে ফেলে। এদিকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী মারা গেলেও বৃদ্ধ সরকার মারা যান নি। তিনি বাড়ীতে ফিরে আসেন, কিন্তু অন্ধকুসংস্কারে অন্ধ হয়ে পুত্রগণ জীবিত বাবার সম্পদ ভোগ করলেও সামান্য কর্তব্য পালন করে নি— বাবার জন্যে গঙ্গার তীরে ঘর তৈরি করে সেখানে বাবার থাকার ব্যবস্থা করে। অন্ধ বিশ্বাসের কাছে পিতা-মাতাও যে কত তুচ্ছ হয়ে যায় তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'সংসার' গল্পটি।

প্রতিমা ঃ- সামন্ত-সংস্কারের ভয়ে নির্মল চরিত্রের যমুনা আত্মহত্যা করেছে। চরিত্রহীন, মাতাল, ছোটজমিদার বাবু ফুলশয্যার দিনেই স্ত্রীকে প্রহার করেছে। বিবাহিতা জীবনে যমুনা শান্তি পায়নি— একটি ঘরে বন্দিনীর মত জীবন যাপন করেছে। তার অব্যক্ত বেদনা, দুঃখ, কষ্ট সব উপলব্ধি করেছিল জমিদার বাড়ির পুরুষ পরম্পরায় মৃৎশিল্পী কারিগর কুমারিশ। তার কেমন যেন একটা মমতা জাগে যমুনার প্রতি। দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছে কুমারিশ। কিন্তু এ কি? মূর্তির মুখাবয়ব ঠিক যেন যমুনার মত। যমুনা মূর্তি দেখে তার পরিণাম ভেবে শিউরে ওঠে এবং উপায়ান্তর না দেখে পাশের খিড়কিতে ডুবে প্রাণ দিয়েছে। সকলে যমুনাকে নিয়ে কুমারিশের অবৈধ সম্পর্কের কথা বলবে যার ফল হবে মারাত্মক যা তদানীন্তন সামন্ত পরিবারে অহরহ ঘটত। অর্থাৎ সামন্ত পরিবারের পুরুষেরা ব্যভিচারী জীবন যাপন করেছে; মেয়েদের কেবল অবিচার, অত্যাচার করেছে। প্রতিমার মূর্তি মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্যে কারিগর এই পৃথিবীর যে কোন সুন্দর মানুষেরই হুবহু নকল করে । তাছাড়া কুমারিশের হৃদয়ে এক দুঃখিনী মেয়ের প্রতি স্নেহের উদয় হয়েছিল। তারই প্রতিফলন মূর্তিতে ঘটে। কিন্তু সামন্ত-রক্ত এই সত্যকে উপলব্ধি কোনদিনই করে নি। খুঁত দেখলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করাই তাঁদের ধর্ম। এই স্বার্থান্বেষী সংস্কারের পায়ে বলি হয়েছে যমুনা।

অগ্রদানী ঃ- এই গল্পটি লোক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। হিন্দু সমাজে মৃতদেহের আত্মার মুক্তির জন্যে পিন্ডদান প্রচলিত। পিন্ড গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ সমাজে নিম্ন স্থানীয় বলে গণ্য হন। তাই পিন্ড গ্রহণ করতে সহজে কোন ব্রাহ্মণ রাজী হতেন না। অর্থদানে বশীভূত করেই তাকে অনুপ্রাণিত করা হত। সামন্তদের খেয়াল খুশিমত অর্থ, জমির প্রলোভন দেখিয়ে অসংখ্য পূর্ণ চক্রবর্তীদের বাধ্য করে পিন্ড গ্রহণকারী সাজিয়েছে— তাদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করেছে বহু সামন্ত-জমিদার।

ভুলোর ছলনা ঃ- 'ভোলা' নামে এক অপদেবতা ভর করলে নাকি মানুষ সব ভুলে যায় অর্থাৎ বিভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত হয়—এটাই লোকসমাজে প্রচলিত বিশ্বাস। 'ভোলায়' ধরলে রোগী অনেকটা বোবার মত হয়ে যায়। ভোলা

তাকে যেমন খুশি পরিচালনা করে। সুস্থ মানুষকে হঠাৎ ভোলায় ধরলে সে উল্টোপাল্টা দিকে চলে যায়। সে হয়তো পূর্ব দিকে যেতে চাইছে, কিছুক্ষণ হাঁটার পর সে দেখল সে পৌঁছে গেছে পশ্চিমদিকে। কিংবা কিছুই সে মনে করতে পারে না, হাবার মত দাঁড়িয়ে থাকে, হয়তো কথাও বন্ধ হয়ে যায়। 'ভোলা' তাকে শুধু ভুল করাতে থাকে। "অনেক জায়গায় এর চিকিৎসা হিসেবে 'ভোলা'য় ধরা ব্যক্তিকে সর্বসমক্ষে হাজির করানো হয়। তারপর গুণীন কিছু মন্ত্র পড়ে হঠাৎ রোগীর কাপড় খুলে তাকে উলঙ্গ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোগী আত্মসচেতন হয়ে কাপড়টি ধরে রাখতে চায় আর 'ভোলা' ও তখন পালিয়ে যায় অর্থাৎ লোকটির স্মৃতি ফিরে আসে।" (৪০) 'ভোলা' নামের কোন অপদেবতার সৃষ্টি কোনদিনই হয় নি। এই 'ভোলা' কে নিয়ে তারাশঙ্করের এই গল্পটি লিখেছেন। ভূতেরা অন্ধকারের বাসিন্দা। এই ভূতেরা মায়ায় রাতের অন্ধকারে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে বিপথে। পরে তার দেহ পাওয়া যায় কোন খালের কাছে কিংবা জঙ্গলের ধারে। এরকমই এক ভূত 'ভোলা' নিতাই পাঁড়েকে টেনে নিয়ে যায়। শশীর চেষ্টায় সে বাঁচে। লেখক ভূতকে বিশ্বাস করেন নি। তিনি মনের ভুলের জন্যেই এমন হয় মনে করেন। মানুষ যদি একাগ্র চিত্তে কোন কিছু চিন্তা করে, তবে মানুষ এমন ভুল করে। ভূত সম্বন্ধীয় 'ভূতপুরাণ', 'অক্ষয়বটোপাখ্যানম্', 'স্বর্গলোকে' ভূমিকম্প প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তারাশঙ্করের পিসীমা অসামান্যা ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী ছিলেন। সেকালের সমস্ত কুসংস্কারকে তিনি কিন্তু মেনে নিয়েছিলেন। কত বিচিত্র ভূত প্রেতের সন্ধান তিনি জানতেন, মারীভয়, মৃত্যুভয় প্রভৃতি থেকে সর্বদাই তিনি নয়নের-মণি তারাশঙ্করকে রক্ষার জন্যে বিভিন্ন দেব-দেবতার মাদুলী বেঁধে দিয়েছিলেন তার দেহে, সর্দির ভয়ে তারাশঙ্করকে সপ্তাহে তিন দিন স্নান করতে দিতেন। এছাড়া ছিল নানা বিধি নিষেধ। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন, "হাঁচি, টিকটিকি অশ্লেষা, মঘা, দিক্‌শূল, যোগিনী, পদে পদে নিষেধের ডোরে' বালক তারাশঙ্করকে বেঁধে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন পিসীমা। কিন্তু তারাশঙ্কর ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন স্বভাব-বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যখনই কোনো বিধিনিষেধ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হত তখনই তাঁর শিশুসত্তা অস্বস্তি বোধ করত। সূক্ষ্ম মান অপমান বোধ, তীক্ষ্ম আত্মমর্যাদা এবং আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণ বালক তারাশঙ্করের ছিল প্রধান চরিত্র ধর্ম।"(৪১) তাই পরবর্তী জীবনে তিনি কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করতে পেরেছিলেন ডাইনী চরিত্রের মধ্যে মানবচেতনার ক্রন্দন শুনতে পেয়েছিলেন, আবার ভূতের ভুলোর ছলনাকে তিনি সবার কাছে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন।

পাদটীকা

১।	লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার	:	ডঃ বরুণ চক্রবর্তী	পৃ. ১২-১৩
২।	Man and his Superstitions (2nd Edn.)	:	Curveth Read	P-1
৩।	Cultural Anthropology, Ch-XII Religion Man and the universe	:	Melville J. Herskovits	P-221
৪।	The Outlines of Mythology (London)	:	Lewis Spence	P-5
৫।	The Columbia Encyclopadia	:		P-78
৬।	লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ	:	আব্দুল হাফিজ	পৃ. ১৭
৭।	Totem and Taboo	:	Sigmund Freud	P-2
৮।	Totemism and Exogamy	:	J. G. Frazer (Vol.1)	P-355
৯।	সিগমুন্ড ফ্রয়েড/টোটেম ও টাবু (ভাষান্তর)	:	ধনপতি বাগ	পৃ. ৫
১০।	ঋক সংহিতা ১০ম মন্ডল ১৬৫ সূক্ত।			
১১।	Encyclopaedia of Superstition	:		P-53

১২। Myths of Peru and Mexico : Abanindranath Tagore P-26

১৩। লোকসাহিত্য / ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী : ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখিত ভূমিকা পৃ. ২২

১৪। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ১৩

১৫। লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ : আব্দুল হাফিজ পৃ. ৬৯

১৬। The Science of Folklore : Alexander H. Kraappe (1964) P-203

১৭। হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ) : ক্ষিতিমোহন সেন পৃ. ৫৬

১৮। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ১৯-২০

১৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) : ডঃ নীহাররঞ্জন রায় পৃ. ৩৩

২০। (ক) Social Change in Modern India : M. N. Srinivas P-2-3

২০। (খ) The English works of Raja Ram Mohan Roy (part-iv) : Sadharan Brahmo Samaj P-95

২০। (গ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী : প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত (৩৯ সংখ্যক পত্র) পৃ. ৫০

২০। (ঘ) উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা : ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার পৃ. ২৬৫

২১। ধাত্রীদেবতা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ১১৩

২২। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর : ডঃ মুক্তি চৌধুরী পৃ. ২৩৯

২৩। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ৩৫

২৪। প্রাগুক্ত (১ম খন্ড) : পৃ. ২২০

২৫। তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ : আদিত্য মুখোপাধ্যায় পৃ. ৫১

২৬। The black Art (Arrow Books Ltd) 1966 : Rollo Ahmed P-13

২৭। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (৩য় খন্ড) ভূমিকা : জগদীশ ভট্টাচার্য পৃ. ৩৬

২৮। প্রাগুক্ত (২য় খন্ড) : পৃ. ৫৭

২৯। লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ : আব্দুল হাফিজ পৃ. ১০৫

৩০। লোকশ্রুতি (ত্রৈমাসিক লোক সাহিত্য সংকলন : ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য পৃ. ৫১
আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
শ্রাবণ। ১৩৭৪, ১ম সংখ্যা

৩১। প্রাগুক্ত : পৃ. ৫১

৩২। অলৌকিক নয় লৌকিক (২য় খন্ড) : প্রবীর ঘোষ পৃ. ২২৫

৩৩। বাংলা গল্প বিচিত্রা : ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ৭৭

৩৪। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড) : জগদীশ ভট্টাচার্য পৃ. ২৪৩-২৪৪

৩৫। তারাশঙ্কর : দেশকাল সাহিত্য : ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ. ১৪২

৩৬।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৮৪
৩৭।	তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা	:		পৃ. ৪৬
৩৮।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১২৩
৩৯।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড)	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ২৭১
৪০।	শরীর ঘিরে সংস্কার	:	ভবানীপ্রসাদ সাহু	পৃ. ১৭০
৪১।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড)ভূমিকা	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ২০

* * * * * * * * * * * *

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি — পণপ্রথা, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা

অষ্টম অধ্যায়

সামাজিক ব্যাধি—পণপ্রথা, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথা

পরিবার :- মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ, সামাজিক জীব। একাকীত্ব কোনদিনই মানুষের ধর্ম নয়। পরিবারভুক্ত হয়ে মানুষ সমাজে বাস করে। জীবন-যাপনের জন্যে মানুষ যে সব আচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে পরিবার ও বিবাহ অত্যন্ত প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ। **"বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন না করিলে মনুষ্যজাতি সম্ভবত এতদিন বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিতে পারিত না।"** [১] বাঁচার তাগিদেই মানুষ পরিবার গঠন করেছে। শিশু থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সন্তানদের লালন পালন করতে হয় বলে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিবার সর্বাপেক্ষা ছোট সংস্থা হলেও এর ভূমিকা মানবজীবনে সর্বাধিক। পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে "Mac Iver and Page" তাঁদের "Society : An Introduction Analysis" শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "The family is a group defined by a sex-relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children." [২] সুতরাং পরিবার গঠনের প্রাথমিক শর্ত হল যৌনবাসনার চরিতার্থতা, সন্তান-উৎপাদন ও পালন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও এ ব্যাপারে বলেছেন, **"জীবপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি এই দ্বৈরাজ্যের শাসনে মানুষ চালিত এবং বিবাহ জিনিসটা সভ্যসমাজের অন্যান্য সকল ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা।"** [৩] পরিবারের গুরুত্ব সম্পর্কে "William. J. Goode বলেন, **"For these reasons, man must live in some sort of family grouping to be fed, protected, and taught what nature has not provided."**[৪] পরিবারের আয়তন যেমনই হোক না কেন, তার কেন্দ্রবিন্দু হল সন্তান। স্বামী ও স্ত্রী মিলে হয় দম্পতি, আর সন্তানকে নিয়ে হয় পরিবার। এ প্রসঙ্গে E.W. Burgess and Locke এক বর্ণনামূলক সংজ্ঞায় বলেছেন, পরিবার হল, **".....a group of persons united by ties of marriage, blood or adoption; Constituting a single household; inter-acting and communicating with each other in respective social roles of husband and wife, mother and father, son and daughter, brother and sister, and creating and maintaining a common culture."** [৫] সমাজজীবনের প্রথম ধাপই হল পরিবার। পারিবারিক ভিত্তিতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় এবং সম্পর্কিত ব্যক্তিদের পরস্পরের সাথে বিবাহ যোগ্যতা স্থির করা হল পরিবারের প্রধান কাজ। নবজাত শিশুকে পরিচয় করানো পরিবারের দায়িত্ব। T. B. Bottomore বলেছেন, **"The family transmits values which are determined elsewhere; it is an agent, not a principal."** [৬] ক্রমবিবর্তনের ধারায় যে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে তার ভূমিকা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীরা যৌন, অর্থনৈতিক, প্রজনন ও শিক্ষা সম্পর্কীয়—এই চারপ্রকার কাজের কথা বলেছেন।

এই পরিবার হল সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রাথমিক ও প্রাচীন গোষ্ঠী। সমাজের ভিত্তি স্বরূপ পরিবারের প্রধান কাজ হল সন্তানকে সামাজিকীকরণ, যার উপরে সমাজ গড়ে ওঠে। প্রাচীন কালের পরিবার বর্তমানে গঠনের দিক থেকে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এর প্রধান কারণ শিল্প বিপ্লব। শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আর্থ-সামাজিক সচলতা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়াদি পরিবারের স্বয়ম্ভরতা বিনষ্ট করেছে। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশ, ধর্মীয় গোঁড়ামির অবলুপ্তি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি পরিবারের পরিকাঠামো ও প্রকৃতির উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তবে একথা সত্যি যে তারাশঙ্করের প্রথম পর্বে বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় পারিবারিক জীবনযাত্রা প্রাচীনতার দেওয়ালে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষার অভাব, জনস্বাস্থ্যের অনগ্রসরতা, অর্থনৈতিক মন্দা, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে গ্রামের পরিবারে তখনও আধুনিকতার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা বা আত্মকেন্দ্রিক ও কৃত্রিম মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। কৃষি-নির্ভর পরিবার এর মূল কারণ। তাই যৌথ পরিবার-চিত্র ছিল প্রকট। ধীরে ধীরে কৃষিপ্রধান অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন ধরে। পরিবারে পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের পরিবর্তে পুত্র-কন্যাদের প্রাধান্য বাড়ে। কেবল উপজাতির মধ্যে এই ধারা বিদ্যমান থাকে।

বিবাহ :- পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হ'ল বিবাহ। বিবাহকে বাদ দিয়ে পরিবারের কল্পনা করা যায় না। বিবাহ হল স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এক দৃঢ় বন্ধন। নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌন মিলনের এক সামাজিক উপায় হ'ল বিবাহ। **"বিবাহ** বলতে বলা হয়েছে : **(a) .....ceremony or process by which the legal relationship of husband and wife is constituted; or (b) .....physical, legal and moral union between man and woman in complete community of life for the establishment of a family.** এ প্রসঙ্গে **Horton and Hunt** 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন—**Marriage is the approved social pattern whereby two or more**

persons establish a family." (৭) কিন্তু বিবাহ কেবলমাত্র যৌন আচরণকারী সামাজিক ব্যবস্থা নয়। এর মাধ্যমেই পরবর্তী পরিবারের বৈধ শিশুর জন্ম হয়। পিতার পরিচয়েই সন্তান সমাজে পরিচিত হয় এবং সেই সন্তানকে লালন-পালন ও পরিচর্যা করার দায়িত্বও তাদের উপরেই থাকে। পিতৃত্ব অজ্ঞাত থাকলে সন্তান সমাজে জারজ বলে ধিকৃত হয়। তাই বিবাহ শুধু যৌন সম্ভোগের ছাড়পত্র নয়, পিতৃত্বের স্বীকৃতিও বটে। এই জন্যে Malinowski বিবাহের সংজ্ঞা দিয়েছেন, **"Marriage cannot be defined as the licensing of sexual intercourse but rather as the licensing of parenthood."** (৮) তাই "বেশীরভাগ দম্পতির জীবনে নর-নারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট" (৯) হলেও জীবনের সাহচর্য সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও স্বামী-স্ত্রীর মিল থাকে। তাছাড়া সমাজে অবৈধ প্রণয় ও সন্তান বিধিবদ্ধ নয়, নানা সমস্যার জন্যেও বিবাহের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সমাজের ইচ্ছার সঙ্গে আপস করে চলতে হয়। এই আপসের ফলশ্রুতিই হল বিবাহ।

বিবাহের সামাজিক ও ব্যক্তিগত তাৎপর্য আছে বলেই প্রত্যেক সমাজে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়। এ বিষয়ে Anderson and Parker তাঁদের Society : its organisation and operation গ্রন্থে বলেছেন, **"The wedding is the recognition of the significance of marriage to societies and to individuals through the public ceremony usually accompanying it. Such a ceremony indicates the society control. The pageantry impresses upon the couple the importance of the commitment they are undertaking."** (১০)

ভারতবর্ষের জনজীবনে বিবাহ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। হিন্দু পন্ডিতগণ বিবাহকে 'সংস্কার' বলে আখ্যা দিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্রে ত্রিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে বিবাহের প্রয়োজন। ধর্ম, প্রজা (সন্তান পালন), এবং রতি (যৌনসম্ভোগ)। দুই নরনারী ও দুই পরিবারের মিলন বিবাহের দ্বারা সংঘটিত হয়। গার্হস্থ্য জীবনই হল ভারতবর্ষীয় সমাজব্যবস্থার মূলভিত্তি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "সমষ্টি জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব।" (১১)

আবার সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা প্রসঙ্গে মনু বলেছেন—

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষং স্ত্রী নিবন্ধনম্" (১২)

অর্থাৎ অপত্যের উৎপাদন ও তার প্রতিপালন, প্রতিদিন অতিথিসেবা, ভিক্ষাদান প্রভৃতি গৃহস্থের কর্তব্য কেবল স্ত্রীর সাহচর্যেই সম্ভব।

এই বিবাহ পদ্ধতি ভারতবর্ষের বহুপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। অবশ্য বিবাহের প্রকার ভেদ ছিল অনেক। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী খগেন্দ্রনাথ সেন তাঁর "সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা"র ২য় খন্ডে আট (৮) প্রকারের বিবাহ উল্লেখ করেছেন। (১৩) এদের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রজাপত্য এই চারটি শ্রেষ্ঠ কারণ, এগুলি সমাজ অনুমোদিত। গান্ধর্ব, ও রাক্ষস এই দুটি বিবাহ ক্ষত্রিয়দের জন্যে নির্দিষ্ট। কিন্তু আসুর এবং পৈশাচ এই দুপ্রকার বিবাহকে অবৈধ বলেছেন মনু। " ন কর্তব্যৌ কদাচন" (১৪) 'আসুর' বিবাহে কন্যাপণ দিতে হত। আর সুপ্তা বা প্রমত্তা কন্যাতে উপগত হওয়ার নাম পৈশাচ বিবাহ। অর্থাৎ কন্যাপণকে মনু নিন্দা করেছেন।

বৌদ্ধযুগেও নারীর সম অধিকার স্বীকৃত ছিল। ঋগবৈদিক যুগে পণপ্রথার প্রচলন ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে ১২৬তম সুক্তে কক্ষীবাণের সঙ্গে স্বনয়ের কন্যার বিবাহকালে কক্ষীবাণ একশত স্বর্ণমুদ্রা ও এক শত অশ্ব যৌতুক বা পণ হিসেবে গ্রহণ করেন। এই ভাবেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। পুরুষশাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষের আধপত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে। হৃদয়হীন, স্বার্থপর, পক্ষপাতদুষ্ট, সমাজের লোভ ও লালসার ঘৃণ্য পৈশাচিক উল্লাসে নারীর প্রেম-প্রীতিময় স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়— অশিক্ষা, কুশিক্ষা, এবং নানা কুসংস্কারে বন্দিনী করে মূল্যহীন করে তোলে নারী জীবনকে। তাই নারী সমাজের ও সংসারের বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়ে।

হিন্দুশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ দুপ্রকার। অনুলোম ও প্রতিলোম। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ হলে তা অনুলোম এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ হলে তা প্রতিলোম বলে। প্রতিলোম বিবাহ সমাজে অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু অনুলোম বিবাহ সমাজস্বীকৃত ছিল। এই ব্যবস্থা ইংল্যান্ডেও ভিক্টোরীয়যুগে দেখা যায়। A. L. Basham বলেছেন, **"This distinction is to be found in other societies. For instance, in victorian England the pear who married an actress rarely incurred the same scorn and ostracism as the lady who married her groom."** (১৫)

পিতা ব্রাহ্মণ ও মাতা শূদ্রাণী হলে তাদের সন্তান 'চণ্ডাল' বলে অভিহিত হতো। অনেকে বলেন যে অনুলোম, প্রতিলোম বিবাহের ফলেই বর্ণসংকর জাতি বা উপজাতি বা উপবর্ণ , উপ-উপবর্ণ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই ভারতে জাতির এত বাহুল্য।

সেনবংশের রাজা বল্লালসেন খ্রীস্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। 'কুলীন' শব্দের অর্থ সৎকুলোৎপন্ন। 'আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান—এই ন'টি গুণের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের কৌলিন্য দান করেন বল্লাল সেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। " তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা আদিশূরের আমন্ত্রণে কনৌজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করেন। প্রথমে তাঁহারা সংখ্যায় ৫ জন ছিলেন। বল্লাল সেন গুণগত ভিত্তিতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের চারটি ভাগে ভাগ করিলেন। যাঁহাদের উল্লিখিত নয়টি গুণই আছে, তাঁহারা হইলেন, "কুলীন", যাঁহাদের ৮টি গুণ-তাঁহারা হইলেন "সিদ্ধ শ্রোত্রীয়", যাঁহাদের ৭টি গুণ আছে তাঁহারা হইলেন, "সাধ্য শ্রোত্রীয়", এবং তাহার কম হইলে তাঁহারা হইলেন "কস্ত শ্রোত্রীয়"। শ্রোত্রীয় অর্থ যাঁহার শ্রুতিতে (বেদে) প্রতিষ্ঠা আছে। এই বিভাগের ফলে ১৯টি ব্রাহ্মণ (রাঢ়ী) কুলীনের মর্যাদা পাইলেন। নিয়ম হইল যে কুলীন, পুরুষ-কুলীন, সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় অথবা সাধ্য-শ্রোত্রীয় বিভাগ হইতে, এবং কস্ত শ্রোত্রিয় কেবলমাত্র নিজেদের মধ্য হইতে স্ত্রী সংগ্রহ করিতে পারিবেন। অপর পক্ষে কুলীন কন্যারা কেবলমাত্র কুলীন পুরুষ এবং কস্ত-শ্রোত্রীয় কন্যা কস্ত-শ্রোত্রীয় পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন; সাধ্য-শ্রোত্রীয় কন্যারা সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় অথবা নিজেদের গোষ্ঠীর পুরুষের সঙ্গে বিবাহ করিতে পারিতেন। সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় কন্যারা নিজেদের গোষ্ঠী হইতে, কুলীনশ্রেণী হইতে পতি সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ..... যে সকল কুলীনের সহিত নিম্নবর্ণের পাত্র-পাত্রীর বিবাহ হইত, তাহারা (কুলীন বংশীয়) শ্রেণীচ্যুত হইত তাহাদের পুত্র কন্যারা 'বংশজ' হইত। এইরূপে তিনটি শ্রেণীর উদ্ভব হইল; কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রীয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অনুরূপ প্রথায় ভাগ হইল, যথা কুলীন, কাপ ও মৌলিক।" [১৬] সেনবংশের আমল থেকেই নারীজীবনে অন্ধকার নেমে আসে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ কন্যাদের। শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মুজমদার বলেছেন, "একদিকে উপযুক্ত পাত্র মিলিত না সুতরাং কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইত। অন্যদিকে পুরুষ একাধিক বিবাহ করিত। বহু কুমারীর বিবাহ হইত না। যাহাদের বিবাহ হইত তাহারা প্রায় সারাজীবন পিতৃগৃহেই থাকিত, স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হইত। কারণ অনেক কুলীনের ৫০/৬০ বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত। .....অনেক ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ..... এ রূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে এক মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসী, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০/১২টি কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে— এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের সকল স্ত্রী কয়েকদিনের মধ্যে একসঙ্গে বিধবা হইয়াছে। কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা এত অধিক হইত যে একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন।" [১৭] এই কৌলিন্য প্রথা বহুবিবাহের অন্যতম কারণ। আবার বরপণের বৃদ্ধি ঘটাতেও কৌলিন্য প্রথার অবদান নেহাত কম নয়। দ্বাদশ শতক থেকেই বাংলাদেশে তুর্কীদের আগমনে অনেক হিন্দু আর্থিক কারণে তুর্কীদের দরবারে যাতায়াত শুরু করে। মঘ ও পর্তুগীজদের এদেশে আগমন ও নারীহরণ করার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও গোষ্ঠীগত সম্মান বৃদ্ধির জন্যে মুখ্য বন্দ্য, মজুমদার, সারখেল, শিকদার, সরকার প্রভৃতি পদবী গ্রহণ করায় সমাজে এক বিপুল বিস্তারী পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে কৌলিন্য প্রথা ও পণপ্রথা আরও প্রকট হয়। যার কুফল বিভিন্ন নাটক ও গল্পে তুলে ধরা হয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি "কুলীন কুল সর্বস্ব" নাটক। এই নাটকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, ".....অদ্যোপ্রান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলিন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।" [১৮] পণপ্রথা ও কৌলিন্য প্রথার দোষ সমাজে তুলে ধরাই ছিল নাটকে রামনারায়ণের লক্ষ্য। "বাংলা নাটকের ইতিহাস" গ্রন্থে অজিত কুমার ঘোষ অনুরূপ মন্তব্য করেছেন— "কুলীন কুলসর্বস্ব" কৌলিন্য প্রথার দোষ ও অসঙ্গতি হাস্যরসাত্মক দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া দেখাইয়া ইহার নিন্দা করা হইয়াছে।" [১৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন " রামনারায়ণের দুটি নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৬০) যথাক্রমে কৌলিন্য প্রথাও বহুবিবাহের কুফল দেখাইবার জন্যই লেখা হয়েছিল।" [২০] কেবল কৌলিন্য প্রথার রক্ষার জন্যে চারটি কন্যার (সহোদরা) সঙ্গে এক প্রবীণ, কদাকার, অকাট মূর্খ, কানা ও বধিরের বিবাহ হয়েছে তাই দেখানো হয়েছে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে।

বহু বিবাহ বা পণপ্রথা রাঢ়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেশী দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই প্রথা কদর্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চলে সূপকার বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণরা কন্যাপণ হিসাবে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দান করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং অনেকে অবিবাহিত অবস্থায় কালযাপন করিয়াছে।" [২১]

কন্যাপণের বিষময় রূপ দেখা যায় "ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "কনের মা কাঁদে, টাকার পুঁটলি বাঁধে (১৮৬৩), রাধাবিনোদ হালদারের "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" (১৮৮৬) পাওয়া যায়। আবার বরপণের চিত্র বহু নাটকে চিত্রিত হয়েছে। যেমন— গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'বলিদান', রসরাজ অমৃতলাল বসুর "বিবাহ বিভ্রাট" (১৮৮৪) ইত্যাদি বহু নাটক।

রামকৃষ্ণ রায়— এর "লোভেন্দ্র গবেন্দ্র প্রহসনে" (১৯২৭) পাত্রপাত্রীর পিতামাতার চিত্র বর্ণিত আছে। লোভেন্দ্র গান করে বলেছে—

"এক এক ছেলে দশ হাজারে
বেচবো কসে বে'র বাজারে,
মেয়ের বাবার দফা রফা
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে দেবো।" (২২)

কৌলিন্যের সাহায্যে অনেক সময় কুলীন ব্রাহ্মণ নিজেদের অনড় আর্থিক অবস্থাকে সচল করেছে। কুলীন পাত্রকে সামনে রেখে বহু অভিভাবক অর্থশোষণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় পিতৃ-মাতৃহীন হলে সংসারের দৈন্যতা ঘোচাতে তাঁর পিতৃব্য রাসবিহারীর ৮টি কুলীন কন্যার সাথে বিবাহ দেন। পরে রাসবিহারী নিজ ইচ্ছায় আরো ৬টি বিবাহ করেন। কৌলিন্য প্রথা কত ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা তদানীন্তন বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়— "পূর্ববঙ্গে বারজন কুলীন আছেন। তাঁহাদের সর্বসমেত ৬৫২ টি বিবাহ। তন্মধ্যে একজনের ৮০টি বাকি ১১জনের ৫৭২টি। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য তাঁহার কেবলমাত্র ৪০টি পত্নী। সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন চূড়ামনির বয়স ৭০বৎসর ও সর্বকনিষ্ঠের বয়স ৪০ বৎসর।" (২৩)

মধ্যযুগেও পণপ্রথা বিশেষ প্রভাববিস্তার করে। ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। উচ্চ-নীচ হিন্দুরা ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচানোর তাগিদে, সেইসঙ্গে বিদেশী আক্রমণে অর্থনৈতিক অবস্থা হিন্দুদের শোচনীয় হয়ে যায়। তাছাড়া অবিবাহিত মেয়েদের নিরাপত্তার অভাববোধ করতেন তাদের পিতা মাতা। তাই ভাল পাত্রের যোগারের জন্যে খোঁজা খুঁজি শুরু হয়। একদিকে ভালপাত্রের সংখ্যা যেমন কমে যায় অন্যদিকে বাল্য বিবাহ ও পণপ্রথার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। " এই সময়ই বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন ঘটে। সমাজে এমন একটি অবস্থা এসে দাঁড়ায়, যার যত বেশী সংখ্যক স্ত্রী থাকবে তার সামাজিক মর্যাদা ততবেশী হবে। তার ফলে তৎকালে সমাজে বিধবা, বালবিধবা, পণপ্রথা জনিত মৃত্যু ক্রমাগত বাড়তে থাকে।" (২৪)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিবাহ রদ করতে উদ্যোগী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। সেই সময়ে বাংলাদেশে বহুবিবাহের তালিকা সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে হুগলী জেলায় অনুসন্ধান করে এক বিশদ তালিকা দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায় ঃ—

	নাম ঃ	হুগলী জেলা/বিবাহ	বয়স	বাসস্থান
১।	ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫	বসো
২।	ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪	দেশমুখো
৩।	পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫	চিত্রশালী
৪।	মধুসূদন মুখোপাধ্যায়	৫৬	৪০	ঐ
৫।	দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়	১৬	২০	ঐ (ক্রমশ) (২৫)

সুতরাং "তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে ৫০জন ব্যক্তি গড় পড়তায় ৫০ বৎসর বয়সের মধ্যেই ১৪৬৮টি বিবাহ করিয়াছিলেন।" (২৬)

বাংলা নাটক বা প্রহসনে-ই প্রথম বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, অযোগ্য বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ, পণপ্রথা, বিবাহিতের ব্যাভিচার ইত্যাদির আলোকপাত ঘটে।

ব্রাহ্মণ সমাজে এবং উচ্চবর্ণের মধ্যেও কৌলিন্য প্রথার প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে বহু বিবাহ ঘটে। কুলীনেতর শ্রেণীর মধ্যে বহুবিবাহ অপেক্ষাকৃত কম ছিল কারণ কুলীন স্বামীদের ভার্যার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হত না। কিন্তু নীচবর্ণের স্বামীদের সে দায়িত্ব নিতে হত। কৌলিন্য প্রথার জন্যে সমাজে যেমন বহুবিবাহ ঘটেছে তেমনি ঘটেছে বাল্যবিবাহ। এই অসংখ্য বালাবধূ অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে পড়ে ফুলশয্যার স্বপ্ন সার্থক হবার আগেই হয়ত বিধবা হয়েছে, নয়ত বা অসংখ্য

সন্তান জন্ম দিয়ে অল্প বয়সেই অকর্মণ্য হয়ে অকালবার্ধক্যে প্রবেশ করেছে। সমাজে বিধবার সংখ্যাধিক্য কমাতে কৌলিন্যধারী নেতৃবৃন্দ সতীদাহের মত নরমেধ যজ্ঞের বিধান দিয়েছে। সতীদাহের কারণ প্রসঙ্গে "বিনয় ঘোষ" তাঁর "বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১ম খন্ডে" বলেছেন, " বহু বিবাহের বিস্তারের **Corollary** বা প্রতিফলন হল বালবিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি। কুলীনের স্ত্রী পিতৃগৃহবাসী, এমনিতেই অর্থনৈতিক বোঝা, তার উপর বৈধব্যের যন্ত্রনা তার জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলল। তখন সহমরণের শৌর্যবীর্যের আদর্শও বিকৃত হয়ে দায়মুক্তির অপকৌশলে পরিণত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে সহমরণের সংখ্যা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল, কোন শাস্ত্রীয় বা আদর্শগত যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না।" [২৭] আবার অনেক সময় "বিধবার সম্পত্তির লোভে তার আত্মীয়স্বজন অনেক সময় জোর করে তাকে সতী করতো।" [২৮] বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকে সতীদাহের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ে। কলকাতা ডিভিশনে ১৮১৮/১৯ সালে সতীদাহে সংখ্যা ঃ—

জেলা		সংখ্যা				
বর্ধমান	-	৭৫		বর্ণ ও বয়স ভেদে সতীদাহ- ১৮১৯		
কটক	-	১৩	বয়স	ব্রাহ্মণ	বৈদ্য/কায়স্থ	নিম্নবর্ণ
খুড়দা	-	৯	১০ বছরের কম	২	x	x
পুরী	-	১১	১০-১৯ " "	৬	৫	৯
হুগলী	-	১১৫	২০-৩৯ " "	৩৪	২১	৫১
যশোহর	-	১৬	৪০-৫৯ " "	৫৯	৪৩	৮৮
জঙ্গলমহল	-	৩১	৬০ বছরের বেশী	৭৪	২৯	৮১
মেদিনীপুর	-	১৩				
নদীয়া	-	৪৭				
কলকাতা শহরতলী	-	৫২				
২৪ পরগণা	-	৩৯				
		৪২১				[২৯]।

এই জঘণ্যতম নিষ্ঠুর সহমরণ প্রথা রামমোহনের চেষ্টায় বন্ধ হয় কিন্তু সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সদ্য গৌরীদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। অনেকের জীবনে আদিমপ্রবৃত্তি-জনিত কারণে পদস্খলন ঘটে; তাই হয়ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, " কলিতে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য পালনে অপারগ। সুতরাং একালে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা থাকা উচিত।" [৩০] তাই পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু কালের চাপে, রক্ষণশীল সমাজের কটাক্ষে, শিক্ষার অভাবে সর্বোপরি মানসিকতার অভাবে, বিধবা বিবাহ বহুল প্রচারের পরিবর্তে বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে বরপণ বর্তমানে সামান্য মাথাচড়া দিয়েছে, কিন্তু তারাশঙ্করের সময়ে কন্যাপণ ছিল। পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে পণ দিয়ে বিয়ে করে। পণ দিতে অসমর্থ হলে কন্যাপক্ষের দাবী অনুযায়ী পাত্রকে শ্রম দিয়ে কন্যাপণ দিতে হত। আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য নিম্নবর্ণের মধ্যেও কন্যাপণ ছিল এবং এখনও কিছু আছে। এর কারণ মূলতঃ অর্থনৈতিক। উক্ত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানতালে চাষাবাদ, কায়িক পরিশ্রম বা অর্থ উপার্জন করতে সমর্থ। কন্যাকে বিয়ে দিয়ে কোন পরিবারের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই কন্যাপণের প্রচলন। যেমন সাঁওতালদের মধ্যে এই কন্যাপণ হিসেবে পাত্রীর দাদা ভাইকে একটি 'গরু' কন্যাপণ দিতে হয়। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও বীরভূমে এই প্রথা এখনও আছে। আবার বিয়ের পর যদি পাত্র পাত্রীকে পছন্দ না করে বা স্বামী স্ত্রীর মিল না হয় তবে পুরুষ দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে সেক্ষেত্রে আর বিয়ে হয় না। হয় সাঙা বা নিকা। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। তারাও এক পতিকে ত্যাগ করে অন্য পতি গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করতে চায়, তাহলে তার স্বামীকে গরুটি ফেরত দিতে হয়। যাযাবর বেদেদের মধ্যেও বিবাহ ও বিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটত। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে বহু বিবাহ বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে পণের বোঝা প্রায়ই ছিল না।

তারাশঙ্করের গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিধবা বিবাহ বা পণপ্রথা দু-চারটি গল্পে থাকলেও বহু বিবাহ অনেকগুলো গল্পে বিধৃত। আবার পণপ্রথা, কৌলিন্যপ্রথা বা বহুবিবাহ ব্রাহ্মণ পরিবারের দু-চারটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্বলিত গল্পগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। লেখকের বাল্যকালে কৌলিন্যের দোর্দন্ড প্রতাপ ছিল। কন্যার বিবাহের পরেও পিতৃগৃহে থাকতে হত। তারাশঙ্কর তাঁর "আমার কালের কথা"তে বলেছেন, "এক এক কুলীন তখনও চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বিবাহ ক'রে থাকেন। আমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে এ রেওয়াজ তখন কমেছে। বিবাহ পেশা যাঁদের, তাঁদের অধিকাংশেরই বাস ছিল পূর্ববঙ্গে—যশোর, খুলনা, বিক্রমপুর। আমরাও কুলীন। কিন্তু এক স্ত্রী বর্তমান বিবাহ তখন নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। সন্তান না হলে দু-তিন বিবাহরীতি অবশ্য তখনও বর্তমান। তখনকার দিনে সন্তানহীনা স্ত্রী বংশরক্ষার জন্য নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বামীর বিবাহ দিতেন, তার পিছনে ছিল সমাজের উৎসাহ। এমন স্ত্রী সমাজে অজস্র প্রশংসায় ধন্য হতেন। এসব অবশ্য সম্পত্তিশালী লোকের ঘরেই ঘটত।" (৩১)

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনেকগুলোতে পণপ্রথা বহুবিবাহ ও কৌলিন্যের নিত্য যন্ত্রনার চিত্র রয়েছে। পণপ্রথার বলি "দেনাপাওনা", কৌলিন্যপ্রথা ও সহমরণের চিত্র "মহামায়া" ছাড়া বহুবিবাহ (একের বেশী) 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান', 'সুভা' 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি গল্পে মেলে। শরৎচন্দ্রের বহুবিবাহ-আশ্রিত গল্প "অনুরাধা" উল্লেখযোগ্য।

পণপ্রথা ঃ- পণপ্রথা নিয়ে তারাশঙ্করের প্রায় পাঁচটি গল্প রয়েছে। অবশ্য সরাসরি পণের বিষময় রূপ সব গল্পে নেই, কেবল পণের উল্লেখ আছে মাত্র। অর্থাৎ এই প্রথা গল্পে কোন প্রভাববিস্তার করে নি। যেমন "মুখুজ্জে মহাশয়" গল্পটির মূল ঘটনা অন্য। কিন্তু গল্পের সূত্রপাত পণ নিয়ে শুরু হয়েছে। ঘোষ পরিবারে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল তা জানা যায়। এখানে কন্যাপণ ও বাল্য বিবাহের সন্ধান মেলে। ছ'বছরের কন্যার বিয়ে হচ্ছে এবং কন্যাপণ দেড়'শ টাকা। সেই পণের দেড়শ টাকা ধার করতে এসেছে পাত্র শিবু ঘোষ জমিদারের কাছে।

ইতিহাস ঃ- এই গল্পটি মূলতঃ ইতিহাসাশ্রিত তবুও এর মধ্যে পণপ্রথার চিত্র স্পষ্ট। হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ষাট টাকা বেতনের শিক্ষক। সাহেব গুপ্তর কাছে কন্যার বিবাহের কথা বলতে গেলে সাহেবগুপ্ত হরপ্রসাদের কাছে সৌরীণের (অনাথ) জন্যে দু-হাজার টাকা দাবী করে। সেই টাকা হরপ্রসাদ দিতে পারে না ও বিয়েও হয় না। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় যে, বিপত্নীক বি, এ পাশ জমিদার হরপ্রসাদের মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করতে রাজী হয়েছে। প্রথম পক্ষের কোন সন্তান ছিল না। পাত্রের বয়স অবশ্য একটু বেশী হয়েছে— প্রায় ত্রিশ।

কালোমেয়ে ঃ- গল্পটিতে প্রত্যক্ষ পণের অঙ্কের উল্লেখ না থাকলেও, প্রভাব রয়েছে। উপীনবাবু স্কুল শিক্ষক ছিলেন, বর্তমানে তাঁর পা দুটো পঙ্গু— বড় দুর্ভাগ্য তাঁর। উপযুক্ত দুই ছেলে থেকেও নেই, উপরন্তু জঞ্জাল। বড় ছেলে বিমল এম, এ পাশ করে বিদেশে গিয়ে সেখানেই বান্ধবীকে বিয়ে করে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। মেজছেলে অমল প্রথম জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জেলে যায়। ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করে ও পরে অভিনয়ের জগতে গিয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায় এবং অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে। বর্তমানে তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাঝে মাঝে এসে টাকা, গয়না চুরি করে, কখনও জোর করেও নিয়ে যায়। কন্যা সুমতি-অত্যন্ত কালো, অথচ সুন্দরী। সুমতি দুধের দোকানে কাজ করে এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেছে। এগার বছর বয়স থেকে সুমতি সংসারের যাবতীয় কাজ করে। ছোটভাই শ্যামলকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে, ঘরে রাখা যায় না— অথচ সহায় সম্বলহীন উপীনবাবু। তাই তিনি বসত বাড়ীটুকু বিক্রির কথা বলেন। সেই কথা আড়াল থেকে সুমতি শুনতে পায়। পরে বাবাকে বলে, "আমার বিয়ে দেবেন না বাবা। না-না-বাবা, আমি কালো। না-।" এইভাবে গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। সুমতি নিজে কালো বলে সমাজে অনেক ঘৃণা, অবজ্ঞা, হতাশা পেয়েছে, সেইসঙ্গে বাবা ও ভাইয়ের শেষ সম্বল ভিটেটুকু বিক্রি করে বিয়ে হোক তাও সে চায় নি। সে রাত্রির মত তপস্যা করতে চায় সূর্যের মত রূপবান পাত্রের জন্যে। অর্থাৎ সে চেয়েছে যদি তার জীবনে দাবীহীন উদারচেতা কোন পাত্র আসে তবেই সে বিয়ে করবে।

কৌলিন্যপ্রথা : কুলীনের মেয়ে ঃ- কৌলিন্য প্রথা নারীজীবনে এনেছিল এক ভয়াবহ বিভীষিকা। ধনদা মুখুজ্জের একমাত্র আদরের কন্যা তরু পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে দুখানি পত্র লিখে রেখে যায়। তার মধ্যে একখানিতে তরু নিজের জীবনের অন্তিম পরিণতির কথা লিখে যায়। ধনী ধনদা মুখুজ্জে কুলীন পাত্র পেয়ে কৌলিন্য বজায় রাখতে বহু পত্নীক (৫টি) বিপদতারণের সঙ্গে তরুর বিয়ে দেন। পেশাদার কুলীন কুলাঙ্গার পাত্র বিপদতারণ। উচ্ছৃঙ্খল, তস্কর, চরিত্রহীন বিপদতারণকে পাত্র নির্বাচনের সময় অনেকে ধনদাবাবুকে বাধা দেন। কিন্তু ধনদা একগুয়ে এবং অর্থের মোহে হিতাহিত জ্ঞান হারান। তিনি আশা করেছিলেন যে অর্থ দিয়ে, চাকরী দিয়ে, ঘরবাড়ি করে দিয়ে বিপদকে বাড়ীতে বেঁধে রাখবেন। তাই তিনি স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণবাবুর নিষেধের উত্তরে বলেছিলেন, "রূপোর শেকল দিয়ে বেটাকে বেঁধে রাখব। ঘর করে দেব, জমি দেব, আর সাবরেজেষ্টারর আপিসে একটা কাজে ঢুকিয়ে দেব, বুঝলে।" এই আশায় বিয়ে দিলেও তরুর জীবনে অচিরেই অন্ধকার নেমে আসে— ফুলশয্যার দিনেই শরশয্যা রচিত হয়। মদ্যপ

বিপদতারণের কদর্য ব্যবহারে অসহায় তরু দিশাহারা হয়ে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। কিন্তু কুলীনের মেয়ে, তাই নিস্তার নেই। বছর চারেক পর তরুর বয়স যখন সতের তখন তার বাবা জামাইকে বাড়ী এনেছে প্রতিরাতের জন্যে পাঁচ টাকা সম্মানী দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। প্রথম দিনেই এসে বিপদ সুযোগ বুঝে তরুর কানের মাকড়ী নিয়ে ভোর রাতে পালিয়ে যায়। ধনদা বাবুর মৃত্যুর পর বিপদতারণ তরুর সঙ্গে কিছুদিন থাকলেও একদিন তরুর যথাসর্বস্ব চুরি করে পালিয়ে যায়। যে টুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ছোট দাদারের অসুখে খরচ হয়ে যায়, ফলে তরু ভিক্ষা বৃত্তি গ্রহণ করে। সধবা কুলীন কন্যার মর্যাদা তথাপি খোয়া যায় নি। নির্লজ্জ, বিবেকহীন কদর্যস্বামী বিপদতারণ সামান্য কর্তব্যটুকুও করে নি। এমনকি তরুর নিজের ছোট দাদা স্বামীপরিত্যক্তা ছোট বোনটির সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করিয়ে খেয়েছে। অসুখে ছোটদাদা মারা গেলে সংসারের সব দায়িত্ব তরুর কাঁধে এসেছে। পাড়ার যোগেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী এয়ো সংক্রান্তির ব্রত করেছেন, তাতে সধবা হিসেবে তরু আমন্ত্রণ চেয়ে নেয়। সে গাঙ্গুলীবাড়ীতে গিয়ে সোনার তাগা চুরি করে ধরা না পড়লেও তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে, অনুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে তার সমস্ত কথা এমনকি তাগাটি গাঙ্গুলীদেরই নর্দমায় যে ফেলা আছে সে কথাটাও লিখে যায়। কৌলিন্য প্রথা নিয়ে সার্থক গল্প এটি। তারাশঙ্করের পূর্বপুরুষ ছিলেন "উড়ে কুলীন" হয়তো লেখকের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও এই জঘন্য কৌলিন্য প্রথা বিদ্যমান ছিল। এই গল্পটি সম্পর্কে জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, " এ গল্পে শিল্পীর সহানুভূতি স্বয়ম্প্রকাশ। বাংলাসাহিত্যে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' থেকে কৌলিন্য প্রথাকে নিয়ে অনেক সার্থক রচনাই হয়েছে তারাশঙ্করের 'কুলীনের মেয়ে' গল্পটি বিশুদ্ধ ছোটগল্পের শিল্পসম্মত রূপে সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেছে। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে স্রষ্টার লেখনী প্রচারধর্মী না হয়েও কতটা মর্মস্পর্শী হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গল্পটি।" (৩২) 'হোলি' গল্পে কানাই মুখুজ্জের স্বর্গীয় পিতা কুলীন বলে প্রায় ষাটটি বিয়ে করেছিলেন।

বহু বিবাহ ঃ- তারাশঙ্করের বহু বিবাহ বিষয়ক গল্পের সংখ্যা প্রায় দশটি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ তিনটি, বৈষ্ণব দুটি, ডোম দুটি, তাছাড়া সাঁওতাল, বেদে ও বাউরী পরিবারের একটি করে। বহু বিবাহ-বিষয়ক গল্পের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে তারাশঙ্করের লেখনীর যাত্রা শুরু ঊনবিংশ শতকের প্রায় তৃতীয় দশক থেকে— যখন বাংলাদেশ অনেকখানি প্রগতির পথ অতিক্রম করেছে, দেশ ও জাতি স্বাধীনতার তরঙ্গে উদ্বেলিত। শত শত তরুণ দেশ সেবায় নিবেদিত প্রাণ, নারীরাও ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে শিখেছে; অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়েছে, বাল্যবিবাহ প্রায়ই গেছে প্রভৃতি কারণে বহু বিবাহ সমাজে অনেকাংশে লুপ্ত হতে বসে ছিল। সমাজে একগামিতা বা একজন পুরুষের সঙ্গে এক নারীর দাম্পত্য জীবনকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হোত। বহুগামিতা বা এক কালে নারী বা পুরুষের একাধিক জনের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন তখন অনেকাংশে নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। এক পুরুষ বহু পত্নী গ্রহণ করতে পারত বিশেষ করে হিন্দু সমাজের কুলীনগণ। কিন্তু ১৯৫৫ সালের "হিন্দু বিবাহ আইন" মোতাবেক তা বন্ধ হয়ে যায়। আদিম ও উপজাতিদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বহু বিবাহের সন্ধান মেলে তবে তা খুবই কম। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা" এই নীতি বর্তমানে প্রায় অচল হয়ে গেছে।

উল্কা ঃ- এই গল্পের কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিতি না হলেও মূল ঘটনাকে পরিণতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বিমলা চরিত্র। হরিচরণ ব্রাহ্মণ-এর বিধবা শ্যালিকার কন্যা বিমলা— অসহায়া নিঃস্ব। হরিচরণ নিঃসন্তান তাই বিমলাকে আশ্রয় দিয়েছিল। হরসুন্দরী পিতৃ-মাতৃহীন ভাসুরের পুত্র জ্যোতির সাথে বিমলার বিয়ে দিতে চাইলে জ্যোতি বাড়ী থেকে চলে যায়। হরসুন্দরী তখন বিমলাকে নিয়ে বিমলার দেশের বাড়ীতে গিয়ে বিষয় সম্পত্তিটুকু বিক্রি করে পাঁচশ টাকা পণ দিয়ে ঐ গ্রামেরই ষাট বছরের এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দেয়। বৃদ্ধ রামেশ্বর বিপত্নীক, কিন্তু সংসারে চারপুত্র ও পুত্রবধূ বিদ্যমান। তথাপি বৃদ্ধের বিবেকে বাধেনি, ছয় মাসের মধ্যেই বিমলা বিধবা হয়েছে। সামাজিক অন্যায় ও ব্যক্তি স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বিমলার মত সহজ সরল মেয়েদের জীবন এভাবেই মরুভূমি হয়েছে।

কুলীনের মেয়ে ঃ- ধনীর একমাত্র কন্যা নয়নের মণি হওয়া সত্ত্বেও বিপথগামী স্বামীর হাতে পড়ে সেই কন্যা তরুর জীবন ছারখার হয়ে গেছে। লোভী ব্রাহ্মণ নিজে কৌলিন্যের দোহাই দিয়ে সবশুদ্ধ ছটি বিয়ে করেছে এবং রক্ষিতাও তার অনেক, অথচ নিজে বেকার ও অর্থহীন। তরুর সমস্ত অর্থ, গয়না, তস্করের মত আত্মস্যাৎ করেছে, বিনিময়ে সামান্য কর্তব্যও পালন করে নি। সমাজে তার কোন অন্যায় বা শাস্তির দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। লেখকের যুগেও মেয়েদের এইভাবে অপমান ও পুরুষের শত অন্যায়ের পরেও সাধুবেশে থাকা যেত।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ- বিভা সেন এই গল্পের নায়িকা। তার মা ধনীর গৃহে রক্ষিতা ছিল। বিভা ভালোবেসে পার্থ মুখার্জীকে বিয়ে করে। পরে অভিনয়ের জগতে গিয়ে এবং স্বামীর শয়তানিতে সে সুরেণকে গ্রহণ করে পরে আবার ভবেশকে গ্রহণ করে। এমনি করে অনেক পুরুষ এসেছে তার জীবনে। শেষে এক দিন সে এক সন্ন্যাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে হত্যা করে ফাঁসিতে যায়। এখানে বিভার বহুভর্তৃক জীবনের লক্ষণ স্পষ্ট।

মালাচন্দন ঃ- গল্পটি বৈষ্ণব পরিবারের ঘটনা। এরা ভিক্ষে করে কিন্তু সংসার বাঁধে। গায়ে নামাবলী, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করে (স্বামী-স্ত্রী), বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী একত্রে একতারা খঞ্জনী নিয়ে গানগেয়ে ভিক্ষে করে, আবার গৃহস্থের মত আচার ব্যবহার মেনে চলে। মোহনদাস বাবাজী ঘরে জীর্ণা স্ত্রী থাকতেও সে কথা গোপন করে দ্বিতীয় বিবাহ করেছে বিধবা তুলসীকে। সতীনের সঙ্গে থাকে তুলসী এবং স্বামীসেবা করে চলে অকৃত্রিমভাবে। একদিন বৃন্দাবন যাত্রার কথা বলে তুলসী। মোহনদাস যেন অন্য কিছু ভাবে। তুলসীর প্রতি মোহনের আকর্ষণ যেন আগের মত আর নেই। হঠাৎ কয়েকদিনের জন্যে মোহনদাস গ্রামান্তরে যায়, ফিরে আসে নতুন সেবাদাসী নিয়ে। তুলসী বরণ করে নতুন সঙ্গীনকে ঘরে তোলে, সন্ধ্যায় নিজের হাতে ফুলশয্যা সাজিয়ে দেয়। পরদিন সকালে তুলসী মহান্তর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। মোহনদাসের বহুপত্নীক আসক্তি গল্পের ট্রাজেডি সৃষ্টি করেছে। তুলসী সৎ ও জাতবোষ্টমের মত পারিবারিক জীবন যাপন করতে চেয়েছিল, তাই বিধবা হওয়ার পর সে আর নতুন মালা গাঁথে নি। কিন্তু শঠ, মিথ্যাবাদী কামুক মোহনদাসের ভালোমানুষের মত অভিনয়ে সে সব ভুলে গিয়েছিল।

মহামারী ঃ- এই গল্পটির পটভূমি এক গ্রাম— যেখানে হঠাৎ কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এই রোগের সূত্রপাত বিবাহের বরযাত্রীদের মধ্যে একজনের প্রথম হয়। যে বিবাহটি সংঘটিত হয়েছে তাতে বর তৃতীয় পক্ষ বিয়ে করতে এসেছে। প্রথম দুই স্ত্রী মারা গেছে। মারা যাওয়ার কোন কারণের উল্লেখ নেই। বিনাপণে সুন্দরী দরিদ্রকন্যাকে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করতে এসেছে রামায়ণ পালাগানের অধিকারী মশাই। কিন্তু দলের একজনের কলেরায় মৃত্যু হলে অধিকারী মশাই পালিয়ে যায়। বহুদিন পরেও সে গ্রামে নববধূকে নিতে আসে না। এখানেও কারণের উল্লেখ নেই। হয়তো কুসংস্কার এর পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

মতিলাল ঃ- এই গল্পটি ডোম পরিবারভুক্ত। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই বহুপত্নীক ও বহুভর্তৃক। এই পর্যায়ের আর একটি গল্প 'প্রহ্লাদের কালী'। প্রহ্লাদ ভন্না (জাতিতে ডোম) ডাকাত ও কালী ভক্ত। সে জীবনে সাতটি মেয়ের সর্বনাশ করেছে। প্রথম বিবাহ দশ বছর বয়সে করেছিল— তখন পাত্রীর বয়স ছিল তিন। এরপর আরও দুটি বিবাহ করেছিল। বাকী বিবাহ না করলেও সেই মেয়েদের সাথে প্রহ্লাদ কিছুদিন খেলা করেছিল। ছেলেপুলে ও স্ত্রীদের কোন খবর ও দায়িত্ব সে পালন করেনি।

সাপুড়ের গল্প ঃ- গল্পটির নায়িকা কালী বেদেনী। সে বহুভর্তৃক, তিনবার বিয়ে করেছে এবং পরিত্যাগ করেছে নির্দ্বিধায়। স্বৈরাচারিণীর মত ঘুরে বেড়ায় ঝাঁপিতে এক পুরুষ সর্প নিয়ে। এখন ওটাই তার বঁধু। শেষে, এক সন্ন্যাসীর প্রেমে পড়েছে। চার পাঁচ মাস তার সঙ্গে থাকার পর হঠাৎ সন্ন্যাসী যেদিন কালীকে বন্ধ্যা হবার জন্যে ওষুধ খাওয়ার কথা বলে সেদিন কালী সন্ন্যাসীকে সহ্য করতে পারেনি— নেশাগ্রস্ত সন্ন্যাসীকে কামড়ে দিয়ে ক্ষতস্থানে সাপের তীব্র বিষ ঢেলে মেরে ফেলে।

একটি প্রেমের গল্প ঃ- অশিক্ষিত আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারে আজও বহু বিবাহ ঘটে চলেছে। লেখকের সমকালীন যুগে রাঢ় বাংলা বিশেষ করে বীরভূম জেলায় অসংখ্য সাঁওতালের বসতি। তাদের বহু বিবাহ প্রকট। এই গল্পটিতে বুধন সাঁওতাল কত সহজে বহু বিবাহ করেছে এবং নিরপরাধা স্ত্রীকে অনায়াসে ভুলেছে— তাদের প্রেম, ভালবাসার এতটুকু মর্যাদা দেয় নি।

এক পশলা বৃষ্টি ঃ- গল্পের নায়িকা জয়া বাউরী— সুন্দরী, চঞ্চলা, বহুভর্তৃক, চরিত্রহীনা স্রষ্টা চরিত্রের রমনী হয়েও প্রেম, প্রীতি ও কর্তব্যের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং উনমানবী হয়েও দৈবীসত্তায় উন্নীত হয়েছে। ভরা যৌবনে চন্দ্র চৌধুরীর বাহু বন্ধনে সে ধরা দেয়। ধনী কন্ট্রাক্টর চন্দ্র তাকে বিয়ে করতে চাইলেও জয়া সে প্রলোভন জয় করেছে এবং কথা দিয়েছে যে চন্দ্রকে বিয়ে না করলেও সে চন্দ্রেরই সঙ্গিনী হিসেবে থাকবে। জয়া জোর করে চন্দ্রের বিয়ে দেয়। পরে ব্যবসায় লোকসান ও চন্দ্র দারিদ্রের যন্ত্রনায় রোগে জীর্ণ হয়ে স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে মারা যায়। জয়া তখন নিজের সমস্ত অর্থ ও গয়না খরচ করে সংসারটাকে বাঁচায়, অনাহারে, অর্ধাহারে থাকে, তথাপি ধনী ব্যবসায়ী সেজো দে বাবুর আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এইভাবে অজস্র প্রলোভনকে জয় করে সে প্রেমিকের কথার মর্যাদা রেখেছে।

বিধবা বিবাহ

তারাশঙ্করের গল্পের মধ্যে বিধবা বিবাহের চিত্র প্রায় নেই বললেই চলে। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা নিয়ে কোন গল্পই নেই। এর কারণ বিংশ শতকে সামন্তপ্রথার অবক্ষয়, ব্রাহ্মণদের অতীত দাপটের অবসান, গ্রামীণ অর্থনীতির সর্বনাশা অধঃপতন, উচ্চবিত্তদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহ প্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ, নারীশিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি। কিন্তু সমাজের নিম্নে সেইসব অন্ত্যজ সংস্কার হীন, বন্ধনহীন আদিম সমাজে তখনও বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। এইসব শ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই কর্মঠ ও আদিম ক্ষুধায় জরাজীর্ণ। বিধবা মেয়েরা মাঠে বা

কারখানায় কাজ করে। সুতরাং জীবিকার প্রয়োজনে পুনর্বিবাহের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি অল্প বয়সের বিধবা সমাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করত এবং শ্বশুরবাড়িতে যথাযথ সম্মান পেত না। অনেক সময় নেশা করার সময়েও অন্য পুরুষে আসক্ত হত ও সাঙা (বিবাহ) করত। আদিবাসী সম্প্রদায়ে মেয়েরাও পুরুষের সাথে সমানতালে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত, আবার বাড়ীতেও খেত। নেশার ঘোরে মেঠোয়ালী সুর তুলে পরপুরুষের ঘরে চলে যেত। বস্তুতঃ বর্তমানে বিধবা বিবাহ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কমে এসেছে। যদি অল্প বয়সে বিধবা হয় তাহলে পুনর্বিবাহের প্রশ্ন জোরদার হয়। বিধবা সম্বন্ধীয় প্রায় তিনটি গল্পের সন্ধান মেলে তারাশঙ্করের—

স্থলপদ্ম ঃ- নায়িকা বেলে বিধবা; দেখতে সুশ্রী; কলেরায় তার বাবা, ভাইয়ের মৃত্যু হয়। সংসারে সে একা। রাজমিস্ত্রী গণির সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি বেলে সন্তান কামনায় পাগলিনী হয়ে যায়। মাতৃত্বের জন্যে সে হারা বাউরীকে সাঙা করে। হারা সংসার চালানোর কথা ভাবে, অথচ বেলে ভাবে ভাবী সন্তানের কথা— এই নিয়ে দুজনের বিচ্ছেদ। হারা যখন নিরুদ্দিষ্ট হয় তখন বেলে গর্ভবতী। কিন্তু সন্তান লাভ করতে সে পারে নি। অসতর্ক মুহূর্তে পড়ে গিয়ে বেলের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়, এমনকি নিজের জীবন পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

মালাচন্দন ঃ- বৈষ্ণব প্রধান গল্প। গার্হস্থ্য জীবনের আচার আচরণ পালন করে আবার 'রাধেকৃষ্ণ' বলে ভিক্ষা করে। বৈষ্ণবও বৈষ্ণবী দুজনেই থাকে। তুলসীর দশবছর বয়সে বিবাহ হয় এবং চৌদ্দ বছর বয়সে সে বিধবা হয়। জয়দেবের মেলায় যাবার পথে মোহন দাস মহন্তের সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং কিছুদিন পর মোহনদাসকে মালাচন্দন (বিবাহ) করে সুখ ও শান্তির জন্যে, কিন্তু চরিত্রহীন ও বহুপত্নীক মোহন দাসের সংসারে গিয়ে সে শান্তি পায় নি। দুঃখে ও ঘৃণায় তুলসী আবার স্বামীর ঘর ছেড়েছে।

প্রত্যাবর্তন ঃ- জেলেদের মধ্যে যে বিধবা-বিবাহ হয় তার প্রমাণ এই গল্পটি। নায়ক পশুপতি বিমাতার ও পিতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে বাল্য বয়সে ঘর ছাড়ে; দীর্ঘদিন পরে জাহাজে খালাসী গিরি করে কিছু টাকা কড়ি ও সাহেবী পোষাক পরে গ্রামে ফিরে আসে। সেই উপলক্ষে পাড়ায় সন্ধ্যায় এক মদের আড্ডা হয়। সেখানে পশুপতি সাহেবী কায়দায় নাচতে থাকে। সেই সময় রমার সাথে পরিচয় হয় এবং রমার রূপে পাগল হয়ে বিয়ে করতে চায় পশুপতি, কিন্তু বাবা ও মা মত দেয় না, কারণ রমার পরপর তিনবার বিবাহ হয়েছে। সব স্বামীই তার মারা যায়। তাই পাড়ার সকলের চোখে রমা 'বেউলো রাঁড়ী'। রমার প্রথম বিবাহ তিনবছরে, বিধবা পাঁচ বছরে, দ্বিতীয়বার সাঙা হয় এক বৎসর পর অর্থাৎ ছয় বছরে কিন্তু ছ মাসের মধ্যেই বিধবা হয়, তৃতীয় বার বিবাহ হয়েছিল তের-চোদ্দ বছরে, মাসখানেকের মধ্যে সেই স্বামীও জলে কুমীরের পেটে প্রাণহারায়। তারপর পশুপতির সাথে বিয়ের ঠিক হলেও অবশ্য সে বিয়ে হয় নি।

পাদটীকা

১।	পরিমলভূষণ কর	:	সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২৮৫
২।	R. M. Maclver and C. H. Page	:	Society	P-238
৩।	রবীন্দ্র রচনাবলী	:	জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খন্ড	পৃ. ৫
৪।	William J. Goode	:	The Family	P-13
৫।	Burgess and Socke : The Family : From Institution to Companionship			P-8
৬।	T. B. Bottomore	:	Sociology	P-175
৭।	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ৪২১
৮।	Quoted by Davis	:	Human Society	P-401
৯।	অতুলচন্দ্র গুপ্ত	:	সমাজ ও বিবাহ	পৃ. ৪৭
১০।	Anderson and Parker	:	Society : its organisation and operation	P-150
১১।	স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা	:	জন্মশতবার্ষিক সং- ষষ্ঠ খন্ড	পৃ. ২৩৮
১২।	মনু সংহিতা ৯/২৭			
১৩।	খগেন্দ্রনাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (২য় খন্ড)	পৃ. ১০০
১৪।	মনুসংহিতা	:	৩, ২৪, ২৫১	

১৫।	A. L. Basham	:	The wonder That was India (Cal-1967)	P-148
১৬।	খগেন্দ্র নাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (২য় খন্ড)	পৃ. ১০৯
১৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১১০
১৮।	রামনারায়ণ তর্করত্ন	:	কুলীনকুল সর্বস্ব ভূমিকা	পৃ. ৫
১৯।	অজিতকুমার ঘোষ	:	বাংলা নাটকের ইতিহাস	পৃ. ৬৭
২০।	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত	পৃ. ৪৪৬
২১।	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন	পৃ. ২৩৮
২২।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ২৪৭
২৩।	অনুসন্ধান, ২৯শে মাঘ, ১২৯৫			
২৪।	জয়ন্ত সরকার	:	পণের আর এক নাম অপমান	পৃ. ১৩
২৫।	বিদ্যাসাগর রচনাবলী	:	পাত্রজ সংস্করণ	পৃ. ৩৪৬
২৬।	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন	পৃ. ৬৫
২৭।	বিনয় ঘোষ	:	বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ (১ম)	পৃ. ১০০
২৮।	ডঃ অজয়েন্দ্রনাথ সরকার	:	ঊনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্ক রচনা	পৃ. ৫২
২৯।	বিনয় ঘোষ	:	বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১ম প্র:)	পৃ. ২৪২
৩০।	সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত	:	শম্ভুচন্দ্রের "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত", নতুন সং	পৃ. ১০৭
৩১।	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	রচনাবলী, ১০ম খন্ড	পৃ. ৩৫৯
৩২।	জগদীশ ভট্টাচার্য	:	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) ভূমিকা	পৃ. ৫১

* * * * * * * * * * * *

নবম অধ্যায়

হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক

নবম অধ্যায়

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

প্রাচীনকালে বাংলাদেশে কোন মুসলমান ছিল না। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমানের আগমন ঘটে। ধীরে ধীরে তারা বাংলার দন্ডমুন্ডের মালিক হয়। দুইজাতি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি বাস করলেও কখনও দুইভাই, আবার কখনও দুই শত্রু হিসেবে থেকেছে; আবার বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে, ঠিক তেমনি মুসলমানও হিন্দু হয়েছে। এই পারস্পরিক মিলন, বিচ্ছেদ এবং একে অন্যের ধর্মগ্রহণ— এই বৈচিত্র্য নিয়েই বাংলাদেশ।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ বলতে "পুন্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, দন্ডভুক্তি, বঙ্গ, গঙ্গারিডি, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি" [১] কে বোঝাত। এই বাংলাদেশের অধিবাসী বহুপ্রাচীন। কারণ এই বাংলায় নানা স্থানে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের, নব্য প্রস্তর যুগের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও জীবাশ্মের সন্ধানে পাওয়া গেছে। তাম্র-প্রস্তর যুগেও বাংলাদেশে জাতির অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ে "যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে মেদিনীপুর জেলার তামজুরি গ্রামে বীরভূম জেলার কীর্ণাহারে, বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে এবং সর্বোপরি ভেদিয়ার কাছে, পান্ডুরাজের ঢিবি'তে"। [২] লোহা'র যুগেরও বাংলাদেশে অজয় নদীর তীরে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, "সিন্ধু সভ্যতার সমকালে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এখানে সমমানের সভ্যতার অধিকারী ছিল।" [৩] নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালীরা প্রাচীন অস্ত্রাল জাতির বংশধর। তাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা। যা চেনার কোন উপায় বর্তমানে নেই। এরা "বিশেষ বিশেষ গাছ, পাথর, ফল, জীবজন্তু ও জায়গার ওপর দেবত্ব আরোপ করে তার পূজো করত। কোম বা গোষ্ঠীভেদে এই দেবতা ভিন্ন হতে পারত। লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল"। [৪] ধীরে ধীরে বাংলাদেশে জৈন, আজীবিক, বৌদ্ধধর্ম প্রাক গুপ্তযুগে বিস্তার লাভ করে। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তা উত্তরভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। "উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা বাংলাদেশের মানুষকে আর্যেতর বলে মনে করত। সংস্কৃত সাহিত্যে এর অনেক প্রমাণ আছে। কথিত আছে রাজা আদিশুর-এর শাসনকালেই এদেশে প্রথম ব্রাহ্মণের পদার্পণ। যদিও অনেকের মতে তার আগেও বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব ছিল।" [৫] শুর, সেন, বর্মন প্রভৃতি অবাঙালী রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বাড়ে। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিজ স্বার্থ অনুযায়ী সামাজিক নিয়ম, রীতি, ধর্মীয় অনুশাসন সমাজে প্রয়োগ ও প্রচার করে থাকে। সামাজিক সম্মান, সুখ-সুবিধে বেশী পাওয়ায় বিদ্যা ও বুদ্ধিতে তারাই সমাজে অগ্রগণ্য হয়ে পড়ে। গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময়ে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি কম ছিল না। এরা তখন বৌদ্ধদের সহ্য করতে পারত না। ফলে "হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মধ্যে কলহ বরাবরই চলে আসছিল।" [৬] প্রায়শই বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণ ও রাজকর্মচারীদের হাতে নির্যাতিত হতো। বল্লাল সেনের সমসাময়িক 'কান্দী রাজবাটী'র কারিকায় এর প্রমাণ মেলে "বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। বৌদ্ধাচারীগণ প্রতিনির্যাতন কৈল।" [৭] তাছাড়া উচ্চ হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন করত, এমনকি রাজারাও তাতে ইন্ধন জোগাতেন। তাই হয়তো পাল যুগে সমাজের নিম্নবর্ণের বিদ্রোহ (কৈবর্ত) হয়েছিল— যদিও তার পেছনে অন্যান্য কারণও ছিল।

এখন আসা যাক, হিন্দু-সৃষ্টির কারণ নিয়ে। 'সিন্ধু' শব্দের পরিবর্তিত রূপ হল 'হিন্দু'। "গ্রীক আক্রমণ থেকে শুরু করে একের পর এক কুষাণ, শক, হুন, গুর্জর হয়ে আরব পর্যন্ত কত জাতিই না ভারতে এসেছে কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে, কেউ বা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। শেষ পর্যন্ত তারা ভারতবর্ষ নামে এক বিশাল দেহে লীন হয়ে যায়। সুদীর্ঘ সমন্বয়ের ফলে সংস্কৃত ভাষা আশ্রিত ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মশাস্ত্র বহিরাগত সংস্কৃতির সাহচর্যে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সে বদলে যায়নি, বরং অর্জন করেছে এক স্বকীয় সত্তা। বিবর্তন ও আত্তীকরণের ফলে ভারতবাসীর মনে এক বিশেষ ধরনের চেতনার উন্মেষ হয় যাকে বলা হয়েছে আর্যাবর্ত চেতনা।" [৮] "কিন্তু তুর্কি আক্রমণ ও সেই সঙ্গে ইসলামের আগমন এই চেতনার ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। এই প্রথম ভারতীয় ধর্ম তথা সংস্কৃতি অপর এক উন্নত ও পরিপূর্ণ ধর্ম তথা সংস্কৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। রাজশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় ইসলামের মধ্যে সর্বেশ্বরতার ভাব ফুটে ওঠে। ফলে এক্ষেত্রে আত্তীকরণ ঘটল না। ভারতবাসী নিজেকে যেন গুটিয়ে ফেলল।" [৯] এইভাবে ধীরে ধীরে "হিন্দু বলতে যে ভৌগোলিক অভিব্যক্তির অধিবাসীদের বোঝানো হতো সেই অধিবাসীদেরই সমাজ-সংস্কৃতি, সর্বোপরি ধর্মকে বিশেষিত করা হলো একই হিন্দু শব্দ দিয়ে। একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা রূপান্তরিত হলো একটি সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায়। ইসলামের আগমনের পর সুপ্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির ওপর আরোপিত হলো। জন্ম নিল হিন্দুধর্ম।" [১০] এরপর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজী নদীয়া জয় করেন ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর থেকে বাংলায় যে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা হল তা ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভের আগে পর্যন্ত বজায় ছিল। "১২০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬২ বছর সময় কালের জন্য ৭৬ জন মুসলমান, সুবাদার, রাজা, ও নাযিম ক্রমাগত বংগদেশ শাসন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ১১জন সুবাদার ঘোরি ও খিলজী সম্রাটদের হাতে নিযুক্ত হয়েছিলেন, ২৬ জন ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা, এঁদের মধ্যে শের শাহের রাজত্বকালের সমসাময়িক শাসকগণও ছিলেন এবং অবশিষ্ট ৩৪জন ছিলেন মোগল সম্রাটদের অধীনস্থ নাযিম।" [১১] সুলতানগণ তাঁদের ইচ্ছামত রাজ্যশাসন

করতেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা অত্যাচারিত নিম্নবর্ণরা ও বৌদ্ধগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এমন কি তারা শাসকদের গুপ্তচরের কাজ করতো। " **তারনাথের বিবরণী থেকে জানা যায় যে বৌদ্ধভিক্ষুরা বখতিয়ার খলজীর গুপ্তচরের কাজ করছিলেন।"** (১২)

একদিকে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি, অন্যদিকে ক্ষমতাজনিত অত্যাচারে ক্লিষ্ট নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধসম্প্রদায় রাতারাতি মুসলমান হয়ে যায়। ইসলাম ধর্মের শরিয়তে ধর্মীয় উদারতা এবং মুসলিম শাসকের আমলে ইসলাম হলে অর্থনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক শান্তি লাভ করত। ডঃ মুসা কালিম, তাঁর "মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক" গ্রন্থে বলেছেন, **"বাঙালী মুসলমানের অধিকাংশ খাস আরব, ইরাক বা তুরস্কের বংশধর নন। নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের মতে বেশীরভাগ মুসলমান নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধ হতে ধর্মান্তরিত। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আদমশুমারী রিপোর্টে Mr. H. Beverley বলেন—বাংলার অধিকাংশ মুসলমান বাংলার হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। রিজলি সাহেব তাঁর Tribes and Casts of Bengal** গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে বাংলার মুসলমান, বিশেষ **করে মুসলমান চাষী বাংলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর বংশধর। .... সে যুগে একের উৎসবে ও জীবন যাত্রায় অপরের অংশগ্রহণ করতে কোনো বাধার সৃষ্টি হতো না। হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে ততটা হয়নি যতটা হয়েছিল নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিতদের মধ্যে।"** (১৩) তাছাড়া হিন্দুদের মুসলমান হওয়ার আর একটি কারণ হোল বিভিন্ন বৃত্তির সুযোগ। অর্থাৎ সে সময় যোগ্যতানুযায়ী নিম্ন হিন্দুরা শাসকের বিভিন্ন পদে যোগদান করার সুযোগ পেত। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর "বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেছেন, **"হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিলে যোগ্যতানুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখতিয়ার খলজির একজন মেচ জাতীয় অনুচর গৌড়ের সম্রাট ইইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছুই নাই।"** (১৪) যুগনায়ক বিবেকানন্দও তাই বলেছেন, " **ভারতবর্ষের দরিদ্রের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মুসলমান কেন? তরবারি বলে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে একথা বলা বুদ্ধিহীনতা। জমিদার ও পুরোহিতদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।"** (১৫) শুধু নিম্নবর্ণ হিন্দুই নয়, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও উচ্চ রাজপদ বা সম্রাটের সানুগ্রহ লাভের আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে রাজনৈতিক বৈষম্য ও জিজিয়া কর প্রদান থেকে নিষ্কৃতি পেত হিন্দুরা। জগদীশনারায়ণ সরকার বৃন্দাবন দাসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ) গ্রন্থে—

"হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ;

আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।

হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম,

আপনি যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম।" (১৬)

হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্ক মধুর হয়েছিল চৈতন্য যুগে। বিশেষ করে বাংলার নবাব হুসেন শাহের আমলে। এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান আচারে-ব্যবহারে এমন কি জীবনযাত্রার প্রশ্নেও একত্র হয়েছিল। যেমন খাঁ উপাধি ছিল আফগানি পাঠানদের। সেই খাঁ উপাধি অনেক হিন্দুদের উপাধিতে পরিণত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায় এই যুগে যে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। **"নবাব হুসেন শাহের একাদশ কন্যার সঙ্গে তাঁর অমাত্য মদন ভাদুড়ির অনুরূপ সংখ্যক পুত্রের বিবাহ হয়।"** (১৭) এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছে। যেমন নানক, কবীর, তুকারাম, প্রমুখ— যাঁদের শিষ্যগণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ছিল।

বৃত্তির ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের মিল পাওয়া যায়। যেমন হিন্দুদের মধ্যে যারা মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত তাদের পদবী হয় জেলে আবার মুসলমান হয়ে যারা মাছ শিকার করত তাদের পদবী হয় জোলা। এই জোলা পরিবারেই কবীরের জন্ম হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বাস করেছে রাম ও রহিম সৌহার্দ্য বজায় রেখে, পরস্পরের কাছে এসেছে, আচারে-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় মিল হলেও মাঝে মাঝেই আবার তারা ভ্রাতৃহত্যায় মেতে উঠেছে, সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এর কারণ মূলতঃ মধ্যযুগে পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র এরাই সমাজ জীবনকে সংক্রমিত করে। এ ছাড়া অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর "সাম্প্রদায়িকতাঃ উৎস ও প্রসার" নামক গ্রন্থে বলেছেন, " (১) **বিজেতা ও বিজিতের মানসিকতার ব্যবধান।** (২) নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে দীক্ষিত মুসলমানদের সম্পর্কে উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানদের বিদ্বেষ। (৩) শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের পার্থক্য। (৪) রাজশক্তির মদতে শাসক সম্প্রদায়ের মনোভাব বদল ও নিম্নবর্ণের মানুষদের প্রতি অত্যাচার। (৫) মৌলবাদী শক্তির আবির্ভাব, শরিয়তি বিধানের প্রত্যাবর্তন। (৬) পুরোহিততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্রের প্রভাবে

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি।" [১৮] এর ফলে পারস্পরিক সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, সংঘটিত হয় সংঘর্ষ বা দাঙ্গা।

শাসকশ্রেণীও হিন্দুদের ধর্মেকর্মে আঘাত হানে, মন্দির ধ্বংস করে, তরবারির সাহায্যে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে। "মুঘল সৈনিকেরাও অনেক সময় নববিজিত এলাকায় হিন্দুদের ধর্মকর্মের ওপর আঘাত হেনেছে। তাদের আরাধ্য দেবমূর্তি এবং দেবমন্দিরকে ধ্বংস করেছে। ত্রিপুরা-বিজয়ী মুঘল সৈনিকেরা তথাকার হিন্দুদের ওপর কিরূপ নির্যাতন করেছিল ত্রিপুরার জাতীয় ইতিহাস 'রাজমালা'য় তার উল্লেখ আছে—

চতুর্দশ দেবপূজা নিষেধে যবন।

কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ।" [১৯]

আবার ধর্মান্তরীকরণ প্রসঙ্গে ডঃ অমলেন্দু দে তাঁর "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ গ্রন্থে ডাঃ জেমস ওয়াইজ"-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন—" ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জেমস ওয়াইজ লেখেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উৎসাহী সৈনিকেরা ভীরু বাঙালী জাতির মধ্যে ইসলামের বার্তা প্রচার করে এবং তরবারির সাহায্যে বল প্রয়োগ করে তাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে।" [২০] নবাব-বাদশাগণ ও তাঁদের সংশ্লিষ্ট সমগোত্রের কর্মচারীগণ হিন্দু রমনীদের বলপূর্বক হরণ বা সাদী করতে শুরু করেন— "মুসলমান রাজা এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সিন্ধুকী (গুপ্তচর) লাগাইয়া ক্রমাগত সুন্দরী হিন্দু ললনাগণকে অপহরণ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ময়মনসিংহের জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানগণ এবং শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গের দেওয়ানেরা এইরূপ যে কত হিন্দু রমণীকে বিবাহ করিয়াছেন তাহার অবধি নাই।"[২১] এইসব কারণে হিন্দুরা ক্রমশঃ মুসলমানদের থেকে অনেক দূরে সরে যায়— শত্রু ভাবতে শুরু করে।

অন্যদিকে হিন্দুরা মুসলমানদের যবন, ম্লেচ্ছ বলতে শুরু করে, আবার মুসলমানরাও হিন্দুদের কাফের, মালাউন ইত্যাদি বলতে থাকে— যার ফলশ্রুতি সংঘাত। এইভাবে সংঘাতের ক্ষীণ ধারার জন্ম হয়। সেই ক্ষীণ ধারাকে খরস্রোতায় পরিণত করে বৃটিশ শাসকবৃন্দ। তারা এদেশে এসেই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদ নীতি গ্রহণ করে; কখনও হিন্দু আবার কখনও মুসলমানদের তোষণ নীতি আরোপ করতে থাকে। ফলে প্রত্যক্ষ জঘন্য সংঘর্ষ ঘটেছে এই বৃটিশ আমলেই। তাই বৃটিশ শাসন এত দীর্ঘায়িত হতে পেরেছে।

হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ নবাবী আমলেই সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সামাজিক স্তরে, কিন্তু বৃটিশ সরকার কূট-কৌশলে তাকে রাজনৈতিক স্তরে নিয়ে আসে। প্রথমে সরকার সংখ্যাগুরু হিন্দুদের তোষণ নীতি শুরু করে এবং মুসলমানদের দুয়োরানীর চোখে দেখতে থাকে। "কর্ণেল টমাস মনরো বলেছেন,— " যতদিন হিন্দু জনসাধারণ বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত থাকবে, ততদিন মুসলমানরা অসন্তুষ্ট থেকেও কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।" [২২] ফলে ব্যবসা, বাণিজ্যে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে, জমিদারী, সম্মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের একাধিপত্য বেড়ে যায়। "১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশীয় সরকারী চাকুরেদের ৮৮.১ শতাংশ ছিলেন হিন্দু।" [২৩] ধীরে ধীরে মুসলমানগণ জমিদারী থেকে বঞ্চিত হয়, নবাবের ক্ষমতা খর্ব হওয়ায় রাজকর্মচারী থেকে মুসলমানগণ বিতাড়িত হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে মুসলমান নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। " আমরা মুসলমান ভদ্র শ্রেণীর জন্য সেনাবিভাগ বন্ধ করে দিয়েছি, কারণ আমরা বুঝেছি যে, আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের ছেঁটে ফেলা দরকার।" [২৪] এইভাবে সীমাহীন শোষণে ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। "শাসন ক্ষমতা হারিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে দূরে থেকে, জমিদারী চ্যুত হয়ে, লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়ে, আধুনিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ে, সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে কোম্পানীর শাসন আমলে বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণী অবলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়ায়। তারা মনে করে ইসলামের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতির ফলেই তাদের এই দুরবস্থা। তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য মুসলমানদের মধ্যে ফরাজী, ওয়াহাবী প্রভৃতি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।" [২৫] মূলতঃ ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসেবে, শুরু হলেও পরে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে মোড় নেয়। নীলকর ও দেশীয় জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার থেকে বাঁচতে এই আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যায়। জমিদার ও নীলকর কেবল দরিদ্র মুসলমানদের শোষণ করতেন না, তাঁরা দরিদ্র হিন্দু কৃষকদেরও শোষণ করতেন। তার ফলে আত্মরক্ষার তাগিদে বহু দরিদ্র হিন্দু এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এরপরেই ঘটে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বা মহাবিদ্রোহরূপী সিপাহী বিদ্রোহ। এই সমস্ত আন্দোলনে হিন্দু সংখ্যাধিক্যে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ভীত হয় এবং মুসলমান তোষণ নীতি শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, যেমন করেই হোক হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদেরা ঐক্য বন্ধ করা। তাই আলিগড় আন্দোলনে সৈয়দ আহমেদ খানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিয়েছিল বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী।

তারাশঙ্করের সমকালীন যুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

বঙ্গভঙ্গের সময়ে তারাশঙ্কর ছিলেন কিশোর, লাভপুর ছিল জাতীয়তাবাদের এক সুদৃঢ় নিগম এবং খুব সহজেই ও আগ্রহের সঙ্গে লেখক এই চেতনার সঙ্গে পরিচিত ও মিশবার সুযোগ পান। এমনিতেই তারাশঙ্কর জমিদার-তনয় হলেও তাঁর চিত্ত ছিল সমাজ সেবায় নিবেদিত। ফলে দেশসেবার সুযোগে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মূলস্রোতের সংস্পর্শে আসেন। তাছাড়া তারাশঙ্করের মা পাটনার মেয়ে হলেও তাঁর দেশপ্রেম ছিল প্রকট। বঙ্গভঙ্গের সময়ে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে দুঃখ পেয়েছিল তাও লেখক তাঁর বাবার ডাইরী থেকে উল্লেখ করেছেন, " রাখী বন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর (বাবার) ডায়রীতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রী। বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু-মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন।" (২৬) অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গে রাঢ়-বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মর্মাহত হয়েছিল। লেখকের বাল্য বয়সে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বা অস্পৃশ্যতা নিয়ে বিবাদ খুব একটা ছিল না। তিনি " আমার কালের কথা" তে বলেছেন, " হিন্দু-মুসলমানেদের মধ্যে স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা নিয়েও কোন বিরোধ সেদিন অনুভব করিনি। শুদ্ধাচারী হিন্দু মুসললমানকে স্পর্শ করে কাপড় ছাড়তেন। এ মুসলমানেরা জানতেন। তাঁরাও কোনদিন হিন্দুর বাড়ীতে অন্নজাতীয় আহার্য গ্রহণ করতেন না। মধ্যে মধ্যে সামাজিক নিমন্ত্রণে সিধা এবং ফল মিষ্টান্নের আদান প্রদান চলত।" ".....সমাজগত ভাবে বিরোধ উপস্থিত হলে এর (দাঙ্গা) প্রকাশ্য প্রকাশ সেকালে কদাচিৎ হত। তবু ছিল"। (২৭) গান্ধীজীর অহিংসাবাদ, অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানদের সমভাবে যোগদান করতে তিনি দেখেছেন। ১৯২৫/২৬-এ বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের দফায় দফায় দাঙ্গা শুরু হয়। এর কারণ মূলতঃ ধর্মীয়। "১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুলাই কলকাতায় দাঙ্গা, উপলক্ষে হিন্দু কর্তৃক গোহত্যায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ।..... কলকাতায় ১৯২৬ খ্রীঃ ২রা থেকে ১৫ই এপ্রিল, ২২শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে এবং ১১ই থেকে ২৫ শে জুলাই— এই তিন দফায় ব্যাপক দাঙ্গা ঘটে।" (২৮) আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে তারাশঙ্কর জেলে যান। এবং জেলে বসেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপর মনোভাব দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সেই সঙ্গে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ইত্যাদি দেখে তিনি চিন্তা করেছেন, " তখন জেলখানায় রাজনীতি সর্বস্ব মানুষের চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছি। .....সব থেকে পীড়িত হলাম আত্ম কলহের কুটিল কদর্যতা দেখে। পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য সে কি ষড়যন্ত্র। মোক্ষম অস্ত্র প্রতিপক্ষকে স্পাই প্রতিপন্ন করা। একের দল ভাঙ্গিয়ে বিশ্বস্ত অনুসারকদের নিজের দলভুক্ত করে নিজের দলকে পুষ্ট করে তোলাটাই তখন মুখ্য কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"(২৯) এই সময় মুসলমানদের অনেকগুলি পার্টি গঠিত হয়। যেমন— নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি (১৯২৯)-এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আক্রাম খাঁ, ফজলুল হক প্রমুখ। এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, আবদুর রহমান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ১৯৩২ খ্রীঃ কলকাতায় "নিউ মজলিস পার্টি" এবং খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দি কলকাতায় ১৯৩৬ খ্রীঃ স্থাপন করেন "ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি।" ১৯৩৫ খ্রীঃ পর থেকে মুসলিম লীগের প্রচারের মূল বক্তব্য হয় মুসলমানদের স্বার্থ এবং তার জন্যে ঐক্য। মহম্মদ আলি জিন্না এই সময়ে ফজলুল হককে প্ররোচিত করে মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্রের দাবী জানান। শুরু হয় হিন্দু-মুসলমানদের দূরত্বের ফারাক। জিন্নার চিন্তা বা কৌশল স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আজও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। তারাশঙ্কর তাই বলেছেন, "ইংরেজ চলে গিয়েছে, আজ সে কদর্যতা নখরদন্ত প্রকাশ করে যুধ্যমান।" (৩০) পরে তিনি রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্রব ত্যাগ করে সাহিত্য সাধনা ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সেখানেও নানা বাধা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়ে এই মানুষটাই আবার সংকল্প করেছিলেন, " বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্য দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।" (৩১) এই উক্তির মূল কারণ হল তারাশঙ্কর ছিলেন গান্ধীবাদী ও প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী।

১৯৪৬ সালে কলকাতা সহ অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় যার পশ্চাতে ছিল মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ উস্কানি। এ প্রসঙ্গে ডঃ নজরুল ইসলাম বলেছেন, " কে দাঙ্গা সত্যিকার বাঁধিয়েছে সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় যে, মুসলিম লীগই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। মুসলিম লীগই ময়দানে সভা ডেকেছিল। মুসলিম লীগই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল কাজেই দাঙ্গা যাতে না ঘটে তা দেখার দায়িত্ব মুসলিম লীগ সরকারের ওপরেই পড়ে। আর সে দায়িত্ব সরকারের প্রধানমন্ত্রী এড়াতে পারেন না। তাছাড়া মুসলিম লীগ নেতাদের উত্তেজনামূলক প্রচার যে দাঙ্গা বাধাতেও সাহায্য করেছিল তাতে কোনরকম সন্দেহ নেই।" (৩২) এই দাঙ্গার কদর্যরূপ তারাশঙ্কর স্বচক্ষে দেখেছেন আবার গ্রামবাংলায় রাম ও রহিম কত স্বচ্ছ, কত নির্মল তাও তিনি দেখেছেন। রাজনীতির কূটচালে দাঙ্গা ঘটেছে, মুষ্টিমেয়ের স্বার্থে অসংখ্য নিরীহ, নিরপরাধ, রাম ও রহিমের মৃত্যু ঘটেছে,—তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর সাধনা ছিল রাজনীতি, স্বার্থ, জাতপাতের উর্দ্ধ "মহিমময় মানুষের, মানুষের মহিমাকে" (৩৩) তিনিই সবক্ষেত্রেই সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়েছেন। ভারত স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তিনটা টুকরো হয়ে। বাংলাদেশও ভাগ হয়েছে— এসবের মূলে ছিল সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধিতে মোহান্ধ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চবিত্ত হিন্দু-মুসলমান। কিন্তু নীচু তলার হিন্দু মুসলমান দায়ী নয়। "সমাজের কোনো কোনো স্তরে বিশেষত রাজনৈতিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যতো দ্বন্দ্বই থাক, সমাজের নীচু মহলে পারস্পরিক সহাবস্থানই লক্ষ্য করা যায়।" (৩৪)

বীরভূম জেলায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে, বর্তমানেও আছে। লেখকের আমলে এমন বহু গ্রাম ছিল যেখানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ঠ্যাঙাড়ে হিসেবে খ্যাত ছিল। মুসলমান-ঠ্যাঙাড়েদের গ্রাম ছিল বামুনিগ্রাম, বজরাহাট ও হিন্দু-ঠ্যাঙাড়েদের গ্রাম ছিল আখড়াইয়ের দীঘি, সুঁদীপুর প্রভৃতি। "তারাশঙ্কর নিজেও একবার বাইসাইকেলে সাঁইথিয়া যাবার পথে ঠ্যাঙাড়েদের পাল্লায় পড়েছিলেন, ভাগ্যজোরে বেঁচে যান।" (৩৫)

লাভপুর সংলগ্ন গ্রামের মুসলমানদের বেশীরভাগ আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল ছিল না, পেশায় তারা কৃষক শ্রেণীভুক্ত। তারাশঙ্কর স্থানীয় মুসলমানদের বংশানুক্রমিক পরিচয় যা দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় যে অনেকেই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত। "আমাদের গ্রামের পাশে ঠাকুর পাড়া। তারপর পশ্চিম পাড়া। তার ওদিকে ব্যাপারী পাড়া। ব্যাপারী পাড়ার পাশে ছোট গোগা, শেখপাড়া, একখানা গ্রাম পার হয়ে পুরনো মহুগ্রাম, কামারঘাট, ফলগ্রাম। এগুলি সব মুসলমানদের বসতি। এককালে ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরেরা ছিলেন এ অঞ্চলের অধিপতি। ঠাকুরেরা মুসলমান। এঁরা ছিলেন নাকি যোগী বংশের সন্তান, তাই লোকে বলত ঠাকুর। শুধু এ অঞ্চলে ভূমির অধিপতিই ছিলেন না; মুসলমানদের ধর্মগুরুও ছিলেন। .....অনেক সন্ধান করেছি, সন্ধান করে আমার মনে হয়েছে, কোন কালে এঁরা ছিলেন হিন্দু এবং ধর্মগুরু ব্রাহ্মণই ছিলেন। কোন মতে স্বধর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং হয়েছিলেন তাঁর স্বজাতীয় কোন ব্রাহ্মণ প্রতিপক্ষেরই চক্রান্তে। তার ফলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিষ্য যজমান ভক্ত সকলেই ইসলাম অবলম্বন করেছিলেন।" (৩৬) লেখকের আমলেও হরিজন কৃষক সম্প্রদায় নানা কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে। বীরভূমে এমন সম্প্রদায় আছে যারা আচারে হিন্দু, কিন্তু ধর্মে মুসলমান। এদের নিয়ে তারাশঙ্কর অনেকগুলি গল্প লিখেছেন যেমন বেদেনী, রাঙাদিদি, কামধেনু প্রভৃতি। বর্তমানে এই সম্প্রদায় প্রায়-অবলুপ্তির পথে।

বিংশ শতকে জমিদার ও মহাজনদের কূটকৌশলে এবং নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রদায়িকতা মূলতঃ ইংরেজদের আগমনের সময় থেকেই শুরু হয়। জমিদারগণ কর বৃদ্ধি করলে যদি প্রজারা প্রতিবাদ করতো তখন জমিদারগণ প্রজাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দিতেন। এই ঘটনা তারাশঙ্কর "ধাত্রীদেবতা" উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, "জামালপুরের কৃষকরা যখন ঐক্যবদ্ধভাবে জমিদার-মহাজনের কর-বৃদ্ধি ও পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়, তখন ঐ সকল জমিদার মহাজনেরা এই বিদ্রোহকে (১৯০৭ খ্রীঃ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নামে রটনা করে। যুগান্তর দলের স্বেচ্ছাসেবক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তখন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে আসেন এমনকি এ খবর কলিকাতায় পৌঁছাবার পর আরো কিছু বিপ্লবী বোমা, পিস্তল, রিভলভার নিয়ে হিন্দুদের সাহায্য করতে আসে। জামালপুরের কৃষকদের জমিদার-মহাজন বিরোধী অভ্যুত্থান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয় এবং এইভাবেই বিপ্লবীদের সহায়তায় জমিদার-মহাজনদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।" (৩৭) অথচ যেখানে জমিদার-মহাজনদের শোষণ ছিল না, থাকত না কর আদায়ের নামে দস্যুবৃত্তি, সেখানে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পাশাপাশি বাস করত। হিন্দুদের উৎসবে বা মন্দিরে মুসলমানরা আসত আবার মুসলমানদের দরগায় হিন্দুরা যেত। তারাশঙ্কর তাঁর "পঞ্চগ্রাম" উপন্যাসে এক সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন— "হিন্দুদের কয়েক বাড়ীতেও মহরমের পর আসিত লাঠিয়ালের দল, তাহারা সেখানে বৃত্তি পাইত। পীরের দরগায় হিন্দু বাড়ীর মানসিক চিনি-মিষ্টির নৈবেদ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কঠিন শূলরোগের জন্য দেখুড়িয়া কালীবাড়ীতে আজও মুসলমান রোগী আসে।" (৩৮) 'গণদেবতা'য় অম্বুবাচীতে চাষের পূর্বে যে কুস্তির লড়াই হয় তার বর্ণনা আছে, যার আঞ্চলিক নাম "আমুতির লড়াই"— হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই যেটি সমারোহের বস্তু।

তারাশঙ্করের ওটি কয়েক গল্প রয়েছে, যেগুলি হিন্দু-মুসলমান সংশ্লিষ্ট। তার মধ্যে কোনটা দাঙ্গাক্লিষ্ট, আবার কোনটা একান্তই সামাজিক। সামাজিক হিসেবে—রাঙাদিদি, ইমারত, কামধেনু, একটি যাদুকরের মৃত্যু, আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি প্রভৃতি গল্প— যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা "আখেরী" ও দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা কান্না, বিস্ফোরণ, কলকাতার দাঙ্গা ও আমি, জটায়ু প্রভৃতি গল্প উল্লেখ্য।

সাম্প্রদায়িকতা ঃ— 'সম্প্রদায়' বলতে জাতি, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা, জীবিকা বা ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পর নৈকট্য অনুভব করে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায়। "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কিছু নিজস্ব চরিত্র, চিন্তা, ও চেতনা আছে। বিশেষ একটি স্বার্থ তাদের মধ্যে ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি করে। এই স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনেই তারা সংগঠিত হয়।" (৩৯) সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ থেকেই সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। কোনো ব্যক্তির সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বদরুদ্দীন উমর বলেছেন, " কোন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানসিক প্রস্তুতি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় বা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষ এখানে গৌণ, মুখ্য হ'ল সম্প্রদায়"। (৪০) যদিও কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেকে সাম্প্রদায়িক ভাবতেই পারে না। "আমরা যাকে সাম্প্রদায়িক দাবি বলি সেই সম্প্রদায়ের কাছে তা ন্যায়সঙ্গত দাবি। আমাদের দৃষ্টিতে যা সাম্প্রদায়িক চেতনা সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে আমরা

যে আন্দোলনগুলিকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিই, সেই সম্প্রদায়ের কাছে আন্দোলনগুলি আত্মপরিচিতি লাভের, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার, বঞ্চনা ও শোষণ মুক্তির সংগ্রাম।" (৪১) এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের উগ্রজাতীয়তাবাদী লেখকদের রচনা অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। উভয়েই তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, দীর্ঘদিন সহাবস্থানের ফলেও উভয়ের সংস্কৃতির সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। এঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তোষণনীতি গ্রহণ করেছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার। এই কারণেই ভারতে বৃটিশ-শক্তি এতদিন নির্বিঘ্নে রাজত্ব করতে পেরেছিল। চিরাচরিত ভারতীয় সনাতন সমাজ ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করে দেয়। জমির ব্যক্তিগত মালিকানা দান ও গ্রামবাংলায় নতুন জমিদার, মহাজন ও দালালশ্রেণীর সৃষ্টি করে, যার থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়। এদের সঙ্গে শুরু হয় ইংরেজ বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব, জন্ম হয় বুদ্ধিজীবীদের— যারা সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ধরে ফেলেন এবং নিজ স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হন।" "মার্কসীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ সর্বভারতীয় স্তরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে কল্পনা করেন এবং বর্ণ, অঞ্চল ও ধর্মভিত্তিক চিরাচরিত সামাজিক বিভাজনের ওপর শ্রেণীবিভাজনকে স্থান দেন।" (৪২) মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের মতে বস্তুগত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের ফলেই সাম্প্রদায়িকতার উন্মেষ ও প্রসার ঘটে। "মার্কসীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ সেইজন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে ভ্রান্তচেতনা বলে মনে করেন। দাঙ্গাগুলি অসম অর্থনৈতিক উন্নয়নের মান ও আর্থ সামাজিক বৈষম্যের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।" (৪৩) সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষোভই হল দাঙ্গার মূল কারণ।

সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ ও যোগদান করেছিলেন। "বিখ্যাত চট্টগ্রাম-বিপ্লবের নায়ক সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, তারকেশ্বর দস্তিদার, কালী দে প্রমুখ গ্রামাঞ্চলের মুসলমান কৃষকদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। নিদারুণ নিপীড়ন ও উৎকণ্ঠার দিনগুলিতেই মুসলমান জনগণের ম্লান মুখগুলি সূর্য সেন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেন নি। ......কল্পনা দত্ত এক সাক্ষাৎকারে তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন, তাঁরা (মুসলমানগণ) জীবনের অনেক কিছুই হারিয়েছেন কিন্তু যে অক্ষয় সম্পর্ক এখনও তাদের মনের মণি কোঠায় সঞ্চিত আছে তা হল এই সহজ সরল মুসলমান কৃষককুলের অদম্য ও অকৃত্রিম ভালবাসা।" (৪৪)

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাক্কালে যে সব মুসলমান সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে ১৯১৯ খ্রী:'জামিয়াত উলেমা, জন্ম লগ্ন থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে থেকেছে এবং অজস্র সদস্যকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণ করেছে। ১৯২৯ খ্রী: পাঞ্জাবে 'মজলিস-ই আরহার' নামে আর এক সংগঠন ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিল। বেলুচিস্তানের 'সমরু আল্লা বক্স' মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমরণ-সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে ভিন্নজাতি হিসাবে বিবেচনা করার জন্যে মুসলিম লীগের যে দাবি তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কোরানের সত্যকার শিক্ষা অনুযায়ী যে মুসলমানের ঈশ্বর-বিশ্বাসী চরিত্র, সে সকল জাতির মানুষের মধ্যে শান্তি ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস চালাতে পারে। ধর্মের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের যে বিভাজন তা মূলতঃ কৃত্রিম এবং ভ্রান্ত, এমন কি ভয়ানক বিপজ্জনকও।" (৪৫) তাহলে দেখা যায় যে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারে মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা ও মৌলবাদীদের চক্রান্তেই মূলতঃ সাহায্য করেছিল এবং আজও তা ঘটে চলেছে তাই বলা বাহুল্য। সাম্প্রদায়িকতার প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্করের গল্পগুলির মধ্যে "কান্না", "বিস্ফোরণ", "জটায়ু", "কলকাতার দাঙ্গা ও আমি উল্লেখযোগ্য"।

কান্না ঃ- এক হিন্দু-সন্তান অল্পবয়সে অনাথ হয়ে এক মুসলমান রমণীর কাছে মানুষ হয়। সেই বিধবা রমণী ছেলেটির নাম রাখেন জনি। সে বড় হতেই বস্তির পরিবেশের নোংরা স্পর্শ তার গায়ে লাগে। সে নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। বিধবা রমণী চুড়ি বিক্রি করতেন, সেই সঙ্গে ছেলেমেয়ে চুরি করে বিক্রি করতেন। কিন্তু জনিকে তিনি বেচতে পারেন নি। জনির 'নানী' আহ্বানে রমণীর যেন কেমন স্নেহ সঞ্চারিত হয়েছিল। বস্তিটা ছিল অত্যন্ত অসামাজিক। কলকাতার এন্টালীর কাছে এই বস্তিতে তারা "একটু সেয়ানা হলেই ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের তাঁবেদারি করে, কাটা ঘুড়ির পিছনে পিছনে ছোটে, মিথ্যে করে রাস্তায় পড়ে কাতরে কাতরে ভিক্ষে চায়, ভাল পোশাক পরা লোক দেখলে বলে 'সেলাম হুজুর'। বলে আর সেলাম বাজিয়ে ভিক্ষের জন্যে পিছনে পিছনে চলে; ভিক্ষে না পেলে গালাগাল দেয়। .... বড় হয়ে গাঁট কাটে, ছুরি মারে গুন্ডাগিরি করে— তাদের বাল্যকালটা হল এই রকম।" (৪৬) এই গুন্ডাদের মধ্যে আছে হালিম, রহমান, দবির, টম, হ্যারি, শুকলাল, কিষণ প্রভৃতি। একদিন হালিম ও দবির নানীকে ছুরি মেরে হত্যা করে। জনি থানায় গিয়ে হালিম ও দবিরের নাম বলে ধরিয়ে দেয়। প্রমাণ অভাবে খালাস পেয়ে তারা জনিকে হত্যা করতে উদ্যত হলে এক খ্রীষ্টান ফাদার নিজের প্রাণের বিনিময়ে জনিকে বাঁচান, কিন্তু হালিমের দল জনির দুচোখ অন্ধ করে দেয় এবং অন্ধ জনি গড়ের মাঠে প্রতিদিন গান গেয়ে বেড়ায়।

এই গল্পটি বাংলা ১৩৫২ সালে প্রকাশিত হয়— যখন তারাশঙ্কর ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সঙ্ঘের সদস্য। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় তখন সাম্যবাদের ঢেউ উঠেছে, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে মিটিং, সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখনই তিনি এই গল্পটি লেখেন। "বিশ্বরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীর মানুষ আজ আপন আপন আদর্শ, আপন আপন দাবি নিয়ে দৃঢ়-পদক্ষেপে ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন মানুষের

শ্রমশক্তি, তার উপার্জন, তার জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্মের নামে ঈশ্বরের বিধানের নির্দেশ ঘোষণা করে পৃথিবীকে দুঃখ জর্জর করে তুলেছে—তারই প্রতিকার করবে বিপ্লব। তাই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" [৪৭] এদিকে কলকাতার আকাশে-বাতাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে মানুষ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে; সকলের কাছে তখন ছোরা থাকত। মানুষ মানুষকে হত্যার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ) সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে থাকে কারণ যারা দরিদ্র, মৃতপ্রায়, তারাই এই দাঙ্গার মাঝেই নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে চেষ্টা করে।

জটায়ু :- এই গল্পটিও হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের পরোক্ষ ফল। স্বাধীনতার সঙ্গে ভারত হয় দ্বিধাবিভক্ত, ফলশ্রুতিতে রাম-রহিমে দিবারাত্র দ্বন্দ্ব। এই সময়ে বেশ কিছু অমানুষ দাঙ্গায় মাতে বা লুটতরাজে অংশ নিয়ে বিখ্যাত সমাজবিরোধী হয়ে যায়। লোক-চক্ষু ও পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বেশ, নাম পরিবর্তন করে তারা আত্মগোপন করতে থাকে। কিন্তু অন্তরের গহণে সুপ্ত পাশব প্রবৃত্তি সুযোগ পেলেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এমনই এক কদর্য চরিত্র কালা গোঁসাই। কলকাতার বিখ্যাত সমাজবিরোধী খুনী নেপাল গুন্ডা। অসামাজিক কাজের জন্যে "গুন্ডা আইন" এর হাত থেকে বাঁচতে বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলকাতা নেপাল, বিহারে কালা গুন্ডা এবং পূর্ববঙ্গে কাদু সর্দার হয় দেশ বিভাগের উত্তাপ কিছুটা প্রশমিত হলে নেপাল, বীরভূমের এক গ্রামে আসে। এখানে এসে নিরীহ, শান্ত, সহজ, সরল গ্রামবাসীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সে নবগ্রামের এক গাছতলায় শিব প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের শান্তি আনার জন্যে চাঁদা আদায় করতে থাকে। শিবতলায় বসে কালা গোঁসাই বিভিন্ন রোগের দাওয়াই দিতে শুরু করে। কখনও মুসলমান ফকির সেজে, আবার কখনও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা হাতে চিমটে নিয়ে সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে মুসলমান ও হিন্দুদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করত। চাঁদা নেওয়ার ফিকির ছিল হিন্দুদের কাছে "হিন্দুকে বাঁচানেকে লিয়ে চন্দা। বাবা বিশ্বনাতকে হুকুমত। হিন্দুকে ধরম যাচ্ছে। পাঁচ হাজার দশ হাজার কলকাত্তা, নোয়াখালি, জেনানীর হিন্দুর ইজ্জত, ধরম বচানোকে লিয়ে চন্দা।" মুসলমানদের কাছে— "মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমত, কায়েদে আজমের ফরমান নিয়ে এসেছে।" এইভাবে সে যেমন উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে টাকা রোজগার করেছে, আবার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও এমন জঘন্য চরিত্র সমাজে দুষ্ট-ক্ষতের মত বিরাজ করছে।

কলকাতার দাঙ্গা ও আমি :- কলকাতায় থাকার পর তারাশঙ্কর স্বগ্রামের মাটিতে ফিরছেন। কলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষময় রূপ পরিগ্রহ করেছে— রাম-রহিমে ভ্রাতৃত্ববোধ বিস্মৃত হয়ে পারস্পরিক খুন জখমে লিপ্ত। ষ্টেশনে নেমে লেখক এক মুসলমান গাড়োয়ানের গাড়ীতে চড়ে গ্রাম লাভপুরে ফিরছেন, সঙ্গী কেবল বৃদ্ধ-বাউল নিতাই দাস। সাত মাইল দূরত্বে সুন্দীপুরের সেই ভয়াল বিভীষিকাময় বটতলা। যার পরিচয় ইতিপূর্বে বিশদ আলোচিত হয়েছে। এই গাছের নীচে শতাব্দী ধরে হিংস্রতা, হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, রাহাজানি চলেছে। সেই বটতলাতে আসতেই উঠল প্রচন্ড ঝড়— তিনজনেই ত্রস্ত, ভীত। এই বটতলাতেই গাড়োয়ান সেজে মুসলমান ডাকাত পথিকদের ভুলিয়ে এনে খুন করে টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিত— এ ঘটনা শুধু লেখকের নয় সমকালীন ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। বৃদ্ধ নিতাই বাউল এই অবস্থায় বলতে থাকে যে এখন পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল সত্য-কথন। নিজের পাপের কথা কেউ যদি অকপটে স্বীকার করে তাহলে কোন পাপই এই তিনজনের কারুরই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিতাই তখন পল্লীর সেই মুসলমান গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করতে সে (গাড়োয়ান) নির্দ্বিধায় 'হ্যাঁ' বলল। কিন্তু লেখক কোন উত্তর দিতে পারলেন না। সভ্য মানুষ সত্য-কথনে নিজের পাপ স্বীকার করতে অপারগ, অথচ নিরীহ, অশিক্ষিত পল্লীর সরল মানুষ সত্য-কথনে নির্ভীক।

লেখক এই গল্পের মাধ্যমে শিক্ষিত, সভ্যতাভিমানী, শহুরে অভিজাতবর্গের কুৎসিত রূপের দিকটির নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষিত থেকে রাজনৈতিক নেতারা পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কেউই অকপটে নিজের পাপ কোনদিন স্বীকার করতে পারবেন না, কারণ শিক্ষা ও আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে এঁরাই নিজেদের আখের গোছাতে দিবারাত্র সমাজের বুকে অন্যায় করে চলেছেন— নিজেদের বিবেক নিজেরাই হত্যা করেছেন। এই সম্প্রদায়ই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মূলে রয়েছেন, এই নির্দেশও দিয়েছেন লেখক। রামা কৈবর্ত কিংবা রহিম শেখের দল যে শুধু পারস্পরিক ধ্বংস ও হত্যালীলায় মেতে ওঠে তার উৎসাহ দাতাগণ হলেন এই শহুরে শিক্ষিতের দল।

বর্তমানেও তাই দেখা যায় যে, রাম-রহিমের সংঘর্ষের মূলে রয়েছে শিক্ষিত মৌলবাদীদের গভীর চক্রান্ত। গল্পটি একেবারে বর্তমান দিনেও বাস্তব ও সার্থক সৃষ্টি— যা সমভাবে প্রযোজ্য। তারাশঙ্কর নিজে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের অসাফল্যের দিকের সত্য নির্দেশ করতে কার্পণ্য করেন নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, তিনি কত বড় মাপের মহৎ শিল্পী। তিনি আশাবাদী ও ভারতীয় সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী, তাই তিনি নিশ্চিত যে আজ না হয় আগামী দিনের প্রজন্ম একদিন নিজের পাপ সত্যভাবে স্বীকার করতে পারবে একথাই তিনি গল্পের অন্তিম লগ্নে [redacted] ইঙ্গিত দিয়েছেন, "আগামীকালে

কোনদিন না কোনদিন মানুষ অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করতে অবশ্যই পারবে।" (৪৮)

বিস্ফোরণ ঃ- সাম্প্রদায়িকতার বিষময় পরিণামের সার্থক রূপায়ণ "বিস্ফোরণ" গল্পটি। রামতারণ মোটর গাড়ীর ড্রাইভার, কিন্তু তার হিন্দুয়ানা প্রকট। তার বন্ধু ইসমাইল অচলগাড়ীকে সচল করে দেয়। তাইজন্যে তার অহংকার পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উভয়ের মধ্যে মৌখিক বন্ধুত্ব হলেও আন্তরিক হয়নি। উপরন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে ইসমাইল রামতারণের কারখানায় না এসে দাঙ্গায় যোগ দিয়েছে। রামতারণ মুসলীম লীগের মিছিলে ইসমাইলকে "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনি তুলে ডান্ডা ঘুরিয়ে নাচতে দেখেছে। রামতারণের চিন্তার জগতে "কলকাতায় দাঙ্গার ভয়াবহতা কত নির্মম হবে" এই ভেবে দিশাহারা। ধীরে ধীরে দাঙ্গা বীভৎস রূপ নেয়। "কলকাতা কালো হয়ে গেল। লাল আগুন নিবে অঙ্গার হল। লাল রক্ত শুকিয়ে পচে কালো রঙ ধরল। নোয়াখালি হল, বিহার হল। কলকাতায় দাঙ্গা থামে আবার লাগে, লাগে আবার থামে।" (৪৯)

এমন একদিন রাত্রে কারখানায় আকণ্ঠ মদ্যপান করে তিন বন্ধু, রামতারণ, নটবর এবং ইসমাইল। রাস্তার দুদিক থেকে "আল্লা-হো-আকবর" এবং "জয় হিন্দ" ধ্বনি আসে। ঘরে বসে তারা দাঙ্গার ভয়ঙ্করতা উপলব্ধি করে। রামতারণ হঠাৎ তার নিষ্পাপ বন্ধু ইসমাইলকে ছোরা দিয়ে হত্যা করে এবং মেঝেতে রাখা বোমাটা নিয়ে মেঝেতে প্রচন্ড আঘাত দিয়ে ঠোকায় প্রচন্ড বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় রামতারণ আর তাদের বন্ধু নটবরদার দেহ।

দাঙ্গার ফল ভয়াল ও ভয়ঙ্কর, যেখানে দরিদ্ররাও নিস্তার পায় না। হিন্দু-মুসলমানের সুমধুর মিলন সাগরে চীড় ধরে।, অতিপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করে। মৌলবাদীদের চক্রান্তের শিকার হয় নিষ্পাপ ইসমাইলের দল। যদি সে মুসলিম লীগের মিছিলে যোগ না দিত তাহলে তাকে এ ভাবে মরতে হত না হয়তো। অন্যদিকে রামতারণ আত্মহত্যার মাধ্যমে বিড়-বিড় করে কী যেন বলতে থাকে, মনে হয় দাঙ্গার ফলশ্রুতি। এ ভাবেই অন্যকে হত্যা করে সে কিন্তু নিজেও সুখী হয় না, তাকেও এভাবেই আত্মঘাতী হতে হয়। দাঙ্গার ফলে স্বার্থবাজরা নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নেয়, মরে কিন্তু নিরীহ মানুষের দল অর্থহীনভাবে। নটবরের মৃত্যু সেই ইঙ্গিতই বহন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস রূপ (৪৬ এর কলকাতা'র) এমন বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ তারাশঙ্করের নির্ভীক লেখনীতেই সম্ভব। রামতারণ হয়তো নিজের জীবন দিয়ে বলেছিল— ভ্রাতৃহত্যার হোক অবসান, হিন্দু-মুসলমান মধুর সম্পর্ক নিয়ে বাস করুক। আসুক নেমে অহিংসা —যা গান্ধীবাদী লেখকেরই অন্তরের কথা।

বর্তমানেও হিংসা, হত্যা, সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের অবসান হয় নি। মানুষের মধ্যে যতদিন কুপ্রবৃত্তি বিরাজ করবে, জীইয়ে রাখবে স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যতদিন রাঘব বোয়াল সেজে থাকবে, দেশে দারিদ্র্য যতদিন প্রকট থাকবে, ততদিনই এই বিষময় নাটকের কদর্য অভিনয় চলবেই— এই সত্য বোঝাতেই লেখক বেশ সুন্দর ও সার্থক কৌশল অবলম্বন করে গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন, " ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রামতারণ বিড়বিড় করে কি বলছে। বিস্ফোরণের শব্দের রেশের মধ্যে তা বোঝা যাছে না। " (৫০)

সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণের প্রসঙ্গে এ, আর, দেশাই মন্তব্য করেছেন, সাম্প্রদায়িকতা বিভিন্ন ধর্মের কায়েমী স্বার্থবাদীদের সংগ্রামের ছদ্মবেশ মাত্র। এরা এই বিরোধকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেয়। তিনি আরও বলেছেন, " সাম্প্রদায়িকতা দমন করার অন্যতম কার্যকরী উপায় হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিম্নবর্গকে তাদের সর্বজনীন অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে একত্রিত করা।" (৫১)— যা তারাশঙ্করের প্রাণের কথা ছিল।

পাদটীকা

১।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ৩
২।	বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খন্ড	:	রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৮/১৫
৩।	বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খন্ড	:	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার	পৃ. ১৮
৪।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ২১
৫।	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	:	নীহাররঞ্জন রায়	পৃ. ২৭০/২৯৯
৬।	প্রাগুক্ত	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ৩৫

৭।	বাঙ্গালার ইতিহাস	:	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	পৃ. ৫৩
৮।	ভারতবর্ষ ও ইসলাম	:	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	পৃ. ৩১
৯।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ৩
১০।	ভারতবর্ষ ও ইসলাম (১৩৯৮)	:	সুরজিৎ দাশগুপ্ত	পৃ. ৩৪
১১।	বাংলার মুসলমান (মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত)	:	খন্দকার ফজলে রাব্বি	পৃ. ৩২
১২।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)	:	জগদীশনারায়ণ সরকার	পৃ. ৬
১৩।	মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক	:	ডঃ মুসা কালিম	পৃ. ১১
১৪।	বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খন্ড)	:	রমেশচন্দ্র মজুমদার	পৃ. ২৩১/৩২
১৫।	স্বামীজীর রচনা সংকলন (৮ম খন্ড)	:		পৃ. ৩৩০
১৬।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)	:	শ্রীজগদীশনারায়ণ সরকার	পৃ. ৯
১৭।	দাঙ্গার ইতিহাস (মিত্র ও ঘোষ)	:	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫
১৮।	সাম্প্রদায়িকতা : উৎস ও প্রসার	:	অমিতাভ চক্রবর্তী	পৃ. ১৩
১৯।	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ (ঢাকা - ১৯৮৬) : মহম্মদ আবদুল জলিল			পৃ. ২৬০
২০।	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ	:	ডঃ অমলেন্দু দে	পৃ. ১২১
২১।	বৃহৎ বঙ্গ	:	শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন	পৃ. ৩৬৩
২২।	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	:	এম, এ, রহিম	পৃ. ৫৮/৫৯
২৩।	The Indian Mushalman	:	W. W. Hunter (আব্দুল মত্তদুদ অনূদিত)	
২৪।	প্রাগুক্ত	:	(ঢাকা - ১৯৮২)	P. 164
		:		P. 160
২৫।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ১৫০
২৬।	তারাশঙ্কর রচনাবলী ১০ম খন্ড দে'জ পাবলিশার্স			পৃ. ৩৬৬
২৭।	প্রাগুক্ত			পৃ. ৪১৪/১৫
২৮।	দাঙ্গার ইতিহাস	:	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৪০
২৯।	আমার সাহিত্য জীবন, ১ম খন্ড	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ ১০/১১
৩০।	প্রাগুক্ত			পৃ. ১১
৩১।	প্রাগুক্ত			পৃ. ২৪
৩২।	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ নজরুল ইসলাম	পৃ. ২৫৬
৩৩।	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ১৫১
৩৪।	গীতিকার : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	:	ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৫৮
	মালদহের ললিতমোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী পত্রিকা (১৯৯৩) থেকে সংগৃহীত			
৩৫।	তারাশঙ্কর রচনাবলী-১০ম খন্ড	:	দে'জ পাবলিশার্স	পৃ. ৪০৬
৩৬।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪১৩/১৪
৩৭।	ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর	:	ডঃ মুক্তি চৌধুরী	পৃ. ১২৭/২৮
৩৮।	পঞ্চগ্রাম	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩০/৩১

৩৯।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ৯
৪০।	সাম্প্রদায়িকতা	:	বদরুদ্দীন উমর	পৃ. ৯
৪১।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান	:	অঞ্জন গোস্বামী	পৃ. ১
৪২।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫০
৪৩।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫০
৪৪।	ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান	:	শান্তিময় রায়	পৃ. ৪১/৪২
৪৫।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৬৯
৪৬।	তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খন্ড)	:	জগদীশ ভট্টাচার্য	পৃ. ৬০৩
৪৭।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৫৯৯
৪৮।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৬
৪৯।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৫০
৫০।	প্রাগুক্ত	:	(৩য় খন্ড)	পৃ. ২৫১
৫১।	(Sumit Sarkar-Swadeshi Movement in Bengal-1903-1908) এই গ্রন্থ থেকে ইংরেজী উদ্ধৃতিকে বাংলায় অনুবাদ করে অঞ্জন গোস্বামী তাঁর "ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান গ্রন্থে লিখেছেন			পৃ. ৫২

* * * * * * * * * * *

দশম অধ্যায়

ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ও ভাব

দশম অধ্যায়

ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষা ও ভাব

ভাষা হল ভাবের বাহন। ভাষা হল এমন এক অভিজ্ঞান যা অন্যপ্রাণী থেকে তাকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মানুষের হৃদয়ের চিন্তা মূলতঃ আত্মার নিজের সঙ্গে নীরবে কথোপকথন। কিন্তু যে প্রবাহটি আমাদের চিন্তার জগৎ থেকে ধ্বনির আশ্রয়ে ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বয়ে আসে তাই ভাষা। "মানুষের উচ্চারিত, সুনির্দিষ্ট অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।" (১) আবার মতিলাল বাণারসী দাস বলেছেন, **"A group of people whose the same system of speech signals is a speech community."**(২) সামাজিক স্তর ভেদে এবং ভৌগোলিক অঞ্চলভেদে ভাষার কিছু পৃথক রূপ গড়ে ওঠে, একে সামাজিক উপভাষা বলা হয়। তেমনি একই ভাষার মধ্যে অঞ্চলভেদে যে কিছুটা পৃথক রূপ দেখা যায় তাকে আঞ্চলিক উপভাষা বলা যায়। "পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সব ভাষারই রয়েছে নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য— আঞ্চ লিক উপভাষা। বাংলা ভাষায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাংলাভাষারও প্রধান পাঁচটি উপভাষা রয়েছে।" (৩)

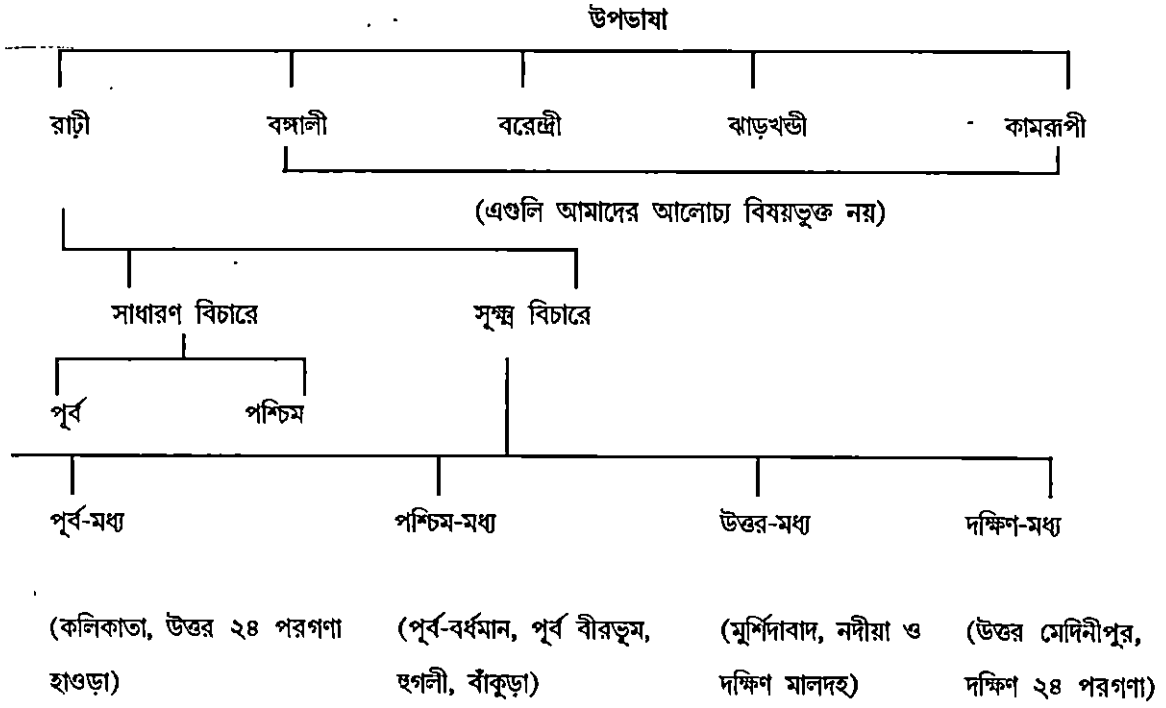

তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বহু আঞ্চলিক ভাষা জায়গা করে নিয়েছে। রাঢ়-বংলার সেইরূপ এখানে দেখানো হল—

রাঢ়ীর ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ঠ্য ঃ রাঢ়ের ভাষায় বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। রাঢ়ের পরিধি যেমন ব্যাপক তেমনি শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও কলকারখানার সংখ্যাধিক্যের জন্যে জনঘনত্বও বহুল। সুতরাং তাদের লোকায়ত ভাষার মধ্যেও বিভিন্নতা প্রকট। বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে বৈশিষ্ঠ্যগুলি দেখানো যেতে পারে। এই বৈশিষ্ঠ্যগুলি সবই বীরভূমে প্রযোজ্য। প্রথমত ঃ— এখানে অভিশ্রুতি/স্বরসঙ্গতি জনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন রাখিয়া > রেখে, করিয়া > কোরে।

দ্বিতীয়ত ঃ — প্রায়শই 'অ' কারের 'ও' কারের উচ্চারণের প্রবণতা স্পষ্ট। যেমন অতুল > ওতুল, বন > বোন।

তৃতীয়ত ঃ- অনুনাসিক স্বরের বহুল প্রয়োগ রয়েছে।

যেমন- হইঁছে, খাইঁঞে।

চতুর্থত ঃ- 'ল' কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন লৌহ > নোয়া, লবন > নুন।

পঞ্চমত ঃ- শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত ঘটলে শব্দের অন্তেস্থিত ও মহাপ্রাণ ধ্বণি স্বল্পপ্রাণে উচ্চারিত হয়।

যেমন - দুধ > দুদ্, বাঘ > বাগ্।

ষষ্ঠত ঃ- কোন কোন অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়। যেমন কাক > কাগ, ছত্র > ছাদ ।

সপ্তমত ঃ- কোন কোন অঞ্চলে বিষম স্বরধ্বনি সমস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে। যেমন— দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি।

অষ্টমত ঃ- ক্রিয়ারূপে বিশেষত্ব রয়েছে। 'লুম' বা 'নু' বা 'লম' দিয়ে উত্তম পুরুষের পদ গঠন হয়েছে। যেমন— করলুম বা করনু বা করলম্। ক্রিয়াপদের শেষে 'লম' যুক্ত হয় নিম্নজ শ্রেণীর কথাতে। করলম্/দিলম ইত্যাদি (শিলাসন গল্প)।

"বীরভূমের ভাষার দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন পশ্চিম বীরভূমের ভাষা পশ্চিম রাঢ়ীর অন্তর্গত এবং পূর্বের ভাষা পূর্ব রাঢ়ীর। বিভিন্ন উপভাষার ও আঞ্চলিক ভাষা বা ঔপভাষিক ভাষার মিশ্রণে এখানকার ভাষার পরিধি ও গতি প্রকৃতি বিচিত্র, শ্রেণী বিচার অত্যন্ত দুরূহ। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছিল সাঁওতাল পরগণা, তাছাড়া বীরভূম বহুদিন মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল। ফলে উর্দু বা হিন্দী এবং সাঁওতালী ভাষার প্রভাব রয়েছে। বীরভূমের ভাষার সঙ্গে মৈথিলী ও ওড়িয়ার মিল রয়েছে।" (৪)

তারাশঙ্করের ভাষাগত দক্ষতা বিস্ময়কর। সহজ সরলভাবে ভাষায় তিনি সঞ্চার করেছেন স্বীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণীর পাত্র পাত্রীদের মুখের কথা এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে; যেন মনে হয় তারাশঙ্কর ঐসব অখ্যাত অন্ত্যজ শ্রেণীর সঙ্গী ছিলেন। চরিত্রপ্রধান গল্প লেখায় ঝোঁক তাঁর বেশী ছিল। ফলে চরিত্রের মুখের কথা হুবহু তিনি চয়ন করেছেন। এই সুযোগটাও তিনি ছোট বয়স থেকেই পেয়েছিলেন। মুখে মুখে গল্প বলার বৈঠকী-রীতি তাঁকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, " ছেলেবেলায় আমি যত গল্প শুনেছি , এত গল্প বোধ হয় খুব কম ছেলেই শুনতে পায়। আজ মনে পড়ছে; সেকালের গল্পগুলির মধ্যে অন্ততঃ আমি যাঁদের কাছে গল্প শুনেছি তাঁদের গল্পের মধ্যে আশ্চর্যভাবে প্রাণপুরুষের সন্ধান ছিল।" (৫) বিভিন্ন সময়ে নানা কাজে তিনি রাঢ়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরেছেন-মিশেছেন সেই সব ব্রাত্য অজ্ঞাতকুশীলদের সাথে। তাদের নিয়েই তিনি গল্প লিখেছেন। অন্যান্য লেখকদের কাছে গল্প বলার আর্ট বস্তুটা মুখ্য, বিষয়বস্তু গৌণ। কিন্তু তারাশঙ্করের লেখনীতে তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম চোখে পড়ে। আদিত্য কুমার মুখোপাধ্যায় সেইজন্যেই বোধ হয় বলেছেন, "চরিত্র ও চিত্রের সার্থক রূপায়ণ না ঘটলে প্রকৃত সাহিত্যের মর্মোদ্ধার হয় না। তারাশঙ্কর সেই বিরল জাতের লেখক, যাঁর রচনায় ভালোবাসার প্রকৃতি ছুঁয়ে উঠে এসেছে ভালোবাসার মানুষ।" (৬) নিতাই বসুও তাই বলেছেন, "রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে জান্তব স্থূলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর আমাদের সাহিত্যের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ লেখক"। (৭) রাঢ়ের বিশেষকরে বীরভূমের সাধারণ মানুষের প্রাণ হলেন তারাশঙ্কর। "বিশেষভাবে যতদিন ময়ূরাক্ষী বীরভূমের প্রাণ প্রবাহিনী হয়ে থাকবে, ধর্ম ঠাকুর হয়ে থাকবেন অধিদেবতা এবং রাঢ় বাংলার সদ্গোপ, কৈবর্ত, কাহারেরা বেঁচে থাকবে, ততদিন তারাশঙ্করও বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে।" (৮)

তারাশঙ্কর তাঁর দেখা মানুষ ও পরিবেশকে সরাসরি সাহিত্যে এনেছেন। যেমন 'কবি' গল্পের সতীশ, রাজন। "ডাইনী" গল্পের স্বর্ণ প্রভৃতি। পরিবেশ ও প্রতিবেশ— যেমন সুঁদীপুরের বটতলা, আখড়াইয়ের দীঘি, ফুল্লরাপীঠ, কংকালীতলা, ধনডাঙ্গা, গোগা, দাশকল প্রভৃতি বহুস্থান ও পরিবেশের চিত্র বহু গল্পে সন্নিবিষ্ট আছে। 'বেদেনী' গল্পের রাধিকা, 'যাদুকরী' গল্পের যাদুকরীদল, 'কামধেনু' গল্পের নাথু পটুয়া বা গরুমারা এরা লেখকের দেখা চরিত্র। লাভপুরের শশী ডোমের চৌর্যবৃত্তি, শশাঙ্কবাবুর চায়ের দোকান বা অন্ধ পঙ্ক্ষী প্রভৃতিদের পেশা, কথা, গান, অঙ্গভঙ্গী সবই গল্পে বিধৃত করেছেন। বীরভূমে বহু সম্প্রদায়ের আনাগোনা ও বসতি। তাই এখানকার ভাষা কেবল রাঢ়ী নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহার প্রচলিত। পশ্চিম রাঢ়ের (বীরভূমের) মানুষের উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর "দেবতার ব্যাধি" গল্পে বলেছেন, "পশ্চিমরাঢ়ের পল্লী, লোকেদের কথায় বিচিত্র টান, ঐকার, একার, চন্দ্রবিন্দু, 'ড়' কারের ছড়াছড়ি। গিয়েছে, হয়েছে স্থলে গেইছে, হইছে; কেন কে বলে কেনে; খেয়েছিকে বলে খেঁয়েচি। হার কে বলে হাড়, রামকে বলে আম আর আমকে বলে ড়াম।"

বীরভূমের পাশেই হিন্দী ভাষা-ভাষী বিহার রাজ্য। বহু যুগ থেকেই ব্যবসাগত বা অন্যান্য কারণে দুই পারের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে নিবিড় ভাবে। সুতরাং হিন্দী ও বিহারী ভাষার থেকে বহু শব্দ ও ধাতু সরাসরি বা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে বীরভূমে প্রচলিত হয়েছে। তারাশঙ্করের বহু গল্পে এর নিদর্শন মেলে। যেমন "কামধেনু" গল্পে নাথু জেলখানায় ফাঁসির

প্রাক-মুহূর্তে ওয়ার্ডারকে প্রশ্ন করে—" ওহি যে আঁতঠো, উঠো গরুকা হ্যায় না ?" আবার 'ইমারত' গল্পে জনাব বলেছে, "একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ্। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয়— পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভস্ম লিয়ে খা সি তখন ওষুধ। কাঁচা খা গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।" 'প্রত্যাবর্তন" গল্পে সদ্য বিদেশাগত পশুপতি তার সৎ বাবাকে বলেছে, "বুঢ্ঢা কাঁহা? শুয়ার কি বাচ্চা?" "গোস্ত রাধতে জানিস? মান্সো।" "যাদুকরী" গল্পে যাদুকরী মেয়েটি বলেছে, "শিব ঠাকুরের মত ঢুলু ঢুলু চোখ,—ললছা পারা বাবুটি।" "বুঝলা ঠাকরণ, বাবুটিকে দেখতম আর ভাবতম ইয়ার গলায় মালা কে দিবে?"

এছাড়া তারাশঙ্করের বহু গল্পে গা, গো, গে, প্রভৃতির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বীরভূমে আভিমুখ্য বোঝাতে এগুলি ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিহারী মৈথিলী ভাষার স্বার্থিক 'গ' প্রত্যয়। এখানকার মানুষ 'বাড়ী'কে ঘর বলে। যেমন তুর ঘর কুথা বটে? এখানে 'বাড়ি' কথাটি ক্ষেত বা খামার অর্থে প্রযুক্ত। কোন কোন জেলায় তা 'কামাত' নামে প্রচলিত। আবার পুত্র-কন্যাকে অনেকেই বেটা-বেটি বলে। 'ইমারত' 'যাদুকরী', 'প্রতীক্ষা' ইত্যাদি গল্পে এর প্রমাণ মেলে।

বীরভূমের ভাষায় অতিহ্রস্ব 'ই' ধ্বনির আগমে সাঁওতালী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট। আবার 'ন' কারের স্থলে 'ল'কারের প্রয়োগ। যেমন- 'শিলাসন' গল্পে কাঁদন বলে, "আমি দেখাব, সি লোকটার লহু আমি দেখব, রক্ত লিব, দেখাব - পাথর কালো হল না, কিছু হল না।" আবার ক্রিয়াপদের অতিরিক্ত ব্যবহার। যেমন- 'তমসা' গল্পে পঙ্খী বলে, "আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে।" এখানে 'লাগছে' কথাটি জিজ্ঞাসা অর্থে ব্যবহৃত। ক্রিয়াপদের বিকৃতি - রেঁধে > এঁদেও (বরম লাগের মাঠ) পুড়ে > পুড়্যা (বেদেনী), গোঙারছে (আখড়াইয়ের দীঘি), নারি > লারি (একপশলা বৃষ্টি) পেলাম>পেলম (বেদেনী)।

বাক্যরীতির বিশিষ্টতা ঃ- "আমার আস্পদ্দা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে" (তমসা)। "ওরে বাপ্‌রে, ওটা ফুটায়েন না।" "আপনাদের চি-চরণের দাস" (বরমলাগের মাঠ)।

"সর্বনামের বিকৃতি ঃ- ই < এই, যি < যে, উ < ও, ইখন < এখন, ইথে < এতে। বিশেষ্য ও বিশেষণের বিকৃতি আমানুষী < অমানুষী, পচি < পশ্চিম, সিনুর < সিন্দুর, টুকচা < একটু, এত্যানি < এতখানি।" [১]

ধ্বনির পরিবর্তন ঃ- (১) বিষমীভবন— শরীর < শরীল (ইমারত), পৃথিবী < পৃথিমী (পাটনী)।

(২) ব্যঞ্জনের আগম - ওঝা > রোজা (সাপুড়ের গল্প), অজ > রজ (আওয়াজ) (তমসা), অন্ন > রন্ন (বরমলাগের মাঠ), মূর্খ > মুরুক্ষু (যাদুকরের মৃত্যু)।

(৩) তালবীভবন - সন্ধ্যা > সন্‌জা (ডাকহরকরা), সম্মুখে > ছামনে (তমসা)।

(৪) অনিয়মিত পরিবর্তন :- অক্ষম > অকখ্যাম (ইমারত), এই শব্দটি থেকেই উত্তরবঙ্গে ক্ষতস্থান বা অচল বোঝাতে 'খাম' শব্দটি ব্যবহার করে। কেন > ক্যান্যা (বেদেনী) ।

(৫) অন্ত্যস্বর লোপ :- সঙ্গ > সঙ্ (মতিলাল), প্রতিবেশী বিহারী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

(৬) 'ন'কারের 'ল'কারে রূপান্তর :- বড়নথ > ফাঁদিলত, নষ্ট > লষ্ট, নদী > লদী(তারিণী মাঝি), এই গল্পে 'আমানি' শব্দটি আছে। রাঢ় বাংলায় রান্নাকরা গরম ভাতের অতিরিক্ত জল বের করে দেওয়া হয় তাকে বলে ফ্যান, অন্যত্র মাড় বলে। আবার বাসী শুকনো ভাতে জল মিশিয়ে রাতে রেখে পরদিন সকালে তা পান্তা ভাত হয়। ভাতের সঙ্গে মিশ্রিত জল 'আমানি', নামে পরিচিত। এই জল ভাতের সঙ্গে খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে বলে, গ্রীষ্মকালে রাঢ় বাংলার দরিদ্র সংসারে প্রায়ই দেখা যায়। নীল > লীল (তারিণী মাঝি), আপনার > আমনার (প্রতীক্ষা)।

(৭) ই-ধ্বনি উ বা এ হয়েছে- টাইম > টায়েন (ডাকহরকরা) জীবন >জেবন (বরমলাগের মাঠ)।

(৮) পসুক্রিয়া 'বটে' এর ব্যবহার প্রচুর যেমন- ভারী মিঠা বটে, লয় তো কুঁড়ে বটে, ইত্যাদি (একটি প্রেমের গল্প) ভাই বটে, (কমলমাঝির গল্প)।

(৯) 'পারা' প্রত্যয়টি বহুল ব্যবহার। যেমন— কালোপারা, ললছে পারা (যাদুকরী ইত্যাদি)।

(১০) বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে প্রথমপুরুষের সকর্মক পদে 'স্বার্থিক ক' প্রযুক্ত হয়। যেমন—সিখান থেকে বটেক (একটি প্রেমের গল্প)।

"আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও লোকজীবনকেন্দ্রিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের ব্যবহার তাঁর গল্পকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। যেমন

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জাত বৈষ্ণব ও ভেকধারী, ছাড়পত্র প্রথা(রসকলি), ঘাঁটি খেলা (আখড়াইয়ের দীঘি), সূতিকা গৃহের দুয়ারে রাতে রাখা প্রহরা (অগ্রদানী), পৌষ আগলানো (পৌষলক্ষ্মী), রাঢ়দেশে বৈশাখী পূর্ণিমায় নিম্নজাতির মধ্যে ধর্মপূজা উপলক্ষে মুক্তিস্নান (মতিলাল), অন্ত্যজ জাতির মধ্যে সাঙা প্রথা (স্থলপদ্ম), ভাঁজোগান(বাবুরামের বাবুয়া), সুরভিমঙ্গলের গান (কামধেনু) ইত্যাদি।" [১০]

"বাউরী সম্প্রদায় ভাঁজোপরব বা সূর্যদেবের উপাসনা করে— দিনরাত সুরার স্রোতে ভেসে থাকে' (প্রতীক্ষা)। এখনকার গ্রামের অশিক্ষিতরা স্ত্রীকে তুচ্ছার্থে 'মাগী' বলে।

বীরভূমে প্রচলিত শব্দের মধ্যে 'সিজুনি' হল এমন একটি শব্দ যার অর্থ কাপড়ের তৈরী নক্সা আঁকা কাথা। সুতো দিয়ে বিভিন্ন চারুশিল্প এতে সৃষ্টি করা হয়। অতিথি এলে বিছানার উপর এটি বিছিয়ে দেওয়া হয়। 'রসকলি' গল্পে এই শব্দটির ব্যবহার আছে। আবার কুটিল হাসিকে এখানকার লোক বলে 'মসনে ফুলী',—"প্রসাদমালা" গল্পে এই শব্দটি আছে। গাছের সবচেয়ে উঁচু শাখাটাকে শিরডাল বলে। আবার অন্ত্যজ শ্রেণী শিরডালকে 'শিরডগাল' বলে (বেদের মেয়ে), খ্রীষ্টান শব্দটিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা বলে, "কেরেস্তান" (বাবুরামের বাবুয়া)। 'কিন্তু' শব্দটিকে "কিন্তুক" বলে বহুল ব্যবহৃত। অন্ধকার > অন্নকার (সনাতন)। এই শব্দটি মালদহের পশ্চিমপ্রান্তে অন্ত্যজগণ 'আনার' ব্যবহার করে। 'সুরতহাল রিপোর্ট' গল্পে পরী বাউরী চিরজীবন কে বলেছে "ছেরো জেবন"। আবার পাঁট শব্দটি (জুয়াড়ী) এসেছে পাঁইট- শব্দ থেকে। রাঢ় বাংলায় অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে মদের অর্ধেক বোতলকে পাইট বা পাঁট বলে।

তারাশঙ্কর কেবল শব্দের বা উপভাষার ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সঙ্গে তিনি গল্পে অসংখ্য প্রবচন ও ছড়ার ব্যবহার করেছেন যেগুলি রাঢ়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ। যেমন—

(১) মিসে নেয় না পায়ের কাছে/মাগী বলে আমার সোহাগ আছে, (স্রোতের কুটো), ভাতদেবার সোয়ামী নয়কো, ঠেঙা মারবার গোঁসাই (স্রোতের কুটো), যেমন দেবা/তেমনি দেবী (রসকলি), আপন তেতো পর মিষ্টি/ছেনালের এই কুষ্টি (স্থলপদ্ম), ভাতদেবার সোয়ামী নয়কো/ কিল মারবার গোঁসাই (শ্মশানের পথে), বাহাদুর পুরের লাঠি/কুলির ঘাঁটি (আখড়াইয়ের দীঘি), লাজেমা কুঁকড়ি/ বেপদের ধুকুড়ি (তারিণী মাঝি), পরের মাথায় দিয়ে হাত/ কিরে (শপথ) করে নির্ঘাত (সুরতহাল রিপোর্ট), বাপকো বেটা সিপাহীকা ঘোড়া (জুয়াড়ী), সোনা বাইরে আঁচলে গিঁঠ/দেবতা ফেলে হনুর খাতির (জুয়াড়ী), 'ঘোড়া দিলেন তো চাবুক দ্যান' (তমসা) সোম-শুক্রে পরে শাড়ি/ ধন হয় তার আড়ি আড়ি, চৈতেবুয়া, ভাদরে বান/নরমুন্ড গড়াগড়ি যান(পৌষলক্ষ্মী), বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো (বিষ পাথর), "তুমিই বুঝি তুলসী বোষ্টমী/গাইয়ে বাজিয়ে, বলিয়ে-কইয়ে, রূপে মরি মরি, (মালাচন্দন), কারও মাথায় সোনার ছাতা/কারও ফাটে ব্রহ্মতালু (বাউল), টাকা নিজের ঘরে বাড়ে না / টাকা বাড়ে পরের ঘাড়ে (শ্মশান বৈরাগ্য), তোর ভাঁজোতে মোর ভাঁজোতে পাতিয়ে দেব সই। গয়না কিন্তু লারব দিতে মুড়কীমালা বই (প্রতীক্ষা), নাইধন যার হরষ বদন সুখে নিদ্দে যাচ্ছে /আছে ধন যার বিরস বদন ভাবনায় শির ফাটছে, (সন্ধ্যামণি) চাষার বুদ্ধির ধার কেমন/না ভোঁতা লাঙলের ধার যেমন (রাইকমল), রাঙা পেড়ে শাড়ী দিব শঙ্খ দিব রাঙা/সুন্দরী লো কর্ না থানায় তিন নম্বর সাঙা (স্থলপদ্ম), অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড়চড় করে (রসকলি) ইত্যাদি।

তাঁর গল্পে গানের ব্যবহারও অসংখ্য। যেমন— "ও আমার ঘেটুনির মন হলো ভারী/ লতুন কাপড় লইলে যাবে না শ্বশুর বাড়ি (ইস্কাপণ), হায় কি কঠিন রোগ উঠেছে ওলাউঠো, লোক মরিছে অসম্ভব (ডাকহরকরা) হল শূল, সখি পীরিতি হল শূল (প্রতীক্ষা), ভাল করে পড়গা ইস্কুলে/নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে (বাউল), ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী/আর কি তোর মনে আছে এলোকেশী (সর্বনাশী এলোকেশী), সখি বলিতে বিদরে হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া, এভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর (মালাচন্দন), বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে/দেখা না হইত পরাণ গেলে (প্রসাদমালা), কালা বিনে হলাম কাল/কলোর গুণ আর বলব কত (স্থলপদ্ম), পাঁচসিকের বোষ্টুমি তোমার/ওহে গোসা করেছে, গোসা করেছে (রসকলি), বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে/ দেখা-ত হত না পরাণ গেলে (উল্কা), কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি, চোখে ছটা লাগিল/ তোমার আয়না বসা চুড়িতে" (তমসা), বাবুদের চিলে কোঠার ছাদে। চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে (ইমারত), ইত্যাদি।

এমনিভাবে সব গান তিনি গল্পে এনেছেন— যে গানগুলোর বেশীরভাগই লোক-ব্যবহার ও কিছু কিছু বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যা আঞ্চলিকতারই জলছাপ।

পাদটীকা

১।	ভাষার ইতিবৃত্ত	:	ডঃ সুকুমার সেন	পৃ. ১
২।	Bloomfield Leonard	:	Language (Delhi) Monilal Banarsidass	P-29
৩।	সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা	:	ডঃ রামেশ্বর শ	পৃ. ৬৫১
৪।	বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ	:	ডঃ সত্যনারায়ণ দাস	পৃ. ২
৫।	রচনাবলী (১০ম খন্ড) দে'জ সং	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ. ৩৯২
৬।	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ. ১১০
৭।	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	:	ডঃ নিতাই বসু	পৃ. ১৫৪
৮।	তারাশঙ্কর : দেশ কাল-সাহিত্য	:	ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত)	পৃ. ৩৬
৯।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৬
১০।	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ১২৭

* * * * * * * * * *

একাদশ অধ্যায়

সামাজিক পরিবর্তনের ত্রিধারা

একাদশ অধ্যায়
সামাজিক পরিবর্তনের ত্রিধারা

সমাজ একটি ধারণা, অনুভূতির ব্যাপার; সমাজ একটা Process. সমাজের সংজ্ঞা হিসেবে ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেছেন, **"Society is a system of usages and procedures, of authority and mutual aid, of many grouping and divisions of controls of human behaviour and liberties."** (১)

সমাজকে উপেক্ষা করার সাধ্য কারও নেই। নিজ নিজ বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষ তার স্থান অধিকার করে। কিন্তু সমাজ অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহের ন্যায় গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। আদিম বর্বরযুগকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগে উপনীত ও অনাগত ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে চলা— সমাজের পরিবর্তনশীলতারই দৃষ্টান্ত। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কেবল সামাজিক কাঠামো ও তৎসম্পর্কিত কার্যাবলীর পরিবর্তন বোঝায়। এ প্রসঙ্গে Kingsley Davis বলেছেন, **"By Social change is meant only such alterations as occur in social organisation— that is, the structure and functions of society. Social change thus forms only a part of what is essentially a broader category called 'cultural change'. The latter embraces all changes occuring in any branch of culture, including art, Science, technology, Philosophy etc, as well as changes in the forms and rules of social organisation."** (২)

অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ **"Society : An introductory Analysis** গ্রন্থে বলেছেন **"Society exists only as a time sequence. It is a becoming, not a being; a process, not a product. In other wards, as soon as the process ceases, the product disappears."** (৩)

সুতরাং সমাজ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। অধ্যাপক L. Von Wise অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন— **"Society is a process, not a product."** (৪) অতীতের যে সমাজ ব্যবস্থা ছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা অভিন্ন নয়, পরবর্তিত প্রকৃতির। কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বহিরঙ্গে তথা অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে। আবার ইংরেজ সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপক মারিস জিন্সবার্গ বলেছেন, **"By social change I understand a change in social structure, e.g. the size of the composition or balance of its parts or the type of its organisation..... The term social change must also include changes in attitudes and beliefs."** (৫) সামাজিক কাঠামো, মানবীয় আদর্শ, মূল্যবোধ, আর্থিক অবস্থা, এমনকি স্তর বিন্যাসেরও পরিবর্তনকে বোঝায়। বাইরের আলো কিংবা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ। দ্রুতগতি, পারস্পরিক পৃথকত্ব পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি অনিশ্চিত, বৈচিত্র্য ইত্যাদি হল বৈশিষ্ট্য।

পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ প্রসঙ্গে Kingsley Davis বলেছেন, **".....interaction is possible because there is a structure, and change is possible because there is interaction".** (৬)

মার্কসবাদীগণ সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বুঝিয়েছেন। এই পরিবর্তন বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক নিয়ম সমূহের অধীন। মার্কসীয় দর্শন সামাজিক পরিবর্তন বলতে কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন বা রূপান্তরকে বোঝায় না। মার্কসবাদীরা মনে করেন যে সমাজের পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত মৌলিক পরিবর্তনে পরিণত হয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপর তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

সামাজিক পরিবর্তন বলতে বলা যায়, যে "মানব সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক ও মূল্যমানগত কাঠামোর পরিবর্তনই হল সামাজিক পরিবর্তন।" (৭)

সামাজিক পরিবর্তনের ধারা হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল—

ক) একাভিমুখী (Unilinary)

খ) পুনরাবির্ভাবশীল (Pendular)

গ) বিবর্তন সম্মত (Evolutionary)

সামাজিক পরিবর্তন সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। সেই পরিবর্তন বড়ই বিচিত্র। কোন পরিবর্তন সমাজের উন্নতির সহায়ক, আবার কোন পরিবর্তন জনকল্যাণের পরিপন্থী।

ক. একাভিমুখী ঃ- এই পর্যায়ে পরিবর্তন একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে সর্বদাই গতিশীল। এই পরিবর্তন মানুষের ধী, শক্তি ও মেধার ক্রমশঃ উন্নতি। ঐতিহাসিকগণ একে একাভিমুখী পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই পরিবর্তন জীবদেহ বা প্রাণীদেরও মধ্যে হতে পারে। তারাশঙ্করের 'জটায়ু', 'কালাপাহাড়' প্রভৃতি গল্প এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

১। জটায়ু ঃ- এ গল্পের নায়ক কর্মকারের ছেলে জন্ম পাগল জটে। বাবুদের সীতাহরণ পালা দেখার পর জটায়ু

পক্ষীর আত্মদান তাকে পাগল করে। জটায়ুর কথা ভাবতে ভাবতে সে রামায়ণের জটায়ুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। সে জীবনে প্রথম ও শেষ বারের মত সার্থক অভিনয় করেছে অর্থাৎ কালা গুন্ডার হাত থেকে শিবনাথবাবুর অসহায়া স্ত্রীকে রাতের অন্ধকারে রক্ষা করেছে, কালাকে হত্যা করেছে এবং নিজেও প্রাণ দিয়ে জটায়ু সাজার বাসনা চরিতার্থ করেছে। সমাজ জীবনে জটেপাগলের মত অনেকেরই জীবনে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ঘটনা প্রভাব ফেলে।

২। কালাপাহাড় ঃ- রংলাল চাষী। তার জীবনে উন্নতির মূলে ছিল কালাপাহাড় ও কুম্ভকর্ণ নামে দুই মহিষ। একদিন মনিবকে রক্ষা করতে গিয়ে কুম্ভকর্ণ মারা যায়, কালাপাহাড় সঙ্গীহীন হয়ে দুর্দান্ত হয়ে ওঠে। পুত্রপ্রতিম কালাপাহাড়কে বাধ্য হয়ে দালালের কাছে বিক্রি করে দেয় রংলাল। কালাপাহাড় কিন্তু যেতে চায় না। দুরন্ত গতিতে রংলালের কাছে যেতে চায়— এসে পড়ে শহরে, তার উদ্দামতা-তান্ডবতা দমন করতে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। রংলাল পুত্রাধিক স্নেহ করে জন্তুটির হৃদয় জয় করেছিল এবং কালাপাহাড়ও সব সত্তা দিয়ে রংলালের মাঝে থাকতে চেয়েছিল, তা পায়নি বলেই শেষে এই পরিবর্তন— যা পরবর্তী সমাজকে শিক্ষা দেয়।

খ) পুনরাবির্ভাবশীল ঃ- দোলকের ন্যায় সামাজিক পরিবর্তন। শুরুর বিন্দু থেকে পুনরায় অন্যবিন্দুতে গিয়ে আবার নিজ বিন্দুতে ফিরে আসা, অর্থাৎ ছান্দিক রূপে তারা পরিবর্তন। এই রীতি প্রতিষ্ঠান, মৌলিক লোকাচার ও লোকরীতির মধ্যেও দেখা যায়। এ ব্যাপারে 'রায়বাড়ি', 'কবি', 'পিতাপুত্র' প্রভৃতি গল্প উল্লেখ্য।

১। রায়বাড়ি ঃ- গল্পের জমিদার রাবণেশ্বর রায় দয়ামায়াহীন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি, স্ত্রীপুত্রের মৃত্যুতে নিরাসক্ত হয়ে সংসার ত্যাগের সংকল্প করেছেন, জমিদারী প্রজাদের জন্য দান করে গৃহত্যাগী হয়েছেন আবার পরক্ষণেই তিনি পুনরায় নিজ জমিদারীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

২। কবি ঃ- হাড়ির ছেলে কবি ও গায়ক নিতাই। তার পিতৃপুরুষ পরম্পরায় সিঁদেল চোর, ডাকাত, অথচ নিতাই সত্যসন্ধ, কোনো নেশা করে না। সে কুখ্যাত পরিচয় ত্যাগ করে সৎজীবন যাপন করতে চায়। মুচির ঘরের মেয়ে ঠাকুরঝিকে দেখে তার প্রণয় জন্মে, সে সংসারের স্বপ্ন দেখে জাত ধর্ম, বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে পায় না। তাই কবি আবার সংসারের আশা ত্যাগ করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে, অসৎ ও কুপ্রবৃত্তির সাথে সাথে সংসার গড়ার ইচ্ছাও ত্যাগ করেছে। নোংরা পরিবেশ থেকে সে সুন্দর জীবনে এসেছে।

৩। পিতাপুত্র ঃ- ন্যায়তীর্থ নিঃসন্দেহে প্রাচ্য মহাপন্ডিত, তথাপি আধুনিক সভ্যতা বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তীব্র উন্নাসিকতা বিদ্যামান। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় জ্ঞানী হয়েও পুত্র পিতার স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও আত্মহত্যা করেছে। এখানে সামাজিক-পরিবর্তন সনাতন ভারতীয় আদর্শ থেকে শুরু, মধ্যে আধুনিকতায় প্রবেশ এবং শেষে আবার ভারতীয়ত্বে উদ্‌গমন।

গ) কুন্ডলাকার পরিবর্তন ঃ- এই পর্যায়ে পরিবর্তন যে বিন্দুতে শুরু হয়, পরিবর্তন ঠিক সেই বিন্দুতে না হয়ে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমী হয়। একেই কুন্ডলাকার বা Spiral পরিবর্তন বলে। নিম্নলিখিত গল্প এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—

১। নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ- নুটু সামান্য শিক্ষক কিন্তু নিজ জমির ভাগীদার মহাভারতের উপর জমিদারের অত্যাচারের বদলা নিতে নুটু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। মহুরী থেকে সে উকিল হয়েছে, জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে। নুটু প্রতিজ্ঞার অনেকটাই পূর্ণ করেছে। জমিদারী দাপটকে চূর্ণ করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধনী হয়ে নুটু সেই জমিদারের সঙ্গেই আত্মীয়তা করেছে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবর্গ সকলেই মর্মাহত হয়েছেঃ বিরাগভাজন হয়ে তাকে ত্যাগ করেছে। নুটু জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করলেও শেষে নিজেকেই সমর্পণ করেছে তার কাছে।

২। দীপার প্রেম ঃ- দীপা শিক্ষিতা ও দাদুর একমাত্র নাতনি, পিতৃহারা কিন্তু হঠাৎ সে ভালোবেসে তাদেরই বাড়ির ঝি-এর দৌহিত্র দেবপ্রিয়কে (M.A. পাশ) বাড়ীর অমতে বিয়ে করে বসে। দীপা নাস্তিক ও এইভাবে বিয়ে করে সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী হলেও বিয়ের অল্প পরেই দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু হয়েছে এবং বিধবা হয়েছে, তাই বলে দ্বিতীয় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও একাকীই থেকে গেছে। আস্তিকই হোক আর নাস্তিকই হোক, ভালোবাসা সকলের উর্ধ্বে, এমন কি সমাজ জীবনকেও তা উপেক্ষা করতে সক্ষম।

৩। রাজপুত্র ঃ- বহু প্রাচীন আমলের জমিদারের বংশধর বিশ্বনাথ, বর্তমানে ভীষণ দরিদ্র। অভিনয় প্রেমী, দারিদ্র্যের কশাঘাতে তার পুত্র মারা যায়। সব কিছু সহ্য করেও বিশ্বনাথ নির্বিকার। অর্থনৈতিক পরিবর্তন সামাজিক জীবনে কি নিদারুণ প্রভাব ফেলে তার নিদর্শন এই গল্পটি। বিশ্বনাথ যা হতে চেয়েছিল তা না হয়ে হলো ক্যারিকেচারিষ্ট।

চৌকিদার ঃ- সহজ সরল সুখী দম্পতি চৌকিদার বনোয়ারী ও কমলি। বনোয়ারী রাত্রে পাহারা দিতে যাবার সময় কমলির ঘরে বাইরে থেকে শিকল দিয়ে যায়। একদিন নেশার ঘোরে, বনোয়াড়ি ঝোপের পাশে কমলির আবছায়া মূর্তি দেখে নিরপরাধা কমলিকে ত্যাগ করেছে। সমাজ বনোয়ারীর এই বিচার নীরবে মেনে নিয়েছে, কোন প্রতিবাদ করেনি।

অশিক্ষিত সম্প্রদায় নেশায় থেকে যে কত অঘটন কান্ডই না ঘটায়, এটি তার নিদর্শন।

ঘ) চক্রাকার বা Cyclical পরিবর্তন ঃ- এই পরিবর্তনের গতি চক্রাকার। অর্থাৎ যে প্রান্তে শুরু আবার সেই প্রান্তেই ফিরে আসা। এই গোত্রে নিম্নলিখিত গল্প ঃ—

১। তিনশূন্য ঃ- দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে কালোবাজারী, সুদখোর, লোভী শয়তান রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়। গরীব যুবক যুবতীদের আনাচে কানাচে ভিড়, সেই সুযোগে এক ধনী শয়তান সামান্য খাদ্যের লোভ দেখিয়ে নিজ কাম চরিতার্থ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। মেয়েটির পঙ্গু সন্তান হয়। সে হয় পরিচয়হীন। সেও একদিন রাতের বেলায় ঘুমন্ত কিশোরীর উপর অত্যাচার চালায়। যন্ত্র-সভ্যতা ও ধনতন্ত্রের প্রবেশে সমাজ-জীবনে মূল্যবোধ শূন্য হয়, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে এর ব্যাপকতা ঘটে। বর্তমান সমাজ-জীবনেও এর উদাহরণ যত্রতত্র সামাজকে ক্রমাবনতি ঘটিয়ে চলেছে।

২। রাজসাপ ঃ- অর্থনৈতিক সংকটে কত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বিপথগামী হয়, মূল্যবোধ, কর্তব্য হারিয়ে ফেলে। লোভের বশে অন্যায় কাজ করে এবং সমাজে বদনাম হয়। দরিদ্র মজুর ভবেশ ধনী হবার আকাঙ্ক্ষায় নিশাকর দত্তের বাড়ী থেকে রাজসাপ চুরি করে কিন্তু ধনী তো হয় না বরং সাপের বিষে মায়ের মৃত্যু হয়। শেষে সাপটাকে সাপুড়ের কাছে পাঁচ টাকায় বিক্রি করে দেয়। মূঢ়তার বশে এমনভাবে সমাজে সাময়িক অনেক পরিবর্তন ঘটে।

৩। প্রত্যাবর্তন ঃ- প্রত্যাবর্তন গল্পের নায়ক পশুপতি জাহাজে কাজ করে। দশ বছর পর এই জেলে-পুত্র গ্রামে ফিরে এসে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে মন জয় করে নেয় স্থানীয় সকলের। দিনরাত মদ্যপান করে সে। হঠাৎ বহুভর্তৃক সুন্দরী রমার প্রেমে বদ্ধ হয় এবং সংসারের স্বপ্ন দেখে। পিতামাতা ও সমাজের অন্যান্যরা বাধা দেয়, তবুও সংসার গড়ার কাজে সে এগিয়ে যায়। নতুন সংসার গড়তে দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজনে শহরে যায় কিন্তু আর ফিরে আসে না। রমা আত্মহত্যা করেছে। চলমান সমাজে চকিতে পশুপতির আগমনে সমাজে আলোড়ন, নিরীহ রমার মৃত্যু সবই ঘটেছে।

ঙ। বিবর্তন বা Social Evolution ঃ- পরিবর্তন যখন কোন একটি পূর্ব নির্দিষ্ট বিশেষ পরিণতির অভিমুখী হয় (যেমন বীজ থেকে বৃক্ষের পরিণতি) এবং যদি এই পরিণতি তার অন্তর্নিহিত প্রবণতা বা প্রকৃতির অভিব্যক্তি হয়, তা হলে তাকে "বিবর্তন বলা যায়। স্পেন্সার সমাজের বিবর্তনকে বলছেন "Super Organic Evolution"— অর্থাৎ বিবর্তন একটি সর্বজাগতিক নিয়ম। ম্যাকাইভার ও পেজ একে বলছেন, **"The grand key to the comprehension of change"**—"বিবর্তন পরিবর্তনের অর্থ উপলব্ধির মূল চাবিকাঠি।" (৮)

রাঢ়ের রুক্ষ মাটির কাঁকর ছড়ানো রূঢ় রুক্ষ প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা কাহার, বাউরী, বাগদী, বেদে, বৈষ্ণব নারী পুরুষ নারী-নাগিনীর পুরুষপরম্পরায় ক্রম বিবর্তনের তারাশঙ্কর যেন সার্থক বাজীকর। লাভপুরের চৌহদ্দী থেকে পঙ্ক্ষী, দ্বিজপদ, নিতাই, জ্ঞান ডাক্তার, ঠাকুরঝি তাঁর সাহিত্যে ওঠে এসেছে স্বমহিমায়। "কবি" গল্পের নিতাই রক্তে মাংসে লাভপুরের সতীশ। পূর্বপুরুষদের ঘৃণ্য জীবন ত্যাগ করে কবিত্বে উন্নীত হয়েছে —এতো বিবর্তনেরই উদাহরণ। 'কবি' উপন্যাসের ঝুমুর দলের বংশধরগণ মল্লারপুরে বাস করছেন, কেউ কেউ বোলপুরে কীর্তন ও যাত্রাপালায় অংশ গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, গোপাল, ভুবন মল্লালপুরেই ব্যবসায়ে মন দিয়েছেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকেই আর্থিক অনটন মেটাতে চাষবাসে মনোনিবেশ করেছেন। বেদে, যাদুকরী ইত্যাদি সম্প্রদায় হয়তো এই কারণেই আজ অবলুপ্তির পথে।

সমাজিক পরিবর্তনে পরিবেশগত, জৈবিক, সংস্কৃতিগত এবং মনস্তত্বমূলক কারণগুলি বিশেষ কাজ করে থাকে। সেগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে—

ক) পরিবেশগত কারণ (Environmental Factor)	খ) জৈবিক কারণ (Biological Factor)	গ) সংস্কৃতিগত কারণ (Cultural Factor)	ঘ) প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণ (Technological Factor)	ঙ) মনস্তত্ব মূলক কারণ (Psychological Factor)

ক) পরিবেশগত কারণ (Environmental Factor) ঃ- প্রাকৃতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ মানুষকে প্রভাবিত করে থাকে। মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির মূলে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী শ্রমশীলতার পার্থক্য ঘটে, বিভিন্নতা ঘটে যৌনাচারের। পরিবর্তিত হয় শ্রেণী সংগ্রামের।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশের যে ঐতিহ্যের পটভূমিতে ধীরে ধীরে সমকালীন পরিবর্তন ঘটেছে তারাশঙ্কর সেগুলিকে বিভিন্ন গল্পে আলোকপাত করেছেন। কৃষিপ্রধান ভারতীয় জনজীবনে ইংরেজদের দয়ায় শিল্পের প্রভাব বেড়েছিল

যার ফলে গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন এসেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পূর্বভারতের গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনের স্বয়ং নির্ভর গ্রামজীবনের যৌথ দায়িত্ব শেষ হয়। কিন্তু যাতায়াত ব্যবস্থার প্রসার ও অবাধ বানিজ্যনীতির প্রসারের ফলে ভারতে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ও আধুনিকীকরণ ঘটে নি। কিন্তু লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। গ্রাম্যজীবনে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ— জমিদারী ব্যবস্থায় কৃষক ও ক্ষেতমজুর শোষণের চরম রূপ। কৃষি ও কৃষক ব্যতিরেকে জমিদার স্থায়ী হতে পারে না, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামের' দেবু ঘোষ পুরানো সমাজব্যবস্থার শাসনযন্ত্রের ভাঙন লক্ষ্য করেছে। গ্রামের চাষীরা নিঃস্ব হয়ে শহরে কারখানায় কাজে যোগ দিচ্ছে। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'তে কাহাদের জীবনে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব ও প্রবীণের ঐতিহ্য ক্রমশঃ বিলীন হয়েছে। 'চৈতালী ঘূর্ণিতেও চাষীর জীবনে অসহায়তা প্রকট হয়েছে। এইভাবে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীগত সচলতার চিত্র তারাশঙ্করের মধ্যে ব্যাপকভাবে ধরা পড়েছে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নবজাগ্রত ধনতন্ত্রের সংঘর্ষ ও সামন্ততন্ত্রের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী তাও লেখক দেখিয়েছেন 'জলসাঘর' গল্পে।

তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনা হল দেশগঠনের, কিন্তু তা প্রাচীনকে উপেক্ষা করে নয়। তাই হয়তো সারা জীবন রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেও, বিভিন্ন দেশ ঘুরেও ভারতীয় সমাজতত্ত্বের অভ্যন্তরে সুদৃঢ়ভাবে তিনি প্রবেশ করেন নি, পারিবারিক ধ্যান-ধারণার মধ্যেই থেকেছেন। বুর্জোয়াকে কখনই সামন্তশ্রেণীর চেয়ে বেশী প্রগতিবাদী ভাবেন নি। যদিও 'চৈতালীঘূর্ণি'তে গোষ্ঠের মধ্যে দিয়ে বামপন্থী শ্রেণী-সংঘর্ষের স্বরূপ ব্যক্ত করতে চেয়েছেন কৃষক আন্দোলনকে ভিত্তি করে —কিন্তু তা খুব ক্ষীন। অহিংসাই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধারণা— "আমার কল্পনা ছিল এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে। উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে অভ্যুত্থান হবে অহিংস অভ্যুত্থান, পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন, সর্বপ্রথম। বুদ্ধের আবির্ভাব-তপস্যাবীজ গান্ধীজীর কর্মসাধনায় তা পরিণত হবে ফলবান বৃক্ষে।" (৯) অহিংসার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন "আমার অহিংসা দুর্বলের নয়, আমার অহিংসা আমাকে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি দেবে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি স্থির হয়ে তাঁর দিকে তাকাব।" (১০)

পুঁজিবাদের বিকাশ গ্রাম্যজীবনকেও প্রভাবিত করেছে। বীরভূমের কাঁকুরে রুক্ষ মাটি, অন্ধসংস্কার, অশিক্ষিতদের মনে বদ্ধমূল ছিল, জাতিভেদ ও বর্ণভেদ প্রকট হয়েছিল। বিশেষ করে মেয়েদের স্বাভাবিক মর্যাদা থেকেও বঞ্চনা করা হত বিশেষতঃ নিম্নজ শ্রেণীর মধ্যে। সেকালে গ্রামে এইরকম কোন না কোন রমণীর 'ডাইনী' অপবাদ ছিল। অথচ তারা ডাইনী সাজতে চায় নি— সমাজ তাদের জোর করে সাজিয়েছে। 'ডাইনী' গল্পে স্বর্ণ তাই ঈশ্বরের কাছে ভাল হবার বাসনা জানিয়েছে। ধীরে ধীরে এই সামাজিক কুপ্রথার উচ্ছেদ হবেই— এই ভেবেই লেখক স্বর্ণর হৃদয়াকুতি প্রকাশ করেছেন। কুসংস্কারের ভিত্তিতে এক গ্রামের নিরীহ মেয়ের দুর্ভাগ্য এখানে চিত্রিত।

সামাজিক পটভূমিকায় রচিত 'পৌষলক্ষ্মী'তে নবীনের সঙ্গে প্রবীনের দ্বন্দ্ব, শারীরিক দক্ষতা নিয়ে। এই দ্বন্দ্বে উদ্ধত আধুনিকতার হাতে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য মুকুন্দ পালের পরাজয়। বলিষ্ঠ শক্তিমান চাষী মুকুন্দ উঠতি চালের চোরাকারবারী শ্রীকৃষ্ণ পালের আস্ফালনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়। জরার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে অশিক্ষিত মুকন্দ গোপনে মদ খায় তবুও যৌবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে না। তাই মুকুন্দ মাঠে ধান কাটবার সময় মাটিতে পড়ে মারা যায়, ঠিক যেন মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত। প্রবীণ নবীনের প্রচন্ড আঘাত উপেক্ষা করলেও তা সাময়িক, বিদায় তাকে নিতেই হয়। তার স্থলে আসে নবীন ভুঁইফোড় চেকার (কৃষ্ণ) দল।

আদিম-প্রবৃত্তি তাড়িত বেদে, যাদুকরী সম্প্রদায় যাযাবর। সামাজিক নিয়মনীতি সেখানে নেই, কেবল উদ্দাম ভোগতৃষ্ণা— তাই তাদের মধ্যে যৌনাচারই জীবনের মুখ্য অবলম্বন। আধুনিকতার স্পর্শ গ্রামে আসার পর জীবন জটিল হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে এই বেদের দল কেউ হারিয়ে গেছে , কেউ কেউ স্থায়ী বসতি গড়েছে— এইভাবেও যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে তা লেখক দেখিয়েছেন। অনেকের মতে বেদেরা হীন-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে সমাজে অধঃপতিত হয়ে না থেকে লাভজনক ব্যবসায় বা কলকারখানায় যোগ দিয়েছে। ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সমাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

খ) জৈবিক কারণ ঃ- সামাজিক পরিবর্তনে জৈবিক কারণের প্রভাবকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হল লোকসংখ্যার গতি ও বংশগতি, জন্মহারের হ্রাসবৃদ্ধি ইত্যাদি ফলে সমাজ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে, আবার মৃত্যু হারের জন্যেও সমাজ প্রভাবিত হয়। এছাড়া অভিপ্রয়াণ (migration), জীবনযাত্রার মান ইত্যাদিও সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে।

লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামাজিক বিষয় প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেগুলি হল বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সন্তান উৎসর্গ ইত্যাদি সামাজিক প্রথা এবং জরা, ব্যাধি, মহামারী প্রভৃতি নিরাময় সংক্রান্ত সামাজিক কুসংস্কার বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক চোখে পড়ে।

জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে-বাড়ে, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমান্তর হারে। কালক্রমে এই খাদ্যাভাব ঘটে, দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী কেন্দ্রিকগল্প শ্মশানের পথে, 'মহামারী' 'সমুদ্রমন্থন' ইত্যাদি।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ধ্বংস হয় এবং বন্ধন ছিন্ন হলে চিত্তে আদিমতার উল্লাস দেখা যায়। তাছাড়া অভাব, আর্থিক সংকট নেমে আসে ও চারিত্রিক শৈথিল্য ঘটে। 'পঞ্চরুদ্র,' 'বন্দিনী কমলা'—এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রাহ্মণ পরিবারের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে তাদের মানবিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে, দেবোত্তর সম্পত্তিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে 'পঞ্চরুদ্র' গল্পে। অর্থে, যশে, প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ পরিবার রাজহাটের 'রায়বাড়ি'। গোপীবল্লভ বুদ্ধিমত্তায় ও পরিশ্রমে যে বিশাল সম্পদের অধিকারী হলেন, ৪র্থ পুরুষে তা ধ্বংস প্রায়। পরিবারের সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে, নেমে এসেছে দারিদ্র্য 'বন্দিনী কমলা' গল্পে।

১। অগ্রদানী ঃ- জমিদার ও সামন্তযুগ থেকেই ব্রাহ্মণগণ ছিলেন উপস্বত্বভোগী শ্রেণী। অলস, কর্মহীন, কেবল পূজা অর্চনা করে বহু বিবাহ ও বহু সন্তানের পিতা সেজে ঠাকুর মশাই বলে সমাজে গণ্য হতেন। ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হলে মানুষের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তিভাব কমতে থাকে, জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয় বা তাদের দাপট অস্তমিত হয়। ফলে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কেবল শ্রমবিমুখ হয়ে পরস্মৈপদী জীবন যাপন করেন। তাঁরা বিবাহ করেন ও বহু সন্তানের পিতা হন, সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হন তথাপি দারিদ্র্যের কশাঘাতে নির্লজ্জের ভূমিকা পালন করেন। সামান্য অর্থ ও ভূসম্পত্তির জন্যে নিজসন্তানকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। এই গল্পে ব্রাহ্মণদের সমাজে কি পরিবর্তন হয়েছে তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন লেখক যদিও উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও সমাজে ছিলেন—তাঁরা অবশ্য মুষ্ঠিমেয়।

২। শ্মশানের পথে ঃ- পল্লীশোষণ ও শহর বাঁচানোর স্বার্থে গ্রাম শ্রীহীন হয়েছে, শত শত সম্ভ্রান্ত কৃষক পথের ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে। গোষ্ঠ তাদেরই একজন, সর্বস্বান্ত সে, দুর্ভিক্ষে অনাহারে ক্লিষ্ট। কাবুলিওয়ালা, মহাজন ও জমিদারের পেয়াদাদের আক্রমণে জর্জরিত। একমাত্র সন্তানের অসুখে ওষুধ দিতে সে পারে না। তার সন্তান মারা যায়। দুর্ভিক্ষ ও শোষণ শুধু গোষ্ঠকেই নয় বহু পরিবারের জীবনে এনেছে সন্ধ্যা।

৩। মহামারী ঃ দেশে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি শুরু হলে গ্রামের সমাজ-জীবনে কী ভয়াবহতা নেমে আসে তার বাস্তব চিত্র এই গল্পটি। লেখকের সময়েও গ্রামে গ্রামে এই মর্মান্তিক ঘটনা যে ঘটত তা তারাশঙ্কর নিজের চোখে দেখেছিলেন, "গ্রামে গ্রামে কখনও খাজনা আদায় উপলক্ষে, কখনও সেবাধর্ম উপলক্ষে, ঘুরবার সময় গ্রামের অবস্থা আমার চোখে বিচিত্র রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল।" (১১)

এখানে রামায়ণ গান করতে এসে মূল গায়েন তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করেছেন। পরদিন দলেরই একজনের কলেরা রোগ দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়লে গ্রাম ছেড়ে সকলে চলে যায়।

৪। সমুদ্রমন্থন ঃ- অনাবৃষ্টির দাবদাহ ও দুর্ভিক্ষের করাল চিত্র এই সমুদ্রমন্থন গল্প। ধনী উমা ও রমার সংসারে এক কঙ্কালসার রমণী ভাত ও আচার চায়। তৃতীয় দিন রাত্রে ছাগল ঘরে ছাগলের চিৎকারে উমা টর্চ হাতে বাইরে এসে দেখেন যে পূর্বের সেই ভিখারিণী ভয়ে মূর্চ্ছিতা হয়েছে। দরজায় আঘাত শুনে উমা খিল খুলে এক শীর্ণ লোককে তীব্র যন্ত্রণায় কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকতে দেখে তার যন্ত্রনার তীব্রতায় সে তার বুকে হাত বুলাতে থাকে। পরে জানা যায় যে সে তারই স্বামী। ডাক্তার তাকে মাংস খাওয়াতে বলেছিল বলে মেয়েটি ছাগল চুরি করতে আসে। অন্নাভাব মানুষকে কত নীচেয় নামাতে পারে তা তারাশঙ্কর এখানে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সনাতন ভারতের দাম্পত্য জীবনের গূঢ় সম্পর্কের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ. সাংস্কৃতিকগত কারণ ঃ- মানুষের সঙ্গে অন্যান্য জীবের পার্থক্য হল সংস্কৃতিগত। সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতিগত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়, সমাজ থেকে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বিদূরিত হয় এবং শুভকে গ্রহণ করতে মানুষ ব্রতী হয়। সংস্কৃতি সমাজের মানসিক সম্পদ— সভ্যতা তার বহিঃপ্রকাশ, বাহ্যিক রূপরেখা। সংস্কৃতিই মানুষের সাধনা, চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধ, ধর্ম ও নীতিজ্ঞান। আবার প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগে সমাজে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তার মধ্যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায়। 'কবি' 'উপন্যাস ও গল্প', 'মালকার', 'চন্দ্রজামাইয়ের জীবনকথা' প্রভৃতি এ পর্যায়ের গল্প।

কবি ঃ- মাঘী পূর্ণিমায় চামুন্ডাপূজা বা চন্ডীপূজা উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় কবিগানে কবিয়াল নোটনের টাকা না পেয়ে পলায়ন, মহাদেব কবিয়াল ও তার দোহরের কবির লড়াই এবং এই উৎসবেই কবি হিসেবে নিতাইয়ের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা লাভ। বংশ পরম্পরায় কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করে আদর্শ চরিত্ররূপে নিতাই-এর আবির্ভাব। এই কাহিনী 'কবি' উপন্যাসে ও গল্পে পরিস্ফুট।

মালাকার ঃ- পুরুষ-পরম্পরায় নেশায় ও নারীতে আসক্ত— রজনী মালাকারও তাই। কারিগর হিসাবে সে প্রতিভাধর পুরুষ। যা আয় করে তা সবই সেঙাতিনীদের মনোরঞ্জনে ব্যয় হয়ে যায়। বাবুদের প্রতিমাকে ডাকের সাজ দেবার জন্যে বায়না নেয়। সে জিনিসপত্র কেনার জন্যে সেঙাত কালী সিংয়ের কাছ থেকে ত্রিশ টাকা ধার করে মেলায় যায় কিন্তু সেখানে রূপোপজীবিনীদের নেশায় সে হয় সর্বরিক্ত। মনসাতলায় পূজার্থিনীদের মধ্যে একজনের শিশু-কন্যার

গলার হার চুরি করে জিনিস কিনে প্রতিমা সাজাতে যায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিড় করেছিল। একটি মেয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কাতরস্বরে রজনীকে বলেছিল, "ডাক দাও। মালাকার! ওই এমনি হার দাও।" এই মেয়েটি রজনীর জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। এরপর রজনী অন্য মানুষ হয়ে যায়— সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। প্রতিমা তৈরীর জন্যেই রজনীর জীবনে এই পরিবর্তন।

চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা ঃ- ঘর জামাই, সু-অভিনেতা চন্দ্রবাবু শ্বশুরালয়ে সর্বদা থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অভিনয় পাগল চন্দ্র জামাই কোন অভিনেতার ভুল দেখলেই তাকে শাস্তি স্বরূপ চপেটাঘাত করতেন। বন্দেমাতরম্ ছিল থিয়েটার ক্লাবের নাম। দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার আসে এবং রাজনৈতিক কারণে থিয়েটারের নাম বদল করে "অন্নপূর্ণা থিয়েটার" রাখা হয়। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কিছুদিন বাদে চন্দ্রজামাই-এর মানসিক পরিবর্তন আসে এবং তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে যান।

ঘ. প্রযুক্তিবিদ্যাগত কারণ ঃ- বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং শিল্পের প্রয়োগ কৌশলের ফলে মানসিকতা এবং সামাজিক পরিবর্তনে সহায়তা হয়েছে। " জন্মের আভিজাত্য, শিল্পকলার রীতি ও প্রকৃতি, সংরক্ষিত পল্লীজীবন ও সভ্যতা, যৌন সম্পর্ক ও অধিকার ধর্ম রাজনীতি, এমনকি ক্ষাত্রনীতি ও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দ্বারা অকল্পনীয়ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। এমন কি নারী পুরুষের সম্পর্ক, পিতা পুত্রের সম্পর্ক, গুরু শিষ্যের সম্পর্ক-এই সকল ক্ষেত্রেও যন্ত্রযুগের ভাবধারার অনুপ্রবেশ হইয়াছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির আধিপত্য অবিসংবাদিত।" (১২)

বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশের ফলে মানুষের মন থেকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূরীভূত হচ্ছে, যুক্তিবাদী হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তন কোন না কোন ধরণের সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে থাকে। তাই প্রযুক্তিবিদ্যার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে ফস্টার বলেছেন, **"It (Technology) does not simply mean the crest acceptance of material and technical improvements. It implies a cultural, Social and psychological process as well."** (১৩)

সামন্ততান্ত্রিক ও কৃষিভিত্তিক পল্লীজীবনে ইংরেজদের আগমনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে, ঘটে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা ও কারখানার আগমন। করভারে জর্জরিত বিলীয়মান জমিদার, ভূমিহীন কৃষক ধীরে ধীরে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাত্রা করেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার-তনয় তারাশঙ্কর জন্ম নিলেন সমাজের এক ক্রান্তিকালে— যেখানে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে আধুনিক পশ্চিমী নগরতন্ত্র, ব্যক্তিনির্ভর এক নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজ চেতনা। তিনি দেখালেন, "গ্রামীন সমাজ কি ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, যন্ত্রসভ্যতা আর কৃষি সভ্যতার দ্বন্দ্ব, জমিদার আর ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা— আধুনিক ইনডাস্ট্রি কিভাবে সংরক্ষিত গ্রামীণ সমাজের শাসন ও অবরোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, কি ভাবে আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য গ্রামের অবহেলিত মানুষকে সমাজ ভেঙ্গে আসতে প্রলুব্ধ করছে, কি ভাবে শতাব্দী-সঞ্চিত সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিমূল আলগা হচ্ছে তার বিশ্বস্ত ছবি অভিজ্ঞতার রসে পুষ্ট করে উপস্থাপন করেছেন রুক্ষ ভয়াল-অসংশোধিত ভাবেই। এখানেই তারাশঙ্করের পূর্ণতা ও স্বকীয়তা। তিনি কেবল প্রতিমা গড়েন নি, তাতে দিয়েছেন তাজা রক্তাক্ত হৃৎপিন্ড।" (১৪)

'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০) এবং উত্তরকালে 'পদচিহ্ন' (১৯৫০)-এ অর্থনীতি ও যন্ত্রসভ্যতা ইত্যাদি বিচিত্রশক্তির চাপে সামন্তজীবনের ক্ষয় ও ক্রমবিলোপের ছবি আছে। বাঙলার এক যুগের অবসান ও আধুনিক পশ্চিমী ধনতন্ত্র ও যন্ত্রসভ্যতা গ্রাম-নির্ভর এদেশের ভিত্তিমূলকে শিথিল করেছে। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৩৫৮) উপন্যাসে মূল বিরোধ কৃষি ও শ্রমের। এখানে যুগপ্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, কারখানায় শ্রমিকের প্রয়োজন, কাঁচা টাকার ছড়াছড়ি ইত্যাদির প্রভাব এখানে আছে। যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে দেবতার স্থানে ঠিকাদারের অফিস হয়েছে। কাহার-পাড়া ধ্বংস হয়েছে। "লেখক 'চৈতালীঘূর্ণি' (১৯৩১) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করেন।" (১৫) জমিদার, মহাজন ও কাবুলিওয়ালার অত্যাচারে ও শোষণে পল্লীর শান্তজীবন অশান্ত, তাই বাঁচার তাগিদে স্ত্রীর হাত ধরে গোষ্ট শহরে এসে কারখানায় কাজ করে। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার যূপকাষ্ঠে সৃজনশীল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়। গোষ্ট ধর্মঘটে যোগ দেয়। অনশনরত শ্রমিকদের খাবারের জন্যে দামিনীর শেষ সম্বল বালা দুগাছি সে অম্লানবদনে দিয়ে দেয়। কিছু শ্রমিক কাজে যোগ দিলেও গোষ্ট দেয় নি, "জান দেগা, লেকিন নেহি যায়েগা" (১৬) বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। যন্ত্র সভ্যতায় শ্রমজীবী মানুষ মালিকের বিরুদ্ধে যে জোটবদ্ধ হতে বাধ্য হয়, তাও লেখক সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে অঙ্কন করেছেন। প্রযুক্তিবিদ্যার আগমনের ফলে, "নূতনের কাছে পুরাতনের পরাজয় ঘটেছে, জমিদারদের স্থান অধিকার করেছেন মিল মালিকেরা চাষীরা পরিণত হয়েছে শ্রমজীবীতে।" (১৭)

উপন্যাসের মত তিনি বহু ছোটগল্পের মধ্যেও প্রযুক্তিবিদ্যাগত সামাজিক পরিবর্তন ও প্রভাব লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমন 'ময়দান' 'জলসাঘর' 'মুখুজ্জে মশাই' 'খাজাঞ্চিবাবু' 'হরিপন্ডিতের কাহিনী' 'কান্না' 'ময়দান' 'মানুষের মন' ইত্যাদি গল্প।

১। **ময়দান** ঃ- প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্পের ধ্বংস হয়েছে, মালিক শ্রেণী লোভী স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। মানুষের হৃদয় থেকে মূল্যবোধ অস্ত যাচ্ছে— কেবল মুনাফা অর্জনই জীবনে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই শক্ত সামর্থ্য পনেরো ষোলো বছরের ফণী কামার আজ ষাট বছরের প্রৌঢ়কর্মী— যে জীবনের সব কিছু দিয়ে কলিয়ারীর ফায়ার ব্রিকস কারখানায় ছোট্ট মেশিনটাকে সচল রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিড়িকে ছোট কারখানাটি যন্ত্রদানবে পরিণত হল। মালিক বিদ্যুতে মেশিন চালাবে তাই বৃদ্ধ ফণীর দরকার নেই। দুঃখে, স্মৃতির রোমন্থণে বিহ্বল ফণী কারখানার ভিতর দিয়ে যাবার সময় অসাবধানতা হেতু চলন্ত মেশিনের দাঁতের চাপে মারা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যা আজ মানুষের হৃদয়কে কৃত্রিম করেছে, কেড়ে নিয়েছে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা।

২। **'খাজাঞ্চিবাবু'** ঃ- হিসাব রক্ষক বদিবাবুকে ষাট বছর বয়সে হঠাৎ তিন মাসের মাইনে বোনাস দিয়ে বিদায় দিয়েছে সদ্য উদীয়মান শিক্ষিত নতুন ম্যানেজারবাবু। ছোট্ট জমিদারীকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন বিষ্ণু মুখার্জী, অথচ তাঁরই ভাইপো (দূর সম্পর্কীয়) কলকাতায় ব্যবসা করে কাঁচা পয়সার মালিক হয়েছেন। অর্থ, যশ ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা বোধ কেড়ে নিয়েছে, তাই হীরেন্দ্র অতি সহজেই বৃদ্ধ বিষ্ণুবাবুকে জবাব দিয়েছেন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ভবিষ্যৎ চলবে কিসে তার সামান্য ব্যবস্থাটুকুও তিনি করেন নি। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার ফসল হীরেণ বাবু 'মুখুজ্জেমশাই' গল্পে প্রতিফলিত ।

৩। **মধুমাস্টার** ঃ- মধুমাস্টার বই লেখার কাজে কলকাতায় ছাত্র সতীশ নামে খ্যাতিমান উকীলের বাড়িতে থাকতে চেয়েছেন, কিন্তু ছাত্র সতীশ মানবতা ভুলে, মর্যাদাজ্ঞানকে তুচ্ছ করে অর্থের দম্ভে ও মোহে শিক্ষককে অপমান করেছে।

৪। **হরিপন্ডিতের কাহিনী** ঃ- হরিপন্ডিত আদর্শ শিক্ষক। দরিদ্র সন্তান ফড়িংকে শিক্ষা দীক্ষায় আদর্শ ছাত্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ফড়িং উত্তীর্ণ হয়। সেই ফড়িং-এর অনুযোগক্রমে পন্ডিতের চাকরী যায়। পন্ডিতের মৃত্যুর সময় ফড়িং কেবল একটি গাঁদার মালা দেয় অথচ পন্ডিত ফড়িং এর কাছ থেকে অনেক আশা করেছিলেন। রাজনীতি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় বলীয়ান ফড়িং শিক্ষক মশাইয়ের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাবোধ দেখায় নি।

শহরে গজিয়ে ওঠা বড় বড় কারখানায় নিযুক্ত হয়ে হাজার হাজার কৃষক শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। তারা শহরে জমায়েত হয়, গজিয়ে ওঠে বস্তি। ধীরে ধীরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে বস্তির জীবনে নেমে আসে নানারূপ অসামাজিক কার্যকলাপ— খুন, জখম, ধর্ষণ, বোমাবাজি, দাঙ্গা। এর পেছনে মালিক পক্ষ বা ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত থাকে। চরিত্রহীন, শয়তান, গুন্ডাবাজির আখড়া হয় বস্তির জীবনে। এই ধরণের চিত্র সম্বলিত গল্প লিখেছেন তারাশঙ্কর, যার মধ্যে 'কান্না' 'ময়দান' প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য।

৫। **জলসাঘর** ঃ- ইংরেজ ঔপনিবেশিক প্রভুদের দয়ায় এক শ্রেণীর অর্ধগঠিত সদ্য গজিয়ে ওঠা উদ্ধত আধুনিক ভুঁইফোড় উঠতি ব্যবসায়ী ধনীর জন্ম হয়। একদিকে রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লাখনির কাঁচা টাকার জ্বলন্ত প্রভাত, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বিদায়-সন্ধ্যা। তাই রায়বাড়ির সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভর রায় দেউলিয়া হয়ে, স্ত্রী পুত্র কন্যাকে হারিয়ে ভগ্নপ্রায় আভিজাত্যে অটল থেকে বিশাল জমিদারীর প্রাসাদের এককোণে আত্মগোপন করে থাকেন, অন্যদিকে সদ্য ধনতন্ত্রের মালিক মহিম গাঙ্গুলী সামন্ত আভিজাত্য ও মর্যাদাকে টাকা দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছে। আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে একদিন আত্মগোপন ত্যাগ করে জলসাঘরে প্রতিযোগিতায় আসর বসান রায়বাবু কিন্তু মহিম গাঙ্গুলীর ডায়নামোর প্রজ্জ্বলিত বিজলি বাতির আলোর কাছে বিশ্বম্ভরের ঝাড়লণ্ঠনের পরাজয় অনিবার্য হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, কারখানাবৃদ্ধি, ব্যবসায় মনোনিবেশ, নগদ টাকায় সৃষ্টি মুষ্ঠিমেয় ধনতন্ত্র—আভিজাত্য বা সৌজন্য লেশহীন। তথাপি ধনতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

৬। **মানুষের মন** ঃ- যন্ত্রসভ্যতার আশীর্বাদে কাঁচাপয়সার আমদানী হয় অনেক বেশী। একদিকে ভারতের সদ্য স্বাধীনতা লাভ, অন্যদিকে কালোবাজারির সংখ্যা বৃদ্ধি ফলে রাতারাতি গজিয়ে ওঠে ধনতন্ত্র। ধনীর ঘরে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় পাশ্চাত্য কায়দায়। সনাতন ভারতীয় আদর্শকে তারা মর্যাদা বা মূল্য দিতে চায় না, লক্ষ্য হয় কেবল অর্থ। তাই ধনীর কন্যা সুভাষিণী স্বদেশী, বিপ্লবী, আদর্শবাদী স্বামী ভবেন্দ্রকে অর্থহীন বলে ঘৃণা করে। সংসারে দিবারাত অশান্তির ঝড় ওঠে। তাই শান্তির জন্যে ভবেন্দ্র ঘর ছাড়ে। এদিকে বাপের বাড়ী গিয়ে সুভাষিণী নতুন জীবনের সন্ধান পায়। দাদা বৌদিও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তাকে এই পথে যেতে শিক্ষা দেয়। ফিরে আসে শ্বশুর বাড়ীতে— স্বামীর ফটোতে রোজ প্রণাম করে। এবং নৈশ বিদ্যালয় ও মেয়েদের স্কুলে চাকরী করে। এদিকে ভবেন্দ্র এক মিলিটারী অফিসারের দৌলতে মিলিটারী কন্ট্রাকটারী করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে ঘরে ফেরে মদ্যপ হয়ে। সেই অভিমানে সুভাষিণী আত্মহত্যা করেছে। এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী সুভাষিণী নিজেই এবং প্রযুক্তিবিদ্যাগত আধুনিকতা।

৬. **মনস্তত্ত্বমূলক কারণ** ঃ- মানুষের ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আগ্রহ ও মনোভাবে সমাজজীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা হল সামাজিক পরিবর্তনের মনস্তত্ত্বমূলক কারণ। গতানুগতিক অতৃপ্তি, প্রচলিত নীতি বোধের পরিবর্তন, আত্মকেন্দ্রিকতা,

স্বাতন্ত্র্যবোধ, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব, রুচিবোধের পরিবর্তন, অনুকরণ মোহ, নব আদর্শে বিশ্বাস, প্রগতিমূলক ও নবনব চিন্তাধারা, প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বন্দ্ব বা সংঘাত, প্রতিন্যাস (attitude), অতৃপ্তিজাত আকাঙ্খা, ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত যে সামাজিক পরিবর্তন তাকেই মনস্তত্ত্বমূলক সামাজিক পরিবর্তন বলে। প্রগতিশীল সমাজ গঠনে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। 'নটু মোক্তারের সওয়াল', 'শিবালীর অদৃষ্ট', 'পিতাপুত্র', 'কবি', 'বোবাকান্না', 'মাটি', 'ডাকহরকরা' প্রভৃতি গল্প এই বিষয়ে উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন— 'গণদেবতা' ঔপন্যাসে শ্রেণীগত ও বর্ণগত সংঘাত ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। শ্রেণীগত বিরোধ শেষ পর্যন্ত জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে; স্বদেশী যতীনের প্রেরণায় গ্রামবাসী দেবনাথের পল্লীমঙ্গলের কাজে মেতে ওঠে। অন্যদিকে দেখা যায় যে নিম্নবর্ণের মহাজন উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত অথচ ঘাতককে অবলীলাক্রমে অপমান করেছে।

যুগ যুগ ধরে মহাজনী জমিদারী শোষণ ও অত্যাচারের হাতে থেকে মুক্তি পেতে এবং সমগ্র কাহার সম্প্রদায়কে মুক্ত করতে করালী প্রবীনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে, 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে।

প্রাচীন বিশ্বাসের ও নিদানের বিরুদ্ধে আধুনিক আত্মবিশ্বাসী বাস্তববাদী ডাক্তার প্রদ্যোত গর্জে উঠেছে, শেষে দুই প্রজন্মের সংঘাত শেষ হয়েছে, প্রধান জীবন ডাক্তার নবীন প্রদ্যোতের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে। অনেক উপন্যাসেই তারাশঙ্কর এইভাবে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের নিখুঁত ছবি অঙ্কন করেছেন।

১। নটু মোক্তারের সওয়াল ঃ- সহজ, সরল, আদর্শবাদী শিক্ষক নটু বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিত্তশালী জমিদার গৃহে দারিদ্র্য হেতু স্ত্রী অপমানিতা হলে কলির দুর্বাসার মত জেগে ওঠেন নটু। জমিদার নটুর ভাগচাষী মহাভারতকে উৎখাত করলে নটু জমিদারকে জব্দ করার প্রতিজ্ঞায় কৃতসংকল্প হন। তাই মহুরী ও পরে ওকালতি পাশ করে আদালতে সওয়াল করে জয়ী হন এবং জমিদারের কঠিন সাজা হয়। এইভাবে অদম্য ইচ্ছা নটুকে জয়ের মালা পরিয়ে দেয়। কিন্তু বিত্তশালীদের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তিনিই বিত্তশালী হয়ে তাদের বন্ধু হয়ে যান, এবং তাঁর নীতি বোধের পরিবর্তন ঘটে। যে জমিদার তাঁরই চিরশত্রু তাঁর নাতনীর সঙ্গেই নটু বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। এই পরিবর্তন প্রচলিত নীতিবোধের পরিবর্তন বলা যেতে পারে।

২। শিবানীর অদৃষ্ট ঃ- স্বর্ণকারের কন্যা, বিধবা দরিদ্র শিবানী কপাল গুণে এক অধ্যাপক দম্পতির গৃহে পরিচারিকার কাজ পায়। তাঁদের শিক্ষায়, আদরযত্নে শিবানী যেন নবজন্ম লাভ করে। কিন্তু অধ্যাপক দম্পত্তির দাম্পত্য সুখে সে ঈর্ষান্বিত হয় এবং অধ্যাপকের স্ত্রীকে বিষ মাখানো মাছ খাওয়াতে যায়, কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাসে শেষে এই মাছ শিবানীকেই খেতে হয়। অবশ্য চিকিৎসার পর সে বেঁচে যায়। অতৃপ্তিজাত আকাঙ্খাই এই গল্পের মূল কারণ।

৩। কবি ঃ- নিতাই ডোম কবিয়াল হয়, ঠাকুরঝিকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ঠাকুরঝি যখন রাজাকে বিয়ে করে বসে তখন নিতাইয়ের সব প্রচলিত জীবনের মূল্য হারিয়ে গেছে, সে নব আদর্শে বিশ্বাস করে রেলগাড়িতে চেপে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়। নিতাইয়ের নব আদর্শ হল, "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয়।"

৪। বোবাকান্না ঃ- বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব। পরিশেষে দুইয়েরই পরাজয়। বোবামায়ের ছেলেটাকে বাঁচাতে না পেরে ত্রিপুরা ভট্টাচার্য পূজা ছেড়ে দিয়েছেন, ডাক্তার মৃত্যুকে স্বীকার করে ভাবাবেগে তলিয়ে গেছেন, চির পরিচিত চোর-শশী আত্মহত্যা করেছে, আর বোবা মায়ের অব্যক্ত কান্না যেন মূক পৃথিবীর কান্নায় পরিণত হয়েছে— যা চিরন্তন ও শাশ্বত ভারতের নারী জাতির মর্মবাণী।

৫। পিতাপুত্র ঃ- ইংরেজি বিদ্যা বিশারদ প্রগতিশীল পুত্র শশিশেখরের সঙ্গে টোল ও সংস্কৃত-পন্থী পিতা ন্যায়তীর্থের সংঘাত। পুত্রের দেশজোড়া খ্যাতি পিতা সহ্য করতে পারেনি, তাই দুঃখে ও ক্ষোভে পুত্র আত্মহত্যা করেছে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এখানে মুখ্য।

৬। মাটি ঃ- মাটির মমতায় ও মাটিকে ভালবেসে মেওয়ালাল জীবনে বহু মূল্য দিয়েছে, এমন কি তার প্রাণাধিক লছমনিয়া ঘৃণিত সাহেবের অঙ্ক শায়িনী হয়েছে, তথাপি জীবন সায়াহ্নে এসে মেওয়ালালের কোন ক্ষোভ নেই। গঙ্গা মাটি সারা অঙ্গে লেপন করে লৌকিক ক্ষোভ, দুঃখ, বাসনা, কামনা, অহমিকা, সব কিছুর মোহ ত্যাগ করে এক অনাস্বাদিত আনন্দের জগতে সে উত্তীর্ণ হয়েছে।

৭। ডাকহরকরা ঃ- কর্তব্যনিষ্ট পিতা ও লোভী, শ্রদ্ধাহীন, মদ্যপ পুত্রের দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদ।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে সামাজিক পরিবর্তনের যে ত্রিধারা এবং তার কারণসমূহ যে গল্পগুলিতে এখানে বিশ্লেষিত ও আলোচিত হল সেগুলি জল অচল (Watertight compartment) ভেদে বিভক্ত নয় বলেই অনেক গল্পেই একাধিক রূপ ও কারণ বর্তমান।

ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন

ভারতীয় সমাজ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন তেমনি ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তন আলোচনা করা আরও কঠিন। কারণ কোন একটি ধারাপথ প্রলম্বিত করে ভারতীয় সমাজ গঠিত হয় নি। বহুধারা নিয়ে ভারতীয় জন সমুদ্রের সৃষ্টি। বিশাল আয়তন, বহুভাষা ভাষী, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, নানা জাতির বর্ণ সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। তাদের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, ধরণ-ধারণ, আচার ব্যবহার উৎসব অনুষ্ঠন, পোষাক পরিচ্ছদ—ইত্যাদির মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কেউ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। আবার কেউ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পক্ষপাতী। এক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি প্রাচীন পন্থার দিকে, অন্য সম্প্রদায় পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শের অনুসারী। "১৮৬১ সালে পাদ্রী লঙ সাহেবই প্রথম সমাজতত্ত্ব বিষয়টির গুরুত্ব ভারতবর্ষে প্রচার করেন।" (১৮) তথাপি সর্বভারতীয় মৌলিক সমাজ সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি আজও হয় নি। তাই সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা অত্যন্ত জটিল। কখনও এই পরিবর্তন সুপ্তভাবে, কখনও অপরিকল্পিতভাবে, কখনও মন্থরগতিতে, কখনও দ্রুতলয়ে সকলের জ্ঞাতসারে সংঘটিত হয়েছে। ভারতের সামাজিক পরিবর্তনের ধারা তাই অসংখ্য, তথাপি একাধিক সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ ভারতের সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যেমন—এম. এন, শ্রীনিবাস, নির্মলকুমার বসু, কে. এম. কাপাডিয়া, বি. কুপ্পুস্বামী, অধ্যাপক বটোমোর প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদগণের নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া

অষ্টাদশ শতক থেকে ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন (ক) পশ্চিমীদের প্রবেশ ও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা (খ) কুটির শিল্পের ধ্বংস ও সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গন। (গ) ভারতের স্বাধীনতা লাভ। (ঘ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন (ঙ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আইনের প্রবর্তন। (চ) সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা। (ছ) সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ। (জ) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণসংযোগের মাধ্যমগুলির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও বিস্তার। (ঝ) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রয়োগ। (ঞ) ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। (ট) সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব। (ঠ) নগরায়ণ (ড) শিল্পায়ণ (ঢ) পাশ্চাত্তীকরণ (ণ) আধুনিকীকরণ (ত) সংস্কৃত্যায়ণ প্রভৃতি।

উপরিউক্ত বিষয়াদির দ্বারা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন ভারতের সমাজজীবনে সাধিত হয়েছে।

পরিবর্তনের প্রকৃতি ঃ- বর্তমান ভারতের সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রকৃতি বিচিত্র ধরণের। যেমন সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্দিষ্ট হয়—

ক। ব্যক্তির অর্জিত সামাজিক পরিচিতির মাধ্যমে। ব্যক্তি যোগ্যতানুযায়ী বৃত্তি পরিবর্তন করতে পারে; জন্মসূত্রের জন্যে কোন বাধা হয় না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন কাজ যোগ্যতানুযায়ী গ্রহণ করতে পারে। যেমন—ডাকহরকরা ঃ- বীরভূমে ডোম জাতি বললেই দুর্ধর্ষ ডাকাত বোঝায় অথচ দীনু ডোম বংশে জন্ম গ্রহণ করেও রানারের কর্তব্য ও নিষ্ঠায় নিজেকে সমাজে উচ্চস্থানে আসীন করেছে। "নুটু মোক্তারের সওয়াল" গল্পে নুটু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছেন। তাঁর বৃত্তি সৎ আদর্শবান গ্রামীন শিক্ষক। অপমান ও লাঞ্ছনায় তিনি বৃত্তি পরিবর্তন করেছেন। ওকালতি পাশ করে বেশ প্রসার ঘটিয়ে সমাজে নিজেকে যোগ্যতানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটি প্রেমের গল্প-এ সাঁওতাল কালো সুন্দরী রমণী ফুলমণি প্রথম জীবনে সংসার পাতে কিন্তু দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না, আত্মহত্যা করতে গিয়ে সে জেলে যায়। দুবছর পর সে মুক্তি পায় ও হাসপাতালের নার্স এর কাজ করে।

খ। বৃত্তির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ও বিশেষীকরণ ঘটেছে। সেই সঙ্গে সামাজিক গতিশীলতার বৃদ্ধি।

স্বাধীন ভারতবর্ষে শিল্প, বাণিজ্য কারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ফলে নবনব বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে।

১। রাজপুত্র ঃ- প্রযুক্তি-বিদ্যার ব্যাপক প্রসার, জমিদারী লোপ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে বহু সম্ভ্রান্ত ও জমিদার সন্তানদের জীবনে নেমে এসেছে চরম লাঞ্ছনা। বিশ্বনাথ ভীষণ গরীব, বিনা ওষুধে তার পুত্রের মৃত্যু হয়। জীবিকার জন্যে অভিনয় শুরু করে সেখানেও নিরুপায় হলে শেষে ক্যারিকেচারিস্ট হয়ে যায়।

২। চরহাটির স্টেশন মাস্টার ঃ- জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়েও বিদেশী ইংরেজ রেল কোম্পানীর চাকরগিরি করেছেন। চাকরী চলে গেলেও তিনি বিনা পয়সায় টিকিট আদায় করতে চেয়েছেন এবং জনসাধারণকে নিজের ব্যর্থতার কথা না বলে নিজেকে বড় বলে জাহির করেছেন।

৩। ময়দানব ঃ- ফণী কামার পনেরো-ষোল বছর বয়সে গ্রাম ছেড়ে কয়লাখনির পাশে ছোট্ট একটি ফায়ার ব্রিকস কারখানায় কাজ করতে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাতারাতি কারখানার প্রসার ঘটেছে ব্যাপক, পরিণত হয়েছে বিশাল

কারখানায়। ফণীও ছোট মিস্ত্রী থেকে বেশ বড় মাপের মিস্ত্রী হয়। সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও সে ধর্মঘটে যোগ দেয় এবং শেষে সভাপতি হয়। কিন্তু নতুন ম্যানেজার ও মালিক এলে তার চাকরী যায়।

৪। বোবাকান্না ঃ- আনু ঠাকুর অন্যস্থান থেকে এই গ্রামে আসে। ভুলমন্ত্র উচ্চারণ করে পূজো করে, পুলিশের চরের কাজ করে— বিশেষ করে রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকজনকে ধরিয়ে দিয়েছিল। সেই গ্রামে সকলে আনুর চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞাত হলে, বিপদ হতে পারে ভেবে আনু ঠাকুর পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে বাস করে। চন্ডীমন্ডপে ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের পূজো আনু লুকিয়ে থেকে দেখে এবং তাঁর পূজো পদ্ধতির ভুল ধরে।

৫। খাজাঞ্চিবাবু ঃ- বদিবাবু বিরাট কারখানার হিসাব রক্ষকের চাকরী করেন। নতুন কলকারখানার প্রসারের জন্যে এই সব অভিনব পদের সৃষ্টি।

৬। শাপমোচন ঃ- দেবীচরণ, কৃষক, মহুরী, পিয়নগিরি জ্যোতিষী ইত্যাদি বহু কাজ করেছে; কুৎসিত রূপের জন্যে কোথাও চিরস্থায়ী হয় নি। শেষে হাতুড়ে চিকিৎসক হয়েছে।

গ। আধুনিক ভারতে সামগ্রিক বিচারে সামাজিক সচলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তির জন্ম যে বর্ণেই হোক না কেন তার সামাজিক মর্যাদা স্থিরীকৃত হয়, তার আর্থিক অবস্থা বা প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে। অর্থহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্থশীল নিম্নবর্ণের সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশী। যেমন অগ্রদানী গল্পে স্থানীয় জমিদার শ্যামাদাস বাবু অর্থ ও প্রতিপত্তির বলে বলীয়ান, তাই দেখা যায় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে দরিদ্র পূর্ণ চক্রবর্তীর সামাজিক মর্যাদা নেই বললেই চলে, ফল চুরি করে, জমিদারবাবুর বাড়ীতে আসন্ন সন্তান-সম্ভবা স্ত্রীর ঘর পাহারা দিয়েছে পূর্ণবাবু।

গোপাল বাঁধের ইতিকথা ঃ- ঘোষ পরিবার অর্থে ও সম্পদে গ্রামের মাথা। ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে ঘোষেদের পুত্রের প্রণয় জন্মেছে, ঘোষ বাড়ির একছেলে বিমলাচরণ হাইকোর্টের উকিল। শহরের সঙ্গে এই গ্রামের ঘোষেরা গাঁটছড়া বেঁধেছে। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মামলা করেছে। সুতরাং সমাজে তাদের প্রতিপত্তি বেড়েছে।

ঘ। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তাই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে নিকৃষ্ট ব্যবসা করতে দেখা যায়। আবার তারাশঙ্করের যুগে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা থাকায় অর্থনৈতিক উন্নতি যেমন ব্যাহত হয়েছে তেমনি সামাজিক মর্যাদার বিচিত্রকরণ ঘটেছিল।

১। ব্যাধি ঃ- নারায়ণচন্দ্র রায় ওরফে হারাণ আচার্য বিগ্রহ ও বিগ্রহের অলংকার চুরি করে বেড়াত। মুর্শিদাবাদের মনোহর বাবু তাকে আত্মীয়বৎ বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে অথচ হারাণ ব্রাহ্মণ তার বাড়ীতেও অলংকার চুরি করেছে।

২। তৃষ্ণা ঃ- ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ হয়েও দোকান করেছে। সেই দোকান তুলে দিয়ে সংসারী হয় ধার বাকির জন্যে, তবে সংসারী হয়েও সংসারের কর্তব্য পালন করে নি। মা, স্ত্রী বাপের বাড়ী চলে যায়। কীর্তনের দলে মিশে সুরধনী জেলের প্রেমে পড়ে। এইভাবে ক্ষুদিরাম নিকৃষ্ট জীবন যাপন করেছে।

ঙ। অসবর্ণ বিবাহ ঃ- অসবর্ণ বিবাহ তারাশঙ্করের যুগে ব্যাপকভাবে সমাজে মাথাচাড়া দেয় নি। কারণ জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল। যেমন— দীপার প্রেম। চ্যাটার্জী পরিবারে জন্ম নিয়েও কলেজে চাকরীরতা দীপা তাদেরই বাড়ির প্রাক্তন ঝি-এর দৌহিত্র দেবপ্রিয় হালদারকে বিয়ে করেছে।

১। রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ- বিভা সেন ব্যবসায়ী মণিলাল সেনের রক্ষিতার কন্যা। রক্ষিতা হলেও মণিলাল তাকে স্ত্রীর মর্যাদাই দেন। বিভাকে ভাল ঘরে বিয়ে দেবেন ঠিক করেন। কিন্তু বিভা গায়ক পার্থ মুখার্জীকে বিয়ে করে। যদিও এ বিয়ে সুখের হয় নি।

২। সুতপার তপস্যা ঃ- এই উপন্যাসে সুব্রত মুখার্জী ও সুতপা দাশগুপ্তের প্রেমজ বিবাহ হয়েছে।

চ। মানুষের মানসিক পরিমন্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতের সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বদলে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দয়ায় মানুষ এখন উপযোগিতার বিচারে সব কিছু বিবেচনা করে। অর্থাৎ অনেক বাস্তববাদী হয়েছে। লেখকের যুগে অবশ্য অন্ধ কুসংস্কার এবং বাস্তবতা দুইয়েরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ- সংসার। কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশের শ্রাদ্ধশান্তি হবার পর যদি সে ব্যক্তি উপস্থিত হয় তাহলে সংসার সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করে না। প্রচলিত এই অন্ধকুসংস্কারের জন্যে কাশী-ফেরত বাবা সংসারে আশ্রয় পান নি কারণ কোন সংবাদ না পেয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করে ফেলে সন্তানগণ। তাই বড় ছেলে কৌশল করে কাটোয়ার কাছে গঙ্গার তীরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। কী নির্মম এই সংসার।

এ মেয়ে কেমন মেয়ে ঃ- শিবানন্দ স্বামী এক কালে দেশকর্মী। তিনি সমাজ সেবা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। গ্রামে ফায়ার বিগ্রেড তৈরী করেন— জাত বিচার না করে সমাজের সেবা করেছেন। সামান্য জমিদারী টুকু আত্মীয়দের দিয়ে ভিক্ষে করে আশ্রম করেছেন। যদিও তিনি আইনসভার সভ্য তবুও তিনি মধ্যবিত্তদের কাছ থেকেই আঘাত পান, তাই সব ছেড়ে সন্ন্যাসী জীবন যাপন করেন, রাজনীতির প্রতি তাঁর বিরাগও হয়েছিল।

বরমলাগের মাঠ ঃ- কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিংস্র মানুষের ভয়ালতা এখানে লক্ষনীয়।

ছ। সনাতন ভারতবর্ষের সাবেকী একান্নবর্তী একক পরিবারের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দম্পতি-কেন্দ্রিক একক পরিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বাড়ছে— যার মূলে রয়েছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের আধিক্য, বিচ্ছিন্নতার মনোভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের স্বার্থেও ভাঙ্গন, ধরেছে।

শিবানীর অদৃষ্ট ঃ- বৃত্তিগ্রহণের জন্যে স্বামী-স্ত্রী (অধ্যাপক ও শিক্ষিকা) এক সন্তান নিয়ে কর্মস্থলে থেকেছেন। তাঁদের পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি কোন কর্তব্যের বা যোগাযোগের খবর প্রায় নেই। দাম্পত্যকেন্দ্রিক সংসার এখানে দৃষ্ট।

কালো মেয়ে ঃ- পঙ্গু শিক্ষক বহু আশা নিয়ে সর্বস্ব দিয়ে পুত্রদের শিক্ষিত করেন কিন্তু বড়টি বিলেতে গিয়ে সেখানেই বিয়ে করে থেকে যায়। মেজছেলে ফ্লিম স্টুডিওতে যায় ও মদ্যাসক্ত হয়। এইভাবে একান্নবর্তী সংসারের ভাঙ্গন ধরেছে।

অহেতুক ঃ- কলকাতার ভাড়াটে ঘোষ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে এজমালী বাড়িতে না থেকে তা বিক্রি করে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে। সন্তানহীন রমণী স্বামী ব্যতীত অন্য কাউকেই সহ্য করতে পারে না এখানে।

সুখনীড় ঃ- দুটি দাম্পত্য চিত্রের উল্লেখ এখানে আছে। একজনের স্বামী-ব্যবসায়ী, মদ্যপ, অন্যজন নাট্যকার ও প্রফেসার— ভাল মানুষ। সবই ঠিক কিন্তু তাদের পারিবারিক অন্যান্যদের জীবনের কোন খবর নেই।

মাছের কাঁটা ঃ- সামান্য মাছের একটি মাথা নিয়ে দুই ভইয়ের সংসারে বিভেদ ও পৃথক এমনকি মামলা মোকদ্দমা ও পর্যন্ত হয়েছে, পরিশেষে অবশ্য মিল হয়েছে।

জ। স্বাধীনতার পূর্বে মহিলাদের মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকা খুবই নগণ্য ছিল। বর্তমানে অনেকাংশে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও কৌলিন্য প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি এখানে বর্তমান।

কুলীনের মেয়ে ঃ- কৌলিন্যপ্রথা বজায় রাখতে গিয়ে ধনদা মুখুজ্জে একমাত্র কন্যা তরুকে তুলে দেন বহুপত্নীক লম্পট, চোর বিপদতারণের হাতে। তরু জীবনের সর্বস্ব দিয়েও স্বামীর মন পায় নি, শেষে চুরি করে আত্মগ্লানিতে আত্মহত্যা করে।

উল্কা ঃ- বিধবার মেয়ে বিমলাকে ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধ রামেশ্বর চাটুজ্যের সঙ্গে বিয়ে দেয় তারই মামীমা। অচিরেই বিমলা বৈধব্য জীবনে প্রবিষ্ট হয়।

দিল্লী কা লাড্ডু ঃ- হীরেন মুখার্জী প্রথম পক্ষের সাতটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও পুনর্বার বিবাহ করেছে।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ- বিভাকে পার্থ মুখার্জী ভালবেসে বিয়ে করে এবং তাকেও টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

নারী ঃ- নায়িকা নির্মলা বিধবা পরে রমেনের সঙ্গে পালিয়ে যায় এবং রমেন নির্মলাকে ত্যাগ করলে তখন নির্মলা এক ধনীর গৃহে রক্ষিতা থাকে। শেষে নার্স হয় এবং তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দেশের মেয়েদের জন্যে ব্যয় করার কথা বলে যায়।

কালোমেয়ে ঃ- পণপ্রথার জন্যেই কালোবর্ণের সুমতি তার শিক্ষক পিতা উপীন বাবুর পায়ে ধরে ভিটে বিক্রি করতে নিষেধ করেছে; বিয়ে করবে না বলেছে— কারণ সে তো কালো। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় কালোমেয়ের কোন মর্যাদা যে নেই তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন লেখক।

এই প্রসঙে উল্লেখ্য যে, কালান্তর উপন্যাসে প্রাচীন সমাজ বিন্যাস ও কৌলিন্যপ্রথার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ মেলে।

ঝ। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষ শহরে এসেছে, শহরের মানুষ কর্মব্যপদেশে গ্রামে গেছে। আবার এক শহর থেকে অন্য শহর বা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের অর্থনৈতিক ও জীবিকার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও বেড়েছে।

মাটি ঃ- জীওনলাল সুদূর পাটনা থেকে কলকাতায় জীবিকার সন্ধানে আসে। সে মাটি বিক্রির ব্যবসা করে।

আখেরী ঃ- দুর্ভিক্ষে ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণায় পিতা মাতার মৃত্যুর পর গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসে গুপী। বন্দরে ও চায়ের দোকানে সে কাজ করে। শহরের পরিবেশে থেকেও মূর্খ গুপীর মধ্যে মানবতাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই এক বুবিকে সামাজিক অপমানের হাত থেকে রক্ষা করে ঘরে এনেছে। বুবির বাচ্চা হয়েছে। বুবির ওপর শয়তানদের দৃষ্টি

পড়লে গুপী বুবিকে ও তার বাচ্চাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

আবার উল্কা গল্পে জ্যোতি, 'মানুষের মন' গল্পে ভবেন্দ্র, রেলে চেপে শহরে এসেছে এবং ভাগ্যতরী পূর্ণ করেছে এবং ময়দানব গল্পে ফণী গ্রাম থেকে কলিয়ারীতে গিয়ে চাকরী নিয়েছে। এমন বহু নিদর্শন তারাশঙ্করের আরও আছে।

ঞ। শ্রেণী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ- জমিদারের অমানবিক শোষণ ও অত্যাচার কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কলকারখানায় মালিকের শোষণে অতিষ্ট হয়ে শ্রমিকরাও আত্মসচেতন হয়ে ধর্মঘট করেছে।

পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান সব প্রজারা সম্মিলিত ধর্মঘটের আয়োজন করেছে। গণদেবতা ঔপন্যাসে দু-ধরণের বিরোধ চোখে পড়ে শ্রেণীগত এবং বর্ণগত। হাঁসুলি বাঁকের উপকথা তে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার সংঘাত। এইভাবেই লেখক শ্রেণীব্যবস্থার পরিবর্তনের চিত্র অংকন করেছেন। গল্পের মধ্যেও এই ছাপ সুস্পষ্ট।

বরমলাগের মাঠে গল্পে তেভাগা আন্দোলনে মুখর কৃষকশ্রেণী। শেষকথা তে শ্রেণী সংগ্রাম প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

সংস্কৃতায়ণ- (Sanskritization)

যখন উচ্চবর্ণের জাতির জীবন যাত্রার প্রণালী অনুকরণ বা অনুসরণ দীর্ঘকাল ধরে সযত্নে নিম্নবর্ণের জাতি পালন করে এবং কালক্রমে নিম্নবর্ণ, জাতি নিজেদের সংশ্লিষ্ট উঁচুজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে। এইভাবে সমাজে যে পরিবর্তন সূচীত হয়, তাকেই সংস্কৃতিকরণ বলে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাই বলেছেন—

"Sanskritization is the Process by which a 'law' Hindu Caste, or tribal or other group, changes its Customs, ritual, ideology and way of life in the direction of a high, and frequently, 'twice-born' Caste." (১৯)

আচার্য বিনয়কুমার সরকার সংস্কৃতায়ণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিনয়বাবুর সংস্কৃতায়ণের ধারণা প্রসঙ্গে ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত বলেছেন, **"When a tribe becomes Hinduized or Aryanized or Brahmanized and adopts the customs and rites of the neighbouring dominating Hindus, the process is called "Sanskritization".** (২০) তিনি আরও বলেছেন, **"to Acharya Sarkar the concept of Sanskritization was not an isolated one. To him, it was the other name of Indianization."** (২১)

নিম্নবর্ণের জাতিগণ জাতিবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর উঁচুস্থান অর্জনের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়। যদিও এই উদ্যোগ সব সময়ে শান্তিতে ঘটে না, অনেক সময় উচ্চতর বর্ণ বা জাতি কর্তৃক তা দমন করার চেষ্টা করা হয়। মাঝে মাঝে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। এমন গল্পগুলি—

একপশলা বৃষ্টি ঃ- জয়া বাউরী চরিত্রভ্রষ্টা, তথাপি ঠিকাদার চন্দ্র চৌধুরীকে সে পাবার পর আর অন্যত্র যায় নি। চন্দ্র তাকে বিয়ে করতে চাইলেও সে চন্দ্রকে জাত নষ্ট হবার ভয় দেখিয়ে বিয়ে করে নি, চন্দ্রের বাড়ীতে থেকে উচ্চবিত্তের মত আচার-আচরণ করেছে।

তৃষ্ণা ঃ- বিপিন জাতিতে জেলে, নিম্নবর্ণের। তার ভাইঝি সুরধনী কীর্ত্তনের দলের মূল গায়েন ক্ষুদিরাম চক্রবর্তীকে পতিরূপে পেতে চেয়েছে। যদিও তার স্বপ্ন সার্থক হয় নি।

সর্বনাশী এলোকেশী ঃ- বলরাম বৈষ্ণব হলেও সে উচ্চশ্রেণীর আচার ও অনুষ্ঠানের নকল করতে চেয়েছে। বৈষ্ণব হয়েও সে মদ, মাংস খায়, বৃদ্ধ চাটুজ্জেকে সে অপমানও করেছে।

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসে করালীর মধ্যেও এই ধারণাটি প্রকট।

পশ্চিমীকরণ (Westernization)

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন অ-পশ্চিমীদেশ পশ্চিমী পোষাক, ভাষা, অভ্যাস, আচার, অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ প্রথা , জীবনরীতি অনুসরণ করে। অধ্যাপক শ্রী শ্রীনিবাস পশ্চিমীকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন—" **Wester nization.....refers to changes introduced into Indian society during British rule and which**

continued in some cases with added momentum, in independent India." (২২)

ভারতে ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য দেশ আগমনের ফলে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। যথা— জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি। পশ্চিমীকরণের ফলশ্রুতি হল শিল্পায়ণ, নগরায়ণ প্রভৃতি। ভারতবর্ষের জনজীবনে যখন পাশ্চাত্তীকরণ ঘটেছে ঠিক তখনই তারাশঙ্করের আবির্ভাব। তাই তাঁর বিভিন্ন কর্মের মধ্যে পশ্চিমীকরণের ছাপ সুস্পষ্ট ও প্রকট।

প্রত্যাবর্তন ঃ- জেলেদের ছেলে পশুপতি সৎ। দুঃখে যন্ত্রণায় তার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। পশুপতি নিরুদ্দেশ হয়েছে। পরে সে ফিরে আসে চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিলাত থেকে— জাহাজের খালাসী হয়। গ্রামে এসেছে একেবারে সুসজ্জিত হয়ে। সে পাড়ায় মদের মজলিসে আকণ্ঠ পান করে বিধবা রমাকে নিয়ে বিদেশী কায়দায় নাচগান করেছে। বাবা মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও পরপর তিনবার বিধবা হওয়া রমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে।

পশ্চিমীকরণের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে ঠিকই কিন্তু মানবতা বা মানবীয় মূল্যবোধ ধ্বংস হয়েছে, মানুষ মানুষকে অর্থের বিনিময়ে বিচার করতে শিখেছে, প্রবীনের আত্মত্যাগ বা উপকারিতার প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধ নবীনের মধ্যে নেই। তাই দেখা যায় ময়দানব, খাজাঞ্চিবাবু গল্পদুটিতে যথাক্রমে ফণীমিস্ত্রী ও বদিবাবু আজীবন কারখানার জন্যে আত্মত্যাগ ও শ্রমদান করলেও নবীন মালিক ও ম্যানেজারের Capitalist মনোবৃত্তির শিকার হয়েছে— তাদের আজীবন কাজ করার মূল্য নব্যবাবুরা কিছুই দেয় নি।

আধুনিকীকরণ (Modernization)

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সূচনা করেন রামমোহন রায়। এছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (১৭৮৪), হিন্দু কলেজ (১৮১৮), কলিকাতা মেডিকেল কলেজ (১৮৩৫), রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৪৭) কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭) ইত্যাদি ভারতে আধুনিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, যুক্তিবাদী মানসিকতা প্রভৃতি কারণও আধুনিকীকরণের নির্ভরযোগ্য উপাদান। ভারতবর্ষে আধুনিকীকরণের অন্যতম ফলশ্রুতি নগরায়ণ, নারীজাগৃতি ইত্যাদি।

আধুনিকীকরণের একটি ফলশ্রুতি নগরায়ণ **Urbanization**। ভারতে বৃটিশ শাসনের প্রাক্কালেই নগরায়ণের প্রবণতা ঘটে। একদিকে শিল্পায়ণ, অন্যদিকে নগরগুলিতে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা প্রদান, ফলে নগরায়ণের চাহিদা বাড়ে। ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক সুবিধা, পার্থিব সুবিধা, বিলাসের আকর্ষণ, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, রাজনৈতিক সুবিধা, বৃত্তিগ্রহণের সুবিধা, জাতপাতের প্রাবল্য না থাকার সুবিধা, ইত্যাদি কারণে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই নগরের প্রতি মানুষের ব্যাপক চাহিদা বাড়ে। যেমন 'ভূবনপুরের হাট' উপন্যাসে দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রাম সমাজের নবতম রূপকে বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রাচীন ধর্মসংস্কারের পটভূমিকায় আধুনিক জীবন যাত্রার নতুন ছন্দটি সমাজ বিবর্তনের এক ক্রমোদ্ভিন্ন রূপরেখার দৃশ্যপটে অংকিত। তাছাড়া **নুটু মোক্তারের সওয়াল, খাজাঞ্চীবাবু, সাড়ে সাতগন্ডার জমিদার, ময়দানব,** পিতাপুত্র প্রভৃতি গল্পে ও হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসে নতুন যন্ত্রযুগ বা ইংরেজী শিক্ষার অপ্রতিহত প্রভাব ও শক্তির প্রাবল্যে প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষার ঐতিহ্যও বিশ্বাস হারানোর জন্যে মানুষের দীর্ঘশ্বাস প্রকাশিত।

এ পর্বে নারীজাগৃতিও ঘটেছে। নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর মানসিকতা তাদের বেড়েছে। আধুনিক যুগের বিবেকহীন পুরুষের কণ্ঠলগ্না থেকে পরিত্রাণ পেতে নারীজাতি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে মুক্ত বা স্বাধীন সত্তা নিয়ে। নারী গল্পের বিধবা নির্মলার জীবনে বহু পুরুষ এসেছে কিন্তু সে শান্তি পায়নি, তাই শেষে নার্সগিরি করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছে। একটি প্রেমের গল্প তে নায়িকা সাঁওতাল রমণী ফুলমণি দাম্পত্য জীবনে সুখ পায় নি। সে প্রশান্তকে ভালবেসেছিল কিন্তু প্রশান্তর সংসার ভাঙ্গতে চায়নি। তাই নার্সের ট্রেনিং নিয়ে বাকী জীবন সেবিকারূপে কাটিয়ে দেয়।

শিল্পায়ণ (Industrialisation)

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকায় ভারতের সামাজিক বিবর্তনের ধারার গতি অনেকটা শ্লথ ছিল। একদিকে কঠোর জাতিভেদ প্রথা, অন্যদিকে কৌলিন্যের চাপ ফলে অর্থব্যবস্থা ছিল অনড় ও সীমাবদ্ধ। বৃটিশ সরকারের সময়ে ও স্বাধীনতার পরে দ্রুতশিল্পায়ণ ঘটে— বৃত্তিভিত্তিক জাতিবিন্যাস ভেঙ্গে পড়ে। অস্পৃশ্য, অশুচি, ঘৃণা ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তির বিনাশ হতে শুরু করে এবং স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। "নিম্নবর্ণের মানুষ ও বিত্তবান, বিচক্ষণ ও শিক্ষিত হলে সামাজিক ক্ষেত্রে সহজেই মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতে পারে।" (২৩) বিশেষ করে শহরের জাতপাতের বিধান প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ফলে সর্বস্তরের মানুষের শহরে বাস করার প্রবণতা জাগে ।

তাই হাঁসুলি বাঁকের উপকথা উপন্যাসে করালী চন্দনপুরে বাস করতে চেয়েছে। মুখুজ্জে মশাই গল্পে জমিদার

পুত্র হীরেণ গ্রামের জমিদারী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করে কলকাতায় ব্যবসা করেছে। জমিদারী ত্যাগ করে কর্মস্থলে যেতে চেয়েছেন সাড়ে সাতগন্ডার জমিদার গল্পের জমিদার ভাগে।

শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন হলেও যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব প্রায় ধ্বংসের মুখে আসে। শিল্পভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এর প্রধান কারণ। গ্রামের মানুষ উন্নত জীবিকার আশায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যৌথ পরিবার ত্যাগ করে শহরে ভিড় করেছে, গড়ে উঠেছে দাম্পত্য-কেন্দ্রিক একক পরিবার, সৃষ্টি হল অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আভিজাত্য এবং ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা হল প্রকট। জীবন হয়ে উঠল কৃত্রিম ভোগবাদী ও মেকানিক।

এই সামাজিক বিবর্তন বা পরিবর্তনের ধারাগুলি তারাশঙ্করের লেখায় যেমন উপন্যাসে প্রকটিত, তেমনি ছোটগল্পেও। লেখকের সমকালীন যুগে যন্ত্রসভ্যতার সার্বিক বিকাশ, শহরে সংখ্যা ও বস্তির সংখ্যাবৃদ্ধি, শিল্পনির্ভর জীবনযাত্রা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই পরিবর্তন তিনি সরেজমিনে তদন্ত করেই তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিধৃত করেছেন।

"তিনি শ্রমিকের যে অতৃপ্ত, অশান্ত বুভুক্ষা ও ক্ষুব্ধ বিদ্রোহোন্মুখতার চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে সত্য সত্যই প্রধূমিত বহ্নিশিখার উত্তাপ ও দীপ্তি অনুভূত হয়। অন্যান্য লেখক শ্রমিকদের দুর্গতি বর্ণনা করিতে কেবল তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহাদের অবস্থা, দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও তাহাদের রিক্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত জীবন কাহিনীতে করুণ রসসঞ্চার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন কিন্তু তারাশঙ্করের ভাষায় শুষ্ক কঠোর ভাবব্যঞ্জনা শক্তি ইহাদের নাই; ভাষার এই সাংকেতিকতার সাহায্যে তিনি এক ধূসর; উদাস, মরুভূমির ন্যায় জ্বালাময়, ছায়ালেশহীন জীবন প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।" [২৪] সমকালীন যুগ পরিবর্তনের প্রভাব তদানীন্তন সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে— তার উপর নাগরিকতার ছাপ পড়েছে। নগরায়ণ জীবনকে প্রগতিশীল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করলেও তা মুষ্ঠিমেয় জনসাধারণকেই করেছে, কিন্তু যেখানে বস্তি সেখানে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, যৌনলালসা পাশব প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়েছে। ফলে সেই সব স্থানে দিনে-রাতে নরকগুলজার হয়ে উঠেছে— জুয়া খেলা, গণিকাবৃত্তি, নেশা বা মাদকাসক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নানারূপ অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটেছে; এর প্রভাব গ্রামের জীবনেও এসেছে। তাই তারাশঙ্করের সময়ে গ্রাম্যমেলার কদর্য চিত্র পরিস্ফুট। জুয়াড়ী গল্পে রাখাল বাঁড়ুজ্জে মেলায় এসে মদে ও জুয়াতে জীবনটাকে শেষ করতে উদ্যত। অহেতুক গল্পে বন্ধ্যা-রমণী ঘোষ গিন্নীর অন্তর্জ্বালা ও কদর্যব্যবহারে সকলে অতিষ্ট, জীবনধর্ম, সমাজধর্ম ও মানবধর্মের একটা নেতিবাদী শূন্যতায় বিলীন হওয়া ও মন্বন্তরের ফলে সমগ্র দেশ এক ন্যক্কারজনক নগ্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ তিনশূন্য গল্পে, শহরীয় শিক্ষিতদের নির্লজ্জ বিবেক ও স্বার্থপরতা কিন্তু গ্রামের সহজ সরল নিরক্ষর মানুষের হৃদয়াকুতি কলকাতার দাঙ্গা ও আমি। আদিম জিঘাংসা তাড়িত জীবনের মুক্তির সন্ধান কান্না গল্পটিতে এবং জাত্যভিমানের নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ বিস্ফোরণ গল্প। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে একদিকে সমাজবিরোধী নারীলোভীদের ভিড়, অন্যদিকে মহান চরিত্রের প্রকাশ আখেরী। কারখানার মালিকদের শোষনের শিকার হয়েছে আজীবন রক্তপাত করা কর্মচারী ফণীমিস্ত্রী এবং বদিবাবু যথাক্রমে ময়দানব ও খাজাঞ্চিবাবু গল্পে। যন্ত্রসভ্যতা মানুষের হৃদয় থেকে প্রেম ভালবাসা কেড়ে নিয়েছে তাই প্রণয় পরিত্যক্তা অভিশপ্তা রমণী রাতের অন্ধকারে গড়ের মাঠে খুঁজে বেড়ায় তার চারধারে দেহপসারিণীদের ভিড় জমে ময়দান গল্পে। ব্যবসা করতে গিয়ে সবাই লক্ষপতি হয় নি, কেউ ভিখারী হয়েছে। খনিজ সম্পদে লক্ষপতি হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে দালালগিরি করে হোলি গল্পের কানাই মুখুজ্জে।

এইভাবে শিল্পায়ণের প্রভাব জনজীবনকে করেছে প্রভাবিত । একদিকে অর্থনৈতিক পরিবর্তন অন্যদিকে কুটীর শিল্পের ধ্বংস হয়েছে। পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত কারিগরদের বৃত্তির পরিবর্তন ঘটেছে, জাতিভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী বৃত্তির ধ্বংস হয়ে যোগ্যতা ভিত্তিক হয়েছে। সম্ভ্রান্তকে অবজ্ঞা করেছে উঠতি ভুঁইফোড় ব্যবসায়ীর দল (জলসাঘর ঃ মহিম গাঙ্গুলী), নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘটেছে অবনতি। নারী সমাজের বন্ধন ও গৃহবেষ্টনী ছিন্ন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রকাশ্যে এসেছে। যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক চেতনারও প্রসার ঘটেছে। সমাজের এই সার্বিক পরিবর্তন তারাশঙ্করের লেখনীতে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত। সুতরাং সামগ্রিকভাবে এ অধ্যায়ে তারাশঙ্করের ছোটগল্পে সামাজিক পরিবর্তন ধারা আলোচনায় তাঁর সমাজনিষ্ঠ সদাজাগ্রত দৃষ্টিরই পরিচয় লভ্য।

পাদটীকা

১) Society	:	Macl-ver and Page	P-5
২) Human Society	:	Kingsley Davis	P-622
৩) Society-Ch-22	:	Mac-lver & Page	P-511
৪) Society Ch-22	:	L. Von Wise	P-511
৫) Essays in Sociology and Social	:	Morris Ginsberg	P-129
৬) Human Society	:	Kingslay Davis	P-623
৭) বিষয় সমাজতত্ত্ব	:	অনাদিকুমার মহাপাত্র (১ম সং)	পৃ-৮৬৬
৮) সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯৯২)	:	অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন	পৃ-৪২৩
৯) আমার সাহিত্য জীবন(২য়)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-১০৭-১০৮
১০) মহানগরী	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৬৫
১১) আমার কালের কথা (২য় সং)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-২১৭
১২) সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯৯২)	:	খগেন্দ্রনাথ সেন	পৃ-৪৪৭
১৩) Traditional Cultures and the impact of technological change	:	G. M. Foster	P-2
১৪) তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	:	আদিত্য মুখোপাধ্যায়	পৃ-৬৭
১৫) আমার সাহিত্যজীবন (২য় খন্ড)	:	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৪৯
১৬) চৈতালী ঘূর্ণি	:	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	পৃ-১২১
১৭) গল্পপঞ্চাশৎ (১ম সং)	:	রথীন্দ্রনাথ রায়	পৃ-১৯
১৮) সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৮০)	:	সমীর দাশগুপ্ত	পৃ-১৭৬
১৯) Social Change in Modern India Ch-I	:	Sri Srinibas	P-6
২০) ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ (সম্পাদিত)	:	আচার্য বিনয়কুমার সরকার	পৃ-১৮৯
২১) প্রাগুক্ত	:	ঐ	পৃ-১৯২
২২) Social Change in Modern India Ch-II	:	Sri Srinibas	P-48
২৩) বিষয় সমাজতত্ত্ব	:	অনাদিকুমার মহাপাত্র	পৃ-৬৯৪
২৪) বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা	:	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃ-৫৪০

* * * * * * * * * *

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর-শরৎচন্দ্র যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কথাকার বলে পরিচিত। মৃত্যুর প্রাক্-পর্বেও তিনি উপন্যাস ও গল্পে রাজ্যে চলমান । জীবন বৃত্তকে ধরার ঐকান্তিকতায় স্বাদের বিপুল বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে তাঁর গল্প নিবেদন। তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্প দুর্লভ বলিষ্ঠতা, তীব্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। বিশাল মানবতাবোধ সমসাময়িক দেশকালের ঐতিহাসিক জীবন চরিত্র তাঁর সুদক্ষ লেখনীর সাহায্যে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে চিত্রিত। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তিজীবন ও সমাজের চিত্র অপূর্ব করুণায়, মমতায় বর্ণিত হয়েছে আবার কোন কোন গল্পে ও উপন্যাসে আধুনিক যুগের বাংলাদেশের সমগ্র জীবন চিত্র স্পষ্ট। একটি যুগ অবসিত এবং সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে ধাবমান নব শিল্পপতির দল। গ্রাম্য জনপদ রাতারাতি যন্ত্রদানবের কৃপায় আধাশহরে পরিণত হচ্ছে। চিমনীর ধূম নিঃশ্বাসে গ্রামের আকাশ ও নারী মলিন। সর্বত্র আবিলতা বর্ধমান। চরিত্রভ্রষ্ট নরনারী বিত্ত ও বিলাসের সন্ধানে গ্রামের মায়া ত্যাগ করে, মাটির মেঠো সুর ভুলে শহরের কারখানার কালিঝুলি মাখছে। এই সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন অনন্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর উপন্যাস ও প্রধান প্রধান গল্পে চিত্রিত করেছেন। মাটির মানুষেরা প্রায়শই জৈব প্রবৃত্তির বশে সামাজিক মূল্যবোধকে আঘাত হেনেছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাৎসল্য, প্রেম, পশু প্রীতির মতো মানব-হৃদয়-বৃত্তিকে জৈবতার বা বিকারে বিদ্ধ করতে থাকে। এদের বাস্তবতা একেবারে প্রশ্নাতীত। অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি অভিজাত ভদ্রসমাজের পাশবিক উৎপীড়নের বীভৎস রূপও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তাইতো জমিদার সন্তান হয়েও সহানুভূতি ও করুণায় ওই ব্রাত্য, মন্ত্রহীন, নিপীড়িত মানুষগুলোর শরিক হওয়ায় তিনি ঐকান্তিক। নিজ ভূমি লাভপুর ছেড়ে কলকাতাকে বেছে নিলেও লাভপুর তথা রাঢ়ের মায়া কখনই লেখক ছিন্ন করতে সক্ষম হন নি।

পাপ, পুণ্য, প্রেম, ঘৃণা, কুটিলতা—মানবজীবনের সমস্তদিক ও প্রবৃত্তির মধ্যে জীবনরস, সন্ধানী দৃষ্টির সমগ্রতা, বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির পটভূমিতে রাঢ় অঞ্চলের জনপদ-জীবন যাত্রার বিচিত্র ছন্দ, আদিম জীবনাবেগের প্রচন্ডতা, সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা ও তার সাথে নতুন সামাজিক শক্তির সংঘাত সেই সঙ্গে জমিদার, বেদে সাপুড়ে, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কাহার, বাউরী, বাগদী-বিচিত্র মানুষের ভিড়। প্রতিটি চরিত্রই জীবনাবেগে উষ্ণ। তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে শিল্পিমানসের যে জীবননিষ্ঠ কল্পনার সর্বত্রচারিতার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে; কাহিনীর বিশাল পটভূমিকা ও আঞ্চলিকতা হার্ডির ওয়েসেক্স নভেলের মতই চরিত্রের নানা বৈচিত্র্য, ব্যক্তির মনোদ্বন্দ্ব এবং সমাজ-পরিবেশ ও মূল্যমানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের স্বাতন্ত্র্যের দ্বন্দ্ব, অতিক্রান্ত যুগের সঙ্গে চলমান যুগের সংঘাত—প্রভৃতি বিষয় যে ভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে শুধু তিনি একজন কথাকারই নন, তিনি অধুনাতন বাঙালী জীবন ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে প্রতিভাত।

তারাশঙ্কর উপন্যাস ও ছোটগল্প উভয় ক্ষেত্রেই যশস্বী কুশলী শিল্পী। তাঁর সাহিত্যে এই দুই শিল্পরূপের উপকরণ উপাদান এবং চরিত্র প্রায় একই জীবন পরিধি থেকে সংগৃহীত। কিন্তু একই ধরণের অভিজ্ঞতার রূপ ভেদ মাত্র। তাঁর ছোটগল্পে সাধারণতঃ কাহিনীরও কিছু আকর্ষণ থাকে (অনেকটা Tale) অসাধারণ চরিত্র সৃষ্টি, বিস্ময়কর চারিত্রিক রহস্য উদঘাটন মানব প্রকৃতির বিচিত্র প্রকৃতির উন্মোচন—এই সব বিশিষ্ট গুণেই তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলোর জনপ্রিয়তা শীর্ষে উঠতে পেরেছে। সভ্যতা ও শোভনতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্তরালে মানুষ যে আদিম প্রকৃতি ও আদি প্রবৃত্তির পঙ্কতিলক বহন করে চলেছে তা সমাজ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি স্পষ্ট ও জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাস ও ছোটগল্পে আঞ্চলিকতাও তারাশঙ্করের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গল্প কাহিনীর সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা এবং বাস্তবতাবোধ-ই আঞ্চলিকতার প্রেরণা। একটি বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক, নৈসর্গিক ও নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যকে গল্পের কাহিনী ও চরিত্রে সংক্রামিত করাই হ'ল আঞ্চলিকতা। এই ধরণের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) কোনো অঞ্চলের অতীত ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় সংস্কার, আচার-আচরণ, ভাষাগত প্রকৃতি যেন একটি চরিত্র হয়ে ওঠে। বিশেষ ভূখন্ডের প্রাণরসে পাত্রপাত্রীর জীবন সঞ্জীবিত হয়। গল্পে তাদের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেই অঞ্চলের ঐতিহ্য, সংস্কার, লোক-বিশ্বাস, ভাষাগত প্রকৃতি ও নৈসর্গিকতা চরিত্র গুলোর মাধ্যমে প্রতিফলিত। তারাশঙ্কর বীরভূমের বস্তুতঃ রাঢ়ের মাটি ও মানুষ, সেখানকার কাহার, বাগ্‌দী, ডোম, মুচি, বাউরী, দুলে প্রভৃতি নিম্ন হিন্দুসমাজ, দরিদ্র মুসলমানদের জীবনযাত্রা, বাউল ও তান্ত্রিকদের পীঠস্থান, শ্মশান-মন্দির-আখড়া, লোকসংস্কৃতি, লোক-উৎসব, সেখানকার শুকনো মাটি, রুক্ষ প্রান্তর, খরা, বন্যা ও মারীর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। বিহারের সাঁওতাল পরগণা ও বাংলার প্রত্যন্ত ভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, এখানকার প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও আদিম সমাজলক্ষণ, এখানকার জনজীবনের নিজস্ব অর্থনৈতিক ইতিহাস, সমাজ ও গঠন

বৈশিষ্ট্য— সবই তারাশঙ্করের সমগ্র কথা সাহিত্যের পটভূমিকা রূপে গড়ে উঠেছে। চরিত্রগুলো বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে; তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া একটি ভৌগোলিক পরিধির অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয়। চরিত্রকে লেখক তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনেন নি। অঞ্চল বিশেষে সংস্কার, সংস্কৃতি, ভাষা, শুভাশুভ বোধ ও জীবন সম্বন্ধে ধারণা চরিত্রগুলোর মাধ্যমেই প্রতিফলিত। রাঢ় অঞ্চলের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর, শস্যহীন মাঠ, শ্মশানে তন্ত্রসাধনা, মন্দির-পীঠে কাপালিকদের আনাগোনা, অরণ্যের আদিমতা, বাউরী, বাগ্‌দী, সাঁওতাল, বীরবংশী, ডোমেদের আদিম জীবনাচার, আরণ্যক জীবনবিশ্বাস ও ধর্মবোধ, বিচিত্র বৃত্তির মানুষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্রের জীবনধারার সহধর্মিতা, আদিম, সারল্য ও বন্য প্রকৃতি হিংস্রতা, লোভ, মাদকতা—সবই তারাশঙ্করের ছোটগল্পে বিধৃত। সেখানকার বন্যজন্তু, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতির সঙ্গে সমাজচারী মানুষের একপ্রকার প্রতিবেশীত্ব, স্নেহ, বাৎসল্য প্রেমের জৈবিক ক্ষুধা—" Struggle for existence" এবং "Survival of the fittest—এই জৈব-নীতির অস্তিত্ব, টোটেম ও ট্যাবু প্রথার ক্ষীণধারা, সেখানকার লোক জীবন সংস্কৃতি, মেলা, কবিগান, ভাদু উৎসব, কীর্তন, বৈষ্ণবের কুঞ্জবিতান, বৈরাগী বাউলের একতারা সেইসঙ্গে অন্নসমস্যা, জৈবসমস্যা, মানস বিকৃতি— এগুলোর বিশ্বস্ত জীবন চিত্র তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন। এরই মধ্যে দিয়ে তাঁর কিছু কিছু গল্পে Soul of humanity বা বিশ্বমানবের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়।

আসলে তারাশঙ্কর মহৎ জীবনবাদী স্রষ্টা। বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তিনি বর্তমানকালের মুকুটহীন সম্রাট; কিন্তু ছোটগল্পেও তাঁর দান অবিস্মরণীয়। কালের দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও তারাশঙ্কর ছিলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন ত্যাগে অনাগ্রহী। তাঁর চেনা-জানার জগৎ ছিল ব্যাপক, তাঁর দৃষ্টি সর্বত্র বিহারী। এই দৃষ্টির মধ্যে সমাজতত্ত্বের বিচিত্র রূপও বন্দী হয়ে আছে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে। আমাদের বর্তমান আলোচনা শিল্পী তারাশঙ্করের শিল্পিমানসের অপরূপতা প্রকাশে যেমন চেষ্টিত, তেমনি সমাজতত্ত্বের নিরিখে তাঁর ছোটগল্পগুলির বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের দৃষ্টির ব্যাপক প্রসারতা, বিশ্লেষণে সূক্ষ্মতা ও সহানুভূতিতে ঐকান্তিকতাও লক্ষণীয়। তাই তাঁর ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব উদঘাটনেও বৃহৎ-মহৎ-গাল্পিক, সার্বভৌম তারাশঙ্কর নূতনভাবে ধরা দিয়েছেন বলেই আমাদের ধারণা।

* * * * * * * * * *

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের (একশত নব্বইটি) মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজনের লেখচিত্র (সংকেত পরপৃষ্ঠায়)

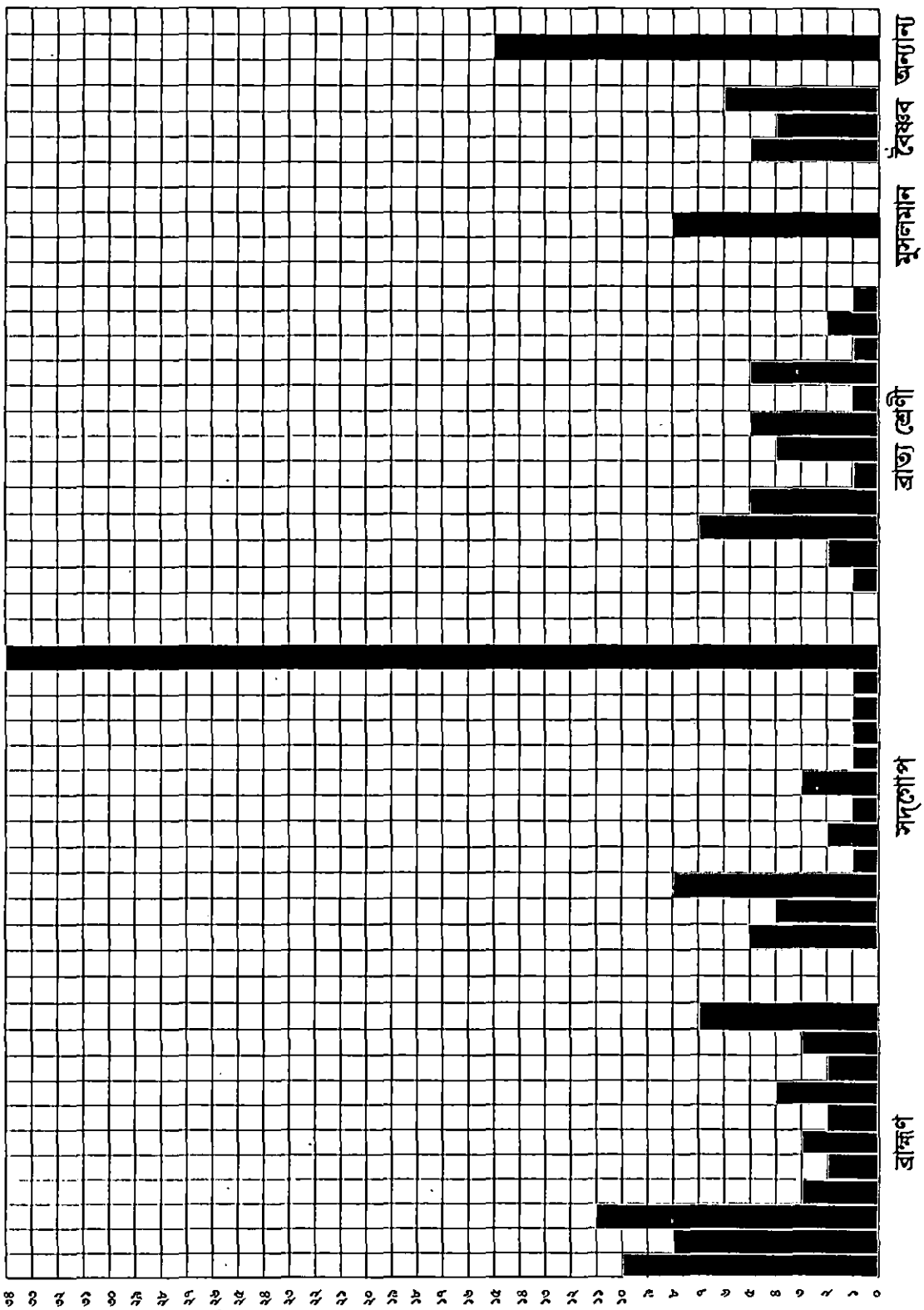

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের (একশত নব্বইটি) মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজন দেখানো হয়েছে। যথা—ব্রাহ্মণ, সদগোপ, ব্রাত্য, মুসলমান, বৈষ্ণব এবং অন্যান্য। এবার এইসব সম্প্রদায়ের পৃথক পদবী দেখা যেতে পারে—
পূর্বপৃষ্ঠায় লেখচিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হল ঃ—

১। ব্রাহ্মণ-মুখ্য গল্প - ৫৫

ক) মুখার্জী	১০
খ) ব্যানার্জী	৮
গ) চ্যাটার্জী	১১
ঘ) গাঙ্গুলী	৩
ঙ) আচার্য	২
চ) ভট্টাচার্য	৩
ছ) রায়	২
জ) চৌধুরী	৪
ঝ) চক্রবর্তী	২
ঞ) ঘোষাল	৩
ট) অন্যান্য	৭
	৫৫

৩। সদ্‌গোপ - ৬২

ক) মন্ডল	৫
খ) সরকার	৪
গ) রায়	৮
ঘ) দত্ত	১
ঙ) বেনে	২
চ) চন্দ	১
ছ) ঘোষ	৩
জ) পান্ডে	১
ঝ) পাল	১
ঞ) বোস	১
ট) দাস	১
ঠ) অন্যান্য	৩৪
	৬২

৩। ব্রাত্যশ্রেণী - ৩৫

ক) মুচি	১
খ) মাঝি	২
গ) বাউরি	৭
ঘ) বাগ্‌দী	৫
ঙ) কোনাই	১
চ) ডোম	৪
ছ) বেদে	৫
জ) মালাকার	১
ঝ) হাড়ি	৫
ঞ) জেলে	১
ট) সাঁওতাল	২
ঠ) চন্ডাল	১
	৩৫

৪। মুসলমান ৮

৫। বৈষ্ণব প্রধান গল্প ঃ- ১৫

ক) আখড়া বা জাত বৈষ্ণব	৫
খ) চাষী বৈষ্ণব	৪
গ) বাউল ও অন্যান্য	৬
	১৫

৬। অন্যান্য ১৫

সংযোজন

তারাশঙ্করের কতিপয় ছোটগল্প-কেন্দ্রিক স্থান ও
পরিবেশে-প্রতিবেশের বর্তমান আলোকচিত্র এখানে সন্নিবিষ্ট হল

তারাশঙ্করের কতিপয় ছোটগল্প কেন্দ্রিক স্থান ও পরিবেশে-প্রতিবেশের বর্তমান আলোক চিত্র এখানে সন্নিবিষ্ট হল ঃ-

তারাশঙ্করের জন্মভূমি লাভপুরের বসতবাটীর নাম "ধাত্রীদেবতা" যা তার বিখ্যাত উপন্যাসের নামও বটে। এরই পার্শ্ববর্তী স্থানে ডাইনী গল্পের স্বর্ণ ডাইনীর বাস ছিল—যা আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

তাঁর লাভপুরের বাড়ির প্রবেশের একদিকের দেওয়ালে একটি ফলক আটকিয়ে রাখেন, এটি আজও আছে। এখানে লেখা আছে—

"সমস্ত জীবের যিনি ধাত্রী তিনি ধরিত্রী;
জাতির কাছে তিনিই দেশ;
মানুষের কাছে তিনিই তো বাস্তু।
তোমাকে চিনেই তো চিনেছি দেশকে;
দেশকে চিনেই তো জেনেছি ধরিত্রীকে;
এবার চেনাও তুমি আকাশকে।"

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৮ তারাশঙ্কর

ভাঙা মন্দির

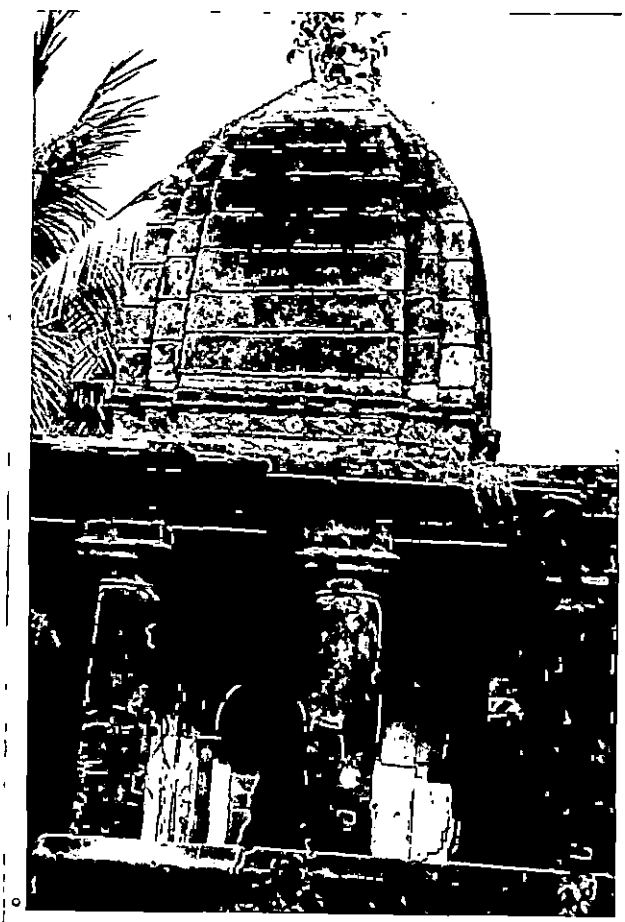

তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র ঠিক পেছনে লাগোয়া এই প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির মালিক কিন্তু তারাশঙ্কর পরিবার নন; গৃহের পাশেই-তাই লেখক পূজা অর্চ্চনা করতেন, এর পাশেই মাঝারি এক পুকুর; তীরে তালগাছ; এই পুকুরের অন্যপাশেই ছিল স্বর্ণ ডাইনীর বাস। এই পুকুরের পূর্ব-পারে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। যেখানে পঞ্চায়েত সভাপতি প্রণব রায়ের বক্তব্য মোতাবেক একটি অতিথিশালা নির্মিত হবে। যাঁরা গবেষণারত বা তারাশঙ্করের বংশধরদের সেখানে থাকার ব্যবস্থাও থাকবে।

সুঁদীপুরের বটতলা

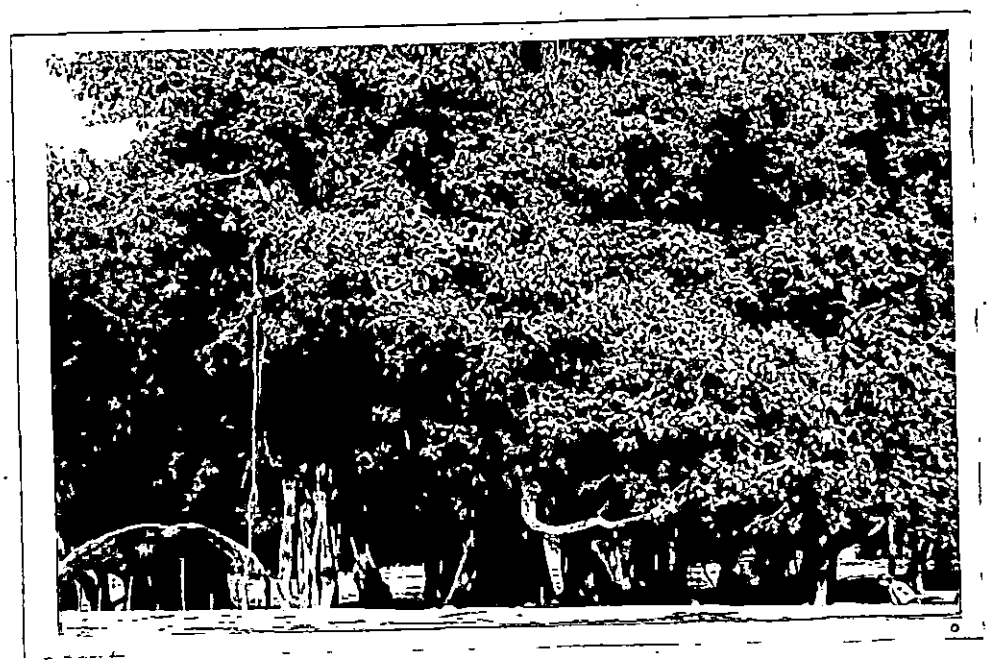

আহমদপুর থেকে লাভপুর যাবার পথে পাকা সড়কের পাশেই সুঁদীপুরের বটতলা। ঝুরিওয়ালা শিকড়ে ও কান্ডে এক জঙ্গলে ঘেরা ঠাঁই। দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো পড়ত না এখানে। চারদিকে প্রায় তিনমাইল স্থান নির্জন, জনমানব শূন্য। এখানেই রাত্রে ঠ্যাঙাড়েরা পথিকের আগমনের প্রতীক্ষা করত। দেখা পেলেই পাবরা ছুঁড়ে তাকে ঘায়েল করে, টাকা পয়সা পরনের কাপড় কেড়ে নিয়ে ঘাড় মটকে মেরে পাশেই কাদা পুকুরে পুঁতে দিত। তারাশঙ্করের 'ডাকহরকরা', 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি', 'তামস-তপস্যা' প্রভৃতি রচনায় সুঁদীপুরের বটতলার উল্লেখ আছে। বর্তমানে গাছটির অনেক অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। পাশের খড়ের চালাটি দিনের বেলায় পথিকদের বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে সব বাসই থামে। রাত্রে মাঝে মাঝে এখনও উপদ্রব হয়। সুঁদীপুরের বটতলা আজ অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে জীবন্ত চরিত্রের মত দাঁড়িয়ে আছে। তারাশঙ্করের অমর লেখনী এই অন্ধনীরব বটকে সচল ও সরব করেছে।

গোগা গ্রামের আখড়া

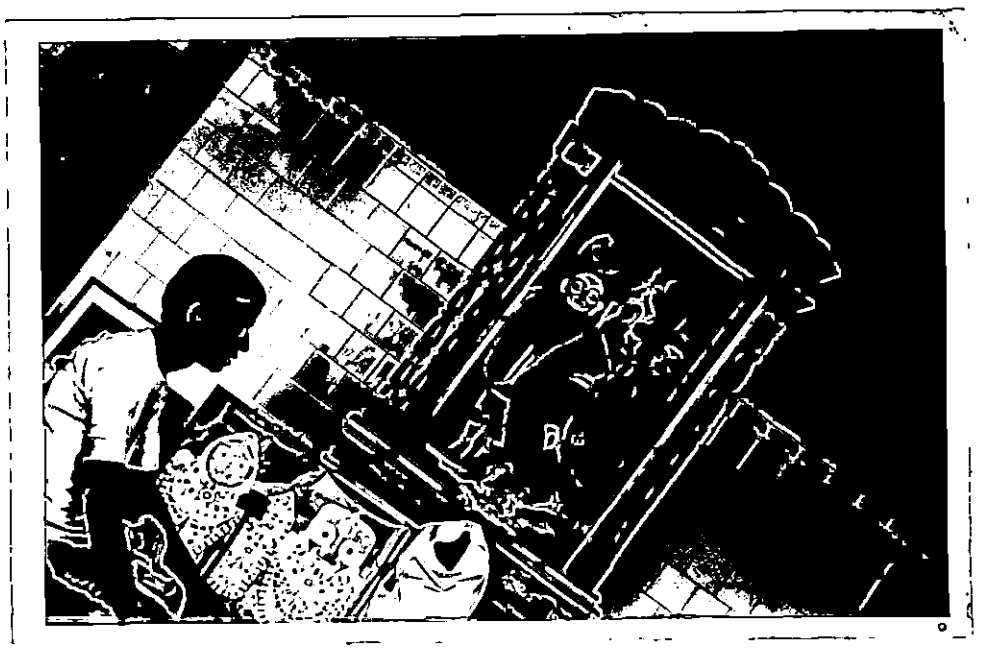

পশ্চিমে জয়দেব কেন্দুলী থেকে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানুবিনে গীত নাই'। বীরভূম তাই প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। লাভপুরের পাশেই (দক্ষিণে) গোগ্রাম— ডাকনাম গোগা। এখানকার অধিবাসী প্রণব দাস ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানান যে, এই গ্রামে প্রাচীনকালে মহর্ষি গর্গমুনি এসেছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম গর্গ গ্রাম > গোগ্রাম> গোগাঁ> গোগা। এখানে একটি প্রায় পাঁচশত বছরের প্রাচীন আখড়া রয়েছে। এখানকার মোহান্ত জানান যে এই আখড়ায় শ্রী চৈতন্যদেবের পদার্পণ ঘটেছিল। এখানে নিত্যপূজা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে আজ প্রায় ধ্বংসের পথে। গ্রামবাসীদের সাহায্যে এই আখড়াটি রয়েছে তবুও এদের অতিথি বাৎসল্য স্মরণীয়। তারাশঙ্করের 'পদচিহ্ন' 'কালান্তর' প্রভৃতি উপন্যাসে গোগাঁ প্রকৃত নামেই বর্ণিত রয়েছে। বহুকাল পূর্বে এই এলাকা এক বাউরী রাজার অধীনে ছিল। সেই রাজার গোশালা ছিল এই গোগাতে। তুর্কীদের হাতে এই রাজার পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই রাজার স্ত্রীর নাম ছিল উদাসী। এই উদাসীর নামে এক দীঘি খনন করিয়েছিলেন রাজা। পরে এই দীঘিটি ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে নাম হয়েছে— " উধোসী'র মাঠ। তারাশঙ্করের বিভিন্ন রচনায় এই "উদাসী মাঠের" কথা আছে। দোল পূর্ণিমায় এখানে মেলা বসে।

ফুল্লরা মহাপীঠ অট্টহাস

লাভপুর থেকে ধনডাঙ্গা বা বাকুল যাবার পথের পাশেই রয়েছে ফুল্লরা মহাপীঠ বা অট্টহাস। লাভপুরের পীঠস্থান। প্রবাদ আছে যে এখানে সতীর অধরওষ্ঠ পড়েছিল। মন্দির মধ্যে অঙ্গ ও আকৃতিহীন একটি বৃহৎ শিলা ফুল্লরা-ও অট্টহাস উভয় নামেই পরিচিত। পাশেই শ্মশানক্ষেত্র। জঙ্গলাকীর্ণ জলাশয়ের তীরে অবস্থিত অতি প্রাচীন তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্র। বসন্ত কবিরাজ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে লাভপুর থানার সিদ্ধল গ্রামের প্রথম ভবদেবের মহাদেব ও অট্টহাস নামে দুই ভাই ছিলেন। অট্টহাস সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করে লাভপুরের এই পীঠস্থানে সাধনা করেন। তাঁর নামানুসারে ফুল্লরা পীঠ অট্টহাস হয়েছে। স্বর্গীয় যাদবলাল চট্টোপাধ্যায় এই মন্দিরের সংস্কার করেন। এখানে পঞ্চমুন্ডির আসন আছে।

বর্তমানে এই পীঠের পূজারী হলেন স্থানীয় বাকুল গ্রামের সমরেন্দ্র নাথ উকিল (মিশ্র), সঞ্জীব কুমার ও'ঝা। এরা আমাকে জানান যে, প্রতিদিন সকালে আসেন ও সন্ধ্যায় বাড়ী চলে যান। 'কবি' 'কালান্তর' উপন্যাসের দেবী চন্ডিকা এখানকারই দেবী।

তারামা মন্দির

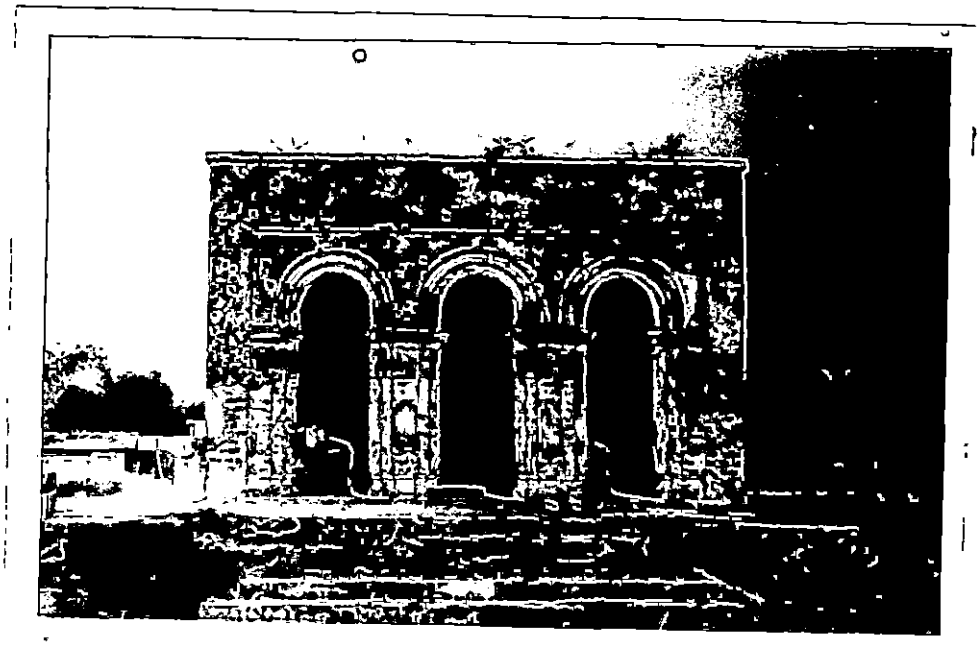

তারাশঙ্করের বংশ তান্ত্রিক। শাক্ত ধর্মে বিশ্বাসী। তারাশঙ্করের বাবা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের প্রান্তে জনহীন প্রান্তরে মন্দির তৈরী করে 'তারা' পূজার প্রবর্তন করেন। আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন চতুর্দশীর মহানিশাতে 'তারা' মায়ের পূজা হয়। এখানেই লেখক পূজারী হিসেবে সতীশ ভট্টাচার্যকে নিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রভাবেই লেখকের তন্ত্রের উপর বিশ্বাস জাগে। কৈশোর, যৌবন বয়সে এমনকি পরিণত বয়সেও তারাশঙ্কর এই তারা-মায়ের পূজায় "তারামায়ের ডাঙার' মন্দিরে কখনই অনুপস্থিত ছিলেন না। এখানকার মায়ের নামেই লেখকের নামকরণ হয়েছিল তারাশঙ্কর।

বাসস্ট্যান্ড থেকে নেমে লাভপুরের পূর্বদিকে প্রায় এক কিমি পায়ে হাঁটা পথে যেতে হয়। বিশাল ফাঁকা মাঠ ছিল-বর্তমানে অনেকটাই জমিতে পরিণত। মন্দিরের একটু দূরে একজন মানসিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মেঠো কয়েকখানি কুটীর তৈরী করেছেন। বর্তমানে মন্দিরে পূজা হয় না। তা ভগ্ন ও জীর্ণ প্রায়। মন্দিরের ভেতরে একখানি শিবলিঙ্গ আছে।

মদের চোলাই এর ক্রেতা-বিক্রেতা

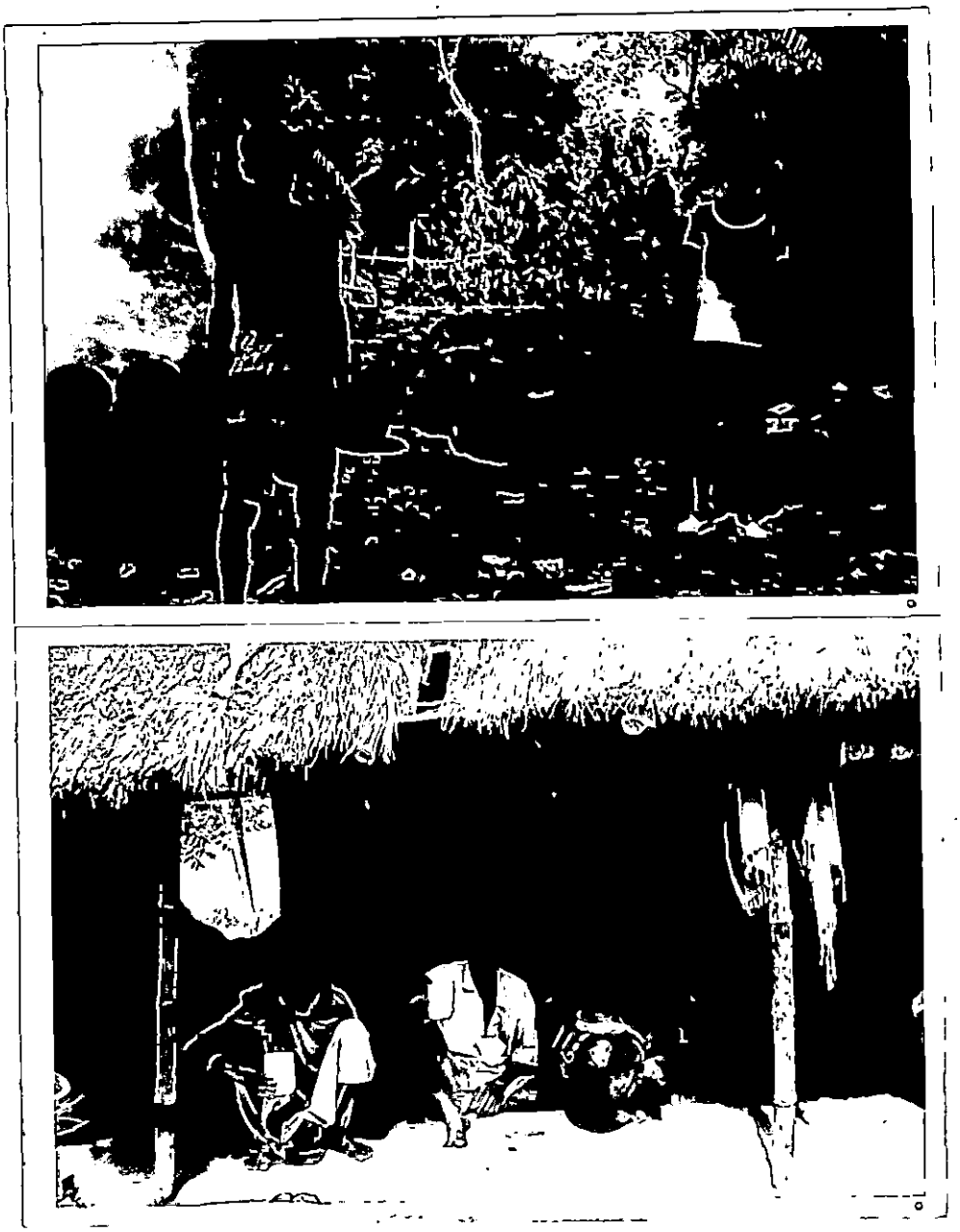

রাঢ়ের কাঁকুরে মাটি, রুক্ষপ্রান্তর, ছাতিফাটা মাঠের মতই এখানকার আদিবাসীগণও শুষ্কপ্রাণ, দারিদ্রক্লিষ্ট, নিরক্ষর মানুষগুলো-তাই ভবিষ্যতের রঙিন আলোর স্বপ্ন দেখে না। তারা সাময়িক আনন্দ লাভের জন্যে দিশাহারা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা তাদের কাছে কেবল জীব ছাড়া কিছুই নয়। ব্যথা-যন্ত্রনা ভুলতে তাই তারা মদ পানকেই শ্রেয় হিসেবে গ্রহণ করে। উপরের চিত্র দুটি তারই প্রমাণ। আমি উনত্রিশে ডিসেম্বর, ছিয়ানব্বই তে সকাল আটটায় তারা মায়ের ডাঙ্গা যাবার পথে এই চিত্র দেখতে পাই। এদের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র সংসার আছে। ঘরেতে ভাত নেই, তবুও সকাল থেকেই ভাতের তৈরী মদ খাচ্ছে। এই দোকানের মালিক মধ্যবিত্ত ও উচ্চবর্ণের। পুরুষ পরম্পরায় তাদের এই দোকান। দুজন কর্মচারী সর্বদা এখানে থাকে। ভল্লা-বাগদী ও সাঁওতালরা অনেকেই আজও বাড়ীতে মদ চোলাই করে খায় ও বিক্রি করে। তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে ও উপন্যাসে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

লাভপুর স্টেশন ও বটগাছ

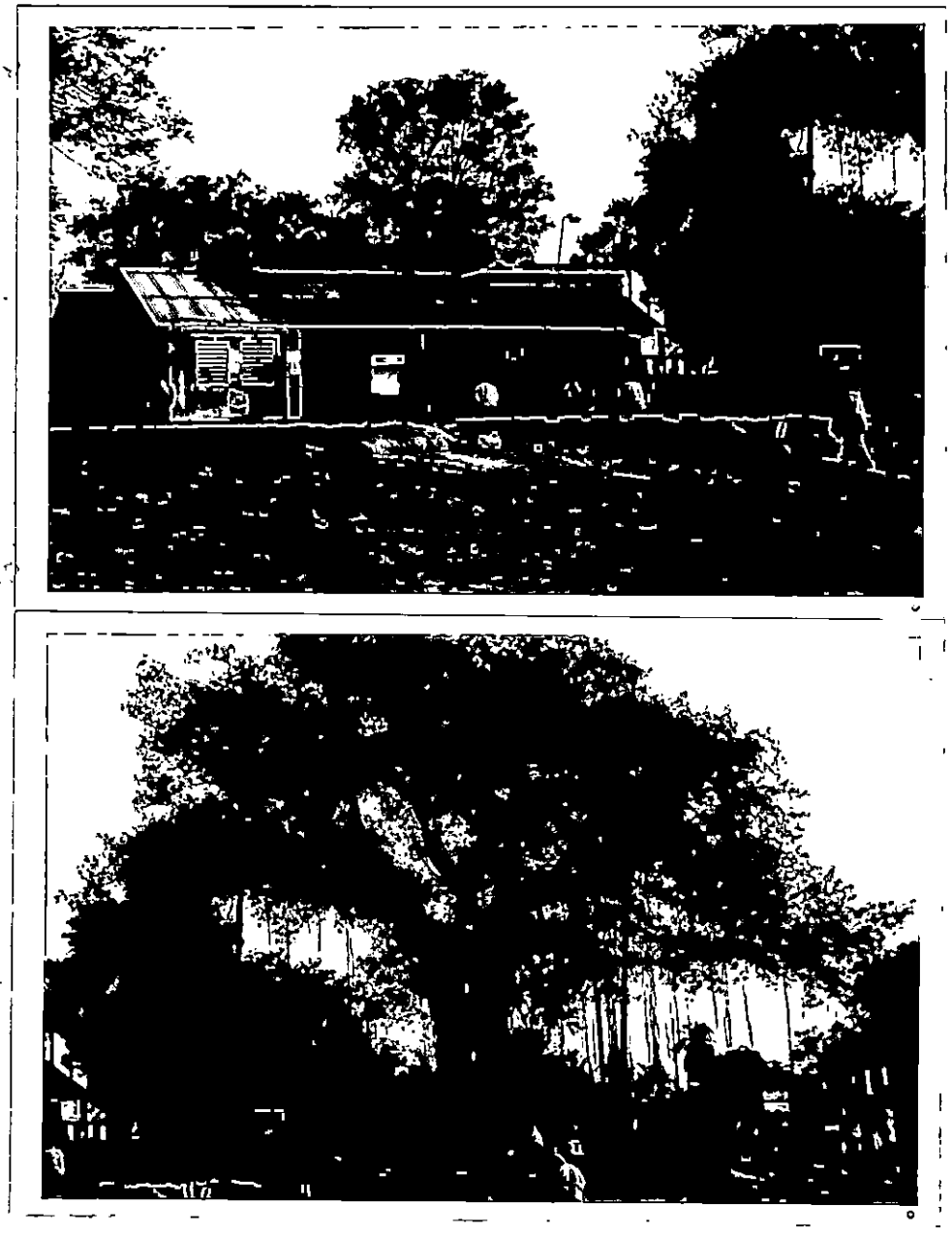

আহমদপুর কাটোয়া ছোট রেলপথের মাঝে একটি ছোট স্টেশন লাভপুর। তারাশঙ্করের সাহিত্যে এই স্টেশনটির জীবন্ত ভূমিকা রয়েছে। এখানকার মামার চায়ের দোকান, দ্বিজপদ, রাজন, নিতাই কবিয়াল, পঙ্খী, ঠাকুরঝির এ এক জীবন্ত চরিত্র। স্টেশনের কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে পঙ্খী ভিক্ষে করত; এখানে দাঁড়িয়ে নিতাই গান বাঁধতো, দেখতো ঠাকুরঝি আসছে কিনা। স্টেশনে নেমে তারাশঙ্কর এদের দেখতেন, এদের সঙ্গে গল্প করতেন। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি আজ আর নেই। কৃষ্ণচূড়ার সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বটগাছটি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সড়ক পথের যোগাযোগ বাড়ার জন্য স্টেশনটি যেন মনে হয় জনহীন এক নির্জন সাধনার স্থল। আর সেখানে একাকী নিতাই প্রশ্ন করে আকাশের দিকে চেয়ে —" জীবন এত ছোট ক্যানে"।

বাড়ীর প্রবেশদ্বার / ছবি ও ভাস্কর্য

তারাশঙ্করের আঁকা গ্রাম-বাংলার ছবি

তারাশঙ্করের তৈরি কাটুম-কুটুম

এই চিত্রটি তারাশঙ্করের বাড়ী "ধাত্রীদেবতার" ভিতরের প্রবেশদ্বার। ভেতরে দর-দালান ও দুটি ঘর রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বারের ঠিক সামনে রয়েছে লেখকের লেখার একখানি গোলাকৃতি ঘর। সবই প্রায় ধ্বংসের মুখে। তবে এ বছর পঞ্চায়েতের হাতে এই বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৪ঠা অক্টোবর '৯৬।

ছবি ও ভাস্কর্য গঠনে তিনি জীবনের কিছু সময় ব্যয় করেছিলেন। গ্রামবাংলার চিত্র। আবার মাটি বা কাঠের তৈরী কাটুম-কুটুম বা নারীমূর্তি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তিলে তিলে তিলোত্তমায় পরিণত করেছেন। নারী মূর্তিটি তারাশঙ্করের দরদালানের এক প্রান্তে রক্ষিত আছে। এছাড়া অনেক ভাস্কর্য ও চিত্র কলকাতার বাড়ীতে আছে। অবশ্য প্রণব বাবু জানান যে কলকাতা থেকে এসব চিত্র ও পাণ্ডুলিপি নিয়ে এখানে এসে সংগ্রহশালা করা হবে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রকাশকাল

প্রথম খন্ড

	গল্প	কোথায় প্রকাশিত	প্রকাশকাল বঙ্গাব্দ
১।	স্রোতের কুটো	পূর্ণিমা	আষাঢ়-১৩৩৪
২।	উল্কা	পূর্ণিমা	আশ্বিন-১৩৩৪
৩।	রসকলি	কল্লোল	ফাল্গুন-১৩৩৪
৪।	হারানো সুর	কল্লোল	বৈশাখ-১৩৩৫
৫।	স্থলপদ্ম	কল্লোল	শ্রাবণ-১৩৩৫
৬।	চোখের ভুল	উপাসনা	ভাদ্র-১৩৩৫
৭।	শ্মশানের পথে	কালি-কলম	আশ্বিন-১৩৩৫
৮।	কুশ-পুত্তলী	উত্তরা	অগ্রহায়ণ-১৩৩৫
৯।	মরুর মায়া	উপাসনা	মাঘ-ফাল্গুন-১৩৩৭
১০।	রাইকমল	কল্লোল	জৈষ্ঠ-১৩৩৬
১১।	প্রসাদমালা	নবশক্তি	ফাল্গুন-১৩৩৭
১২।	বড়-বৌ	উপাসনা	শ্রাবণ-১৩৩৮
১৩।	মালাচন্দন	উপাসনা	ফাল্গুন-১৩৩৮
১৪।	আলো-আঁধারি	ভারতবর্ষ	বৈশাখ-১৩৩৯
১৫।	সর্বনাশী এলোকেশী	উপাসনা	পৌষ-১৩৩৯
১৬।	সন্ধ্যামণি	বঙ্গশ্রী	মাঘ-১৩৩৯
১৭।	ডাইনীর বাঁশী	ভারতবর্ষ	বৈশাখ-১৩৪০
১৮।	মেলা	বঙ্গশ্রী	বৈশাখ-১৩৪০
১৯।	বাউল	অভ্যুদয়	জৈষ্ঠ-১৩৪০
২০।	রাজা, রাণী ও প্রজা	ভারতবর্ষ	শ্রাবণ-১৩৪০
২১।	শ্মশান-বৈরাগ্য	বঙ্গশ্রী	আশ্বিন-১৩৪০
২২।	খড়্গ	ভারতবর্ষ	আশ্বিন-১৩৪০
২৩।	আখড়াইয়ের দীঘি	প্রবাসী	কার্ত্তিক-১৩৪০
২৪।	মধু মাস্টার	বঙ্গশ্রী	অগ্রহায়ণ-১৩৪০
২৫।	ব্যাধি	ভারতবর্ষ	পৌষ-১৩৪০
২৬।	ট্যারা	প্রবাসী	মাঘ-১৩৪০
২৭।	ছলনাময়ী	বঙ্গশ্রী	মাঘ-১৩৪০
২৮।	পুরোহিত	প্রবাসী	বৈশাখ-১৩৪১
২৯।	এ্যাও	শনিবারের চিঠি	বৈশাখ-১৩৪১
৩০।	জলসাঘর	বঙ্গশ্রী	বৈশাখ-১৩৪১

৩১।	নারী ও নাগিনী	দেশ	শারদীয়া-১৩৪১
৩২।	শ্রীনাথ ডাক্তার	বঙ্গশ্রী	আশ্বিন-১৩৪১
৩৩।	মুহূর্ত	নাগরিক	শারদীয়া-১৩৪১
৩৪।	মুখুজ্জে মহাশয়	বঙ্গশ্রী	কার্ত্তিক-১৩৪১
৩৫।	ঘাসের ফুল	প্রবাসী	কার্ত্তিক-১৩৪১
৩৬।	টহলদার	বঙ্গশ্রী	পৌষ-১৩৪১
৩৭।	বিষধর	নবশক্তি	ফাল্গুন-১৩৪১
৩৮।	কুলীনের মেয়ে	প্রবাসী	চৈত্র-১৩৪১
৩৯।	মহামারী	নাগরিক	বাসন্তী সংখ্যা-১৩৪১
৪০।	পুত্রেষ্টি	প্রবাসী	শ্রাবণ-১৩৪২
৪১।	তারিণী মাঝি	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৪২
৪২।	রাখাল বাঁড়ুজ্জে	দেশ	আশ্বিন-১৩৪২
৪৩।	পদ্মবউ	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৪২
৪৪।	মতিলাল	প্রবাসী	কার্ত্তিক-১৩৪২
৪৫।	মধুর বিষ	দেশ	২৫মাঘ-১৩৪২
৪৬।	খাজাঞ্চিবাবু	নতুন পত্রিকা	মাঘ-১৩৪২
৪৭।	রঙীন চশমা	প্রবাসী	ফাল্গুন-১৩৪২
৪৮।	আধলা ও পয়সা	দেশ	জৈষ্ঠ-১৩৪৩
৪৯।	প্রতিধ্বনি	প্রবাসী	আষাঢ়-১৩৪৩
৫০।	সমুদ্র-মন্থন	আনন্দবাজার (শারদীয়া)	১৩৪৩
৫১।	চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস	দেশ শারদীয়া	১৩৪৩
৫২।	ইস্কাপন	আনন্দবাজার	মহাষ্টমী-১৩৪৩
৫৩।	প্রতীক্ষা	কেশরী শারদীয়া	১৩৪৩
৫৪।	ডাক-হরকরা	প্রবাসী	কার্ত্তিক-১৩৪৩
৫৫।	রায়বাড়ি	ভারতবর্ষ	অগ্রহায়ণ-১৩৪৩
৫৬।	তাসের ঘর	দেশ	অগ্রহায়ণ-১৩৪৩
৫৭।	মাছের কাঁটা	শনিবারের চিঠি	মাঘ-১৩৪৩
৫৮।	তপোভঙ্গ	দেশ	মাঘ-১৩৪৩
৫৯।	ব্যাঘ্রচর্ম	আনন্দবাজার (দোল সংখ্যা)	১৩৪৩
৬০।	পণ্ডিত মশাই	দেশ	চৈত্র-১৩৪৩
৬১।	অগ্রদানী	প্রবাসী	চৈত্র-১৩৪৩

পরিশিষ্ট-১

১।	মুকুন্দের জলিস (কমন্দক)	পূর্ণিমা	অগ্রহায়ণ-১৩৩৩
২।	ভালচার ক্লাব	পূর্ণিমা	পৌষ-১৩৩৩
৩।	উপন্যাসের উপদ্রব	পূর্ণিমা	মাঘ-১৩৩৩
৪।	কলা কসরৎ	পূর্ণিমা	মাঘ-১৩৩৩

পরিশিষ্ট-২

১।	কুড়ানো ঘড়ি (অনুবাদ গল্প)	দেশ	চৈত্র-১৩৪২

২য় খন্ড

১।	নুটু মোক্তারের সওয়াল	প্রবাসী	ভাদ্র-১৩৪৪
২।	ভ্রমণ বাহিনী	দেশ	ভাদ্র-১৩৪৪
৩।	প্রতিমা	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৪৪
৪।	কাঁটা	দেশ	শারদীয়া-১৩৪৪
৫।	পঞ্চরুদ্র	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৪৪
৬।	বাণী মা	সচিত্র ভারত	শারদীয়া-১৩৪৪
৭।	রাজপুত্র	প্রবাসী	কার্ত্তিক-১৩৪৪
৮।	তিন শূন্য	শনিবারের চিঠি	কার্ত্তিক-১৩৪৪
৯।	সন্তান	শনিবারের চিঠি	অগ্রহায়ণ-১৩৪৪
১০।	ইতিহাস	দেশ	মাঘ-১৩৪৪
১১।	হোলি	শনিবারের চিঠি	চৈত্র-১৩৪৪
১২।	কালাপাহাড়	রসকলি	বৈশাখ-১৩৪৫
১৩।	মুসাফির খানা	রসকলি	বৈশাখ-১৩৪৫
১৪।	চৌকিদার	প্রবাসী	বৈশাখ-১৩৪৫
১৫।	রাজসাপ	শনিবারের চিঠি	বৈশাখ-১৩৪৫
১৬।	রাঠোর ও চন্দাবত	ঐ	জৈষ্ঠ-১৩৪৫
১৭।	সংসার	প্রবাসী	আষাঢ়-১৩৪৫
১৮।	মা	পরিচয়	আষাঢ়-১৩৪৫
১৯।	না	প্রবাসী	আশ্বিন-১৩৪৫
২০।	রাধারাণী	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৪৫
২১।	সাবিত্রী চুড়ি	দোল	শারদীয়া-১৩৪৫
২২।	মালাকার	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৪৫
২৩।	শাপমোচন	অলকা	অগ্রহায়ণ-১৩৪৫

২৪।	'ট্রিটি'	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৪৬
২৫।	সুখনীড়	অলকা	আশ্বিন-১৩৪৬
২৬।	চোরের মা	বৈজয়ন্তী	কার্তিক-১৩৪৬
২৭।	পিতা-পুত্র	প্রবাসী	কার্তিক-১৩৪৬
২৮।	বেদিনী	শনিবারের চিঠি	কার্তিক-১৩৪৬
২৯।	ডাইনী	প্রবাসী	আষাঢ়-১৩৪৭
৩০।	রাঙাদিদি	ভারতবর্ষ	ভাদ্র-১৩৪৭
৩১।	বন্দিনী কমলা	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৪৭
৩২।	দিল্লীকা লাড্ডু	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৪৭
৩৩।	চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা	দেশ	শারদীয়া-১৩৪৭
৩৪।	পিঞ্জর	চতুরঙ্গ	আশ্বিন-১৩৪৭
৩৫।	চোর	ভারতবর্ষ	কার্তিক-১৩৪৭
৩৬।	কবি	প্রবাসী	কার্তিক-১৩৪৭
৩৭।	একরাত্রি	শনিবারের চিঠি	কার্তিক-১৩৪৭
৩৮।	চরহাটির স্টেশন মাস্টার	তিনশূন্য	বৈশাখ-১৩৪৮
৩৯।	হরি পন্ডিতের কাহিনী	প্রবাসী	বৈশাখ-১৩৪৮
৪০।	রাণুর বিবাহ	প্রতিধ্বনি	চৈত্র-১৩৪৯
৪১।	ইষ্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান।	দিল্লীকা লাড্ডু	কার্তিক-১৩৫০
৪২।	যাদুকরী	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৪৮
৪৩।	প্রত্যাবর্তন	প্রবাসী	কার্তিক-১৩৪৮
৪৪।	সনাতন	শনিবারের চিঠি	কার্তিক-১৩৪৮
৪৫।	শ্যামাদাসের মৃত্যু	ঐ	আশ্বিন-১৩৫০
৪৬।	জায়া	যাদুকরী	ফাল্গুন-১৩৫০
৪৭।	ময়দানব	যুগান্তর	শারদীয়-১৩৫০
৪৮।	মরা মাটি	দিগন্ত	আশ্বিন-১৩৫০
৪৯।	অহেতুক	শনিবারের চিঠি	কার্তিক-১৩৫০
৫০।	চব্বিশে ডিসেম্বর	স্থলপদ্ম	ফাল্গুন-১৩৫০
৫১।	সুরতহাল রিপোর্ট	আনন্দবাজার	দোল-১৩৫০
৫২।	শেষ কথা	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৫১
৫৩।	বোবা কান্না	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৫১
৫৪।	পৌষ-লক্ষ্মী	যুগান্তর	শারদীয়া-১৩৫১
৫৫।	আখেরী	শনিবারের চিঠি	অগ্রহায়ণ-১৩৫১

৫৬।	দেবতার ব্যাধি	প্রসাদমালা	শ্রাবণ-১৩৫২
৫৭।	সাড়ে সাত গন্ডার জমিদার	হারানো সুর	অগ্রহায়ণ-১৩৫২
৫৮।	জুয়াড়ী	হারানো সুর	অগ্রহায়ণ-১৩৫২
৫৯।	ইমারত	আনন্দবাজার	শারদীয়া-১৩৫২
৬০।	তৃষ্ণা	সোনার বাংলা	শারদীয়া-১৩৫২
৬১।	তমসা	দৈনিক বসুমতী	নববর্ষ-১৩৫২
৬২।	কান্না	শনিবারের চিঠি	কার্তিক-১৩৫২
৬৩।	শবরী	দিগন্ত	চৈত্র-১৩৫২
৬৪।	নারী	ইমারত	মাঘ-১৩৫৩
৬৫।	আরোগ্য	ইমারত	মাঘ-১৩৫৩

তৃতীয় খন্ড

১।	কামধেনু	কথাশিল্প	আশ্বিন-১৩৫৩
২।	কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি	বসুমতি	পূজাসংখ্যা-১৩৫৩
৩।	পাটনী	গল্পভারতী	বৈশাখ-১৩৫৪
৪।	নবমহাপ্রস্থান	শনিবারের চিঠি	মাঘ-১৩৫৪
৫।	বিধাতা ও মানুষ	রংমশাল	১৩৫৪
৬।	স্বাধীনতা	শনিবারের চিঠি	১৩৫৪
৭।	গবিন সিংয়ের ঘোড়া	ছায়াপথ	১৩৫৫
৮।	মাটি	যুগান্তর	শারদীয়া-১৩৫৬
৯।	বেদের মেয়ে	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৫৬
১০।	বাঞ্ছাপূরণ	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৫৭
১১।	ময়দান	মাটি	কার্ত্তিক-১৩৫৭
১২।	ডাইনী	মৌচাক	বৈশাখ-১৩৫৮
১৩।	বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা	শনিবারের চিঠি	আশ্বিন-১৩৫৮
১৪।	শিলাসন	যুগান্তর	পূজাসংখ্যা-১৩৫৮
১৫।	প্রহ্লাদের কালী	শিলাসন	মাঘ-১৩৫৮
১৬।	বরমলাগের মাঠ	চতুরঙ্গ	১৩৬০
১৭।	বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী	শারদীয়া	১৩৬০
১৮।	হেডমাস্টার	শারদীয়া	১৩৬১
১৯।	জন্মান্তর	তরুণের স্বপ্ন	বৈশাখ-১৩৬২
২০।	কালো মেয়ে	বিস্ফোরণ	জৈষ্ঠ-১৩৬২
২১।	বিস্ফোরণ	বিস্ফোরণ	জৈষ্ঠ-১৩৬২
২২।	জটায়ু	শারদীয়া	১৩৬০

২৩।	একটি মুহূর্ত	বিস্ফোরণ	জৈষ্ঠ-১৩৬২
২৪।	আফজল খেলোয়াড়ী ও রমজান শের আলি	শারদীয়া	১৩৬২
২৫।	আলোকাভিসার	শনিবারের চিঠি	বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬২
২৬।	কমল মাঝির গল্প	জয়যাত্রা	১৩৬৩
২৭।	বিষপাথর	দেশ	পূজাসংখ্যা-১৩৬৪
২৮।	বাবুরামের বাবুয়া	শিশুসাথী	পূজাসংখ্যা-১৩৬৪
২৯।	রবিবারের আসর	বিষ পাথর	অগ্রহায়ণ-১৩৬৪
৩০।	মানুষের মন	তরুণের স্বপ্ন	১৩৬৫
৩১।	সাপুড়ের গল্প	তরুণের স্বপ্ন	১৩৬৫
৩২।	সুকু ও ভুকু	শারদীয়া	১৩৬৮
৩৩।	অ্যাক্সিডেন্ট	উল্টোরথ	পূজাসংখ্যা-১৩৬৯
৩৪।	কয়েকফোঁটা রক্ত	বিংশশতাব্দী	পূজাসংখ্যা—১৩৬৯
৩৫।	অভিনয়	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৭০
৩৬।	চিনু মন্ডলের কালাচাঁদ	উত্তরায়ণ	১৩৭১
৩৭।	জগন্নাথের রথ	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৭১
৩৮।	একটি প্রেমের গল্প	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৭১
৩৯।	ভুলোর ছলনা	নীহারিকা	১৩৭২
৪০।	এ মেয়ে কেমন মেয়ে	যুগান্তর	পূজাসংখ্যা-১৩৭২
৪১।	শঙ্করীতলার জঙ্গলে	যুগান্তর	পূজাসংখ্যা-১৩৭৩
৪২।	দীপার প্রেম	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৭৩
৪৩।	রূপসী বিহঙ্গিনী	উল্টোরথ	অগ্রহায়ণ-১৩৭৩
৪৪।	দেহের প্রদীপে রূপের শিখা	জলসা	পূজাসংখ্যা-১৩৭৪
৪৫।	ডগি-এ্যালশেসিয়ান নয়	ঝিলিমিলি	১৩৭৪
৪৬।	শিবানীর অদৃষ্ট	জলসা	পূজাসংখ্যা-১৩৭৫
৪৭।	ভূত-পুরান	ইন্দ্রনীল	১৩৭৫
৪৮।	এক পশলা বৃষ্টি	এক পশলা বৃষ্টি	১৩৭৫
৪৯।	দিগ্বিজয়ী ও নগ্ন-সন্ন্যাসী	শারদীয়া	১৩৭৪
৫০।	অক্ষয় বটোপাখ্যানম্	শুকসারী	১৩৭৬
৫১।	ভবানন্দের কাশীযাত্রা	সন্দেশ	পূজাসংখ্যা-১৩৭৭
৫২।	প্রত্যাখ্যান	রূপসীবিহঙ্গিনী	১৩৭৭
৫৩।	স্বর্গলোকে ভূমিকম্প	মনিহার	১৩৭৭
৫৪।	উত্তর কিষ্কিন্ধাকান্ড	উদ্বোধন	১৩৭৮

৫৫।	গোপাস বাঁধের ইতিকথা	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৭৭
৫৬।	সখী ঠাকরুন	আনন্দবাজার	পূজাসংখ্যা-১৩৭৭

পরিশিষ্ট

১।	যাদুকরের মৃত্যু	কামধেনু	
২।	গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী	মাটি	
❖ ৩।	শেষ অভিনয়	অমৃত	পূজাসংখ্যা-১৩৬৯

❖ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত "তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ" গ্রন্থ ত্রয় থেকে প্রাপ্ত।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ বাংলা

	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশকাল
১।	ইসলাম ড: নজরুল	বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	২য় সং ১৪০২
২।	উমর ড: বদরুদ্দিন	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ঊনবিংশ শতকে বাঙালী সমাজ	৩য় সং ১৯৮৮
৩।		সাম্প্রদায়িকতা	(ঢাকা) ১৯৮৭
৪।		দেশের কথা	জৈষ্ঠ ১৩৭৯
৫।	কর পরিমল	সমাজতত্ত্ব	৬ষ্ঠ সং ১৯৯২
৬।	কালিম ড: মুসা	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক	১ম প্রকাশ ১৯৮৮
৭।	গঙ্গোপাধ্যায় ড: নারায়ণ	বাংলাগল্প বিচিত্রা	মাঘ ১৩৬৪
৮।		ছোটগল্পের সীমারেখা	১ম সং ১৯৬৯
৯।	গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ	আমার ধ্যানের ভারত	জৈষ্ঠ ১৩৭৬
১০।	গুপ্ত ড: অতুল	সমাজ ও বিবাহ	(বেঙ্গল পাবলিশার্স) ১৩৫৩
১১।	গুপ্ত ড: ক্ষেত্র	রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব	২য় সং ১৯৯৩
১২।		তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা	১ম সং ১৯৬০
১৩।	গুপ্ত ড: সনৎ (সম্পাদিত)	শম্ভুচন্দ্রের "বিদ্যাসাগর জীবন চরিত"	নতুন সং
১৪।	গোস্বামী ড: অচ্যুত	বাংলা উপন্যাসের ধারা	১ম সং ১৩৬৪
১৫।	গোস্বামী অঞ্জন	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু মুসলমান	১ম প্রকাশ ১৯৯৫
১৬।	গোস্বামী ননীগোপাল	চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব	১ম প্রকাশ ১৩৭৯
১৭।	ঘোষ অজিত কুমার	বাংলা নাটকের ইতিহাস	৫ম সংখ্যা ১৯৭০
১৮।	ঘোষ ড: প্রদ্যোত	আচার্য বিনয়কুমার সরকার	১ম সং ১৯৮৮
১৯।	ঘোষ প্রবীর	অলৌকিক নয় : লৌকিক	(১ম ও ২য় খন্ড) ১৯৯০
২০।		অলৌকিক নয় লৌকিক	৩য় খন্ড ৪র্থ সং ১৯৯৪
২১।	ঘোষ বিনয়	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম খন্ড)	২য় সং ১৯৭৬
২২।		বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব	১ম প্রকাশ ১৩৮৬
২৩।		বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ	১৯৭৩
২৪।	চক্রবর্তী অমিতাভ	সাম্প্রদায়িকতা-উৎস ও প্রসার	১ম প্রকাশ ১৯৯৩
২৫।	চক্রবর্তী ড: বরুণ	লোক বিশ্বাস ও লোক সংস্কার	১৩৭৮ বঙ্গাব্দ
২৬।	চট্টোপাধ্যায় ড: গিরীন্দ্রনাথ	ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি	১ম সং ১৯৮৬
২৭।	চট্টোপাধ্যায় ড: প্রীতিভূষণ	মনোবিদ্যা	৮ম সং ১৯৮৫
২৮।	চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র	বিবিধ প্রবন্ধ পাত্রজ সং	১৯৮৩
২৯।	চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র	নারীর মূল্য	৩য় সং ১৩৯৯
৩০।	চৌধুরী ননী মাধব	ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়	১ম সং ১৯৮০
৩১।	চৌধুরী ভূদেব	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	৪র্থ সং ১৯৮৯

৫১।	চৌধুরী ড: মুক্তি	উপন্যাসিক তারাশঙ্কর	১ম সং ১৯৭৭
৫২।	তালিব মোহাম্মদ আবদুল	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ (ঢাকা)	১৯৮৬
৫৪।	তর্করত্ন রামনারায়ণ	কুলীন কুল সর্বস্ব	১ম প্রকাশ ১৮৫৪
৫৫।	দত্ত ড: ভূপেন্দ্রনাথ	বাংলার ইতিহাস	১৩৮৩
৫৬।	দাস প্রাণগোবিন্দ	রাষ্ট্রচিন্তার ইতিবৃত্ত	২য় সং ১৯৮৮
৫৭।	দাস শিশিরকুমার	বাংলা ছোটগল্প	দে'জ সং ১৯৮৩
৫৮।	ড: দাশ সত্যনারায়ণ	বীরভূমের ভাষা ও শব্দকোষ	১ম সং ১৯৮৮
৫৯।	দাশগুপ্ত অশীন	ইতিহাস ও সাহিত্য	১ম সং ১৯৮৯
৪০।	দাশগুপ্ত সমীর	সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১ম প্রকাশ ১৯৮০
৪১।	দাশগুপ্ত সুরজিৎ	ভারতবর্ষ ও ইসলাম	১৩৯৮
৪২।	দে ড: অমলেন্দু	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ	৩য় সং ১৯৯১
৪৩।	দে বিশ্বনাথ	তারাশঙ্কর বিচিত্রা	১ম সং ১৯৮০
৪৪।	দেউস্কর সখারাম গণেশ	দেশের কথা	ডিসেম্বর ১৯৮৭
৪৫।	পশ্চিমবঙ্গ সরকার	রবীন্দ্রনাথ রচনাবলীর জন্মশতবার্ষিকী সংকলন	১৩দশ সং ১৯৬২
৪৬।	বন্দ্যোপাধ্যায় ড: অসিতকুমার	বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত (১০ম-২০শ শতক)	৩য় সং-১৩৭৮ :
৪৭।	বন্দ্যোপাধ্যায় ড: চৈতালী	উপন্যাসে আঙ্গিক	১ম সং ১৯৯০
৪৮।	বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক	লেখকের কথা	২য় মুদ্রণ ১৯৮১
৪৯।	বন্দ্যোপাধ্যায় রাখালদাস	বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম খন্ড)	১৯৮৭
৫০।	বন্দ্যোপাধ্যায় ড: শ্রীকুমার	বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা--	নবম পুনঃমুদ্রণ ১৯৬২
৫১।	বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেশ কুমার	দাঙ্গার ইতিহাস (মিত্র ও ঘোষ)	১৩৯৯
৫২।	বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর	৩য় সং ১৯৭৬
৫৩।	বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর	তারাশঙ্কর বীথিকা	১ম প্রকাশ ১৯৭৩
৫৪।		রচনাবলী ১ম খন্ড (মিত্র ও ঘোষ)	৪র্থ মুদ্রণ ১৩৯১
৫৫।		হাঁসুলীবাঁকের উপকথা	১১সং ১৩৮৬
৫৬।		আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড	১৩৬০ ২য় খন্ড
৫৭।		সমগ্র রচনাবলী (১০ম খন্ড) ৪র্থ মুদ্রণ (মিত্র ও ঘোষ)	১৪০০
৫৮।		কবি..... ১ম প্রকাশ	১৯৪৪
৫৯।		রাইকমল..... ১ম প্রকাশ	১৯৩৫
৬০।		আমার কথা (সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)	১ম প্র: ১৪০২
৬১।		আমার কালের কথা	১ম সং ১৯৫৮
৬২।		সাহিত্যের-সত্য রচনাবলী (মিত্র ও ঘোষ)	২য় মুদ্রণ ১৩৮২
৬৩।	বসু নির্মলকুমার	হিন্দু সমাজের গড়ন	১ম সং ১৩৫৩
৬৪।	বসু ড: নিতাই	তারাশঙ্করের শিল্পিমানস	১ম সং (দে'জ) ১৯৮৮
৬৫।	বসু শুদ্ধসত্ত্ব	অনন্বয় ও আধুনিক বাংলা কবিতা	১ম প্রকাশ ১৯৭৬
৬৬।	বাগ ধনপতি (অনু)	সিগমুন্ড ফ্রয়েড / টোটেম ও টাবু	১ম সং ১৯৯৩

৬৭।	বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র	বিদ্যাসাগর রচনাবলী	সং ১৯৮৭
৬৮।	ভট্টাচার্য ড: আশুতোষ	বাংলা নাটা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খন্ড)	২য় সং ১৯৬০
৬৯।	ভট্টাচার্য কুমুদচন্দ্র	শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক.....	১৯৭৫
৭০।	ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ	বাংলার বাউল ও বাউল গান (১ম খন্ড)	২য় সং ১৩৮৬
৭১।	ভট্টাচার্য জগদীশ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প	১২শ সং ১৩৮৯
৭২।		তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড)	তৃতীয় সং ১৯৯০
৭৩।		ঐ	(২য় খণ্ড) ২য় সং ১৯৮৫
৭৪।		ঐ	(৩য় খণ্ড) ২য় সং ১৯৮৬
৭৫।	ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু	ছোটগল্পে ত্রয়ী	১ম প্রকাশ ১৯৮৫
৭৬।	" সাধনকুমার	এ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্য তত্ত্ব	১ম সং ১৯৭৮
৭৭।	মনু	মনুসংহিতা ----	
৭৮।	মহাপাত্র ড : অনাদিকুমার	বিষয় : সমাজতত্ত্ব ----	১ম প্রকাশ ১৯৯৪
৭৯।	মজুমদার ড : উজ্জ্বলকুমার	তারাশঙ্কর : দেশ-কাল	১ম প্রকাশ ১৩৮৪
৮০।		রবীন্দ্রোত্তর কাল ---	১ম প্রকাশ ১৩৮১
৮১।		মোহিতলাল সাহিত্য বিজ্ঞান	৩য় সং ভাদ্র ১৩৬৮
৮২।	ড: রমেন্দ্র চন্দ্র	বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ৭ম সং ১৯৮১ ২য় খন্ড তয় সং ১৩৮৫	
৮৩।	মাইতি প্রভাতাংশ	ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন যুগ)	৩য় / সং ১৯৯১
৮৪।	মার্কস এঙ্গেলস	উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে.	
৮৫।	মিত্র হরপ্রসাদ	তারাশঙ্কর	১ম সং ১৩৬৮
৮৬।	মুখোপাধ্যায় ড: অরুণকুমার	কালের প্রতিমা	১ম প্রকাশ ১৯৭৪
৮৭।		কালের পুত্তলিকা	১ম সং ১৩৮৯
৮৮।	" আদিত্য	তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ	১ম প্রকাশ ১৯৯৩
৮৯।	" ড: পূর্ণেন্দু শেখর	মার্কসীয় দৃষ্টিকোণে তারাশঙ্করের উপন্যাস	১ম প্র: ১৯৯৪
৯০।	" ড: বিমলাকান্ত অনূদিত	বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য দর্পণ	
৯১।	রঞ্জিত কুমার	তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা	
৯২।	রসুল আবদুল্লাহ	কৃষক সভার ইতিহাস	
৯৩।	রহিম এম, এ	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	(ঢাকা) ১৯৮৯
৯৪।	রজ্জাক মুহম্মদ আবদুর	অনূদিত খন্দাকার ফজলে রাব্বি-বাংলার মুসলমান (ঢাকা) ১৯৬৮	
৯৫।	রায় ধনঞ্জয়	উত্তরবঙ্গের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন ১ম প্রকাশ ১৯৮৪	
৯৬।	রায় ড: নীহাররঞ্জন	বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)	১৩৫৬
৯৭।	রায় রথীন্দ্রনাথ	গল্প পঞ্চাশৎ (ভূমিকা)	১ম সং ১৩৭০
৯৮।		ছোটগল্পের কথা	১৯৮৮
৯৯।	রায় শান্তিময়	ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান— পরিমার্জিত সং ১৯৯৪	
১০০।	রায় সুপ্রকাশ	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ২য় সং ১৯৭২	

১০১।		ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস—	১ম সং ১৯৭০
১০২।	মুক্তি যুদ্ধে	ভারতীয় কৃষক	২য় সং ১৯৮৯
১০৩।	রায় সুশীল	শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন	৯ম সং ১৯৮৯
১০৪।	রায় চৌধুরী ডঃ গোপিকানাথ	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য	অভীক প্রকাশন
১০৫।	শ ডঃ রামেশ্বর	সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা	২য় সং ১৩৯৯
১০৬।	শর্মা ডঃ রামশরণ	ভারতের গণতন্ত্র :	২য় সং ১৯৮৫
১০৭।	শর্মা রামনারায়ণ	কুলীন কুল সর্বস্ব (ডঃ সত্যবত দে ও ডঃ সনাতন গোস্বামী সম্পাদিত)	১ম প্রকাশ ১৯৮৭
১০৮।	শাস্ত্রী শিবনাথ	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ	১ম বিশেষ সং ১৯৮৩
১০৯।	সরকার ডঃ অজয়েন্দ্র নাথ	ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা বিতর্করচনা :	১ম সং ১৯৮২
১১০।	সরকার জয়ন্ত কুমার	পণের আর এক নাম অপমান	১ম প্রকাশ ১৯৯১
১১১।	সরকার জগদীশ নারায়ণ	বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ)	১৩৮৮
১১২।	সরকার সুনীল কুমার	ফ্রয়েড (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)	২য় সং ১৯৮৫
১১৩।	সেন খগেন্দ্র নাথ	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা	(১ম খন্ড) ১৯৯২ পরিমার্জিত সং
১১৪।	সাহু ভবানীপ্রসাদ	শরীর ঘিরে সংস্কার	৪র্থ ১৯৯৩
১১৫।	সাহা ডঃ পঞ্চানন	হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা—	১৯৯২
১১৬।	স্বামী বিবেকানন্দ	রচনা সংকলন (৮ম খন্ড)	৪র্থ সং ১৯৭৭
১১৭।	সেন ক্ষিতি মোহন	হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ)	১ম সং ১৩৫৪
১১৮।	সেন শ্রীদীনেশচন্দ্র	বৃহৎ বঙ্গ ...	কলি ১৩৪১
১১৯।	সেন খগেন্দ্রনাথ	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা	(২য় খন্ড) পরিমার্জিত সং ১৯৯০
১২০।	সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার	কল্লোল যুগ	৭ম প্রকাশ ১৩৯৫
১২১।	সেনগুপ্ত প্রমোদবন্ধু	মনোবিদ্যা	১৪শ সং ১৯৯৫/৯৬

পত্র ও পত্রিকা

১।	অতুল শিব ক্লাবের স্মরণিকা	:	১৯৯০
২।	আনন্দবাজার পত্রিকা	:	১০ই শ্রাবণ ১৩৭৮
৩।	আজকাল পত্রিকা	:	৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর ১৯৯৬
৪।	এক্ষণ (নববর্ষ) ৫ম ও ষষ্ঠ সংখ্যা	:	১৩৭৮
৫।	ওভারল্যান্ড পত্রিকা	:	১লা আগষ্ট ১৯৯৩
৬।	কালি ও কলম	:	তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা ১৩৭৮
৭।	কথা ও সাহিত্য	:	তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা ১৩৭৮
৮।	কালি ও কলম	:	অগ্রহায়ণ ১৩৭৮
৯।	কম্পাস	:	শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৬
১০।	কম্পাস	:	শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৩
	চিত্রাঙ্গদা	:	তারাশঙ্কর সংখ্যা ১৩৭৮
১১।	দেশ পত্রিকা	:	৯/২/১৯৯১
১২।	দেশ পত্রিকা	:	২৩/৯/১৯৭১
১৩।	দেশ পত্রিকা	:	৪/২/১৯৮৯
১৪।	অনুসন্ধান পত্রিকা	:	১২৯৫- ২৯শে বৈশাখ
১৫।	দেশ - সাহিত্য সংখ্যা	:	১৩৬৫
১৬।	রজত জয়ন্তী পত্রিকা	:	ললিত মোহন শ্যাম মোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়-মালদহ ১৯৯৩
১৭।	লোক সংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা ঃ সংখ্যা ১৩৭৪	:	মাঘ/চৈত্র ১৩৯৭
১৮।	লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা	:	শ্রাবণ সংখ্যা - ১৩৭৪
১৮।	শনিবারের চিঠি-	:	১৩৭৪/১৩৭৩/১৩৭৫
১৯।	শনিবারের চিঠি - তারাশঙ্করের সংখ্যা	:	আষাঢ় ১৩৭১
২০।		:	কার্ত্তিক/ অগ্রহায়ণ-১৩৭৮
২১।	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রাবলী	:	শাস্ত্রী প্রিয়নাথ সম্পাদিত।
২২।	সানন্দা	:	১৬ই সেপ্টেম্বর- ১৯৯৪
২৩।	সমন্বয় ঃ শারদীয়া সংখ্যা	:	১৯৯৫

BIBLIOGRAPHY : ENGLISH

	AUTHOR	BOOKS	PUBLISHED
1.	Anderson & Parker	Society its organisation and operation	Delhi 1996
2.	Allen G. & Unwin	quote from Karl Marx's Capital	-Vol-I
3.	Bose Buddhadev	An Acre of green grass	1st Edn 1948
4.	Bhandari D. R.	History of European Pol-Philosophy	9th Edn 1967
5.	Black Mark	Feudal Society	2nd Edn 1962, reprinted 1967, 1971,1975
6.	Bottomore T. B.	Sociology	
7.	Balts William	Consideration of Indian Affairs	1772
8.	Becker Wiese	Systematic Sociology	
9.	Cooley C. H.	Social organisation	1909
10.	Coolie. Dewan Chamanlal	The Story of labour and Capital in India	Vol-I
11.	Chatterjee. S. K.	Starving Millions	
12	Desai A. R.	Social Back ground of Indian Nationalism (5th Edn-1976. Reprinted 1981/82	
13.	Davis Kingsley	Human Society	1st Edn 1956
14.	Foster G. M.	Traditional Cultures and the impact of Technological change , 1969	
15.	Giddings F. A.	Principles of Sociology	1st Edn 1908
16.	Ginsberg Morris	Sociology	1959
17.	Gupta Dr. Kshetra	Structures and Variations Novels of Tagore, 1st Edn-1991	
18.	Ginsberg Morris	Essay in Sociology and Social Philosophy	Peregrine book 1968
19.	Goode William J.	The Family	1970
20.	Gettle	Pol Sc.	6th Edn. 1961
21.	Herskovits Melville . J.	Cultural Anthropology. Chapt XII Religion : Man and the Universe : 1952	
22.	Hunter W. W.	Annals of Rural Bengal-Vol-I	
23.	Knight Margaret of Rex	A modern introduction of Psychology	2nd Edn 1987 (London)
24.	Karl Mark's	Capital-Vol-I (H) (Eng Ed.)	1972
	Lukac's	Studies in Europian Realism	1st Edn.
25.	Lenin V. I	Mark's Engels -Marxism	6th Edn 1946
26.	Leonard Blomfield	Language : Delhi Motilal Baranasidass	1963
27.	Marquis G.	Psychology : Roberts woodworth & Donald	1st Asian Edn 1961
28.	Mackenzie J. S.	Outlines of Social Philosophy -	1921
29.	Mookherjee K. K.	New Education and its aspects	1st Edn 1953
30.	Maity S. K.	Economic life of Northern Indian in Gupta Period	1st Edn 1957
31.	Mac Iver & Page	Society	1st Edn 1950
32.	Ogburn and Nimkoff	A hand book of Sociology....	1960
33.	Pearson K.	Biometrikka.....Vol-3	
34.	Risley H. H.	The Tribs and castes of Bengal	1st Edn 1891

35.	Read curveth	Man and his Superstitions.....	2nd Edn
36.	Shafter G. Willson	The Biological Basis of pediatric practice	
37.	Sarkar J. N.	Islam in Bengal (13th to 19th century)	1972
38.	Sinha N.K	Economic History of Bengal Vol-I,	Cal-1965
39.	Sri Srinibas	Social change in modern India Ch-I/II - 1968	
40.	Sabine	A History of Pol. theory :	3rd Edn 1963
41.	Sen Gupta S. C. (Edited)	Macbeth : Pub by Mookherjee & Co (P) (Ltd) 1986	
42.	Sarkar Sumit	Swadeshi Movement in Bengal (1903-1908)-1973	
43.	Summer W. G.	Folk Ways	1907
44.	Tagore Abanindaranath	Myths of Peru and Mexico	
45.	Toynbee Arnold	A study of History	1972
46.	Tarachand	Histroy of Freedom Movement in India Vol-I	6th Edn 1965
47.	Tendulkar D. G.	Mahatma, 6th Vol Bombay 1954	
48.	Wilson H. H.	Religious Sects of the Hindus	
49.	Waber Max	Essays in Sociology	1st Edn 1947 (London)
50.	Young Husband	Transactions in India-	1786

51. The English works of Raja Rammhon Roy Part-IV 1947 Published by -Sadharan Brahma Samaj.

Journals

1. Amrita Bazar Patrika : 22nd May-1874
2. British Journal of Sociology-Sept-1958

* * * * * * * * * * *

Laser Composed by : Professional Computers. Cal - 6. Ph : 2414130